গন্ধবণিক্

সমাজবন্ধু ৺অবিনাশচন্দ্র দাস, পি-এইচ-ডি, ও রায়বাহাদুর ৺তারকনাথ সাধু সি-আই-ই, প্রতিষ্ঠিত

৪১শ ভাগ

১ম সংখ্যা

যুগ্মসম্পাদক—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু,

শ্রীহারাধন দত্ত

মাঘ - কার্ত্তিক

পৌষ

১৩৬৭ - ৬৮

গন্ধবণিক

সন ১৩৬৭ মাঘ হইতে ১৩৬৮ সালের পৌষ পর্য্যন্ত

সূচীপত্র

গন্ধবণিক্

সমাজবন্ধু ৺অবিনাশচন্দ্র দাস, পি-এইচ-ডি, ও রায়বাহাদুর ৺তারকনাথ সাধু সি-আই-ই, প্রতিষ্ঠিত

৪১শ ভাগ
১ম সংখ্যা

যুগ্মসম্পাদক—
শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীহারাধন দত্ত

মাঘ
১৩৬৭

গন্ধবণিক

সন ১৩৬৭ মাঘ হইতে ১৩৬৮ সালের পৌষ পর্য্যন্ত

সূচীপত্র

—:○:○:—

গন্ধবণিক মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ ১ম সংখ্যা	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	মাঘ ১৩৬৭

প্রসঙ্গ কথা

মাঘের পুণ্যপ্রভাত আমাদের এই জাতীয় পত্রিকার জন্মলগ্ন। সে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগের কথা। ৪০ বৎসর পূর্বে ১৩২৮ সালে আমাদের সমাজের এক আলোকদূত উদাত্তকণ্ঠে 'জাগো গন্ধবণিক' এই ধ্বনিতে বাংলাদেশকে চকিত করেছিলেন। কিন্তু এই মুক্তি মন্ত্রের ক্ষণশাশ্বতী ভাস্বর রূপটিকে আমরা আরও পূর্বে ক্ষণিকের জন্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম—সে ১৩১২ সালের দিকে। এই সময়েই জাতির মুক্তি সাধক আচার্য ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র দাস নিজ চেষ্টায় 'গন্ধবণিক' প্রকাশ করেন। কিন্তু অচিরে তার অবলুপ্তি ঘটে। বৈদিক যুগ হতে যে জাতি সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের জন্য নব মন্ত্রের প্রয়োজন হল কেন? স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে জাগে। পাঠান মোগলযুগেও এই জাতির চরম সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। বাংলার মঙ্গল কাব্য ও ঐ কালের লোকসংগীতগুলি তার নিদর্শন। তবু স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ যেকালে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেন—তখন হতেই এই জাতি তার প্রধান গৌরবকে বিস্মৃত হতে থাকে এবং সুপরিকল্পিত অর্থনীতি জ্ঞানের অভাবে তাঁদের ধন সম্পদের প্রসারও সঙ্কুচিত এবং কাল-ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ কিছুদিন পূর্বে শারদীয় বসুমতীতে যে রচনাটি [১] প্রকাশ করেছিলেন—তা এখানে উল্লিখিতব্য। তারপর আসমুদ্র ভারতব্যাপ্ত করে বিদেশীর প্রভুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অখণ্ড জাতি জীবনের প্রাণ প্রবাহ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস অখণ্ড মনুষ্যজীবনের ইতিহাস কোন প্রকার সাময়িকী ও খণ্ড কালের কারাপ্রাচীরে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ধ্বংস তাণ্ডবের মধ্যেই নবসৃষ্টির সূচনা আমাদের অলক্ষিতে ঘটে যায়। শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে এখানকার মানবাত্মা যখন নিপীড়িত ঠিক সেই কালেই ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের বাণী আমাদের অর্গলরুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে আঘাত হানল। নবযুগের বোধন কেন্দ্র কোলকাতাকে পেলাম। চৈতন্যদেবের জন্মের পর বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে আবার নতুন রেনেসাঁস এল। এই যুগের ষষ্ঠ দশকে অবিনাশ চন্দ্রের জন্ম। ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁর আলোকে মুক্তিস্নান করেছিলেন অবিনাশ চন্দ্র। তাঁর আগমনের বহু পূর্বে বিদ্যাসাগর, রামমোহন অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি নবজাগরণের মুক্তি-

১ বাঙালার সওদাগর শ্রেণী—বিনয় ঘোষ

নায়কেরা এই বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম নবজাগরণের বোধন মন্ত্র উচ্চারন করলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৫ বৎসর পরে অবিনাশচন্দ্রের জন্ম। বিদ্যাসাগর, রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র শতাব্দীর অভিশাপগ্রস্ত বংগসন্তানদের কর্ণকুহরে যে ইহবাদ পুষ্ট নবধর্মের কথা শোনালেন—অবিনাশচন্দ্রের কালে তারই জয়যাত্রা। অবিনাশচন্দ্র সারস্বত সেবার সংগে সংগে—এই সওদাগর ও বণিক সভ্যতার প্রাচীন উৎসমূলে অভিযাত্রা করলেন। হৃত চৈতন্য, গাঢ় নিদ্রামগ্ন বণিক সন্তানদের সুপ্তি ভঙ্গের জন্য তিনি প্রচার করলেন 'গন্ধবণিক'। অবিনাশচন্দ্রের এই সাধনা সেকালের নবজাগরণের মুক্তি সৈনিকদেরই অভিমুখী ছিল। ১৩৪৩এ অবিনাশচন্দ্র গত হয়েছেন এবং তাঁরই উত্তরসূরীগণ তাঁর আরব্ধ কার্য নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। আজ মাঘের পুণ্য প্রভাতে নিখিল বাংলার গন্ধবণিক সমাজের মুখপত্র একোচত্বারিংশৎ বর্ষে পদার্পন করলো। সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের জীবন ক্ষণস্থায়ী —সে হিসাবে 'গন্ধবণিকের'এই সুদীর্ঘ জীবনপ্রবাহ কেবলমাত্র সমাজচিন্তামূলক হলেও এদেশের সাময়িকপত্র সম্পাদনার ইতিহাসে একটি প্রণিধানযোগ্য ঘটনা। আত্মচেতনায় 'গন্ধবণিকের' ভূমিকা নগণ্য নহে—বিগত ৪০ বৎসরে এই পত্রিকা গন্ধবণিক জাতিকে কি শিক্ষা দিয়েছে —কোন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে—আজ তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। এ ভূমিকা তারই জন্য।

✓বৈশ্যচেতনা ও গন্ধবণিক পত্রিকা

গন্ধবণিক পত্রিকা, এই বঙ্গীয় বণিক সমাজে বৈশ্যচেতনা জাগ্রত করার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিগত ৫০।৬০ বৎসর পূর্বেও আমাদের সমাজের শিক্ষিতগণ নিজেকে গন্ধবণিক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করতেন। পলাশী যুদ্ধ তথা ভারতচন্দ্রের পরে নবযুগের কনকউষার বোধনকেন্দ্র কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নূতন বণিক সমাজের উদ্ভব হয়েছিল। তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেহবা মুৎসুদ্দি কেহবা নায়েব—কেহবা তোষামদী বৃত্তি গ্রহণ করে প্রচুর অর্থসামর্থের অধিকারী হয়েছিল। তারা হল নূতন বেনিয়ান। তারাই হল নূতন ধনতন্ত্রমূলক অর্থনীতির সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। আর এরই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল স্বার্থপর কলঙ্কিত castcism. শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা হতে লাগল। শুধু বনিক জাতি নয়—এমনি করে অনেক বরিষ্ঠ গরিষ্ঠ জাতির অধঃপতন ঘটল। গন্ধবণিকেরা নবশায়ক—এই প্রচার চালান সেকালের স্বার্থপর মুর্খ পণ্ডিতেরা। নূতন শহর ও নূতন বণিক সমাজের অভ্যুদয়ে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা—অর্থনৈতিক কাঠামোর বনিয়াদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে—১৯০১ সালে বাংলাদেশের তদানীন্তন সেন্সাস কমিশনার Mr. Gait যে রিপোর্ট পেশ করলেন—তা বাংলাদেশের মিথ্যা জনমতকে ভিত্তি করেই। গন্ধবণিকগণ যে বৈশ্যবর্ণ—এ সম্পর্কে ডক্টর অবিনাশচন্দ্রই প্রথম তৎকালীন সেন্সাস কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং প্রতিবাদ করে "The Census Commissioner and the Vaisyas of Bengal" শিরোনামায় দুটি ইংরেজী রচনা তৎকালীন একখানি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।২ এরপর অবিনাশচন্দ্র "বৈশ্যবর্ণ" শীর্ষক সুলিখিত বাংলা রচনা প্রকাশ করলেন সেকালের ভারতমুক্তি সাধক বন্ধু রামানন্দের পত্রিকাতে।৩ ১৯০৩ সালে তিনি ইংরাজীতে গন্ধবণিক জাতির ইতিহাস প্রণয়ন করলেন।৪ এর পরই গন্ধবণিক পত্রিকা ১৯০৬ পর্য্যন্ত কাল তিনি গন্ধবণিকের সম্পাদক ছিলেন। নামমাত্র মূল্যের এই সামাজিক পত্রিকা তিনি প্রতিটি গন্ধবণিকের ঘরে ঘরে পৌছে দিলেন—অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করে সমাজের মানস মুক্তি ঘটাতে লাগলেন। গন্ধবণিক যে সম্পূর্ণরূপে বৈশ্য বর্ণ—সেদিনের অধঃপতিত জাতি এই গন্ধবণিক পত্রিকা তথা অবিনাশচন্দ্রের রচনারাজি হতেই দ্বিজন্মের স্থান অর্জ্জন করেছিল। উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের আলো বাতাসে যিনি বর্দ্ধিত—সেই অবিনাশচন্দ্র ও তাঁর গন্ধবণিক কখনও

২ Indian Mirror, Sept. 28 and 5th October, 1901 (Dak Edition).

৩ প্রবাসী ১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ।

৪ The Vaisya Caste— Dr. A. C. Das, Ph.D.

সঙ্কীর্ণ জাতীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। ইহবাদই তাঁর কাম্য ছিল। সংবাদপত্র সেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি সেকালের বিখ্যাত Indian Mirror সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ও Bengalee সম্পাদক স্বদেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এর সত্যতা সম্পর্কে পাঠকগণকে অবিনাশচন্দ্র লিখিত একটি রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিই।৫ বৈশ্যচেতনার উন্মোচন কার্য্যে আর একজন মহাত্মার নাম এই প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয়। তিনি প্রাচীন কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক পুণ্যশ্লোক বটকৃষ্ণ পাল। ১৯০২ সালে পটলডাঙ্গায় নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে যে স্বজাতি ও পণ্ডিতদের সভা আহূত হয়েছিল—সেখানে তিনিই সভাপতিত্ব করেন এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গন্ধবণিককে বৈশ্য বলে ঘোষণা করেন। বটকৃষ্ণ পাল নিজ অর্থব্যয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থও প্রকাশ করেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ।৬ প্রণয়ণ করেন। অবিনাশচন্দ্র ইহারপর আরও দুখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ দুখানির নাম—গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস, চতুরাশ্রমের সমন্বয়', হৃষিকেশ শাস্ত্রীর গান্ধিক বৈশ্যতত্ত্ব, আর একখানি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ ইহা বৈশ্যচেতনা জাগরণে সহায়তা করে। গন্ধবণিক সম্পাদক অবিনাশচন্দ্রের তিরোধানের পর ও এই পত্রিকা মারফত তাঁর সার্থক উত্তরসূরীরা বৈশ্যচেতনার উদ্বোধন মানসে নব নব তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে রচনা প্রকাশ করলেন—তাঁর সহযোগী সম্পাদক স্বর্গীয় রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু ও অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেন। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিশ্বকোষের সহ-সম্পাদক স্বর্গীয় নিত্যরুদ্র বেদান্ত রত্ন, অধ্যাপক গিরিজাশঙ্কর ধর, শ্রীজলধিনাথ সাধু, বার-এট-ল, কবি কৃষ্ণধন দে, অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত, সদ্য পরলোকগত ডক্টর রাখালচন্দ্র নাগ, শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দত্ত, শ্রীশ্যামাপদ দত্ত, শ্রীরসিকলাল দত্ত এবং আরও অনেক জাতীয় লেখক এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বৈশ্য চিন্তা ও সমাজ চিন্তায় জাতির দৃষ্টি ও রুচি পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। গন্ধবণিক পত্রিকা এই জাতির মুখপত্র কেবল তাই নয়—ইহা সেকালের অবসাদগ্রস্ত জাতিকে মনুষ্যত্ব দান করেছে। ৪০ বৎসরে এই পত্রিকায় জাতিতত্ত্ব বিষয়ক এমন অনেক সুলিখিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে—যেগুলি সংকলন ও সম্পাদনা করলে একখানি সুবৃহৎ জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। সে কাজ অচিরে সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু সে বটকৃষ্ণ পাল--সে অবিনাশচন্দ্র কোথায়? গ্রন্থকার, লেখক—এদের অনুপ্রাণিত করার মত সমাজ নেতা আজ কোথায়? পত্রিকার চল্লিশোত্তরে এই পত্রিকার মহান অবদানের কথা আজ সেজন্যই আর একবার স্মরণ করলাম।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে গন্ধবণিক পত্রিকা

১৯০১ সাল হতে ১৯৪৭ সাল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর ব্যবধান। ১৯০১ সালে Mr. Gait গন্ধবণিক জাতিকে নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত করে রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৪৭এ গন্ধবণিক সন্তান মহাত্মা গান্ধী ভারতকে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে এনে ফেলেন। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এই কালে। এই কালেই বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি সমগ্র জগৎ ও মনুষ্য সমাজকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে ফেলেছে। আজ আর খণ্ড দেশ—খণ্ড জাতির আরাধনা এ যুগে অচল। Science reason and humanism এ যুগের মন্ত্র। স্বাধীনতা উদ্ধত এই ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ও বহু প্রসারিত। সুতরাং পত্রিকা মারফৎ জাতির লড়াই এখন স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গেছে। গন্ধবণিক সন্তানগণ এখন শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করছেন। তাদের জীবনের জাড্য মোচন হয়েছে অনেকদিন। বিদ্যা অর্জনের জন্য এখন তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। আমাদের কুলললনাগণও শতাব্দীর অভিশপ্ত গৃহাঙ্গন পরিত্যাগ করে বাহির বিশ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—সুতরাং পত্রিকার পূর্বজীবনের আদর্শ আজিকার এই নবশিক্ষিত সমাজের অনুকূল নয়। আমাদের এই আধুনিক মন আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পূজারী। সে গড়ুডের ক্ষুধা নিয়ে বিশ্ববিজয়ে অবতীর্ণ হবে। যেমন করে এই সওদাগর জাতির সন্তানগণ একদিন সমুদ্রপারে দূর দারুচিনি দেশের স্বপ্নে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে অর্ণবপোত ছুটিয়েছিল। আজকের গন্ধবণিক সন্তান-

৫ স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন—বঙ্গদর্শন—কার্ত্তিক, ১৩১৮

৭। গন্ধবণিক তত্ত্ব

গণও এই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-সাহিত্য, মনন চিন্তার সর্ব অংগে বিচরণ করবে। সেজন্তই পত্রিকার রুচি পরিবর্তন স্বাভাবিক। পরাধীনতার সমাপ্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি এই কালে সুসাহিত্যিক মণীন্দ্র দত্ত মহাশয় যুগরুচিকে অনুভব করেছিলেন এবং 'গন্ধবণিক' পত্রিকাকে আধুনিক ও যুগোচিত করার প্রয়াস করেছিলেন। যাঁরা ৪০ বৎসরের পত্রিকা আগন্ত অনুসরণ করবেন তাঁরাই মণীন্দ্রবাবুর এই নূতনত্বকে অস্বীকার করতে পারবেন না। বর্তমান কালে আমাদের প্রচেষ্টায় মণীন্দ্রবাবুর সেই আরব্ধ কার্য আরও অগ্রগতির পথে চলেছে। সময়োপযোগী নূতন নূতন বিভাগ খুলে আধুনিক মনকে তৃপ্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রসঙ্গ-কথা, পুরাতনী, মণিমঞ্জুষা, শ্রুতি-স্মৃতি, মন্দ্রমুখরের হাল-খাতা, ভোরের আলো, ধাঁধা, পত্রিকার নব নব বিভাগগুলি এর নিদর্শন স্থল। আরও উল্লেখযোগ্য—কেবলমাত্র জাতীয় লেখকগণই এই পত্রিকাতে লেখেন না—সমাজ বহির্ভূত অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও বাণীসেবকের রচনায় এই পত্রিকা নিয়ত শোভিত থাকে। বিগত কয়েক বৎসরের শারদীয় সংখ্যাগুলি বাংলাদেশের বিখ্যাত সংবাদপত্র ও সুধীজনের প্রশংসাধন্য হয়ে সমগ্রজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আধু-নিক যুগ ও জীবনের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই স্বাধীনতা উত্তর যুগের পত্রিকা আর এক সমাজ ও চিন্তা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছে। এ মন্ত্র মনুষ্যত্বের সর্বাংগীন উদ্বোধন। এমনি করেই আমরা ৪০ বর্ষ পূর্তি সংখ্যাগুলি সম্পাদনা করেছি পাঠক গত বৎসরের ১২টি সংখ্যা পরিক্রমণ করলে দেখবেন আমরা ব্যর্থ হইনি।

বিগত বৎসরের স্মৃতি

বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের পৃথিবীতে নব নব ঘটনা ঘটেছে। আফ্রিকায় দেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও গৃহবিবাদ লক্ষ্য করেছি। আলজিরিয়া কঙ্গোর ঘটনা এখনও আমাদের মানসপট থেকে মুছে যায়নি। কিউবা লাওসের কথা ভুলিনি। শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতা দেখেছি। শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বিশ্বে প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বার্লিনের সমস্যা নিয়ে রাশিয়ার সংগে অপর পাশ্চাত্য শক্তির মতবিরোধ ঘটেছে।

সদ্যলব্ধ নেপালের গণতন্ত্রকে রাজা মহেন্দ্র বাজেয়াপ্ত করে-ছেন। আমেরিকার নির্ব্বাচনে রিপাব্লিকান প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট কেনেডি জয়লাভ করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষে নিত্য নূতন ঘটনার সংগে আমরা জড়িত হয়ে পড়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ভয়াবহতা ও তার ব্যর্থতার সংগে পরিচিত হয়েছি। আসামে নির্লজ্জ বাঙালী নিপীড়ন ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আমাদিগকে ব্যথিত করেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট বিভক্ত হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী নাগা নেতাদের সংগে সন্তোষজনক আলোচনা করেন। পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলন এখন প্রজ্জলিত আছে। সেদিনও সংবিধান বহির্ভূত কেন্দ্রীয় সরকারের বেরুবাড়ী ভোট দেওয়াকে এই দেশের গণ-তান্ত্রিক মানুষ সহজে গ্রহণ করেনি। এমনই অসংখ্য ঘটনার তরঙ্গাবর্তে আমাদের পথ চলতে হয়েছে। আমরা চলেছি—এবং স্থির লক্ষ্যে এবং সুনিয়ন্ত্রিত সিদ্ধান্ত দিয়ে আমরা এই বিশ্বপরিস্থিতির সংগে আমাদের পাঠক সাধারণের পরিচয় ঘটিয়েছি। যাঁরা নিয়মিত প্রসঙ্গ কথা ও মন্দ্রমুখরের হালখাতা পাঠ করেছেন তাঁরাই এ সত্য উপলব্ধি করবেন।

গত বৎসরে আমরা দুজন সমাজসেবীকে হারিয়েছি। বিদ্যোৎসাহী দানবীর যুগলকৃষ্ণ হালদার এবং মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং সুলেখক ডাঃ রাখালচন্দ্র নাগ। সুদীর্ঘকাল তাঁরা এই সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন। গন্ধবণিকের পুরাতন ফাইলগুলি লক্ষ্য করলে সুলেখক রাখালচন্দ্র নাগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। শীঘ্রই রাখালচন্দ্রের উপর একটি রচনা প্রকাশের ইচ্ছাও আছে। তাঁহাদের তিরোধানকালে বর্তমান লেখক সম্পাদনাকার্যের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় প্রসঙ্গকথা মারফত এই লেখকের যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়নি। বর্ষশেষ সংখ্যায় জাতীয় সংবাদে তাঁহাদের সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলবার সুযোগ অর্জন করেছি। এখন কেবলমাত্র তাঁদের নাম গান করেই শেষ করছি।

পত্রিকার সামর্থ ও সম্বল অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক

হইনি। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সমাজের প্রথিত যশা তথা উদীয়মান তরুণ লেখক লেখিকাদের গৃহিতব্য রচনা-গুলি আমরা যথাসম্ভব সজ্জিত করেছি। মণ্ডনকলা ও আঙ্গিক পারিপাট্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমরা সরবরাহ করতে পারি না—সেজন্য অতি আধুনিক কলা কুতূহলীদের আমরা সব সময়ে চরিতার্থ করতে পারি না। গন্ধবণিক সন্তানগণ আজিকার যুগে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যে পশ্চাদগামী নয়—আমাদের তরুণ তরুণীদের লিখিত এই পত্রিকার রচনাগুলি দেখলেই অনুধাবণ করা যাবে। একালের তরুণদের এই মানস উৎকর্ষ আগামীকালের সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বিবচিত হতে পারবে। অনেক নূতন লেখক লেখিকাকে আমরা পেয়েছি—তাঁদের এই প্রয়াস ও সদিচ্ছাকে আমরা স্বাগত জানাই। ব্যথার পরাগ, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে কবিশেখর মহাশয়ের গল্প ও কবিতা প্রকাশ করে আমরা ধন্য হয়েছি। শিশুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিভিন্ন প্রকার রচনায় আমাদের পত্রিকা অলংকৃত হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের রীডার ডক্টর অনিলকুমার দে এবং বিজ্ঞাণ গবেষণারত শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দাঁ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত বিমল দে'র বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার কথাও আমরা স্মরণ করছি। বিজ্ঞানের কৃতিছাত্র আমেরিকায় গবেষণারত শ্রীদীপেশ নারায়ণ দে আমা-দিগকে উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। সহ সম্পাদক শ্রীদিলীপ নারায়ণ দে ও শ্রীচন্দ্রনাথ পাল গত বৎসরে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের রসজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের সমাজের কৃতিছাত্রী কুমারী ভারতী দত্ত রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। কুমারী বসুমতী দাঁ'ও কয়েকটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাঁ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে'র উপর প্রণিধানযোগ্য রচনা পরিবেশন করেছেন। কবিতায় অনন্তকুমার দত্ত, শরৎ দত্ত, কমল দত্ত, কুমারী সবিতা দত্ত কাব্যরসিকদের মনোরঞ্জন করেছেন। প্রনবকুমার মল্লিক 'মাসাতিনা' শীর্ষক একটি উল্লেখযোগ্য গল্প পরি-বেশন করেছেন। শ্রীরসিকলাল দত্ত প্রবন্ধে, শ্রীঅরুণেন্দু কুণ্ডু—ভ্রমণ কাহিনীতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া সমাজ বহির্ভূত খ্যাতনামা সাহিত্যিক কবি-শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কবি বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, অনিতা দেবী, রঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী নীলিমা ভট্টাচার্য প্রভৃতির সুলিখিত রচনার সংগে আমরা আমাদের পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়েছি। স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিবাহে নান্দীমুখ" রচনার পুনর্মুদ্রণে এই পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধুনা বিলুপ্ত সাধারণী, দৈনিক, দৈনিক চন্দ্রিকা ও বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন—তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় সম্প্রতি মল্লিখিত একটি দীর্ঘ রচনায় ১ আলোচিত হয়েছে। গত বৎসরে পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছে। বিগত বৎসরের পত্রিকার এগুলিই উল্লেখযোগ্য স্মৃতি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করছি। 'জাতি সাবধান' শীর্ষক একটি কবিতার কথা। গত বৎসরের ইহাই বহু আলোচিত কবিতা। নবাগত শ্রীকালীয়দমন এই কবিতাটিকে লিখেছিলেন। আমাদের সমাজে যে কয়টি সংস্থা বিদ্যমান—শ্রীকালীয়দমন সেগুলির তীব্র ও আক্রা-মনাত্মক ভঙ্গিতে সমালোচনা করেছেন এই দীর্ঘ কবিতায়। রচনা ও প্রকাশভঙ্গি দেখে মনে হয় লেখক বণিক সমাজের সকল বিষয়ের সংগে পরিচিত—তাঁর প্রকাশভঙ্গি কথা বলতে চাই না। তাঁর বক্তব্যে দাহ আছে—আছে রোষ বহ্নি। গন্ধবণিক সমাজের সর্বপ্রকার সংস্থা ও সমিতিগুলির নিষ্ক্রীয়তা, ব্যর্থতা ও গলদগুলিকে তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন এই কবিতায়। বিগত কয়েক বৎসর হতে বর্তমান লেখক এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত থাকাকালীন দূরবাংলার অসংখ্য অভিযোগপত্রের সংগে পরিচিত হতে সক্ষম হয়েছি। যে কোন সংগঠনমূলক

১) বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

প্রতিষ্ঠানে—বিরোধীদের বক্তব্যের যে মূল্য আছে—সেকথা বিবেচনা করেই উক্ত কবিতাটি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলাম। বিশেষতঃ ঐ কবিতায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল না। মত এবং আদর্শের বিরোধ সর্বকালীন—সকল দেশের—সকলকালের সংবাদপত্রে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধকে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে এখানেও তার আবির্ভাবঘটেছে—ইতিপূর্বেও এই পত্রিকায় ইহা অপেক্ষা বহু কদর্য রচনার সহিত আমরা পরিচিত হয়েছিলাম। 'জাতি সাবধানের' লেখকের কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না। কিন্তু বর্তমান সম্পাদক এই কবিতাটিকে অতি সাধারণভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কবিতার অগ্নিদীপ্ত ভাষাতে মাঝে মাঝে কটু আক্রমণ এসেছে—অনেক ভদ্রেতর ভাষারও সন্নিবেশ ঘটেছে। একথা স্বীকার করে ও কবির সামগ্রিক মর্ম্মবেদনার কথা সকলের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আঘাতপ্রাপ্ত সমিতিগুলি সম্প্রতি এই সম্পাদককে জানিয়েছেন যে—কালীয়দমনের অধিকাংশ বক্তব্যের পিছনে কোন গূঢ় সত্য নেই—বরং সেখানে মিথ্যার বেসাতি। যেহেতু বর্ত্তমান সম্পাদক সকল সংস্থার সংগে জড়িত নন—সেজন্ত এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি বক্তব্য-প্রকাশে অক্ষম। 'জাতি সাবধান' কবিতার বিরোধিতা-মূলক যে কথাগুলি উপরে উচ্চারিত হয়েছে—সেগুলি নানাভাবে প্রাপ্ত হয়েছি, এখানে সেগুলিই লিপিবদ্ধ করলাম নিখিল বাংলার গন্ধবণিক সমাজ এবিষয়ে বিচার করবেন। আমি সম্পাদক হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে—এই বিরোধ ও মনোমালিণ্যের জন্ম অনুতপ্ত। আমাদের সর্বাংগীন কল্যাণের জন্ম আমি ঐক্যশক্তিকে অভিনন্দন জানাই। একথা সত্য বিভেদ বিরোধিতা সংগঠনকে অনেক সময় দুর্বল করে। বর্ষ প্রবেশকালে আমরা এই বিরোধিতার সমাপ্তি কামনা করছি। বিগত বৎসরে যাঁরা আমাদিগকে নানা-ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই—বিশেষ করে পরিচালন সমিতি, কার্যাধ্যক্ষ শ্রীদেবনারায়ণ দত্ত, শ্রীঅনাদি নাথ দাঁ, প্রকাশক শ্রীযুক্ত সাধনধন নাগ শুভানুধ্যারী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত এবং অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এরপর আমাদের নূতন বৎসরের কথা।

শুভারম্ভ

নূতনকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিবারের মত এবারও কিছু লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এই প্রাথমিক বক্তব্যেই আমরা আমাদের চলমান বৎসরের দিকদর্শনী তথা জীবনমন্ত্রের ধ্যান ও তর্পণ করি। এবং সেই মন্ত্রকে বাস্তবে রূপদানের শপথ গ্রহণ করি। চিরাচরিত প্রথা-নুসারে সেজন্যই দু একটি কথা বলছি। আমরা সম্প্রদায়-গত ভাবে গন্ধবণিক—কিন্তু আমরা বাঙালী ও ভারত-বাসী। বৃহত্তর অর্থে আমরা এই মহান দেশ ও জাতির সেবক মাত্র। সুতরাং সমগ্র দেশের মানুষ যে পথে চলেছে আমরা একটা খণ্ড সম্প্রদায় তা থেকে ভিন্নপথে চলতে পারি না। এর দ্বারা আমরা অপ্রতিষ্ঠাকেই ডেকে আনি। আমরা এখন বিজ্ঞান বিমুগ্ধ পৃথিবীর অধিবাসী। দ্রুতত্ব ও গতিই এযুগের ধর্ম্ম। সভ্য ভারতবর্ষের নায়ক হতে গেলে এই যুগধর্ম্মকে আয়ত্ত করতেই হবে। যারা পিছিয়ে থাকবে তাদের পতন অনিবার্য্য। আমরা ব্যবসায়ীজাত একথা ঠিক—কিন্তু এযুগে সেই মধ্যযুগীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্যবসারও ভিন্নতর অর্থ হয়েছে এখন। সেগুলোকে অধিগত করতে না পারলে পিছিয়ে আসতেই হবে। সুতরাং এই যুগধর্মে পুরুষের আর্ত্ত ক্রন্দনে যে ব্যক্তি পুরুষের মূর্চ্ছনা নিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সংগ্রামশীল বলিষ্ঠ পৌরুষকে—আমাদের শুভারম্ভকালে স্বাগত জানান হচ্ছে। যে শক্তি কেবলমাত্র অহঙ্কারের ও আত্মাভিমানের শক্তি, যাহা দুর্দমনীয়ভাবে সর্ব্বদ্রোহী এবং স্নেহ ও প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করে না বলিয়া, পরাজয় সত্ত্বেও অপরাজেয়, সেই মহীয়ান পৌরুষ ধর্ম্মকে আমরা জাতিচরিত্রে সংক্রামিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাই। কারণ Miltonএর সেই কথা, "To be weak is miserable !doing or suffering" একথাতে আমরা বিশ্বাসী। মূলকথা—যুগধর্ম্ম-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাষ্ট্রচিন্তা সকলক্ষেত্রেই আমরা পারঙ্গম বণিক সন্তানগণকে দেখতে চাই—সেজন্য জাতি-

চিত্তকে শিক্ষাভিমুখী ও বাণীকণ্ঠ করার দায়িত্বই প্রাথমিক—কেবলমাত্র ব্যবসার দ্বারা তুল ভ সম্মান অর্জিত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মুখে রেখেই আমরা পথ পরিক্রমণ করব। এই হবে আমাদের এ বৎসরের মন্ত্র।

বর্তমান সংখ্যায় সেজন্য কয়েকজন খ্যাতিমান লেখকের রচনা মুদ্রিত করে আমরা যাত্রা সুরু করছি। খ্যাতিমান সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক, অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত, কবি রামেন্দু দত্ত, কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, স্বর্গীয় ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র দাস প্রভৃতি কয়েকজন স্বনামধন্য বাণী-সেবকের রচনার সংগে পাঠকদের পরিচয় ঘটবে। এই বৎসরেই আমরা রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সম্মুখীন হবো। সেজন্য আগামী বৈশাখ সংখ্যা রবীন্দ্র স্মারক সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ষশেষ সংখ্যায় সে বিষয়ে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। এবিষয়ে আমরা বর্তমানেও উৎসাহী জনের সহযোগিতা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তবু এ সকলের মূলেও আমাদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে বিগুমান রাখতে হবে। সে স্বাতন্ত্র আমাদের বণিকবৃত্তি। এই বণিকবৃত্তি কি সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার মত অবসর আমাদের নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের একটি রচনা ৮ এই প্রসঙ্গে পাঠ করতে পারেন। তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি'তে আমাদের বণিক সভ্যতার অনেক দুর্লভ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বণিক সভ্যতা সুপ্রাচীন আর্য্য সভ্যতার মতই—বণিকেরাও আর্য্য ছিলেন। ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় লিখে-ছিলেন—"বৈদিকযুগের বণিকগণ ও নাবিকগণ যে আর্য্য জাতীয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বণিকগণ 'পনি' নামে অভিহিত হইতেন। 'পণি' শব্দ হইতেই পণ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—অর্থাৎ পণিগণ যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সেই সকল দ্রব্যকে 'পণ্য' বলা হইত। অধিকন্তু 'বণিক' শব্দ 'পণি' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র"৯ এই সুমহান ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এবং নূতন যুগ চিন্তাকে আনন্দ আলিঙ্গন করেই আমাদের বণিক বৃত্তির চরম সাফল্য। কারণ পশ্চাতের ঐতিহ্যহীন আধুনিকতা বা পুরাতনের অস্বীকৃতির মধ্যে যে আধুনিকতা তা শূণ্যে মৃত্তিকা বিচ্ছিন্ন কুসুমের মতই অসুন্দর। পরন্তু এই বণিকজাতির সমুদ্রযাত্রায় যে দুর্দ্দমনীয়তা এবং দুঃসাহ-সিকতা একদা এদেশের হিন্দু সভ্যতার গৌরবের কারণ হয়েছিল—তা আজি আর কিংবদন্তী নয় ইতিহাসের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অজানা অজ্ঞাতের প্রতি অনু-সন্ধিৎসা এবং তা আবিষ্কারের মধ্যে যে চরম স্ফূর্তি বিগুমান ছিল সেই দুর্দ্দমনীয় জীবনাদর্শকে আজিকার এই নূতন যুগেও লালন করতে হবে। গন্ধবণিকের বণিকবৃত্তি সেখানেই আস্বাদ করা যাবে। হিন্দু বণিকের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহান্বিত তাঁরা বহু গ্রন্থের মধ্যে এখানে নির্বাচিত দুএকখানি গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন।১০ এ সম্পর্কে বাংলার মঙ্গলকাব্য ও লোক সঙ্গীতে প্রচুর নিদর্শন আছে। বিস্তৃত আলোচনার অবসর নেই। বৈদিক যুগে বণিক জাতির প্রচেষ্টাতেই আর্য্য সভ্যতার বিস্তার হয়ে-ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ancient Indian History and Culture বিভাগের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যা-পক স্বর্গীয় ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস প্রণিধানযোগ্য আলো-করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মণীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। অব্রাহ্মণ হয়ে বেদের আলোচনায় তিনি যে

৮) বণিকবৃত্তি—শারদীয় সমকালীন ১৩৬৬

১০) Ship Building and Maritime Activity etc. Dr. R. K. Mookerjee

ক) Indian cultural Influence in Cambodia By B. R. Chatterjee D. lt.

খ) Cultural relation between India +Java —A. T, Bernet Kempers Ph. D.

গ) Subarnadwip, Part I & II —R. C. Majumder

ঘ) Champa—Dr. R. C. Majumder

ঙ) Aspects of Bengali Society ---Dr. T N. Dasgupta

চ) Ancient Indian Colonisation in South

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছিলেন—সেজন্য তিনি তৎকালীন বাংলা দেশের অনেকেরই ঈর্ষার কারণ হয়েছিলেন। অব্রাহ্মণের এই বেদশাস্ত্র আলোচনা তথা বৈদিক বণিকদের খাঁটি তথ্য প্রকাশের জন্য তাঁকে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল। সেকালের Calcutta Review, Historical Quarterly, Modern Review, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই বিবাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে বৈদিক বণিকদের সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ আলোচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থখানিতে। ১১ তিনি তাঁর অন্য ইংরেজী গবেষণা গ্রন্থখানিতে লিখেছেন—"Their frequent contact with the Panis must have taught the rudimentary arts of civilisation, which received a strong impetus, when Arayan settlers from Sapta-Sindhu founded colonies in the various parts of the Decan. After the drying up of the bed of the Rajputana sea and the gradual disappearance of the eastern sea, the sea going Panis must have left Sapta-Sindhu settled in the Coromondal and Malabar coasts, especially as the latter supplied them with abundant materials for ship building and played a great part in the up lift of the Dravidians. The Panis must have also visited the coast of the Persian gulf and southern Beluchistan, as well as the coast of Arabia and the Red seas, accompanied by the civilised Cholas and the Pandyas, the former settling down Mesopotamia and laying the foundation of Chaldear or Sumerian civilisation, and the latterin the Egypt, along with the Panis, who have been described in classical literature as the Punic race, The Panis ultimately settled down on the Syrian coast and were the ancestors of the Phoenicians who were a mixed product of the Panis and the Semites." ১২ আমরা বৈদিক যুগের এই সুপ্রসিদ্ধ 'পনি' বা বণিকদের বংশধর। সেই মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই এই শুভারম্ভ।

—শ্রীহারাধন দত্ত

১১) Rgvedic India (1921)—Chapter XI

১২) Rgvedic Culture (1925], P—151-152

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাশ

●

আধুনিক উন্নত যুগে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা কন্যার বিবাহে মহাসমস্যায় পড়েন। কন্যার বিবাহের জন্য তাহাদিগকে কম ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। যে দুর্লভ পুরুষটি কন্যার স্বামী হইবেন, উহাকে অন্তত নগদ হাজার খানেক টাকা, ঘড়ি, আংটি, সাইকেল ইত্যাদি দিতে হয় এবং কন্যাকেও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারেও ভূষিত করিয়া দিতে হয়। ইহাতেও নিস্কৃতি নাই বিবাহের দিনে বরযাত্রীদের সেবার এতটুকু ত্রুটি হইলে আর রক্ষা থাকে না, এমন কি বিবাহানুষ্ঠানের সময়ে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়া থাকে। কন্যার পিতাই যেন সমস্ত বিষয়ের দায়ী, কেন না তিনি যে কন্যার পিতা, পিতৃত্বের জন্য মহাপরাধী।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নারীর স্থান ও মর্য্যাদা ঠিক এইরূপ ছিল না। তখনকার দিনে গন্ধর্ব বিবাহ, স্বয়ম্বর প্রথা এবং "স্ত্রীরত্ন" (শাস্ত্রে আছে স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি) পুরুষের অনুনয় বিনয় ও কন্যাপণ বর্ত্তমান অবস্থায় বিপরীত দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

দ্রাবিড় যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তখনকার সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের উপরে। পক্ষান্তরে আর্য্যগণ এককালে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি ছিল বলিয়া এবং মাঝে মাঝে তাহাদের দুর্গম ও দুরারোহ পার্ব্বত্যভূমিতে বিচরণ করিতে হইত ও প্রায়শঃ শত্রুদের আক্রমনের সম্মুখীন হইতে হইত বলিয়া পুরুষের উপর নারীর রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল, কারণ নারীজাতি স্বভাবতই দুর্ব্বল। এইজন্যই নারীদের স্থান পুরুষের নিম্নে ছিল। কি পর্বতারোহনে, কি বিরাট বনানী ও নদনদী উত্তরন, কি শত্রুর আক্রমন হইতে রক্ষণাবেক্ষণ, সমস্ত কার্যেই বলহীনা নারীকে সর্বদাই পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। আর্যাবর্ত্ত বিজয়ের পরে সিন্ধু অববাহিকায় সুসভ্য দ্রাবিড়দের সহিত তাহাদের সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে, যাহার ফলে যে নুতন সমাজের সৃষ্টি হয় তাহাতে নারীজাতি আর পুরুষের কৃপার পাত্রী রহিল না। পরন্তু এইসব নব সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈদিকযুগের গার্গী ও মৈত্রেয়ী এবং পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে সীতা ও সত্যবতী, গান্ধারী ও দ্রৌপদী ও এমন কি ঐতিহাসিক যুগের রাজ্যশ্রী ও লক্ষীবাঈ প্রভৃতির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নারী পুরুষের সমানাধিকার পদ। অবশ্য পরিত্রান পাইবার জন্য নারীজাতিকে এই অধিকার হইতে সাময়িকভাবে বঞ্চিত করা হইত—যেমন শক, হুনদের এবং পরবর্তী কালে মুসলমানদের আক্রমণের সময় ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে এমন কি ঘৃণিত অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলনের প্রয়োজনও হইয়াছিল যাহার প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজ আজও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু একথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা চিরদিনই নারীজাতিকে উচ্চাসন দিয়া আসিয়াছে। অধিক কি, পুরুষ অপেক্ষা নারীর স্থান যে উচ্চতর একনজরে একথাও আমাদের শাস্ত্রে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কেননা শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই

"পিতুরপ্যধিকামাতা গর্ভধারন পোষণাৎ, অতঃ হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সমং গুরু।" এখনও আমরা ভারতকে "ভারতপিতা" না বলিয়া "ভারতমাতা" বলিয়া থাকি। রামায়ণেও দেখা যায় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ রামাবতারে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের জন্য দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন এবং পুরাণেও বর্ণিত আছে কলিরূপী মহাশক্তি মহাকাল রূপ শিবের বুকে পদরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহাই হোক না কেন, এইরূপ কথাটির মধ্যে যে মাতৃজাতির প্রাধান্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে অস্বীকার করিতে পারে? মনুসংহিতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখিবেন সেখানেও দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে— "কন্যাপ্যের সালনীয়া শিক্ষনীয়তু যত্নতঃ"। গুপ্তযুগেও দেখা যায় নারীকে মর্য্যাদা দিবার জন্য পুত্রের নামের পূর্বে

সমাজ স্বাস্থ্যের প্রকৃতি

শ্রীরসিকলাল দত্ত

সুস্থ জীবন যাপনের নামই স্বাস্থ্য। কেবল শরীর সুস্থ থাকিলেই হয় না। মনেরও সুস্থতার প্রয়োজন। কারণ মনকে বাদ দিলে শরীরের অস্তিত্বই লোপ পায়। শরীর অসুস্থ হইলে মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। শরীরের সহিত মনের সম্পর্ক ওতোপ্রোতঃ ভাবে জড়িত বলিয়াই ঐরূপ হয়। সুতরাং স্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন দুইয়েরই সুস্থতার প্রয়োজন। তবে একথাও ঠিক যে শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থই থাকে। অথবা সাময়িক অসুস্থ হইলেও তাহাকে সহজেই সুস্থ করিতে পারা যায়। তাই প্রথমে শরীরের সুস্থতার জন্যই লক্ষ্য রাখিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রেও শারীরিক সুস্থতাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রয়োজনগুলি মিটাইতে সুস্থ শরীরই একমাত্র সক্ষম। স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম অবশ্যই পালন করিতে হয়। শারিরীক স্বাস্থ্যের জন্য চাই উপযুক্ত খাদ্য শরীর চালনা ইত্যাদি। মনের সুস্থতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। সুশিক্ষার প্রভাবে সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে মনের স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব। আবার শরীর ও

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

মাতার নাম সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত এবং এইভাবে পুত্রের পরিচয় মাতৃ পরিচয়ের দ্বারা নির্ণিত হইত—পিতৃ পরিচয়ের দ্বারা নহে। "জাবালী সত্য কাম" গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি ও কুমারী দেবী পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ইত্যাদি নামগুলি হইতে ইহাই নিঃসন্দিগ্ধ প্রমান পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান মহৎ না হইলে কি সীতা ও সতী, গান্ধারী ও গার্গী লীলাবতী ও মৈত্রেয়ী এবং খনা, সাবিত্রী বা দময়ন্তী প্রভৃতি অসংখ্য পুতচরিত্র নারীর স্মৃতি আজ পর্য্যন্তও আমাদের মনে জীবন্ত থাকিত না, ভারত-বাসীর হৃদয় কন্দরে আলোকবর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখিতে পারিত?

ভারতে মুসলমান আগমন হইতে রামমোহনের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত এই যে পাঁচ শতাব্দীকাল, ইহাই ভারতের অন্ধকার যুগ।

ভারতে নারীর স্থান মহৎ না হইলে কি সীতা ও সতী, গান্ধারী ও গার্গী, লীলাবতী ও মৈত্রেয়ী এবং খনা, সাবিত্রী বা দময়ন্তী প্রভৃতি অসংখ্য পুতঃচরিত্রা নারীর স্মৃতি আজ পর্য্যন্তও আমাদের মনে জীবন্ত থাকিত না।

পূর্ববর্ণিত অন্ধকার যুগে অবস্থার গুরুতর বিপর্য্যয়ের ফলে মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক উচ্চতর সংস্কৃতি শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়, যেজন্য হিন্দু সমাজের সমস্ত অংগই পক্ষাঘাত গ্রস্ত এবং সমগ্র জাতি পুতগন্ধময় বদ্ধ জলাশয়ের মত গ্রাম চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে। সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কি আছে যে এই বর্বর শাসক জাতির প্রভাবে হিন্দু সমাজ কুসংস্কারগ্রস্ত হইবে ও নারীর মধ্যে অবগুণ্ঠনের প্রথা সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদিগকে সমস্ত মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করিয়া পুরুষের দাসীত্বে পরিণত করা হইবে।

বর্ত্তমান যুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আত্মা বিস্মৃত হিন্দুজাতি আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। আজ ভারত স্বাধীন, আজ পুনরায় নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও অবগুণ্ঠনের "শাপমোচন" হইয়াছে। তাই আমরা আজ আবার পাইয়াছি সরোজিনী ও বিজয়লক্ষ্মী, সুচেতা ও কমলা চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিকে।

ভারতের গৌরব রবি একবার পশ্চিমাকাশে ডুবিয়া গিয়াছিল, আজ আবার মেঘ, কুয়াশা ঘন অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে। উহার রক্তিমাভায় স্পষ্টতাই আমরা দেখিতে পাইতেছি।

মন এই উভয়েরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুস্থ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীরও প্রয়োজন। কাজেই দেখা যাইতেছে স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য, শরীরচালনা, সুশিক্ষা ও সুস্থ পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর। ঐ সকল কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে তাহাই এখন ভাবিবার। সকলের আগে প্রয়োজন খাদ্যের; শারীরিক শ্রমের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া থাকে। আবার এই শ্রমের দ্বারাই শরীর চালনার উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এখানে একই কার্য্যের সাহায্যে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ায় শ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর শিক্ষা—একাধিক উদ্দেশ্য শিক্ষার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন, কিন্তু সকল সময় একমাত্র উহার দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, উহার সহিত শিক্ষাকেও যুক্ত করিতে হয়। এইজন্য কেবল মনের নয় শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যেও শিক্ষা দরকার। এবারে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর কথা বলিতে হয়। শিক্ষা ও শ্রমের ভিত্তির উপর এমন একটা অবস্থা গড়িয়া উঠে যাহা মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই মানসিক অবস্থাই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গঠনে সাহায্যকারী হয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সব সময়েই যে স্বাস্থ্যের অনুকূল হইয়া থাকে। এইরূপ বলা যায় না। শিক্ষা ও শ্রমের প্রকৃতির দ্বারাই উহা প্রভাবিত হইয়া থাকে। তথাপি স্বাস্থ্যের জন্যে শিক্ষা শ্রমের উপযোগীতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তাই প্রত্যেককে স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য পাইবার আশায় কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ব্যক্তি স্বাস্থ্যের যেমন প্রয়োজন আছে সমষ্টির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অনেক বেশী। সমষ্টি অর্থে সমাজকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র জনসমষ্টির মাত্র একটি সমাজ নয়। উহারা বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত। সমগ্র জনসমষ্টির স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কারণ রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্বীকার করে না। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত জনগণের উপরই তাহার সমান দায়িত্ব থাকে। বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত জনসমষ্টির সকলের সমস্যা কিন্তু একরকম নয়। এবং সেগুলি একই ভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। তাই প্রতিটি সমাজ নিজ নিজ সমস্যাগুলিকে নিজস্ব ধারায় সমাধান করিতে ব্যগ্র হয়। এবং সে সম্পর্কে কম বেশী কাজ করিয়া থাকে। কাজেই এই রকম অসামঞ্জস্যের ফলে কোন সমাজ কিছুটা আগাইয়া যায় কোনটা বা তদনুপাতে পিছাইয়া পড়ে। পিছনে পড়িয়া থাকা সমাজগুলির মধ্যে আমাদের গন্ধবণিক সমাজ অন্যতম। ঐ বিষয়ে সকলে একইরূপ মত পোষণ করিবেন এরূপ মনে করা অন্যায়। তবে যাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করাই সঙ্গত। প্রত্যেককে সবল ও সুস্থকায় করিয়া তোলাই সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতির চরম লক্ষ্য কি' না এখানে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসিতে পারে। আমার মনে হয় ঐ একটি মাত্র উদ্দেশ্যের দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষিত হওয়া কঠিন। কতকগুলি সবল ও সুস্থকায় লোক এক সমাজের মধ্যে বাস করিলেই সে সমাজকে স্বাস্থ্যোন্নত বলা যায় কি করিয়া, যদি না সে সমাজের মানসিক সুস্থতার পরিচয় পাওয়া যায়? সামাজিক পরিবেশও তৎ তৎ সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল হওয়া চাই। এক্ষণে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত আমাদের গন্ধবণিক সমাজ কিরূপ পরিবেশের মধ্যে দিন যাপন করিতেছে। উক্ত পরিবেশ স্বাস্থ্যোন্নতির অনুকূল অথবা প্রতিকূল? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গন্ধবণিক সমাজ যে পথে ও যে পরিবেশের মধ্য দিয়া সমাজরথ চালিত করিতেছে তাহা সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতির আদৌ অনুকূল নয়। কেন নয়—সাধ্যমত ও নিজের বিচার বুদ্ধিমত তাহাই বলিতেছি। ব্যক্তি স্বাস্থ্যের জন্য প্রথমে প্রয়োজন খাদ্য এই খাদ্য সংগ্রহের জন্য চাই শ্রম ও শিক্ষা। এখানে জিজ্ঞাস্য আমাদের সমাজে প্রত্যেকেই কি সুস্থ ও সবল? আমার ধারণা উত্তরে কেহই হাঁ বলিতে সাহস করিবেন না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমাজের সকল লোক সমানভাবে খাদ্য পায়না, ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয় সমাজের প্রত্যেকেই শ্রম করেন না বা শ্রম করিতে চান না অথবা শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সুযোগ পান না। আবার ইহাও প্রমাণিত হয় যে, শ্রমে পরিপূরক সাহায্য দিবার

শিক্ষাও আমাদের নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে শ্রম-বিমুখতা বা শ্রমকাতরতার প্রশ্ন উঠিত না এবং খাদ্য সংগ্রহের অসুবিধা দেখা দিত না। পণ্ডিতেরা বলেন অসুস্থ লোকের মনের অবস্থাও সুস্থ হইতে পারে না। অধিকাংশ এইরকম লোক লইয়াই আমাদের বর্তমান সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে কেমন করিয়া? যেখানে শরীর সুস্থ ও সবল নয় সেখানে মন সুস্থ হইবে কিরূপে? সেখানে অতি সহজেই মানসিক দৈন্যের উদ্ভব হয়। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্যের। আর এই খাদ্য সংগ্রহের জন্যই চাই শ্রম ও উহার পরিপূরক শিক্ষা। সমাজের প্রত্যেকের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পন্ন না হইলে সমষ্টির কথা ভাবিতে পারিবে না এবং সমষ্টির স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্ভব হইবে না। সুতরাং ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং আ ভ এমন হইবে যাহা সমষ্টির স্বাস্থ্যোন্নয়নে পরিণতি লাভ করিতে পারে। খাদ্য সম্পর্কে খুব বেশী মত পার্থক্য না থাকাই সম্ভব। শরীরের পক্ষে যা হিতকর সেইরূপ স্নিগ্ধ সরস ও সুপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিতে কাহারো পক্ষে বাধা নাই। এখন দেখা দরকার কি উপায়ে উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এ বিষয়ে এই কথাই বলিতে হয় শ্রম ও তদনুযায়ী শিক্ষার সাহায্যেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে। তাহা হইলে এই কথাই ভাবিতে হয় শ্রম কিভাবে করিতে হইবে এবং কিরূপ শিক্ষাই বা উহার উপযোগী হইবে? আমাদের আলোচ্য বিষয় সমাজ। সুতরাং প্রথমে দেখিতে হইবে এই সমাজের জন্য কোনপ্রকার শ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে কিনা? এখানে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে না। বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের সমাজের জন্য কৃষি, কুসীদ, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষা সাপেক্ষ শ্রমমূলক কার্য্যগুলি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যদি তাই হয় তবে আমরা উপযুক্ত খাদ্য পাইনা কেন? কেন আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কোনপ্রকার স্বাস্থ্যই সমুন্নত নয়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমরা আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রম করিনা করিতে চাহিনা কিংবা করিবার সুযোগ পাইনা। আবার এই শ্রমকে সাহায্য করিবার উপযোগী শিক্ষাও আমরা গ্রহণ করিনা। সুতরাং আমাদের যদি উপযুক্ত খাদ্য না জুটিয়া থাকে, তাহার ফলে যদি আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে হীন স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া থাকি তবে তাহাতে বিচিত্র কিছু নাই। আশ্চর্য্য এই আমরা কেহই প্রকৃত অবস্থা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই এবং অনুপযোগী শিক্ষার রঙীন প্রলেপ মাখাইয়া জীর্ণ শীর্ণ সমাজদেহকে কিম্ভুতকিমাকার করিয়া মনে করি আমাদের সমাজ স্বাস্থ্যোন্নত হইতেছে। এই মোহ ও বিভ্রান্তি বশে সমাজে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সমাজ নির্দ্দিষ্ট শ্রম করিতে ও তদনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে আমরা বিমুখ। এভাবে সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যতদিন বিভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন সমাজ নির্দ্দিষ্ট শ্রম ও তদনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়। নূতন যে সকল শ্রম সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে সে সকলের সুযোগ তবে কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত হইবে না? কেন হইবে না? উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, আদর্শ যদি নির্দ্দিষ্ট শ্রমের বিরোধী না হয় তবে দুই চারিজন নির্দ্দিষ্ট শ্রমের বাহিরে গেলেও ক্ষতি খুব বেশী হয়না। কিন্তু এই সকল লোককে স্বধর্মনিষ্ঠ হইতেহইবে। তাহার ফলে তাহারা অন্য শ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ সমাজ নির্দ্দিষ্ট শ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। যদি বলা হয় উহা কিরূপে সম্ভব? পরমপুরুষ পরমহংসদেবের ভাষায় তাহার উদাহরণ এই—গৃহস্থঘরের বউ শ্বশুর, ভাশুর, দেবর সকলেরই সেবা ও যত্ন করিয়া থাকে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাহার ব্যবহার স্বতন্ত্র রকম। তাঁহাদের চাইতে আরো ঘনিষ্ঠ। কথা এই আপন সমাজ নির্দ্দিষ্ট শ্রমকেই সর্ব্বাধিক মর্য্যাদা দিয়া অন্যান্য শ্রমের দ্বারা তাহাকেত পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিতে হইবে। সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতির ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বাস্থ্যবান তরুণ, যুবক ও প্রবীন স্বজাতিগণ কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন আশা করি।

বে-হা-লা

(ফরাসী গল্প)

রিচার্ড ও—মনরো

সেদিন আমি রু দ্য প্রোভেঁস (একটি রাস্তার নাম) দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। অভ্যাসবশেই আমি একটি কিউরিও দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। দোকানের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম সেটা মাদাম মঁসাবালের দোকান। আমি দোকানের দরজার হাতল ঘুরিয়ে দোকানে ঢুকলাম। না একটা ব্রেসলেট কেনবার জন্যে মাদাম মঁসাবালের সংগে পরামর্শ করতে ঢুকেছিলাম তা না তবে সোকেসে রাখা একটা বেহালা দেখেই আমার কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি বললাম "ওঃ, মাদাম মঁসাবাল, আপনি দেখছি বাজনার যন্ত্রপাতিও বিক্রী করে থাকেন। এটা কি আপনার দোকানের একটা নতুন সংযোজন? না মঁসিউ প্লাক্‌কে উপহার দেবার জন্যেই ঐ বেহালার আগমন?

"না, ওরকম কোনই কারণ নেই, মঁসিউ রিসার, ওরকম কোন কারণ নেই। আমি সেরকম মা নই যারা মেয়ের জন্যে কোনও প্রোফেসরকে প্রলোভিত করে। আমি জানি আমার মেয়ে জুডিথের মূল্য আর রেবেকার ভবিষ্যত। আমার মেয়েদের ভবিষ্যতে কেমন সৌভাগ্যের উদয় হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ব্যাপারটা কি জানেন—ঐ বেহালা আমার অনেক নিষ্ফল চেষ্টার স্বাক্ষর।"

আমি বেহালাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি জানি না কেন, কিন্তু কোনও রকমে কষ্ট করে বুঝতে পারলাম মাদামের নিষ্ফল চেষ্টায় সাক্ষারটা কি রকম হোতে পারে।

'হ্যাঁ', মাদাম বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি আপনার আশ্চর্য্য হবার কারণ কি? কিন্তু আমার বদন্যতা নিষ্ফল হোয়েছিল। আর। ভবিষ্যতে আমি ওরকম কোন চেষ্টা করব না। আচ্ছা, বেহালাটা কত দাম হোতে পারে বলে আপনার মনে হয়?"

আমি যন্ত্রটা হাতে করে নিয়ে দেখলাম। আমার কাছে মনে হোলো বাচ্ছাদের খেলনা, বা ওর থেকেও কম কিছু।

সেই জন্যেই আমি ইতঃস্তত না করেই উত্তর দিয়েছিলাম।

"আমি বলব বাইরে এর দাম বার ফাঁ।"

—ভাল, এটা আমার কেনা চারশো ফাঁয়ে।

আমার অবাকের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। স্বভাবতঃই এ ব্যাপার সামান্য কৌতুহলদ্দীপক। কিন্তু তখনই আমার নজরে পড়ল, চশমার আড়ালে মাদাম মঁসাবালের চোখ জলে ভরে উঠেছে। আমার সবসময়ই কোমল হৃদয়। এ যেন কুমীরের চোখে জল, বিশেষ করে মেয়ে কুমীর আমায় বিচলিত করে।

আমি মাদামের হাত ধরে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, "এর কথা আমায় বলুন, আপনি সুস্থ বোধ করবেন।"

—আঃ, মঁসিউ রিসার, আপনি ক্ষতের উপর নতুন করে রক্ত আনলেন; কিন্তু আপনাকে আমি বিফল করব না। শীতকালের এক সকাল। জুডিথ আর রেবেকা সবেমাত্র তাদের ব্রেকফাষ্ট শেষ করেছে। তারা হাত ধরাধরি করে ৮টায় স্কুলে গেল। আমি আমার কিউরিও গুলোর ধূলো ঝাড়তে লাগলাম। হঠাৎ আমার নজরে এলো একটি ছোট ভিখারী মেয়ে। সে কি সুন্দরই ছিল? মলিন ছিন্ন আবরণের মধ্যে থেকেও তার সৌন্দর্য্য যেন ম্লান হয়নি। সে বেহালাটি হাতে নিয়ে ঢুকল, ঢুকে ভিক্ষা চাইল। ভিক্ষা আমি দিইনা, আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই ছোট মেয়েটা কাঁদতে লাগল—

'দয়া করুণ মাদাম। শুধু আমার মার জন্যে সামান্য সসেজ কেনবার জন্যে সাহায্য করুণ। মা খুবই ক্ষুধার্ত। দশটার সময় রাস্তায় যখন অনেক লোক চলে, আমি তখন গান গাই। দুপুর নাগাদ আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

আমি গান গাইতে জানি, বিনা যন্ত্রের সাহায্যে গান গাইতে পারি। দয়া করে আমাকে কুড়ি স্যু (Sous) ধার দিন, এর জন্যে আমি আমার বেহালাটা বাঁধা রাখছি, আপনার কাছে। এই বেহালাটা খুবই পুরানো। এটা আমার প্রপিতামহের। পৃথিবীর কোনও কিছুর বিনিময়ে আমি এটা হাতছাড়া করতে পারব না। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই।

'এটা খুব বড় কিছু লোকসানের ঝুঁকি ছিল না। আমি তাকে ২০ স্যু ধার দিলাম, বদলে বেহালাটা রেখে ছিলাম।'

'মাপ করবেন মাদাম, আপনি যে বললেন চারশ ফ্রাঁ—'

'এতো অধীর হবেন না, মঁসিউ। প্রায় ১১টার সময় এক ভদ্রলোক দোকানে এলেন। তাঁকে দেখলে মনে হয় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি এসে আমার কিউরিওর ভেনাসের মূর্তিটা দেখলেন, পঞ্চদশ লুইয়ের আমলের ঘড়িটি দেখলেন তারপর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল বেহালা-টির দিকে।

"তিনি সেটা হাতে নিলেন, মৃদু হাত বোলালেন বেহালাটায়, তারপর বাক্স বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ বললেন, 'এটা আসল ষ্ট্রাডিভেরিয়াস। (Stradivarious)

'অসম্ভব'—আমি বললাম।

'এটা আমার পক্ষে ৫০০ ফ্রাঁতে কেনা সম্ভব'।

এই বিরাট মূল্যের প্রসঙ্গ আমাকে চঞ্চল কোরে দিল।

'কিন্তু যন্ত্রটি আমার নয়', আমি বললাম, এক শিল্পী আমার কাছে রেখে গিয়েছে। সে বলেছে যে সে এটা কোনমতেই হাতছাড়া করতে পারবে না। আমার মনে হয় সে এটা তার পূর্ব্বপুরুষের কাছে পেয়েছে। তবুও তাকে খুবই গরীব বলেই মনে হয়। আমি তাকে মাত্র কয়েকটা মুদ্রা ধার দিয়েছি। আমার মনে হয় ব্যাপারটার একটা ভাল মীমাংসা হোতে পারে।

'মাদাম, দয়া করে আমার কথা শুনুন, আপনি যদি আমাকে ঐ ষ্ট্রাডিভেরিয়াসটা পাঁচশ ফ্রাঁতে দেন তাহলে আপনার তার মধ্যে দুশ ফ্রাঁ লাভ থাকবে। যদিও আমাকে অনেক ফ্রাঁ দিতে হবে তবুও আমি অনেক লাভ করতে পারবো এর ওপর।

আমি বললাম, 'ভাল, মঁসিউ, বিকালের দিকে আসুন, আমি এবিষয়ে সেই শিল্পীর সঙ্গে কথা বলব।'

ঠিক দুপুরে সেই শিল্পী ফিরে এলো। সে আমাকে কুড়ি স্যু ফিরিয়ে দিল।

'আপনি দেখলেন ত' মাদাম, আমি অসৎ নই। এই নিন আপনার পয়সা আমাকে আমার বেহালাটি ফেরৎ দিন।"

"তোমার জন্যে আমার একটা প্রস্তাব আছে যা শুনে তুমি আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। আমি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জানি যিনি তোমাকে বেহালাটির জন্যে তিনশ ফ্রাঁ দেবেন।'

'আপনাকে বাধা দেবার জন্যে ক্ষমা করবেন মাদাম, আপনি যে একটু আগে বলছিলেন পাঁচশ ফ্রাঁ?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই, কিন্তু ঐ দুশ ফ্রাঁর লোভ আমি ছাড়তে পারিনি। কারণ তার মতো দরিদ্র মেয়ের কাছে তিনশ ফ্রাঁ একটা বিরাট কিছু। আমি ভেবেছিলাম সে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। না সেরকম কিছুই করল না সে। বলল যে বেহালাটা তার প্রপিতামহের, সেই জন্যে সে সেটা রাখবেই।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে চারশ ফ্রাঁ পর্য্যন্ত উঠতে হোলো। তবুও আমার একশ ফ্রাঁ লাভ হবে।

'দুশ ফ্রাঁ কমিশনের কথা ছেড়ে দিলেন?'

'হাঁ, কমিশনের অংকটা অনেক ছেড়ে দিয়েও। কিন্তু ব্যবসা ব্যবসাই। রেবেকা জুডিথ আমার কাছে অনেক। অবশেষে আমায় ভিখারিণীটি বেহালাটা বেচে দিতে মনস্থ করল। মেয়েটি সেই ভদ্রলোকের পরিচয় জানত না, সেই জন্যে আমি তাকে চারশ ফ্রাঁ দিয়ে ষ্ট্রাডিভেরিয়াসটা রেখে দিলাম।'

'এই কি শেষ, মাদাম মঁসাবেল?

'মঁসিউ, সব ব্যাপারটা একটা কুহেলিকা। হা ভগবান, একজন অতি ভদ্রবেশী লোককে বিশ্বাস করব না'ত'কাকে করব? ঐ ভদ্রলোকটি একজন দুর্বৃত্ত শ্রেণীর আর ঐ ছোট ভিখারী মেয়েটি তার সংগী। তাদের কাউকেই আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। আর আমার কাছে সেই বেহালাটা আজও আছে।

[মূল ফরাসী থেকে গল্পটিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাল।—সম্পাদক]

শুধু তাহাদেরি তরে

শ্রীকৃষ্ণধন দে এম, এ, কবিশেখর

আজো ভুলি নাই জাতির বেদনা, নিগূঢ় মর্মকথা,
বুকে জমে আছে অনাদৃতের কত না অসহ ব্যথা !
যারা পড়ে আছে আঁধারের বুকে, পায় না একটু আলো,
আমি তাহাদেরই গান গাই, আর তাহাদেরি বাসি ভালো !
যারা চেয়ে রয় মরীচিকা পানে, তৃষায় কাঁদিয়া মরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

ভুলে গেছে যারা অতীত-গরিমা, জানে না কি ছিল তারা,
কোন্ হিমাদ্রি নিঝরে আজ শুকায়েছে বারিধারা,
কোন্ সাগরের বক্ষে জেগেছে মরু-বালুকার হাসি,
চন্দন-বনে কোন্ দাবানল রেখেছে ভস্মরাশি !
লাজ-কম্পিত দ্বিধা-শঙ্কিত যারা এ ধরণী 'পরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

পদে পদে যারা পেয়েছে আঘাত রুক্ষ জীবন পথে,
তৃষ্ণায় যারা হোল দিশাহারা ভাগ্যের সৈকতে,
এতটুকু প্রেম, এতটুকু প্রীতি যাদের দেয় নি কেহ,
বঞ্চিত বুকে পায় নি'ক যারা কারো এতটুকু স্নেহ,
দুর্যোগ রাতে যাদের জীবন-প্রদীপ নিভেছে ঝড়ে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

জানে না'ক যারা নগর-বিলাস সভ্যতা-উপচার,
আপন কুটীরে নিরালা নিভৃতে পাতিয়াছে সংসার,
মাটি কেটে যারা বুনেছে ফসল, রোপন করেছে তরু,
খাল কেটে যারা করেছে শ্যামল তপ্ত ঊষর মরু,
তরী বেয়ে যারা বেসাতি করেছে অজানা দেশান্তরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

নির্জিত যারা, বঞ্চিত যারা, লাঞ্ছিত যারা দেশে,
কঠোর সমাজ যূপবেদীতলে প্রাণ দেয় অবশেষে,
পথ চলে যারা বহি অন্তরে নির্বাক্ হাহাকার,
নিঠুর ভাগ্য স্বপ্ন যাদের ভেঙ্গে করে চুরমার !
এতটুকু ছায়া পায় না'ক যারা জীবনের বালুচরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

যাদের আমরা মানিতে চাহিনা আমাদেরি জাত বলে',
মিলিতে আসিয়া সরে যায় যারা, শুধু সংশয়ে দোলে ;
দূর পল্লীর ক্ষুদ্র কুটীরে জীবন যাদের কাটে,
যারা খুঁজে লয় জীবিকা তাদের হয় হাটে, নয় মাঠে !
গানে যারা পূজে কমলেকামিনী বেহুলা লখীন্দরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

ইতিহাস হায়, বৃথাই খুঁজিছে কোথা গেল সেই জাতি,
ঘর্ঘরি' ছোটে কালের চক্র সৃষ্টি-ধ্বংশ গাঁথি,
কোথা হারায়েছে সপ্ত তরণী, লোহার বাসরঘর,
কোথা শ্রীমন্ত থিরজীবন্ত, কোথা সে চন্দ্রধর ।
কত মহাগ্রন্থ গুঁড়া হয়ে শেষে ধূলিকণা রূপ ধরে,
আমার কবিতা ভাষা পায় আজ শুধু তাহাদেরি তরে ।

লোকান্তরিতা শ্রীমতী নীলিমা সাধু

(জন্ম—১৩২২ :: মৃত্যু—১৩৬৭)

শ্রীহারাধন দত্ত

প্রাচীন কাল হতেই ভারতবর্ষের নারী সমাজ পুরুষের সহগামিনী ছিল। বৈদিক যুগ হ'তে আলোচনা করে দেখলে এই সত্যের সংগে পরিচিত হ'তে পারি। সেই পুরানো কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। ভারতবর্ষের সভ্যতার সেই উষা লগ্ন হতে সওদাগর ও বণিক সমাজের কুলললনারাও পশ্চৎপদ ছিলেন না। আমাদের সওদাগরী সভ্যতার ইতিহাসে তার পরিচয় আছে। কোন জাতির সভ্যতা কেবলমাত্র পুরুষের কীর্তি কথাতেই সম্পন্ন হয় না। সভ্যদেশ ও সভ্যজাতির প্রকৃত পরিচয় থাকে নারী ও পুরুষের সমমর্মিতার মধ্যে। মাতা যদি উন্নতমনা না হন—তাহলে উন্নত পুরুষ জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বৈশ্যগন্ধবণিকদের যদি কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকে তাহলে তার পিছনে নারীর দান স্বীকার্য। বাংলাদেশের মধ্য যুগের বিভিন্ন কাব্য সাহিত্য ও লোকসংগীতের নায়িকারা সেজন্যই সওদাগর সমাজ হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। বেহুলার পুণ্যগাথা দেবমহিমা লাভ করেছে।

কিন্তু সেকথা নয়—সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার পর হতে এই সওদাগর শ্রেণী দীর্ঘকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। দেশ ও সমাজে তারা প্রতিষ্ঠা হারিয়েছিল। প্রকৃত শিক্ষা লুপ্ত হয়েছিল। একদেশদর্শী স্মৃতি শাস্ত্রকারগণের স্বেচ্ছাচারের রাজত্বে আমাদের অস্তিত্ব ম্রিয়মাণ হয়েছিল। কিন্তু কোন খণ্ড বিস্মৃতিই ত জাতির প্রকৃত ইতিহাস নয়। আরও ইতিহাস আছে। পাশ্চাত্ত শিক্ষার আগুনে সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র দেশ অগ্নিস্নান করেছিল। দেশ জেগেছিল—আমরাও জেগেছিলাম। পুরুষ অভিযাত্রা করেছিল—নূতন দারুচিনি দেশের স্বপ্নে নারীও পিছে চলেছিল। আমাদের সমাজের নারীরা আজ আর পিছিয়ে নেই—বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সমাজ সেবায়, কলাসঙ্গীতে তারাও আজ জয়যাত্রার পথে। এই জয়যাত্রার উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আমাদের সমাজের যেই কয়জন নারী সেকালে আমাদের নারী সমাজের আত্মবিস্মৃতি মোচনে অগ্রসর হয়েছিলেন—আমার ধারণায় সদ্য লোকান্তরিতা শ্রীমতী নীলিমা সাধু তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লিখিতব্য।

শ্রীমতী নীলিমা সাধু কলিকাতার এক বিশিষ্ট ও প্রাচীন গন্ধবণিক পরিবারের কুলবধূ ছিলেন। গত ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে তারকনাথ সাধুর নাম জানিত না এমন শিক্ষিত লোক বাংলাদেশে ছিল না। বিশ্রুতকীর্তি আইন ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সি, আই, ই-র নাম, আজিও আইন ব্যবসার জগতে কিংবদন্তীর মত প্রচলিত আছে। কেবল ইহাই নয়—তিনি ভোলানাথের ভুল, মেনকারাণী, ঋণমোক্ষ, মহামায়ার মহাদান, স্মৃতিকথা, উপেক্ষিতের উপকারিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্য জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল সমাজবন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাসের সংগে 'গন্ধবণিক' পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন। গন্ধবণিকের নবজাগরণের পিছনে তাঁর দান নগণ্য নহে। ১৩৩১ সালে, গন্ধবণিক মহাসম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে (চোরবাগান) তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৩৩৮ সালে রিষাড়ায় নবম অধিবেশনে তারকনাথ ছিলেন সভাপতি। এই তারকনাথের পুত্রবধূ ছিলেন শ্রীমতী নীলিমা সাধু। তারকনাথের মধ্যমপুত্র শ্রীজলধিনাথ সাধু বার-এট ল মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ছিলেন শ্রীমতী সাধু। জলধিনাথ ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও একদা তিনি এই গন্ধবণিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এবং ১৩৫৪ সালের বাঁকুড়া অধিবেশনের মহাসম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। ইহার পূর্ব্বেও কলিকায় এই বংশের নিকট আত্মীয়েরা সুশিক্ষিত খ্যাতিমান ছিলেন। তারকনাথের

মাতুল, রায় সাহেব ব্রজনাথ সাহার (সিভিল সার্জেন) নাম উল্লেখ করি। ইহা ছাড়া কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় রমানাথ সাহা। সেকালে পণ্ডিত-জনের মধ্যে একজন ছিলেন (রমানাথ সাহা নামটা এবং তিনি তারকনাথের আত্মীয় কিনা, সঠিক মনে পড়ছে না) ইহার কথা তারকনাথ তাঁর একটি রচনায় উল্লেখ করেছেন।১ শ্রীমতী নীলিমা সাধু কুলবধূ হিসাবে প্রবেশ করে এই পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

আধুনিক সভ্যতার ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র চুঁচুড়া শহরে—১৩২২ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় প্রবাসচন্দ্র সাধু ছিলেন নীলিমা সাধুর পিতা। অতি বালিকা বয়সে অর্থাৎ ১৩৩৩ সালে (ইং ৪ঠা মার্চ্চ, ১৯২৬) তাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর স্বামীগৃহেই তার পড়াশুনা চলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি আই. এ -এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু চক্ষুরোগের জন্য তিনি পাঠ ত্যাগ করেন—পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ—কোনদিনই তার বন্ধ হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাসে (বাংলা ১৩৪৫) সালে স্বামী জলধিনাথ ইউরোপ যাত্রা করেন। স্ত্রী নীলিমা সাধুও স্বামীর সহযাত্রিনী হন। বিদেশে লণ্ডন হতে তিনি Child Welfare and Home Nursingএ ডিপ্লোমা অর্জ্জন করেন। অতঃপর তাঁরা ভিয়েনায় আসেন এবং সেখানে সুবিখ্যাত Prof. Veruerএর কাছে শ্রীমতী সাধু ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীমতী সাধু স্বামী ও স্বামীর বিশিষ্ট বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি শ্রীস্নেহাংশু আচার্য্য সহ নেতাজী স্ত্রী এমিল স্যাঙ্কলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত জলধিনাথ সাধু মহাশয় এই সাক্ষাতের বিবরণ পরে চিত্র সহ প্রকাশ করেন।২ বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে গন্ধবণিক মহাসভা হতে সাধু দম্পতিকে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্যপরলোকগত ডাক্তার রাখালচন্দ্র নাগ মহাশয়। ডাঃ হরিধন দত্ত, স্যার হরিশঙ্কর পাল, প্রভাতচন্দ্র বড়াল, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, ইন্দুভূষণ বিদ, গিরীন্দ্র কুমার লাহা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সম্বর্দ্ধনার বিবরণ তৎকালীন মহাসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীশিশির কুমার দত্ত মহাশয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।৩ ১৩৪৬ সালের ১৯শে আশ্বিন শ্রীমতী সাধু স্বামীসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী নীলিমা সাধু নানা শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছেন। তাঁর বহুবিধ গুণের কথাও সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়ে পড়ল। বাংলা ১৩৫১ সালে (ইং ১৯৪৪ এর সেপ্টেম্বর) বাংলা সরকার তাঁকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত বা Justice of peace উপাধিতে ভূষিত করলেন। আট বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রভূত সুনাম অর্জ্জন করে কার্য্যাধিক্য জনিত রোগের জন্য ১৩৫৯ সালে (ইং ১৯৫২) তিনি পদত্যাগ করেন। আমাদের সমাজের মহিলাদের মধ্যে এই সম্মান ইতিপূর্বে অন্য কেহ অর্জ্জন করেননি। শ্রীমতী সাধু ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হওয়াকালীন মহাসভা এবং বিজয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন হয়। "কলিকাতার লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট" শীর্ষক সেই সভার সংবাদ তৎকালীন গন্ধবণিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।৪ দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি আপন গৃহাঙ্গনের কথা কোনদিন বিস্মৃত হননি। সংসারের খুঁটিনাটিগুলি তাঁর নখদর্পনে থাকত। কেবল তাই নয়—সামান্য অবসর-গুলিকেও তিনি কল্যাণকর কার্যে নিয়োজিত করতেন। বৃহতের প্রতি অসীম পিপাসা তাঁকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করত। গন্ধবণিক জাতির সেবা তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিচয়। এই সমাজের নারীজাতি কেমন করে সহজেই এই যুগের অভিযাত্রী হতে পারে তিনি তার চেষ্টা করতেন। আমাদের সমাজে নারী আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী শ্রীমতী সাধু। ১৩৪৭ সালে মানভূমে,

১) গোত্র ও প্রবর—মাসিক বসুমতী—১৩৩৮ (মাঘ)
২) নেতাজীর বিবাহ—গন্ধবণিক সমাজ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮
৩) গন্ধবণিক, বৈশাখ, ১৩৫৫
৪) গন্ধবণিক, পৌষ, ১৩৫১

রঘুনাথপুরে যে সম্মিলনী হয়—শ্রীমতী সাধু সেই সম্মেলনে মহিলা শাখার সভানেত্রীত্ব করেন। ইহার পূর্বে আর একবার এই মহিলাসভা আহুত হয়েছিল—সম্ভবতঃ ডাঃ হরিধন দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিনী সেই সভায় নেতৃত্ব করেন। তিনি অভিভাষণে এই সমাজের নারীজাতির, নানা বিষয় আলোচনা করেন। বিশেষ করে, চতুরাশ্রমের সমস্যা, পণপ্রথা, বধূগণের প্রতি ব্যবহার, শিক্ষা, বৈশ্যাচার ও বৈশ্যবার্ত্তা, বালবিধবাদের সামাজিক নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুচিন্তিত আলোকপাত করেন। এবং পরিশেষে জাতির দরবারে নিবেদন করে বলেন—'এই মহিলা সম্মিলনী সম্পর্কে আর একটি কথা না বলিয়া শেষ করা যায়না—সেটী হইতেছে এই, মহিলা সম্মিলনী আজ যে সর্ব্বপ্রথম হইতেছে তাহা নহে। ইহার পূর্ব্বেও আর একবার এইরূপ সম্মেলন হইয়াছিল। সেটি হয় ১৩৩৪ সালে গন্ধবণিক মহাসম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সহিত। সেইবার সম্মিলনী কলকাতায় স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের বাটী সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যদিও সেই সম্মিলনী সাফল্যমণ্ডিত হয় কিন্তু তাহার পর হইতে আর কোন মহিলা সম্মিলনীই হয় নাই। তাই আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা সকলে চেষ্টা করিয়া এই সম্মিলনী বন্ধ না হইয়া যাহাতে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করুন।"[৫] সভানেত্রীর এই আহ্বানের পর হতে গন্ধবণিক মহিলা সম্মিলনী সাফল্যমণ্ডিত হতে থাকে। এর পরবর্তীকালে প্রতিমা সাধু বি-এ, চারুশীলা দাঁ, সুষমা বিদ প্রভৃতি মহিলা নেত্রীরা গন্ধবণিক নারী আন্দোলনের বার্তামহী হয়ে ওঠেন। অতঃপর ১৩৫৪ সালে বাঁকুড়া মহাসম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীমতি সাধু পুনরায় সভানেত্রীত্ব করেন। গন্ধবণিকের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে সেজন্যই শ্রীমতী নীলিমা সাধু এক স্মরণীয় নাম।

বাংলাদেশের নারীজাতিকে খেলাধূলা-ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করবার জন্য জাষ্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৩২ (বাং ১৩৩৯) সালে 'আনন্দমেলার' প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমতী নীলিমা সাধুও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী। পরবর্তীকালে এই আনন্দমেলা ও শ্রীমতী সাধুকে অভিনন্দিত করে। এদেশের নারীসমাজের দীর্ঘকাল অসূর্যম্পর্শা জীবনযাপনে শ্রীমতী সাধু ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই বন্ধন মুক্তির জন্য তিনি সাধ্যমত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কলিকাতার প্রগতিশীল মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী নীলিমা সাধুর নামকেও আমরা শ্রদ্ধার সংগে যুক্ত করতে পারি।

শ্রীমতী নীলিমা সাধুর অপরগুণ তাঁর লেখনীশক্তি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি রচনাদি প্রকাশ করতেন। 'গন্ধবণিক সমাজ' পত্রিকা সম্পাদনে তিনি তাঁর স্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর লেখা গল্পগুলির একখানি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।[৬] তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে বংগভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে পারতেন। তাঁর লেখা এই গল্পরাজির মধ্যে সূক্ষ্মরসবোধ তথা মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।

শ্রীমতী নীলিমা সাধুর জীবনের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মাত্র ৪৫ বৎসরের কিছু অধিক বয়সে গত ২রা মাঘ ১৩৬৭তে পার্বতী ঘোষ লেনের নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। গন্ধবণিক সমাজের কুললনাদের মধ্যে শ্রীমতী নীলিমা সাধুর নাম কি কারণে স্মরণীয় আমরা সংক্ষেপে তার ইঙ্গিত করেছি। মহৎজীবনের এই অকাল বিয়োগে প্রতিটি নিষ্ঠ বণিক সন্তান ব্যথিত হবেন। একদা যৌবনেই যিনি সমাজসেবার সর্ব অংগে নিজেকে বিস্তারিত করেছিলেন—আজ তাঁর অকাল বিয়োগে আমাদের শোকসন্তপ্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় গন্ধবণিক সমাজের কোন সংস্থা বা সমিতির দ্বারা এই সদ্য বিগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়নি। ইহ, অতীব দুঃখের কথা। শ্রীমতী নীলিমা সাধুর পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্তের সংগে আমার পরিচয় নেই—তবু তাঁর জীবনের যতটুকু কৃতিত্বের সংগে আমি পরিচিত আছি এই অবসরে তাই লিপিবদ্ধ করলাম এবং এই সামান্য কথা দিয়েই আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

৫) গন্ধবণিক, মাঘ, ১৩৪৬, পৃঃ ২৮

৬) চয়ন, (১৩৬৬)—শ্রীমতী নীলিমা সাধু।

কম্বোজ ও চম্পা

স্বর্গীয় ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র দাস, পি-এইচ-ডি

ভারতীয় প্রাচীন বণিকগণ যে কেবলমাত্র এশিয়ার পশ্চিমভাগে মিশর দেশে এবং ইউরোপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহা নহে, তাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, মালয়-উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ (Borneo) শ্যামদেশ, কম্বোদিয়া বা কম্বোজদেশ এবং চীনদেশের উপকূল সমূহেও বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং এবং যে যে স্থানে বাণিজ্যের সুবিধা হইত, সেই সেই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়নে যবদ্বীপ সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বীপের উল্লেখ আছে। সুমাত্রা দ্বীপকে রামায়ণে সম্ভবতঃ রূপক দ্বীপ বলা হইয়াছে। সুবর্ণ দ্বীপকে আধুনিক বোর্ণিওর সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে, এবং 'শিশির' নামক পর্বত সম্ভবতঃ আধুনিক শিলিবিশ (Celebes) দ্বীপ কিংবা কোন উচ্চ পর্বতের নাম হইতে পারে।

কম্বোজের কথা বলা যাউক। ইংরেজী ভাষায় এই দেশকে কম্বোদিয়া (Cambodia) বলে। কিন্তু ফরাসীগণ (বর্তমান সময়ে এই দেশ তাহাদের অধিকৃত) ইহাকে কম্বোজ (Cambodge) বলেন। স্থানীয় খেমর(Khmers) ইহাকে কম্বোজ নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। রামায়ণে 'কম্বোজ' নামে এক দেশের উল্লেখ দেখা যায়। সেই দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপন্ন হইত। যথা :—

> কম্বোজ বিষয়ে জাতৈবাজীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ
>
> বনায়ু জৈর্ণদাজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ
>
> আদি ৭।২২)

অর্থাৎ "অযোধ্যাপুরী কম্বোজ বা বাহ্লীক দেশজাত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে এবং বনায়ু দেশজাত এবং সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেশজাত উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য উৎকৃষ্ট হয় সমূহে পূর্ণ থাকিত।" এই কম্বোজ দেশ গান্ধার দেশের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সিন্ধু ও বাহ্লীক দেশের উল্লেখদর্শনে মনে হয় রামায়ণে কম্বোজ আধুনিক কাফিরিস্থানের সহিত অভিন্ন। কিন্তু ইহাও মনে হয় যে, তাহা শ্যামদেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কম্বোজ দেশ হইতেও পারে। কেননা, এই দেশের অশ্ব, আকারে কিছু ছোট হইলেও দৃঢ়াঙ্গ ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম বা দশম শতাব্দীতে 'কম্বু' নামক জনৈক হিন্দুরাজা ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গমন করিয়া কম্বোজে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐদেশে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে এবং 'কম্বু' হইতেই কম্বুজ বা কাম্বোজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাও তদ্দেশীয় খেমগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। রামায়ণের উল্লিখিত কাম্বোজ কোম্বোদিয়া না হইতেও পারে এবং সম্ভবত নহে। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, হিন্দু বণিকগণ সমুদ্রযাত্রা করিয়া "ভেড়ার বদলে ঘোড়াও" আনিতেন। সে যাহা হউক, কাম্বোজের প্রধান নগরের নাম, আঙ্কোর; কিন্তু ইহার অপর একটি নাম 'ইন্দ্রপথপুরী' অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী। কম্বু ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গিয়া সে দেশে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি এই নূতন উপনিবেশের রাজধানীর নাম মাতৃভূমির প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরীর নামানুসারেই রাখিয়াছিলেন। ইহা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হইবে না।

এশিয়ার মানচিত্র উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, তাহার পূর্ব দক্ষিণ দিকে শ্যামদেশ; এবং এই শ্যামদেশের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে সমুদ্রতটে কম্বোজ দেশ অবস্থিত। মেকঙ্গ নামক নদী এই দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে। এই দেশের চতুঃসীমা এইরূপ: উত্তরে শ্যামদেশ এবং লায়োস, পূর্ব্বে অনাম দেশ, দক্ষিণে এবং পূর্ব দক্ষিণ দিকে কোচিন চায়না, দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্যাম উপসাগর এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। এই দেশের পরিমাণ ৬৫ হাজার বর্গমাইল এবং বর্তমান সময়ে ইহার অধিবাসীগণের সংখ্যা ১৫ লক্ষ, তন্মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ কম্বোজ দেশীয় এবং অবশিষ্ট লোক চীন, অনাম, চম্পা ও মালয়বাসী ও আদিম অধিবাসী।

কাম্বোজের প্রধান নৈসর্গিক দৃশ্য একটি বিরাট হ্রদ। ইহার নাম তৌলে সাপ (Toule Sap)। ইহা ৬৮ মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ মাইল চওড়া।

খেমর জাতি স্থানীয় অধিবাসী এবং আর্য্য ও চীন জাতির সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। ইহারা এখন বৌদ্ধধর্ম্ম মানিয়া চলে। কিন্তু কম্বোজের রাজসভায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য আছে। হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদের জাতি বিভাগ আছে রাজাদের উর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহবংশ (Brah-vansa) এবং পঞ্চম পুরুষের উর্দ্ধতন ব্যক্তিগণ ব্রাভন (Brah vansa) নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের ব্যক্তিগণের নাম বকেই (Bakon)। সম্ভবতঃ ভিক্ষু শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা রাজকর দেয় না, এবং বাধ্যতামূলক সকলপ্রকার কার্য্য হইতে বিমুক্ত। এই দেশের রাজভাষা, রাজলিপি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাক্যসমূহ আর্য্য (সংস্কৃত) ভাষা এবং লিপি হইতে সমুৎপন্ন। পালি ভাষার সহিত তাহাদের সাদৃশ আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রুতবর্ম্মার রাজকত্বকালে কম্বোজের সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে চমৎকার সৌধাবলী সমন্বিত আঙ্গোর থোম্ নামক রাজধানীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠে। মন্দির সমূহের মধ্যে ব্রহ্মার মন্দিরই প্রকাণ্ড, শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার কারুকার্য্য সমন্বিত। মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত ও পঞ্চাশটি চূড়ার দ্বারা শোভিত। মধ্যের চূড়াটি সর্ব্বোচ্চ ও প্রকাণ্ড। প্রত্যেক চূড়ার চারি পার্শ্বেই প্রস্তরের উপর খোদিত ব্রহ্মার সুবৃহৎ মুখাবয়ব আছে।

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পূর্ব্বোক্ত নদীতটে। 'আঙ্কোর বাট' নামক প্রকাণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। মন্দির ও প্রাসাদের গাত্রে প্রস্তরের উপর লতাপাতা ফুলফল এবং পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক ঘটনাসমূহের বৃত্তান্ত এরূপ সুন্দর-ভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয় এবং স্থাপত্য শিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

চম্পাদেশ কাম্বোজের দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে আধুনিক কোচিন-চাইনা ও অনামদেশ ব্যাপিয়া সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে দিনহ্-বো-লানহ্ (Dinh Bo-Lanh) অনামের কিয়দংশ অধিকার করিয়া স্বীয় নামে একটি নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। চম্পা রাজ্য এক সময়ে কাম্বোজ রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। চম্পার অধিকাংশ মন্দিরই শিবমন্দির, এখনও অনেক শিব লিঙ্গ বিদ্যমান আছে গাত্রে এবং তোরণের উপর দেবদেবীর যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদের শিল্প সৌন্দর্য্য চমৎকার। এই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে দশভূজা ভগবতী দুর্গা দেবীর এবং কার্ত্তিক-গনেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাম্বোজে নাগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, কাম্বোজবাসীরা প্রধানতঃ নাগোপাসক ছিলেন আর চম্পাবাসীরা শৈব ও শাক্ত ছিলেন। এই বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাসই যুদ্ধের মূল কারণ হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে শৈব চাঁদ সওদাগরের সহিত মনসাদেবীর বিবাদের কাহিনীতে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য মুখরিত। এই বিবাদে সাত-সাতটি পুত্র হারাইয়া ছিলেন, তথাপি তিনি মনসার পূজা করেন নাই। এই চাঁদ সদাগরের বাটী চম্পাই নগরে ছিল বলিয়া কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে।

"চাঁদ বেনে সদাগর
চম্পাই নগরে ঘর।

এই চম্পাই নগর কোথায়? বঙ্গদেশের নানাস্থানে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কেহ বলেন ভাগলপুরের নিকট চম্পাপুরীই চাঁদবেনের চম্পাই নগর। কেহ কেহ বর্দ্ধমান মানকরের নিকট কসবা গ্রামই চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইস্থানে এখনও চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন এবং প্রতি বৎসর মাকরী সপ্তমী তিথিতে চাঁদসদাগরের নামে মেলা বসিয়া থাকে এবং সেই মেলায় বহু গন্ধবণিক নর-নারী শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আসেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ববঙ্গে এবং আসামেও কোন কোন স্থানে চম্পাই নগরীর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। আমার অনুমান হয় যে বাঙালী গন্ধবণিকগণ বাংলা দেশ হইতে সুদূর কোচিন চাইনাতে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেইস্থানে অঙ্গদেশ বা বঙ্গদেশের চম্পানগরীর নামানুসারে চম্পা নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন, এবং তাহাই চম্পা রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

প্রবাসী পৌষ ১৩৩২ র হইতে

Gandhabanik Mahasava
NOTICE

The Sub-committee of Gandhabanik Mahasava is pleased to grant the following stipends to the students for the session 1960-61. in a meeting held on 7. 1 61. The students concerned are hereby directed to contact Hony. Secretary, Chhatrabas of Gandhabanik Mahasava immediately for further action.

Bankim Chandra Daw
Hony. Secretary

LIST OF GRANTS

1. 'Aukhoy Coomer Laha Mamorial Stipend'—Rs. 15/- p.m. Granted to Sriman Manabendra Das of Jalpaiguri. 1st Year—Engineering.

2. 'Nirodamoni Laha Memorial Stipend'—Rs. 10/- p.m. Granted to Sriman Kalyan Kumar Dutta of Calcutta, 3rd Year Science.

3. 'Satyarani Daw Memorial Stipend' —Rs. 8/- p. month. Granted to Sriman Radhanath Hati of Murshidabad. 4th Year Science.

4. 'Kirti Chandra Daw Memorial Stipend'—Rs. 10/- p.m. Granted to Sriman Tusher Kanti Sinha of Midnapore. 1st Year Medical.

5. 'Renu Bala Dutta Memorial Stipend'— Rs. 12/- per month. Granted to Sriman Sunil Ch. Sadhu of S. Parganas. 4th Year Science.

6. Stipend donated by Sri Keshab Chandra Daw—Rs. 5/- p.m. Granted to Sriman Ashoke Kumar Dutta of Midnapur. 3rd Year Commerce.

7. Stipend donated by Sri Durga Charan Dutta—Rs. 10/- p.m. Granted to Sriman Nirendu Dutta of S. Parganas. 1st Year Science.

8. 'Ashrumati Laha Memorial Stipend' —Rs. 5/- p m. Granted to Sriman Shyamsunder Banik of Trippara. A.M.I.E. Engineering.

নববর্ষে শুভেচ্ছা

চল্লিশ বৎসর ধরে "গন্ধবণিক" মাসিক পত্রখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে, বর্ত্তমান মাসে একচল্লিশ বছরে পদক্ষেপ করছে। মূলতঃ গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র হলেও পত্রিখানির দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও কৃষ্টিসম্পন্ন। ছাপা ও পরিবেশন প্রশংসনীয়।

'গন্ধবণিকে'র সাফল্যের মূলে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম নিহিত রয়েছে তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় যথাক্রমে প্রকাশক শ্রীসাধন ধন নাগ ও পত্রিকার, সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীহারাধন দত্ত মহাশয়দ্বয়ের। তাঁদের যোগ্যতা পত্রিকার পাঠকপাঠিকার অবিদিত নয়। আমি পত্রিকাটির এই শুভ নববর্ষের সূচনাতে আন্তরিক শুভ কামনা জানাই। "গন্ধবণিক" দীর্ঘজীবি হোক্।

প্রাণতোষ ঘটক
সম্পাদক—বসুমতী

১২।১।৬১

গান্ধিককুল-মঙ্গলাচরণম্।

১

শ্রীদুর্গাচরণারবিন্দশরণা যে পূর্ব্বজাঃ সর্বথা
দেবীপূজনযোজনাদিনিপুণাঃ পুণ্যক্রিয়া-পালকাঃ।
আসন্ গন্ধ-বণিক্‌কুলে সুবিমলে ব্যোম্নীব দীপ্তা গ্রহা
স্তেষাং ভক্তিপরায়ণঃ সমভবদ্‌যো রামনারায়ণঃ।

২

তৎপুত্রোঽজনি ধর্ম্মদাস ইতি যঃ সার্থাভিধানঃ কৃতী
বাণিজ্যং নিজবুদ্ধি-সজ্জিতমলং বিত্তা-র্জনায়াতনোৎ।
ধর্ম্মার্থৌ সমমাশ্রয়ন্ নিজকুলং কীর্ত্তিস্রজা রঞ্জয়ন্।
দেবীকৃষ্ণ ইতি প্রকৃষ্ট-মতিযুক্ সূনুং জহৎ স্বর্গতঃ॥

৩

তস্মাত্তারকদাস ইতি যঃ খ্যাতঃ প্রসূতঃ সুতঃ
কলকাতাচিরবাস-চারুযশসা বংশাবতংসান্বিতঃ।
তৎসূনুঃ সহৃদারসুন্দর-মতি-র্গোবিন্দ-সেবাপ্রিয়ঃ
শ্রীমৎকেশবচন্দ্র-নাম-রুচিরোঃ নপ্তো জনানন্দনঃ।

৪

শ্রীদুর্গার্চন-দুর্গমব্রতমহাযজ্ঞস্য কালক্রমাৎ
সৌভাগ্যাদুদিতঃ শতদ্বয়মিতঃ প্রাপোৎসবো বৎসরঃ
দেবী ব্রহ্মময়ী ত্রিলোকজননী ক্ষেমং বিধত্তাং সদা
মৃন্মূর্ত্তি-প্রতিমাপ্রতীতমহিমা লীলাবিলাসচ্ছলাৎ॥

৫

নন্দন্তু স্বজনা-ন মন্দমতয়ো নিন্দন্তু সদ্‌ভাবনাম্
বংশো গন্ধবণিগ্‌জনস্য রমতাং ধর্মস্থিতিং পালয়ন।
নিত্যং শ্রীহরিশঙ্করাদি সহিতা মাতা চ গন্ধেশ্বরী
শ্রীদুর্গাদ্বয়মূর্ত্তিরার্ত্তিহরণী মর্ত্ত্যান্‌পরিত্রায়তাম্॥

ভট্টপল্লীয় শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মনাম্

[ধর্ম্মদাস দাঁর কুলদেবী অভয়া দুর্গামাতার দুই শত বার্ষিকী পূজা মহোৎসব উপলক্ষ্যে (১৩৬৭) যে সংক্ষিপ্ত স্মারক পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল। ভারত সংস্কৃত তথা প্রাচ্য সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, কর্ত্তৃক সেখানে এই কুলপরিচয়টি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হল। —সম্পাদক]

[বর্ষ প্রবেশ সংখ্যায় বিশিষ্ট কবি রমেন্দু দত্ত ও উপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কবিতা ও আশীর্বচন মুদ্রিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ উক্ত লেখা দুটি প্রকাশিত হতে পারল না। এজন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক]

গন্ধবণিক মাসিকপত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ

২য় সংখ্যা

ফাল্গুন

১৩৬৭

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

প্রসঙ্গ কথা

প্রসঙ্গ কথার অবতারণা করতে গেলে অনেক কথাই ভাবতে হয়। কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করা উচিত কোনটা বেশী উল্লেখযোগ্য, কোনটা কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা উচিত এসব কথাই ভাবতে হয় লেখবার আগে। প্রসঙ্গ কথার মধ্যে এমন কতকগুলো প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় আমাদের এই পত্রিকায় যার মধ্যে থাকে সাহিত্য, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক বিষয়ক আলোচনা বা কোন সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে। এবারের উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের কথা মনে করতে গেলেই মনে আসে প্রথমে অতুল গুপ্তের মহাপ্রয়াণ, কঙ্গোর বহু আলোড়িত ঘটনার নায়ক প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যা, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত তথা কলকাতায় আগমন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত

প্রখ্যাত সাহিত্য সাধক ও ব্যবহারজীবি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করলেন গত ৪ঠা ফাল্গুন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বিশিষ্ট মনিষীকে আজ হারাল। স্থাপনাকাল থেকে তিনি এই পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য সেবা করে গিয়েছেন। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অতুলবাবুর দান কারোর অবিদিত নয়। শুধুই সাহিত্যে নয় জীবনে আরও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্রে এসব বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছিল।

পরিণত বয়সেই অতুলবাবুর মৃত্যু হোয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হোয়েছিল ছিয়াত্তর। কিন্তু তবুও যেন তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে অকালমৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে। কারণ তাঁর মতো মনীষির কাছে বাংলাদেশ আরো কিছু পেলে ভালো হোতো। তাঁর মৃত্যুতে পৌর প্রতিষ্ঠানের সভা একদিন মুলতুবি থাকে। হাই কোর্ট তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বন্ধ রাখা হয় একদিন। বাংলাদেশের কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির একজন ধারককে হারালাম আমরা। তাঁর বহু খ্যাত, কাব্য জিজ্ঞাসা, নদীবক্ষে প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড, Studies of Bengal Reniance প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। গন্ধবণিকের

রাণীর আগমন

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সাম্প্রতিক কলিকাতা ভ্রমণে এক অভাবনীয় প্রাণচাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকদিন আগে। বিগত দিনের সেই রাজাপ্রজার সমন্ধ আজ নাই। থাকলে এর থেকে বেশী কোন সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হোতো কিনা জানিনা তবে এর থেকে বেশী হার্দিক হোতো কিনা সন্দেহ। কারণ বোধহয় বিগত দিনের রাজাপ্রজার সম্পর্ক আজ হোয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। রাণী ভারতে ছিলেন প্রায় ২৩ দিন। ২৩ দিনের এই শুভেচ্ছা সফরে রাজদম্পতি যে অভূতপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন তা বোধহয় বিরল। অন্ততঃ কোলকাতার সম্বর্দ্ধনা দেখে রাণী বলেছেন, লণ্ডনকে হার মানিয়েছে কোলকাতা। রাণীর সংগে এসেছিলেন তাঁর স্বামী ডিউক অফ এডিনবরা, প্রিন্স ফিলিপ। তাঁরা কোলকাতায় এসে দেখলেন জাতীয় কৃষিমেলা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, রেস কোর্স ইত্যাদি। দুর্গাপুরেও রাণী গিয়েছিলেন নব-ভারতের গঠন দেখতে। কয়েকটি বৃটিশ সংস্থা কতৃক স্থাপিত ভারতের এই তৃতীয় ইস্পাত কারখানাও তিনি দেখে গিয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের অগ্রগতি। সমালোচকরা যাই বলুন না কেন, ভারতের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে।

কালের পরিবর্ত্তন হোয়েছে। তা না হলে একদা যে সাম্রাজ্যের কখনও সূর্য্য অস্ত যেত না সেই সাম্রাজ্যও আজ অতীব ক্ষীণ হবে কেন। রাণী আজ যে ভারতে এসেছিলেন সেই ভারত ১৩ বছর আগে ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে। ১৩ বছর আগে তিনি এলে সম্মান পেতেন নজরানা নিয়ে, এখন পেলেন উপহার নিয়ে। আগেকার সম্পর্কও নাই আর সে ঐতিহ্যও নাই। আছে শুধু গণতন্ত্রী মনোভাব। বন্ধুত্বের স্বীকৃতি। মৈত্রীর বন্ধন। রাণী এলিজাবেথের সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় এই দুই মহান দেশের মধ্যে যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করে গেলেন তা দীর্ঘজীবি হোক এই প্রার্থনা জানাই

লুমুম্বা হত্যা ও কঙ্গো পরিস্থিতি

কঙ্গোর পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করলো প্যাট্রিস লুমুম্বা হত্যাজনিত ব্যাপারে। সারা বিশ্বে এই হত্যার প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠেছে। কঙ্গোর স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ঘনিয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জটিলতা। ক্ষমতা দিয়েও ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ বেলজিয়াম। এই জটিলতা সৃষ্টি করেছে তাদের উৎকোচপুষ্ট নেতা খাড়া করে। ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে দেশের জনগণের মনে এসেছে শঙ্কা, এসেছে অনাস্থা। কাশাবভু, টিসোম্বে, সংগে কলেঞ্জি একসংগে লুমুম্বার বিরুদ্ধে লেগেছে। কর্ণেল মোবুটুর হাতে পূর্বে ধৃত অবস্থায় থাকাকালে লুমুম্বাকে হত্যা করা হয় তার আরও দুজন সহকর্মী সহ।

লুমুম্বা হত্যার পরে কঙ্গোতে দেখা দিয়েছে গণচেতনা। লুমুম্বা পন্থীদের মধ্যে এসেছে জীগিষা। ক্ষমতাশীল নেতা-দের আর তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে ঘোষিত হোয়েছে সংগ্রাম। সারা বিশ্ব আজ লুমুম্বা হত্যার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মস্কো, বেলগ্রেদ, কায়রো, জাকর্ত্তা, রেঙ্গুন, নয়াদিল্লী প্রায় সব দেশেই বেলজিয়াম এবং তাঁদের সমর্থনকারী দেশ প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছে লুমুম্বাকে যারা ভালবাসতো। নেহেরুজী বললেন মৃত লুমুম্বা জীবিত লুমুম্বা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শক্তি-শালী। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ধ্বনিত হচ্ছে "লুমুম্বা দীর্ঘজীবি হোক্।" আফ্রিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হোলো লুমুম্বা মৃত্যুর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে। প্রতিক্রিয়াশীল দেশগুলির জন্যে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ কঙ্গোতে বিশেষ কিছু কাজ করতে পারেননি। বলতে গেলে অনেক দেশের অভিমত কঙ্গো থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এদের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ অবশেষে এক সুচিন্তিত ব্যবস্থার উদ্যোগী হোয়ে কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ থামাতে প্রয়াসী হোয়েছেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রয়োজন হোলে কঙ্গোতে বলপ্রয়োগ করার জন্যে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নির্দেশ দিয়ে-ছেন। তবে সেই নির্দেশ কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ নিবারণ করায় কতটা সহায়তা করবে বলা যায়না। দেশে সশস্ত্র সৈন্যদল

থাকলে গৃহযুদ্ধের মনোভাব কতটা স্তিমিত হবে বলা কঠিন। তবে কঙ্গোতে আভ্যন্তরীণ সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করতে পারলে আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী দেশে শান্তির ভাব ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হোলে তবু সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাব কার্যকরী হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওদিকে লুমুম্বা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে লুমুম্বা সমর্থকদের অগ্রগতিও আবার দুশ্চিন্তার কারণ হোয়েছে। এই দ্বিবিধ অবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দের অবসান কিভাবে ঘটবে সেটাই এখন লক্ষণীয়।

পরলোকে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ লোকান্তরিত হোয়েছেন। ভারত একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হারাল। 'ভারতরত্ন' পণ্ডিত পন্থ সত্যই ভারত রত্ন ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংগঠনে পণ্ডিত পন্থের দান অনেক। শ্রীনেহরু একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা এবং উল্লেখযোগ্য সহকর্মী হারালেন। ভারতের জনগন হারাল একজন মহান জননায়ককে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এই দেশসেবক যে প্রকৃষ্ট দেশপ্রেমিকতা দেখিয়ে গিয়েছেন তা বিরল। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব মুক্তিকামী কংগ্রেস নেতাগণ ছিলেন পণ্ডিত পন্থ তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিলেন। দেশের সংকটকালে তাঁর দৃঢ়তা অন্যান্য সহযোগী নেতাদের মনে জানিয়েছিল অপরিসীম বল। অনেকে বলেন, সর্দার প্যাটেলের এবং মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর শ্রীনেহেরু সর্ববিষয়ে পণ্ডিত পন্থের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন।

পণ্ডিত পন্থের কর্মবহুল জীবন শুরু হোয়েছিল ১৯১[illegible] সালে। সেই সময় থেকেই তিনি দেশের জনহিতকর কার্য্যে এবং মুক্তি সংগ্রামে ব্রতী হোয়েছিলেন। বৃটিশ শাসনকালে অন্যান্য অনেক দেশনেতাদের মত পণ্ডিত পন্থও নির্য্যাতিত হোয়েছেন অনেক। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তাঁর সক্রিয় সহযোগীতা ছিল। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্বও করেছেন তিনি কিছুকাল। পরে স্বকীয় ক্ষমতায় তিনি ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকালে তাঁর দান যথেষ্ট।

দীর্ঘ ১৪ দিন অজ্ঞান অবস্থায় রোগভোগের পর পণ্ডিত পন্থ ৭ই মার্চ্চ ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পণ্ডিত পন্থের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের এক অপূরণীয় ক্ষতি হোল। মঙ্গলময়ের নিকট আমরা পণ্ডিত পন্থের আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীচন্দ্রনাথ পাল

[মাঘ সংখ্যা প্রকাশের সংগে সংগে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল আমাদের এই পৃথিবীতে। আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল কথা উপস্থিত করতে পারি না। তবু সমাজের আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আমরা অতি প্রয়োজনীয় খবরগুলো সংবাদ সাহিত্যের মতই উপস্থিত করি। বিশেষ কারণে যথাসময়ে উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য পত্রিকার অন্যতর সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছিলাম। তিনি নিষ্ঠার সংগে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবু স্থানাভাববশতঃ একটি সংবাদ পরিবেশিত হতে পারেনি। সেটি সদ্যপরলোকগত সাহিত্যিক ও নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের কথা। বারান্তরে প্রসঙ্গকথায়, এই বঙ্গ নাট্যকলাবিদের উপর আলোচনা করা হবে। —শ্রীহারাধন দত্ত, সম্পাদক]

তারা কি প্রেমিক ?

শ্রীঅনন্ত কুমার দত্ত

হে আকাশ !

শূন্য তব বিশাল হিয়ায়—
কোন্ শিল্পী এঁকে গেছে আলোর কণিকা,
কে তোমারে দিয়ে গেছে অনির্ব্বান শিখা
বিশ্বময় ?
জীবনের অপূর্ব্ব সংশয়—
জাগে মনে—দেয় দোলা—
আপনার সৃষ্টি হাতে সে কোন আপন ভোলা
চেয়েছিল পরিচয় তব—
দেখাইয়া রূপ নিত্য নব
বিস্ময়ে অবাক করি' দিয়াছ তাহারে।
দেখা তার হলো নাকো শেষ—
ফুরাইয়া এলো তার জীবনেতে আলোর নির্দ্দেশ—
অসমাপ্ত রয়ে গেল তাহার জিজ্ঞাসা—
তবু তার চিরন্তন আশা
মানবের চিত্ত মাঝে তোলে আজ তীব্র কৌতূহল
কারা ঐ অন্ধাকাশের দীপ্ত আলো দল ?

কেন তারা বর্ষ বর্ষ জাগি'
রয়েছে উন্মুখ হয়ে—কোন্ ভিক্ষা মাগি'
কালে কালে, মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে—
আকাশের বক্ষ মাঝে
জাগি তারা কোন্ কৌতুকেতে ?
প্রশ্ন তার পায় নি তো ভাষা
কৌতূহলী অন্তরের অদম্য পিপাসা—
ছড়ায়ে পড়েছে আজ নিখিল হিয়ায়—
আজো শোনা যায়—
মুগ্ধ মানবের মুখে অতীত জিজ্ঞাসা—
কারা হোথা, কেন হোথা—
কি তাদের ভাষা ?

তারা কি প্রেমিক ?
ধরার প্রিয়ার পানে চাহি' নির্নিমিখ
যুগ যুগ রহে পথ চেয়ে—
অতীত স্মরণ বেয়ে—
জাগে মনে মর্ত্ত জীবনের কোলাহল।

হয় তো বা কেহ
ভালবেসেছিল তবু প্রতিদানে পায় নি কো স্নেহ
পায় নি কো অন্তরের উষ্ণ সম্ভাষণ,
প্রেমিকের প্রগলভ ভাষণ—
ব্যর্থ হয়ে আসিয়াছে ফিরে—
তারা কি রয়েছে জাগি'
মানবীর অনাদৃত ক্ষুদ্র প্রেম তরে ?

হয়তো কেহবা
প্রেম দিয়ে জীবনের অনিন্দিত শোভা
চেয়েছিল গড়িয়া তুলিতে—
ধরণীর নশ্বর ধূলিতে—
চিরন্তন প্রেমের সংগীত
সে কোন্ ইংগিত—
স্বপ্ন ভেংগে দিল তারে ডাকিতে ডাকিতে
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল বাণী সরিল না
আশা পূরিল না।

হে আকাশ,

তোমার বিশাল বক্ষ জুড়ে
অতৃপ্ত প্রেমিক আত্মা
নিত্য কি বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ?
দিক হতে দিগন্ত অবধি,
আলোর কণিকা হয়ে জ্বলে নিরবধি।
সন্ধ্যা যবে আসে
বিরহীর বিষাদের করুণ নিঃশ্বাসে
মগ্ন যবে প্রকৃতির নীল নভোতল
ভগ্ন আশা বিরহীর দল
গুচ্ছে গুচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে উৎসুক নয়নে
পৃথিবীর পানে—
রহে চাহি' অনিমিখ উদগ্র হিয়ায়—
দেখিবারে যেন তার মানবী প্রিয়ায়
ধরার কুটির প্রান্তে সন্ধ্যা দীপ হাতে
আলো আঁধারেতে।

উন্মুখ প্রেমিক দল দেয় হাতছানি,
অজ্ঞাত সে বাণী—
ফিরে আসে আকাশের নীরবতা নিয়ে—
তবু তারা বসে থাকে
সারা রাত—
পৃথিবীর প্রিয়া পানে চেয়ে।

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত

বহুদিন পর। শীতের সকালে একখানা এনভেলাপ পাইলাম। বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকিল। এই পৃথিবীতে যারা আত্মীয় তাদের কাছ হতে এমন খাম পাওয়ার কথা নয়। অনাত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের সহিত তেমন পরিচিতি বা কোথায়? তবে পত্রটা আসিল কোথা হইতে? বারে বারে পত্রের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালাইলাম। কৌতূহলের সমাপ্তি ঘটিল দীর্ঘদিনের আবিষ্কৃত কাহিনীর মাঝে। কিন্তু ব্যাপারটা চাপাকান্নার মত অস্পষ্ট। মনে হল একি ট্রাজেডি, একি জীবনের কঠিন কঠিন সংঘাত। স্বপ্নময় রজনীর সুখ বিলাসের মাঝে এমনিভাবে সব ক্ষণিকের খেয়ালে ওলোটপালোট হয়ে যাবে একথা ভাবতে পারছিলাম না। হারিয়ে ফেলা বাণী স্মৃতির রেকর্ডে আবার যেন নূতন করে বেজে উঠল। কিন্তু সুর যে জাগে না, বিস্মৃতি ও আত্মগ্লানির মলিনতায় সব দ্বার যেন রুদ্ধ হয়ে গ্যাছে! তবু যে অনুরোধ আসে। পত্রখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ভাবতে থাকি সেদিনের সেই কাহিনী, পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় উজ্জ্বল অভিসারী সেই চঞ্চলতা। সেই স্বপ্ন বিলাস, মানুষের অন্তিম পটভূমিকা পর্য্যন্ত যার অবাধ গতিছন্দ। দোলা দেয় সমগ্র স্নায়ুচেতনাকে। মূর্চ্ছাহত চেতনার ক্ষীণ রেখাগুলি শুধু ভেসে ওঠে অবচেতনে। মনে পড়ে কৃষ্ণাদির সেদিনের কথা।

—"ওরে পার্ব্বতীকে দেখেছিস কোনদিন? না দেখিস তো দেখাব একদিন।"

হেসে সেদিন বলেছিলাম, "পার্ব্বতী কে গো কৃষ্ণাদি, শিবকান্তা পার্ব্বতী·········?"

তেমনি হেসে কৃষ্ণাদি বলেছিলেন "তুই নেহাৎ দেখছি পণ্ডিত হয়ে গেছিস, আধুনিক যুগের ছেলে একথাটাও বুঝলি নে?"

কথাটার উত্তর দেওয়া সমীচীন নয় মনে করে নিস্তব্ধ ছিলাম। কৃষ্ণাদি কিন্তু চুপ না হয়ে বলে চলেছিলেন,—"পার্ব্বতীকে কি আর সাধে বলি প্রীতি, তার নামেও যা কাজেও তা। যেমন রূপ তেমনি বীণাদেবীর করুণা। তাতে শিবেরও মন টলে·······তবে এই যা দুঃখু বাপটা অন্ধ, মা নাই, অবস্থাও তেমন ভাল নয়, মধ্যবিত্ত সংসার দিন একরকম চলে যায়।

কৃষ্ণাদির সেই পার্ব্বতীকে দেখবার সুযোগ বোধ হয় সে নিজেই করে দিয়েছিল। একদিন দেখাও হয়ে গ্যাল কৃষ্ণাদির বাড়ীতেই। স্নাতক পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবসরকে একটু রঙীন কল্পনা নিয়ে কাটাবার চেষ্টায় তখন ব্যস্ত। তাই কৃষ্ণাদির বাসায় গিয়ে উঠেছিলাম। পাঁচ পাঁচটা সন্তানের জননী এই কৃষ্ণাদি। তার সংসারে দৈন্যের ছাপ নাই আর বিলাস বহুলতাও নাই! ছেলেদের সবাই এক একজন রত্ন। সবাই বিয়ে করেছে মহানগরী রাজধানীর এক একটা অপ্সরীকে। বেশ সুখেই আছে। তবে দুঃখের মধ্যে এই যা কৃষ্ণাদির প্রৌঢ় জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই জোর করে তার সিঁথির সিঁদুরটুকু তুলে নিয়ে একটা কটাক্ষ করলেন বিধাতা। বড়ই দুঃখ হয়েছিল সেদিন। গিয়েছিলুম দেখতে, সান্ত্বনা দিতে কিন্তু বুদ্ধিমতি কৃষ্ণাদি সবাই বুঝতেন। তাই দুঃখ যেমন কম প্রকাশ করতেন সুখও ভোগ করতেন তেমনি স্বল্প। তার রসিকতার কিন্তু কমতি দেখিনি। বয়সের ঝুঁকেপড়া দেহটাকে নিয়ে একটা অভিনয় সূচক অঙ্গভঙ্গি করত কৃষ্ণাদি বেশ। সেই প্রাণময়ী কৃষ্ণাদির বাড়ীতে কাটিয়েছিলাম অনেকদিন। কিন্তু বুঝতে পারিনি পার্ব্বতীর কথা নিয়ে আমার সামনে তা তুলে ধরবার কারণ কি।

বৈকালিক রৌদ্রের স্বল্প তেজ। চকচকে জুতা ও আদ্দীর পাঞ্জাবীখানা গায়ে চড়িয়ে বেরুতে চলেছি। কৃষ্ণাদি বাধা দিয়ে বল্লেন, "কোথায় যাচ্ছিস বল দেখি?"

—"এই একটু বাইরে, মানে বেড়াতে যাচ্ছি।"

—"রোজই তো বেড়াতে যাস একদিনও বিকালে বুঝি ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না?"

—হাসিমুখে বল্লাম, গঙ্গার বুকে কেমন ঢেউয়ের খেলা চলে তাই বসে দেখি……তাই আজও চলেছি….বলিয়াই পা বাড়াই।

বাধা দিয়ে ফের কৃষ্ণাদি বল্ল, "না আজ আর তোর যাওয়া হবে না?"

কৃষ্ণাদির মুখের দিকে এবার দৃষ্টিপাত করিয়া বললাম: "কেন বলত তোমার পার্ব্বতী কি আজ আসছে নাকি?"

—"আসছে না মানে দু'দিন আসছে….তোর সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেব, সন্ধ্যায় একটু আনন্দ হবে, তা নয় তুই কেবল কেটে পড়তে পারলেই বাঁচিস্।"

পরিচয়ের পালাটা সেদিন অভিনীত হয়েছিল বেশ। মহানগরীর বধূ সম্পর্কিয়াগণ বসেছিলেন আসর জমিয়ে দেখেছিলাম প্রত্যেকেরই হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র। তানপুরা হস্তে ধ্যানমগ্না পার্ব্বতীর আসন হয়েছিল সভার মাঝে। তত্ত্বাবধান করছিলেন এক দূর সম্পর্কীয়া বৌদি। পরিচয়টা দৃঢ় করে দিয়েছিল কৃষ্ণাদি। আমার দিকে চেয়ে পার্বতী জানিয়েছিল একটা নমস্কার। অপরূপ সে ভঙ্গী।

এর পর ঘনীভূত হয়ে আসে পরিচয়টা। বিনা সঙ্কোচেই পার্বতী এসে বলত, "চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি?" কৃষ্ণাদিও বাধা দেন নাই। সেদিন একটু জ্বর জ্বর ভাব হয়েছিল। আমার জন্য কৃষ্ণাদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাথাটার যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব। আপনার ঘরে বিছানায় গা এলিয়ে সম্ভবতঃ সেদিন পার্বতীর স্মৃতিই রোমন্থণ হচ্ছিল কিনা সেকথা স্মরণ নাই।

ঘরে ঢুকে কৃষ্ণাদি বল্ল: কিরে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

ঘাড় নেড়ে বল্লাম—"হ্যাঁ"।

—"চুপ চুপ থাকলে বেশী কষ্ট হবে। পার্বতী এসেছে একটু গল্প সল্প কর আর এই অ্যাসপিরিনটা খেয়ে নে।" কৃষ্ণাদি একগ্লাস জল আগাইয়া দেয়।

—"কেন অমন করছ, এ কিছুই নয় এখুনি সেরে যাবে।"

ধমক দিয়ে কৃষ্ণাদি বল্লেন, 'বাহাদুরী করতে হবে না খাও দেখি, তারপর কিছু একটা হয়ে যাক।'

অগত্যা ট্যাবলেটা গিলে ফেললাম। গ্লাসটা নামিয়ে রাখছি পার্বতী ঘরে ঢুকে নমস্কার জানায়। কৃষ্ণাদি চলে যায়। বিছানার এক পাশে বসে পড়ে পার্বতী। সদ্য সে প্রসাধন সেরে আসছে। মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক দ্যুতির উপর এক পোঁচ পাউডার মুখখানাকে আরও মসৃণ করে তুলেছে। পৃষ্ঠে বিলম্বিত কুণ্ডলবেণী সর্পাকারে দোল খাইতেছে।

—'আজকের সব প্রোগ্রাম নষ্ট করে দিলেন আপনি।'

—'কি করব বলুন, এজন্য খুবই দুঃখিত।'

—'মাথাটা কি আপনার খুব কষ্ট দিচ্ছে নাকি?'

—'তা একটু দিচ্ছে বই কি।'

পার্বতী তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টানিয়া মাথার দিকে বসে। তারপর মাথায় তার কোমল হস্তের স্পর্শ লাগায়।

—'একি করছেন আপনি?'

—'কেন অন্যায় করলাম নাকি?'

পার্বতীর অযাচিত এই আচরণে বাধা দেবার মত সাহস হইল না। পার্বতীর শিল্পীহস্তের সুষ্টু কোমল সঞ্চালনে মাথার ব্যথা দূরীভূত হয়ে গেল।

অন্তরাল হইতে মহানগরীর বৌদি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কি গো ঠাকুরপো ঔষধ মিলেছে?'

পার্বতী ধমক দিয়ে বলে, 'আপনার যেমন কথা?' বৌদি হাসিয়া চলিয়া যান।

দিন দুই লেগেছিল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। মনটা চঞ্চল হলেও কৃষ্ণাদি বলতেন কোথাও যাবিনে। তার আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। একদিন বেড়াতে যাচ্ছি, পার্বতী এসে দেখা করল।

—'কোথায় চলেছেন?'

—'এই একটু গঙ্গাধারে….'

—'রোজ রোজ গঙ্গার ধারে কী দেখেন বলুন তো?'

—'যা দেখি তা কী করে বলি বলুন দেখি।'

হেসে পার্বতী বল্ল, 'আচ্ছা চলুন আপনার গঙ্গা ধারেই।' পার্বতী ইচ্ছা করেই সেদিন গেল।

গঙ্গার কিনারেই প্রাচীন বটগাছটা তার সহস্র ডাল-

পালা মেলে আজ বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। মোটা মোটা শিকড়গুলো স্রোতের ধাক্কায় মৃত্তিকাহীন হয়ে রুগ্নশীর্ণ দেহের পঞ্জরের ন্যায় বেরিয়ে পড়েছে। দূরে একটা পাল-তোলা নৌকা জলগতির বিপরীত দিকে চলেছে হেলে দুলে। তারই একটা মোটা শিকড়ের উপর বসলাম। পার্বতীও বসতে গেল। হাইহীল জুতার ধক্কায় আর একটু হলেই জলে পড়ে যেত পার্বতী। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম হাতটা—'পড়ে যাবেন যে।'

—'পড়ে গেলেই হ'ল আপনি রয়েছেন কি করতে।'

মনে মনে পার্বতীর এইপ্রকার নির্ভর শীলতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। কুলু কুলু করে বয়ে যায় স্বচ্ছ সলিলা গঙ্গা যেখানে বটবৃক্ষের একটি শাখা নত হয়ে পড়েছে ওর বুকে। এক একটা স্রোত এসে আঘাত দিয়ে চলে যায় আবার নূতন আবর্ত্ত নিয়ে। কে জানে সে গতির শেষ কোথায়। পালতোলা নৌকার সাদা ধবধবে ডানাগুলো দেখে মনে পড়ে পল্লীর শ্রাবণ আকাশে বলাকায় উড্ডীয়ণ। আনন্দে সেদিন কবি কালিদাসের মতই কয়েকটি কথা ছন্দাকারে রূপ নিয়েছিল।

পার্বতী হেসে বলেছিল, 'বাঃ কবিত্ব আপনার রয়েছে দেখছি।'

আমিও সেদিন ইঙ্গিত করেছিলাম, 'নিশ্চয়ই থাকা উচিত....একজন তুলবে বীণার কণ্ঠ লহরী আর একজন সেখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা এ কেমন করে সম্ভব?' খিল খিল করে হেসে ওঠে পার্বতী। আমার কথায় জবাব স্বরূপ বুঝি গান ধরে একটা। আমার অবস্থাটা তখন আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি। ভূলোকে কি কল্পলোকে সে পরিচয় সেদিনই দিয়েছে!

গান থামিয়ে পার্বতী বল্ল, 'চলুন না একটু নৌকা ভাড়া করে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।'

পার্বতীর এমন একটা বিলাসে মত না দিয়ে পারলাম না। নৌকা ভাড়া করে ভাসলাম গঙ্গার বুকে। আস্তে আস্তে পশ্চিম আকাশের সূর্য্যটা লালে লাল হয়ে যেন মিশে গেল গঙ্গারই বুকে। পূর্বদিকে চাঁদ উঠল। দক্ষিণের মৃদু মন্দ বাতাস এসে জানিয়ে যায় কল্পলোকের অভিনন্দন।

আমি ও পার্বতী পাশাপাশি বসে—হঠাৎ এক ঝলক জল নৌকার ভিতর ছলাৎ করে এসে পড়ল। নৌকোটা দুলে উঠল বারেকের তরে। সেইটুকুর মাঝেই পার্বতী আমার হাত দুটো চেপে ধরে বল্লে 'আমার বড় ভয় করছে প্রীতিদা।'

—'ভয় কি ছোট ডিঙ্গি অমন হয়, ডুববে না তা বলে।' মাঝিও আশ্বাস দেয়।

নদীবক্ষে সেদিনের ভ্রমণ চলেছিল অনেকক্ষণ। ঘরে ফিরে আসাতেই কৃষ্ণাদি বল্ল, 'কি রে কোথায় ছিলি তুই এত ভাবনা পারিশ যাই হোক।"

আমি কিছু বলবার পূর্বেই মহানগরীর বৌদি বল্লেন, 'গঙ্গার বুকে অভিসার হচ্ছিল বুঝি?'

কথাটা চাপা দিবার ইচ্ছায় বললাম, 'তাই হচ্ছিল কিন্তু এখন যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে আপনার এক কাপ কড়া চা দিন দেখি।"

একটা ডিশে টুকরো দুই পাঁউরুটী আর এক কাপ চা নিয়ে হাজির হলেন বৌদি।

পাঁউরুটী দুটো উদরসাৎ করে চায়ে চুমুক দেই।

বৌদি নিকটবর্ত্তী হয়ে বল্লেন, "নৌকো কি ধারে ঠেকল ঠাকুরপো?"

—"কিযে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেন তার ঠিক নাই?"

স্মিত হাস্যে বৌদি বল্লেন, "ন্যাকামী করে সত্যের অপলাপ করা কি ভাল তার চেয়ে সোজা কথাটা বল্লেই হয়"।

হাসিমুখে সেদিন বলেছিলাম— "আমার জন্য এত ভাবনা কীসের আপনাদের।"

—"আহাঃ চিরদিনই বুঝি ভীষ্মদেব হয়ে থাকবেন।"

—"ক্ষতি কি?"

—"ক্ষতি অনেক, যাক মত আছে তো?"

—"তা আপনাদের যদি অমত না হয়, আমারও অমত হতে পারেনা।"

দিন কয়েক কেটে যায়। পার্বতী ও আমার মাঝে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবার প্রবল সম্ভাবনা দেখা গেল। এরই মাঝে পার্বতী জানিয়ে ফেলল তার অন্তরের কথা........আশ্বাস জানিয়ে দিলাম তাকে। পার্ব্বতী বলেছিল "একটা কিছু যুক্তি দাওনা প্রীতিদা এরপর কি করব।"

নিজের যুক্তির প্রাধান্য সেদিন তার সামনে উপস্থিত করে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে আহত করি নাই। আজ মনে হয় তখন একটা কিছু বললে হয়তো ভালই করতাম, পার্ব্বতীর জীবনে কিছুটা গণ্ডী দিয়ে আসতাম রক্ষা করবার মত। যাক্ সে কথা রোমন্থন করে আজ কী লাভ?

* * * *

এরপর কালের চাকা অনেকটা পথ পরিক্রমন করেছে? আমিও কার্য্যান্তরে চলে এসেছি অতি একলা। পার্ব্বতীর স্বপ্নবিলাস জেগে ওঠে আরও বেশী। আজ এখানে কাল ওখানে চলে তার গানের আসর রিক্রিয়েশন। নাম হয়ে যায়। অযাচিতভাবে একদিন সুযোগ হয়ে যায় তার জীবনে।. তাকে সে পরম গৌরব জ্ঞানে বরণ করে। বহুদিনের হৃদয় আকাঙ্ক্ষিত সূত্র ধরেই সে চলল।

একদিন সিনেমার পর্দ্দায় দেখলাম তার ছবি ......অতি বিশ্রীভাবে সে আলাপ করছে একজন যৌন বিলাসীর সঙ্গে। মনটা বিষিয়ে ওঠে। চলে আসি কক্ষত্যাগ করে। কৃষ্ণাদির বাড়ীতেই গিয়েছিলাম এরপর। বৌদিকে সেদিন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে—"আপনাদের পার্বতীর ছবি যে এবার পর্দ্দায় ভেসে উঠল....' বৌদি দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমরাও কম দুঃখ পাইনি ভাই.........তবে তোমারও এতে দোষ আছে।'

সেদিনের অন্তরের ক্রোধকে চাপ্‌তে পারিনি, বলেছিলাম, 'কেন বলুন তো? আপনাদের কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না—সুন্দর মুখের দিকে লক্ষ্য সবারই।'

একথা মনে পড়লে আজও কষ্ট হয়। বৌদি অন্যদিন হলে রাগান্বিত হতেন কিন্তু সেদিন যেন অতিমাত্রায় সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছিলেন, "ভাবনা কি অমন পার্বতী আমার হাতে অনেক আছে বুঝলে ঠাকুরপো।' বৌদি এর পর আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য অনেক চেষ্টাই করেছিলেন কিন্তু শুধু অভিসার যাহা মিলনকে আলিঙ্গন করতে পারে না সে তো স্বপ্নবিলাস....তাই ঘৃণা ভরেই ওদের ওখান হতে সরে আসি সেদিন। আর কোনদিন যাইনি।

পুরানো দিনের এই স্মৃতি নির্য্যাস যতটুকু সৌন্দর্য্য বিস্তার করুক না কেন মন ভরাতে পারে নাই। তথাপি পার্বতী আজ ডাকে কেন? সে সুন্দরের পূজারিনী আমি তার কাছে অবহেলিত। নিজের জীবনে আমি প্রতারিত। আমি তার কে? ঘৃণায় ও রাগে মনটা রি রি করে উঠে' চিঠিখানা তুলে নিয়ে টুকরো টুকরে করে ফেলি। তারপর শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত স্মৃতির এই বাহককে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়ে দেওয়ার অভিলাসে ছুঁড়ে ফেলে দিই ডাষ্টবিনের মধ্যে।

কিন্তু এতেও কি রেহাই আছে। ডাষ্টবিনের এই টুকরোগুলো যেন সম্পূর্ণ হয়ে মনের মাঝে নাচতে থাকে, বলতে থাকে ওগো একটিবার শোন....তুমি দেবতা—আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। মনে মনে বলি নাঃ নাঃ পরকীয়তায় যার মন বিলাসী তাকে আমি বিশ্বাস করি না—সে আমার পদসেবার উপযুক্ত নয়, পথের ধূলাই তার আশ্রয় স্থান হওয়া উচিত বাস্তবের কঠিনক্ষেত্রে স্বপ্ন বিলাসের শেষ পরিণতি হউক....আপন মনেই হেসে উঠি। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ি। কেন এ আন্দোলন....পার্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ কি? নাঃ যার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বলি সেই আবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে এগিয়ে আসে। পার্বতী এগিয়ে' আসে নব সাধনায় শীতোতাপ রহিত হয়ে হৃদয়াঞ্জলি ও নৈবেদ্য নিয়ে।

ভাঙা ঘরটায় বসে আপন মনে লিখে যাই জীবনের কাহিনী। পড়ন্ত রোদের তির্য্যকরশ্মির শেষ রেশটুকু ঘরের মধ্যে ঝলমল করে ওঠে। তারা বুঝি জানায় অভিনন্দন। লেখনী অতি দ্রুত বহে যায় ঝরণা ধারার মত, কোন ধারাই সে মানতে চায় না; নির্লিপ্ত গতি। আমি যে বাণীর সাধক হ'ক না ভাড়া কুঁড়ে। হঠাৎ

লেখনি থেমে যায়, প্রতিহত হয় উচ্চ শৈলে। চেয়ে দেখি ঠিক তাই। পার্ব্বতী এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেদিনের নৌকা বিহারের অভিসারীকার ন্যায়। মুখে সেই দীপ্তি সেই জ্যোতি, তবে চঞ্চলতায় যেন একটু ঝিমিয়ে পড়া ভাব। চোখে কমনীয় নমনীয়তার কাজল। এসে দাঁড়াল পাশে মুখে তার কথা নেই····। যেন সব ভাষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে মৌনব্রত নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে কৃত আত্মগ্লানির।

নীরবতা ও মুখমণ্ডলের কাঠিন্যের ছাপ আন্দোলিত করে তোলে বুঝি পার্বতীকে। আরও কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বল্ল, 'বড় অবাক হয়ে গেছ না প্রীতিদা?'

তবুও নীরব। পার্বতী উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে ভাঙ্গা ঘরটাকে আর বুঝি আবিষ্কার করতে চায় অন্য কিছু। নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটা এগিয়ে দিই।

সামনা সামনি বসে সদ্য লেখা কাগজটা উল্টাতে উল্টাতে বল্ল পার্বতী, 'তোমার সাহিত্য চর্চ্চার পরিচয় এতদিন কোলকাতায় থেকে কিছুই পেতাম নাতো····এমন নীরব সাধনায় লাভ কি?'

পার্বতীর কথায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া বললাম: 'লাভ ও লোকসানের প্রশ্ন নিয়ে বিচার করে দেখবার তোমার দরকার কী?'

পার্বতী হাসে···সে হাসি বিদ্রূপের নয় আত্মতৃপ্তির

—'রূপালীর রূপসজ্জায় নেমে রাজকন্যা যখন রাজপুত্রের সন্ধানে খোঁজে তখন তাকে ভবিষ্যৎ লাভ ও অলাভের কথা ভাবতে হয় বৈকি।'

—'ওঃ তাই নাকি? রাজপুত্র তোমায় তো মিলেছে আর এ গরীবের দুয়ারে কেন? নীরব সাধনাকে আহত করতে না আসাই ভাল।'

সহসা ভেঙ্গে গেল অভিনয়ের বাঁধ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে। পার্বতী খপ্ করে ধরে ফেলল হাত দুটো।

—'ভুল বুঝেছ প্রীতিদা, রূপসজ্জায় রূপেরই খেলা চলে সেখানে মনের খেলা চলে না। সেই মনের সীমারেখায় দ্বারে যখনই কড়া নড়ে উঠল তখনই ছুটে এলাম তোমার কাছে।'

পার্বতীর এতদিনের প্রাচীর দেওয়া বাঁধ আজ হঠাৎ ধ্বসে পড়ল আমার জীর্ণ কুটীরের পাশে। তাতে কি জীর্ণ কুটীর রেহাই পায়। ভেসে যায় সেই জলস্রোতে। হারিয়ে যায় সকল অভিমান ও ক্ষুব্ধতার জমানো গ্লানি। তবু একবার চলে অগ্নিপরীক্ষা····।

—'কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করবো কি করে, দীর্ঘদিনের চেতনার বহ্নিকে তুমি কি করে নির্বাপিত করে রেখেছিলে।'

—'নির্বাপিত করে না প্রীতিদা, অতি যত্নে নিমজ্জিত রেখে' পার্বতী যেন হঠাৎ নুয়ে পড়ে নিবেদিতার মত।

একের স্বপ্নভঙ্গে অপরের দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। হাত ধরে তাকে তুলি ধূলি বিলুণ্ঠিত পদতল হতে। মুখ হতে বেরিয়ে আসে দু'টুকরো কথা।

আকাশে ছিল মেঘ বসন্ত প্রকাশে,
কেঁদেছিল পুষ্পরাণী মলয় সকাশে।
কেটে গেছে সেই মেঘ স্বপ্নভঙ্গ দিশা
তুমি আমি চলি পথে পূর্ণ ভালবাসা।

●●

অচল

শ্রীচণ্ডীচরণ পাল

আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই পরের ষ্টপেজ পাওয়া যাবে। ওখান থেকে বাসে চাপলে পৌঁছতে মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগবে না। পয়সাও কিছুটা বাঁচবে।

তাই অনিতা এই পথটা হেঁটেই চলে আসে। মাসের শেষ। এসময়টা একটু টানাটানি প্রতি মাসেই হয়। অনিতাকে তাই একটু বুঝে চলতে হয় এসময়টা। তা না হলে তাকেই বিপদে পড়তে হয়।

সামনেই ষ্টপেজ। একটু জোরেই এগিয়ে গেলো অনিতা। কিন্তু বাধা পেলো। বাধা দিলো পায়ের পুরোন স্লিপারটা। কেমন করে জানি একটা ষ্ট্রাপ তার ছিঁড়ে গেছে। ওটা পরে আর এক পাও এগোনো যাবে না।

ইস্ এখন উপায়? অনিতাকে জুতো হাতে করতে হবে নাকি? ছিঃ ছিঃ সে পারবে না। পারবে না কিছুতেই জুতো হাতে নিয়ে ছাত্রী বাড়ী যেতে।

অগত্যা পথের পাশে মুচীর শরণাপন্ন হতে হয়।

'দিদিমনি' এটা আর চলবে না। বললো মুচি।

চমকে উঠলো অনিতা। চলবে না? এটা যে মাসের শেষ সময়। যে করেই হোক একটা দিন তাকে চালাতেই হবে।

—যাহোক করে একটু ঠিক করে দাওনা ভাই!

মিনতি ঝ'রে পড়লো অনিতার কণ্ঠ থেকে।

......এমাসে আবার বাড়তি খরচ আছে কতগুলো। ছোট ভায়ের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা। তার টাকা জমা দিতে হবে। বোনের একটা সাড়ী না কিনে দিলে আর চলবে না। ওর সব সাড়ী ছিঁড়ে গেছে। বাবার হাঁপানীর ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন। পয়সার অভাবে এত দিন কিনে উঠতে পারেনি। এবার না কিনলে আর চলবে না। বুড়ো বাপ খুব কষ্ট পাবেন তা না হলে। নতুন জুতো কিনতে গেলে এদের একটাকে বাদ দিতে হয়। কিন্তু তা কল্পনাও করে না অনিতা।

অথচ জয়ন্তর কথা মনে পড়লে হাসি পায়। জয়ন্ত বলতো, জানো অনিতা, যে চলবে না তাকে চালাতে যাওয়াই বোকামি।

কিন্তু জয়ন্ত আজ কোথায়?

বাসটা তখনো এসে পৌঁছয় নি। কখন আসবে তারও কোন ঠিক নেই। ষ্টেট বাসের আসার কোন ঠিক থাকে না।

জয়ন্তরও আসবার কোন ঠিক ছিল না হঠাৎই গিয়ে হাজির হত অনিতার কলেজে।

—চলো অনিতা একটু ঘুরে আসি।

অনিতা বাধা দিয়ে বলতো, আমার যে ক্লাস আছে। জয়ন্ত হাসতো। একদিন ক্লাস নাই বা করলে।

কোন কথাই শুনতো না, টেনে নিয়ে যেতো কফি হাউসে অথবা অন্য কোথাও। অনিতাও আর বাধা দিতো না। বরং জয়ন্ত রায়কে তখন ভালো লাগতো।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সেরা ছাত্র ঐ জয়ন্ত রায়। অদ্ভুত ভাবে আলাপ হয়েছিল অনিতার সংগে। সেদিনও এখানে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তবে আজকের সংগে সেদিনের পার্থক্য ছিল অনেক। আজ তার হাতে আছে আপিসের ফাইল, আর সেদিন ছিল একগুচ্ছ ফুলের তোড়া।

বান্ধবীর জন্মদিনে চলেছে। বাসের দেরী দেখে একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল অনিতা। একটু তফাতেই একটি যুবক তারই মত বাসের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু তাকে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন বোধ করেনি অনিতা।

হঠাৎ সেই যুবকই উপযাচক হয়ে অনিতাকে প্রশ্ন করলো—দেখেছেন। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল তবু বাসের দেখা নেই।

একটু অবাক হলেও ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে হয় অনিতাকে। —তাই তো দেখছি।

উত্তর সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সূত্র ধরেই আলাপটা জমে উঠেছিল। কথায় কথায় এক সময় অনিতা জেনে নিয়েছিল। নাম—জয়ন্ত রায়। সেও চলেছে তারই,

বান্ধবী বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তই বললো—চলুন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক। দুজনের শেয়ারে।

প্রস্তাব শুনে অনিতা রাজী হয়েছিলে।

কেন জানি জয়ন্ত রায় কে তার ভালো লেগেছিল।

কিন্তু কথা রাখেনি জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত। মিটারের টাকা সবটা নিজেই দিয়েছিল। অনিতা আপত্তি করতে বলেছিল—

—থাকনা, বন্ধুত্বকে অস্বীকার করছেন কেন?

অনিতা কিছু বলেনি। শুধু মৃদু হেসেছিল মাত্র।

—একটা বাস শেষ পর্যন্ত এলো। কিন্তু অসম্ভব ভীড়। ভাগ্যক্রমে একটা লেডিজ সিটও খালি পেয়ে যায় অনিতা। বসতে পেরে তাই অনিতা মনে মনে একটা ধন্যবাদ জানালো। ওই ওপরে ওনাকে।

এমনি আর একদিন ধন্যবাদ জানিয়েছিল অনিতা যে দিন জয়ন্ত তাকে মুক্তি দিয়েছিল।

মাথাটা অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। চলন্ত বাসের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু আরাম পেলো অনিতা। এক হাতে কপালটা টিপে ধরে বসে থাকলো রাস্তার দিকে চেয়ে।

সেটা অপিস ফেরত সময়। তাই বাসে এতো ভীড়। ভেতরে তখন নানা ছাত্রীর হট্টগোল চিৎকার। নয়া পয়সা নিয়ে বিভ্রাট। কিন্তু সেদিকে মন নেই অনিতার। অন্য আর এক চিন্তা তখন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

জয়ন্তকে প্রত্যাখ্যান করেছিল অনিতা। তখন এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। তা যদি না করতো তবে মা বাবা ভাই বোন আজ কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াতো তা ভাবতে বুক কেঁপে ওঠে।

জয়ন্ত আঘাত পেয়েছিল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাবার সময় বলেছিল তোমাদের মেয়ে জাতটাই স্বার্থপর।

অনিতা সেদিন একটু ব্যথার হাসি হেসেছিল। প্রতিবাদ করে বলতে পারতো, মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী স্বার্থপর। তার একমাত্র প্রমাণ জয়ন্ত নিজেই।

কিন্তু তা বলেনি। বলতে পারেনি অনিতা। দুহাতে কে যেন গলাটা টিপে ধরেছিল। কিন্তু কেন যে বলতে পারেনি তা আজও ভেবে পায় না।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে চাকরি নেবার পর থেকে সংসারের চেহারা বদলে গিয়েছিল। বাবা মা ছোট ভাই বোনেদের মুখে হাসি ফুটেছিল। আর তাই দেখে অনিতা নিজের সব কষ্ট সব দুঃখ ভুলেছিল।

অপিসে যা মাইনে পেতো তাতে সংসারের সব দাবি মিটতো না তাই বাড়তি দুটো টিউশনি জুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে কোন অভিযোগ নেই কারুর কাছে। তবু মাঝে মাঝে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন মনে হয়, এ সময় যদি জয়ন্ত তার পাশে থাকতো তবে ভালো হ'ত। কিন্তু তা আর হয়নি। হতে দেয়নি অনিতা নিজেই। ভালো চাকরি পেয়ে জয়ন্ত বোম্বে চলে গিয়েছেল। যাবার সময় অনিতাকে সংগে নিতে চেয়েছিল। নিজের স্ত্রী পরিচয়ে। বিয়ে করে।

কিন্তু বাপ মা ভাই বোনে ভরা সংসার ফেলে যেতে মন চায় নি। জয়ন্ত বলেছিল, ওর জন্যে ভাবনা কি আছে? মাসে মাসে বাবার নামে মোটা টাকা পাঠিয়ে দেবো। তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা কিন্তু মনঃপূত হয়নি অনিতার। মনে হয়েছিল জয়ন্ত বুঝি তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে চাইছে তার সংসারের কাছ থেকে। তবু বলেছিল, তুমি বরং কোলকাতাতেই একটা ভালো চাকরি নাও।

জয়ন্ত অনিতার বাবা মার জন্যে এতোটা স্বার্থত্যাগ করতে পারেনি। পরের দিনই বোম্বে চলে গিয়েছিল। পরে অবশ্য চিঠি দিয়ে বার বার তাকে অনুরোধ করেছিল। তার মত পাল্টানোর জন্যে।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমড়ে কেঁদেছিল। তবু নিজের মতে অটল ছিল। একটা জেদ চেপে গিয়েছিল তার। এরপর জয়ন্তর পত্রের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেনি।

শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত বিয়ে করেছিল অন্য আর একজনকে। অনিতার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি।

॥ আর কত দিন ॥

শ্রীমুরলীধর দত্ত বণিক

তোমার মনের দ্বারে বার বার আসা যাওয়া,
দুই চক্ষুর বিস্ময়ে এই আকুল অবাক চাওয়া,
আর কতদিন—
আর কতদিন গাছের শিকড়ে জল ঢেলে ঢেলে,
ফুল ফোটাবার কান্নার আহ্লাদ ;
কতদিন আর মনে মনে খেলা,
তোমাকে পাওয়ার সাধ।

তোমার পথের শিরিষ গাছের ঝরেছে অনেক পাতা,
পাখীরা গেয়েছে গান,
তার ফাঁকে ফাঁকে একটি প্রাণের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর
কখনও কি কোন অশুভ ক্ষণে ছুঁয়েছে তোমার প্রাণ ?
মৌসুমী ভরা আকাশের নীচে মৌসুমী প্রাণ শুকিয়ে যায়,
তাতে কি তোমার হে মধু ধন্যা মধুর কন্যা
কিছু এসে যায় ?

মনে মনে তবু ভাল লাগা আজও কত কথা বলি,
একলা পথের নীরব কণ্ঠে বাজাই কাকলি,
তোমাকে নিয়ে ব্যথা বেদনার কবিতা লিখি
আর কতদিন গাছের শিকড়ে জল ঢেলে ঢেলে
ফুল ফোটাবার কান্নর আহ্লাদ
দিনগুনি আর সুর শিখি।

অচল

কথাটা শুনে একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি অনিতা। কঠিন হয়ে গিয়েছিল মন বলে বস্তুটি।

একদিন এই জয়ন্তকে নিয়ে কতই না স্বপ্ন দেখেছিল। ছোট্ট একটা নীড়ের স্বপ্ন। কিন্তু সব ভেস্তে গিয়েছিল এক মুহূর্তে, অনিতার স্বার্থপরতার জন্যে।

মাঝে মাঝে তাই-ই মনে হয় অনিতার।

বাসটা একটা ষ্টপেজে এসে থামলো। অনিতা চেয়ে দেখলো এখানেই তাকে নামতে হবে। সংগে সংগে নেমে পড়লো। এখান থেকে গোটা দুই বাড়ীর পরই ছাত্রীর বাড়ী। বিরাট ধনির একমাত্র মেয়ে। কাঁটা ধরে দু ঘণ্টা পড়াতে হয়। আর তার জন্যে মাস মাস অনিতাকে তিরিশটি টাকাও দেয়।

হাতের লেডিজ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো। ঠিক সময়েই পৌছে গেছে। ঘড়িটা আছে বলে অনিতার অনেক সুবিধা হয়।

জয়ন্তর এই উপকারটা কোনদিন ভুলবে না অনিতা। ঘড়িটা জয়ন্তই প্রেজেন্ট করেছিল তার জন্মদিনে।

সংসারের জন্যে অনিতা সবই ছাড়লো, কিন্তু সেই তাকে কি দিলো ?

কথাটা মনে করে একটু হাসলো অনিতা। চোখটা চক্‌চক্ করছিল।

তারপর ছাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলো। কয়েক পা মাত্র সবে গেছে, এমন সময় কিসে যেন একটু হোঁচট খেলো! সংগে সংগে জুতোর ষ্ট্রাপটাও ছিঁড়লো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অনিতা।

অনিতার মনে হ'ল জয়ন্তর কথাই ঠিক। যে চলবে না তাকে চালাতে যাওয়াই বোকামি।

সেদিন কথাটা জয়ন্ত অনিতার সংসারকে লক্ষ্য করেই বলেছিল। আজ অনিতা কাকে লক্ষ্য করে কথাটা বললো ?

জুতোটা পা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল পথের একপাশে।

খালি পায়েই চলল ছাত্রীর বাড়ী। ভুয়া প্রেষ্টিজের প্রয়োজন কি অনিতার।

জয়ন্তর জীবনে সে আজ অচল ; কিন্তু তার ছোট্ট পৃথিবী! সেখানেও কি সে অচল ?

শোকোচ্ছ্বাস

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেন

(১)

গন্ধকবি গুণানন্দ সবে করি নিরানন্দ
গেছ চলি' ভব-পরপারে।
লভিবারে স্বর্গ-সুখ গেলে চ'লি দিয়া দুখ্
ভাসায়ে গো শোক-পারাবারে
দু'দিনের হাসিখেলা খেলিতে গো এসেছিলা,
মহাযাত্রা করিলা আবার।
বিধির আশীষ বলে গিয়া আজি শান্তি-স্থলে
লভুক্ শান্তি আত্মা-তোমার।

(২)

মুখে ছিল মিষ্ট ভাষা হৃদে স্নেহ-ভালবাসা,
চিতে তব আনন্দ অপার।
সম্ভাষিয়া মধুভাষে, সকলেরে ভালবেসে,
প্রিয় ছিলে তুমি গো সবার।
দানে ছিলে মুক্তহস্ত ; মন ছিল সুপ্রসন্ন,
নিজ দুঃখে ছিলে আত্মভোলা।
ছোট বড় সর্বজনে দেখিতে গো সমজ্ঞানে
কারেও করনি অবহেলা।

(৩)

লেখে শুধু প্রেম-গাথা কিংবা প্রকৃতির কথা
গড়নি কবি, কাব্য তোমার।
বিবিধ অন্যায় তরে মুক্তকণ্ঠে, দৃঢ়স্বরে
চেয়েছ গো প্রতিকার তার।

আমাদের সমাজের যত দীন-দুঃখীদের
কথা তুমি শুনি' একমনে
লিখিলা গো তব কাব্য করিতে তাদের সভ্য
করিয়াছ চেষ্টা প্রাণপণে।

(৪)

কালের করাল গ্রাসে একে একে সব প'শে
রহে কাব্য আর কবি-যশ।
তোমার কবিতাগুলি কে পারে যাইতে ভুলি
বিদ্বান্ যে গো বিস্তারই যশ।
তব গান, তব গাথা সর্বজন মনে গাঁথা
রহিয়াগো হইবে অমর।
তুমিও অমর হবে, শমনেও না দণ্ডিবে ;
লভিয়াছ ভারতীর বর।

(৫)

গন্ধবণিক্ সমাজে হেন শক্তি কা'র আছে
স্পর্শিতে তব যশোমন্দির ?
হারিয়ে তোমারে আজ কাঁদিছে গো এ সমাজ,
সকলের ঝরে আঁখি-নীর।
আজি ঐ দূর হ'তে তব পদ কমলেতে
লহ কবি, মোর প্রণিপাত।
তব শুভ দিঠি হেনে তব স্নেহ ধন্যাগণে
প্রাণ ভ'রে কর আশীর্ব্বাদ।

গন্ধকবি গুণানন্দ (গৌরকিশোর রাজ), এই পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। গত ২১শে কার্তিক, ১৩৬৭ সাল তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করে—এই কবিতাটি লিখিত।

ভোরের আলো

আমার ভ্রমণ কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুমারী প্রার্থনা পাল

●

ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আলমের দ্বারা তাঁহার মাতার সমাধির উপর ইহা নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে মনোহর বাগান। পঞ্চচাকী পরে দেখিলাম। পাহাড়ের জলকে চাকীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। এখানে প্রচুর লাল এবং অন্য রঙের বড় বড় সাইজের মাছ দেখিলাম। এখানে ঔরঙ্গজেবের গুরুর সমাধি আছে। তারপর আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে ষ্টেশনের কাছে একটি মাঠে কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শ্লিপ খাচ্ছিল।

আমিও সেখানে শ্লিপ খেলাম। তারপর ট্রেণে চড়ে মন্মদ হইয়া পরদিন নাসিকে পৌছিলাম। আমরা সকালে একটি ট্যাক্সি করিয়া তপোবনে যাই। এখানে শিবমন্দির বিষ্ণু-মন্দির, লক্ষ্মণ যেখানে সুর্পনখা নাক কাটিয়াছিলেন, মারীচ বধ্যভূমি, এইসব দেখিলাম। এখানে গোদাবরী নদীতে কোপিলা নদী যেখানে মিশিয়াছে, সেই সংগমে আমরা স্নান করিলাম। তারপর আমরা পঞ্চবটীতে আসিলাম। গোদাবরী তীরে সীতা গুহা রামকুণ্ড সীতাকুণ্ড এই সব দেখিলাম। ইহার পর বাবার পরিচিত এক ভদ্র-লোকের কারখানা দেখিতে গেলাম। কিন্তু ঐদিন কার-খানা বন্ধ থাকায় তাঁহাদের বাড়ীতে গেলাম। আমাদের পাইয়া উক্ত ভদ্রলোক এবং তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই খুশী হইলেন। সারাদিন খাওয়া দাওয়া গল্প, এমন কি সিনেমা পর্য্যন্ত দেখাইয়া ফিরিবার সময় মা জ্যেঠাইমাকে উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী সিন্দুর পড়াইয়া একগজ করিয়া সিল্কের ব্লাউজ পিস দিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন। এইটি নাকি তাঁদের প্রথা, চিরদিনের স্মৃতি ও বন্ধুত্ব বজায়

রাখিবার জন্য এইসব করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। অন্যান্য যাত্রীরা ভেবে অস্থির—কোথায় গেলাম। তখন আমরা বলিলাম এই এই ব্যাপার। তারপর রাত্রে গাড়ী ছাড়িল। পরদিন সকালে ভোর পাঁচটার সময় বোম্বাইয়ে পৌঁছিলাম। স্টেশনে আমাদের পরিচিত দুই গুজরাটী ভদ্রলোক গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা সকাল ৭৷৷টার সময় বাহির হইয়া পড়লাম। এপোলো বন্দর, মহালক্ষ্মী মন্দির হইয়া ২৪ মাইল দূরে সরকারী দুগ্ধ কলোনী দেখিতে গেলাম। একটি পাহাড়ের উপর ২৷৷ কোটি টাকা খরচে নির্মিত হইয়াছে। আমরা চারিদিকে দুগ্ধের সংশোধন মেসিন দেখিলাম। বোতলে দুধ খাইলাম। বোতলের দুধ বেশ লাগিল। ওখান থেকে আমরা আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকের খার রোডের বাটীতে আসিলাম। ওখানে জলযোগ সারিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া একটু বিশ্রাম করি। বৈকালে বাহির হইয়া জুহু সমুদ্র সৈকতে, সান্তাক্রুজ এরোড্রম দেখিয়া চৌপাটীতে আসিয়া নৈশভোজ সারিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে ৯টার মধ্যে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া আসিয়া এলিফ্যান্টা গুহায় যাইবার জন্য ষ্টীম লঞ্চে চড়িলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সমুদ্রে লঞ্চে চড়িয়া উক্ত গুহার কিছুদূরে লঞ্চ নোঙ্গর করিল। কারণ গুহার একদম তীরে লঞ্চ যায় না। এক ফুট অন্তর জলের প্রায় পঞ্চাশটি পাথর আছে। ঐ পাথর ডিঙাইয়া তবে সমুদ্র তীরে গুহার পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিলাম। পাথরগুলি ডিঙাইয়া যাইতে আমার এতটুকুও ভয় করে নাই। বিপদেরও কোন কম ঝুঁকি ছিল না। কারণ দুইটি পাথরের মাঝখানে একবার পা পড়িলে একেবারে জলের তলায় চলে যেতে হত। পাহাড়ের উপর ক্রমে ক্রমে আমরা পায়ে হেঁটে উঠিলাম। পরে টিকিট কিনিয়া গুহাগুলি দেখিতে যাই। এইখানে চারিটি গুহা আছে। ইহার মধ্যে ১ নম্বরটির ভিতর বড় বড় পাথরের খোদাই মূর্তি দেখিলাম। অপর তিনটি গুহার মূর্তিগুলি অধিকাংশই ভাঙ্গা। সমুদ্রে বেষ্টিত পাহাড়ের উপর এই গুহাগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে আখের রস খুব তৃপ্তি সহকারে খাইলাম। ইহার পর পাহাড় হইতে নামিয়া আবার সেই পাথরগুলি অতিক্রম করিয়া লঞ্চে চড়িয়া গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ায় ফিরিয়া আসি। ওখান থেকে ট্যাক্সি করিয়া সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের বগিটা খুঁজিয়া পাইলামনা। অনেক খোঁজার পর ষ্টেশন হইতে ২ ফারলং দূরে খুঁজিয়া পাইলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আহার সমাপ্ত করিলাম। বৈকালে বাহির হইয়া মাছের একুই-রিয়াম, (এখানে বহু বর্ণের এবং সাইজের মাছ কাঁচের ভিতর এত সুন্দর ভাবে স্তরে স্তরে পৃথক ভাবে সাজান রয়েছে। চোখে না দেখলে লিখে বোঝানো যায় না।) ওখান থেকে মেরিনড্রাইভ, চৌপাটীতে বেশ খানিকক্ষণ সন্ধ্যার পর বসিয়া সমুদ্র এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেরিন-ড্রাইভের সুসজ্জিত বাড়ীগুলির এবং সুন্দর নানা রঙের ফুলের সুসজ্জিত ঝুলোনো বাগানের আলোকমালা দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি। এবং ঐদিন রাত্রে আমাদের বগীটি দেরাদুন এক্সপ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া ডাকোর অভিমুখে রওনা হইলাম। পরদিন দশটায় (সকালে) ডাকোর পৌঁছিলাম। এখানে টাঙ্গা চড়িয়া রণছোড়জীর মন্দির দেখিতে যাই। এইখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যান। মন্দিরটি খুবই সুন্দর। রণছোড়জীর মূর্তিটি দেখিতে আরও সুন্দর। কুচকুচে কালো হৃষ্টপুষ্ট বেশ বড় মূর্তি। কোলে করিতে ইচ্ছা যায়। পাশেই রণছোড়জীর ঘর শয়ন শয়নকক্ষে মূর্তির উপযুক্ত শয্যাদ্রব্য দেখিলাম। আশেপাশে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি। এবং রাত্রে আমাদাবাদ অভিমুখে রওনা হইলাম। পরদিন সকালে টাঙায় চড়িয়া প্রথমে সবরমতী আশ্রমে যাই। এখানে হৃদয়কুঞ্জ দেখিলাম। এইখানে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার স্ত্রী কস্তুরবাঈ গান্ধী বাস করিতেন। হৃদয় কুঞ্জটির তিনদিকে সুন্দর বাগান এবং একদিকে সবর-মতী নদী। নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড গাছের তলায় প্রত্যহ গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা বসিত। হৃদয় কুঞ্জের একটি গৃহের মধ্যে কাঁচের আলমারীর ভিতর মহাত্মা ব্যবহৃত দু একটি জিনিষ এবং পুরাতন চিঠিপত্র সুসজ্জিতভাবে সাজান

আছে। ইহার মধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত একটি গেঞ্জির কথা আমার মনে পড়িতেছে। ওখান থেকে আমরা ভদ্রকালী (খুব সুন্দর মন্দিরে কালী মূর্ত্তি দেখিলাম।) জগন্নাথ মন্দির ও গীতা ভবন দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি। এখানে শীত বেশ ছিল। এখানে একটি জিনিষ নূতন দেখিলাম। বড় বড় ঠেলাগাড়ী একদিকে মহিষ অপরদিকে পুরুষ কিংবা মহিলা টানিতেছে। ওখান থেকে ভিরামগ্রাম যাত্রা করি। পরদিন বেলা ১॥০ টার সময় ভিরামগ্রামে পৌছিয়া বড় গাড়ী ছাড়িয়া মিটার গেজের রিজার্ভ বগীতে চড়িয়া ভেরাভেলে যাত্রা করি। পরদিন ভেরাভেলে পৌছিয়া সকালে টাঙ্গায় চড়িয়া প্রভাস তীর্থে যাই। এইখানে সরস্বতী, কোপিলা ও হিরণ্য এই তিনটি নদী একত্রে মিশিয়াছে। সেই সংগমে আমরা সকলে স্নান করিয়া নিকটবর্তী মন্দিরগুলি দেখিয়া প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির দেখিতে যাই। সোমনাথের নূতন মন্দির তখনও তৈয়ারী সম্পূর্ণ হয় নাই। মন্দিরটি একেবারে আরব সাগরের কূলে। মন্দির হইতেই আমরা আরব সাগরের বিশাল ঢেউগুলি মন্দিরের পাদদেশে আছাড় খেয়ে পড়িতেছে দেখিলাম। পরে আমরা পুরাতন সোমনাথের মন্দির দেখিয়া শ্রীভাল্‌তীর্থ ও ভালকুণ্ড দেখিতে যাই। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্তৃক চরণে তীরবিদ্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রে ট্রেনে জামনগর অভিমুখে যাত্রা করি। ওখানে পৌছিয়া সকালবেলা একটি টাঙ্গায় করিয়া গিড়নার পাহাড়ের তলদেশ পৌছিলাম। এই পাহাড়টি ৬০০০ ফুট উঁচু ১১০০ হাজার সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া চূড়ায় গিড়নার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ৫০০টা সিঁড়ি উঠিলাম। তার বেশী আর ওঠা হল না, কারণ উঠিয়া নামিতে যাইলে ঘণ্টা সাতেক সময় লাগিত অত সময় হাতে না থাকায় আশা ত্যাগ করিতে হইল। পাহাড়টি দেখিতে অতি সুন্দর। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এই পাহাড়ের উপর মন্দির জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ফিরিবার পথে দামোদর কুণ্ড, রেবতী কুণ্ড, শিব মন্দির, উচ্চ আদালত, যাদুঘর এবং চিড়িয়াখানা দেখিলাম। এখানকার জীবজন্তু উন্মুক্ত জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত। যদিও উন্মুক্ত জায়গায় বাঘ সিংহ ছোট ছোট কৃত্রিম গুহা ও অরণ্যে বাস করিতেছে, আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। এখানে ভূতপূর্ব্ব নবাবের পরিত্যক্ত প্রাসাদ এবং তাঁহার ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পোশাক পরিচ্ছদ দেখিলাম। ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম এবং ঐদিন আমাদের গাড়ী রাজকোট অভিমুখে যাত্রা করিল। পরদিন রাজকোটে পৌছিলাম। পথে ভক্তিনগর ষ্টেশনে আমাদের তিনঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইঞ্জিনের যোগ হওয়ায়। ভক্তিনগর ষ্টেশনটি বড় চমৎকার। রাজকোটে সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের গাড়ী পৌছিল। রাত্রি ১১॥০ টায় গাড়ী ছাড়িয়া পরদিন সকাল ৯॥০ টায় দ্বারকায় পৌছিলাম। সকালের দিকে ঐদিন সূর্যগ্রহণ থাকায় দ্বারকার মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল। ঐ গ্রহণের সময় আমরা গোমতী ও আরব সাগরে সংগমে পুণ্যস্নান করিলাম। সাগরের জলে নামিতে আমার ভীষণ ভয় করিতেছিল। জ্যাঠাবাবু আমায় ভয় ভাঙ্গাইয়া ধরে ধরে নামাইয়া স্নান করাইলেন। ষ্টেশনে ফিরিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। বৈকালের দিকে টাঙ্গায় চড়িয়া ভদ্রকালি, রুক্মিনী, রামবাড়ী, লছমিনারায়ণ, ভূক্ত মহেশ্বর, দেখিয়া আরব সাগরের তীরে বসিয়া সূর্যাস্ত দেখিয়া দ্বারকা মন্দিরে সন্ধ্যারতী দেখি। আরতির সময়ে চারিদিকে বাদ্যবৃন্দর তালে তালে ভজন গান শুনিলাম। ইহার পর আমরা ষ্টেশনে ফিরি। পরদিন সকালে গোমতীতে স্নান করিয়া পূজার ডালি লইয়া মন্দিরে যাই। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ষ্টেশনে ফিরে গাড়ীতে বসে আমাদের দলের মিত্র মহাশয়ের ব্যবস্থায় এবং যোগাযোগে ভগবান দ্বারকানাথের ভোগের প্রসাদ পাইলাম। পরদিন আমরা বড় পাল তোলা নৌকায় চড়িয়া সদলবলে কচ্ছ উপসাগরের উপর দিয়া ভেট দ্বারকা যাত্রা করি। প্রায় দুই মাইল দূরত্ব আধ ঘণ্টায় ভেট দ্বারকা পৌছিলাম। ওখানে সমুদ্র কূলে স্নান করিয়া মন্দিরে বিভিন্ন বিগ্রহের মূর্তি দেখিলাম। পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরতি দেখি ও পুষ্পাঞ্জলি দিই। এই সময়ে একদল হিন্দুস্থানী তীর্থযাত্রী দল ঐ মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া খঞ্জনী, করতালি তালে তালে ভজন গাইয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিল। তাহাদের নৃত্য এবং গীত দেখিতে শুনিতে বেশ লাগিতেছিল। আমরা নৌকায় ফিরে

খাওয়া দাওয়া দোতলাতেই হচ্ছে

নকশা

●

শ্রাদ্ধ বাড়ী। বিরাট ভোজের আয়োজন। ব্রাহ্মণরা খেতে বসেছেন, নিচের তলাতে এবং দোতলাতে। গৃহকর্ত্তারা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে পরিবেশনের তদারক করছেন; প্রয়োজন হলে নিজেরাও ভোক্তাদের পাতে দিচ্ছেন। অপরিমিত আয়োজন এবং উভয় পক্ষই যেন ধুধামান অর্থাৎ যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের দেওয়ার শেষ নাই এবং যাঁরা খাচ্ছেন,—তাঁদেরও অরুচি নাই।

এ হেন অবস্থার মাঝে খানে গৃহস্বামী জোড়হস্তে যখন নিচেরতলার একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, তিনি একটু বিনীতভাবে এবং দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিলেন—হচ্ছে ভালই, তবে আরও ভাল হচ্ছে,—দোতলাতে। গৃহস্বামী অবশ্য একটু আঘাত পেলেন, কেননা তাঁরা আয়োজনের বা পরিবেশনের কোন পার্থক্য রাখেননি কোন যায়গাতেই।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। নিচের ঐ ভদ্রলোকটীর খাওয়ার পরিমাণ এত বেশী হয়েছিল, যে তিনি ওঠবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই দুজন তাঁকে সাহায্য করতে এলেন এবং তাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি কোন রকমে চলতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে ওপর থেকে যাঁরা খাওয়া দাওয়া করে অতি কষ্টে নিচে নামছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের খাওয়া এত বেশী হয়েছিল যে ভগবান সেইখানেই তাকে ডেকে নিয়েছিলেন। তাই তাঁকে নামানর জন্য আরও দুজন বেশী অর্থাৎ চারজনের দরকার হয়েছিল এবং তাঁকে নামাবার সময় তাঁরা হরিধ্বনি করেছিলেন।

এই শুনে নিচের ভদ্রলোক যিনি, দুজনায় কাঁধের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে, অতি কষ্টে চলেছিলেন, তাঁর খাওয়া যে ভাল হয় নি তার হাতে নাতে প্রমান পেয়ে তাঁর দুঃখের মাত্রা গেল বেড়ে। সকাতরে বলতে লাগলেন, বলেছিলুম না, ওপর তলাতেই খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, দেখলেত? আমরা আর কী এমন খেলুম!

রাস্তায় যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়া দাওয়া কেমন হল, তাঁর সেই একই উত্তর, "কী আর খেলুম, যিনি খেয়েছেন, তিনি হরিনাম সংকীর্ত্তন করাতে করাতে পিছনে আসছেন।"

কিছু দূর যাবার পর আর তাঁর শক্তি রইল না, বাড়ীর বাকি পথটুকু অতিক্রম করবার। তখন সঙ্গীরা তাঁকে মাঠের মাঝখানে পথের ধারে একটা গাছের তলায়, শুইয়ে রেখে যে যাঁর বাড়ী চলে গেলেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি সেই গাছতলাতে পড়ে রইলেন। এমন সময়ে একটী গরু তার পাশে শুয়ে জাবর কাটতে লাগল। হঠাৎ তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন, "মশাইএর বুঝি ওপর তলাতেই বসা হয়েছিল! তাই পেটটা ভালই ভরেছে বলে বোধ হচ্ছে!"

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

আমার ভ্রমণ কাহিনী

আসিলে নৌকা আবার দ্বারকার অভিমুখে ছাড়িয়া দিল। নৌকায় এপার ওপার হইবার সময় আমাদের মধ্যে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের ভজন গান গাইতেছিলেন। দ্বারকায় ফিরে ঐদিন রাত্রে আমাদের গাড়ী রাজকোট হইয়া আবুরোড অভিমুখে চলিল। দ্বারকা হইতে আবুরোডের দূরত্ব অনেক। প্রায় ২৪ ঘণ্টা গাড়ী চলিয়া আবুরোডে গাড়ী থামিল। আবুরোডে পৌছিয়া সকালে প্রাতঃরাশ সারিয়া প্রথমে বাসে করিয়া

বাস মন্দিরের কাছে পৌছিল। ট্যাক্স দিয়া টিকিট কিনে মন্দিরের ভিতর যাই। পাহাড়ের চূড়ায় প্রচুর সিঁদুর একটি বৃহৎ পাথরের মূর্ত্তি। এইটি অম্বাজী দেবীর মূর্তি। মূর্ত্তির সামনে একটি পাত্রে মহিলাদের জন্য সিঁদুর রাখা আছে। ঐ সিঁদুর মহিলারা মূর্ত্তিতে দেয় এবং নিজেরা পরে। কাছেই একটি বাজারে কতগুলি দোকানে সুন্দর সুন্দর খেলনার জিনিষ বিক্রী করিতেছিল। আমরা কিছু কিনে

জাতীয়-সংবাদ

রবীন্দ্রস্মারকসংখ্যা ঃ গন্ধবণিক

গন্ধবণিকের পৌষ ১৩৬৭ সংখ্যায় আমরা রবীন্দ্র সংখ্যার জন্য গন্ধবণিকের সকলশ্রেণীর পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন করেছিলাম—কিন্তু যথোচিত সাড়া পাওয়া যায়নি। গন্ধবণিকের আগামী বৈশাখ সংখ্যা রবীন্দ্র স্মারকসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গ—গত একশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি, সম্পর্কীয় যে কোনপ্রকার রচনা বিশেষ করে সুলিখিত রচনা মাত্রই সাদরে গৃহীতব্য। আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে লেখকগণকে রবীন্দ্র সম্পর্কীয় রচনাদি সম্পাদকীয় দপ্তরে (নাগ আর্ট প্রেস, ৬৭।১।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯) পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

কুমারী রাণী বণিক

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে গন্ধবণিক পত্রিকায় কুমারী রাণী বণিকের বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল আমরা আনন্দের সংগে প্রকাশ করেছিলাম। গত ১৯৫৮ সালে কৃষ্ণনগরগভর্ণমেণ্ট কলেজ হতে কুমারী রাণী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তিনি গত ১৯৬০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second Class) উত্তীর্ণা হয়েছেন। কুমারী রাণী বণিক কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বণিক এম. এ., বি. এল. মহাশয়ের কন্যা ও লেঃ কর্ণেল হেরম্ব চন্দ্র বণিক M. C., A. M. C. র ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং পরলোকগত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বর্গীয় তারকনাথ পোদ্দার মহাশয়ের দৌহিত্রী। কুমারী রাণী বণিকের এই সাফল্য সংবাদ আমাদের সমাজের নারী প্রগতির নির্দেশক। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে আরও সাফল্য শ্রীবৃদ্ধিকে চাক্ষুষ করতে অভিলাষী।

●

শ্রীপ্রবীর কুমার বণিক

বিগত নভেম্বর মাসে দিল্লীতে যে National Shooting Championship এর যে প্রতিযোগিতা হয়—কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র কেডেট শ্রীমান প্রবীর কুমার বণিক পশ্চিমবংগে কেডেটদের মধ্য হতে নির্বাচিত হয়ে যোগদান করেন। শ্রীমান বণিক কৃতিত্বের জন্য উক্ত প্রতিযোগিতায় একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন। সদ্য পরলোকগত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে সফল প্রতিযোগীদিগকে পদকাদি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। শ্রীমান প্রবীর কুমার কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বণিকের পুত্র এবং লেঃ কর্ণেল হেরম্ব চন্দ্র বণিক M. C. A. M, C. মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবীর কুমারের এই কৃতিত্ব আমাদের অগ্রগতিকে বৈচিত্রে মণ্ডিত করলো।

●

শুভ বিবাহ

গত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৬৭ সাল বরাহনগর নিবাসী স্বর্গীয় ললিতমোহন দে মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি শান্তমণির সহিত বলরাম বাটী নিবাসী শ্রীতুলসী চরণ দত্তের জেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গণেশ চন্দ্র দত্তের শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা মাতা গন্ধেশ্বরীর নিকট নব দম্পতির মঙ্গল কামনা করি।

শোক-সংবাদ

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নলিয়াপুর গ্রাম নিবাসী 'গন্ধকবি গুণানন্দ' ওরফে ৺গৌড় কিশোর রাজ মহাশয় সন ১৩৬৭ সালের ২১শে কার্ত্তিক তাঁহার নলিয়াপুরস্থ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইনি অনেক দিন যাবৎ 'গন্ধবণিক' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বর্ত্তমানে তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা, দুই পুত্রবধূ, নাতী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা মাতা গন্ধেশ্বরীর নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শুভ বিবাহ

গন্ধবণিক পত্রিকা মারফত সমাজের বিবাহ সংবাদগুলি যথাসম্ভব যত্ন সহকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবিষয়ে সংবাদদাতাগণের সহযোগিতা ও নিষ্ঠা একান্তভাবে কাম্য। গত মাঘ মাসে কলিকাতার গন্ধবণিক সমাজ তথা মফঃস্বল গ্রাম বাংলায় অনেকগুলি বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাবৎ সংবাদের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেনি। শ্রীমান চন্দ্রনাথ পালের বিবাহ সংবাদের সংগে আমাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল—এই সংবাদ পত্রিকার পক্ষেও সুখাবহ এবং বোধকরি উল্লিখিতব্যও বটে। আমাদের পাঠকগণের কাছে চন্দ্রনাথ পালের নাম অধুনা অপরিচিত নয়। বিগত কয়েক বৎসর হতে শ্রীযুক্ত পাল এই পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

বিগত ২৩শে মাঘ সোমবার শ্রীমান চন্দ্রনাথের সংগে কলিকাতা দর্জিপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ দত্তের কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণার সংগে এই শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী কৃষ্ণা গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ লাহার দৌহিত্রী। চন্দ্রনাথ প্রাচীন কলিকাতার বিশ্রুতকীর্তি চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দ্রব্যগুণ, সংগ্রহ Indian Herbalist, A treatish of yoga Philosophy প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্বর্গীয় ডাঃ নবীনচন্দ্র পাল G. M. C. B, মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, ৺বঙ্কুবিহারী পালের পৌত্র এবং শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পালের পুত্র।

শ্রীমান পাল সুশিক্ষিত এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা মার্জিত রুচিসম্পন্না। আমরা নব দম্পতির কল্যাণময় দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

স্বজাতীয় সাফল্য

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ধানবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ হালদার মহাশয় গত মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাতা গন্ধেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া দেশ ও জাতির সেবা করুন।

শোক সভা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সাল শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় মহাসভা গৃহে কার্য্যকরী সমিতির একটি অধিবেশন শ্রীশিশির কুমার দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মহাসভার বিশিষ্ট সভ্যাগণের উপস্থিতিতে পরলোকগতা ও শ্রদ্ধেয়া নীলিমা সাধু মহোদয়ার কর্ম্মময় জীবন আলোচিত হয়।

সভার প্রারম্ভে সমবেত সভ্যাগণ ১ মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও চিরশান্তি কামনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটীর অনুলিপি শ্রীযুক্ত জলধি নাথ সাধু মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়।

শোক প্রস্তাব

"এই সভা আমাদের সমাজের নারী আন্দোলনের অন্যতমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা, নীলিমা সাধু মহোদয়ার পরলোকগমনে গভীর ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছে এবং শ্রীশ্রী৺পরমেশ্বরী গন্ধেশ্বরী মাতার নিকট তাঁহার অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছে। তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের অপুরণীয় ক্ষতিতে এই সভা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এই প্রস্তাবের অনুলিপি শ্রীযুক্ত জলধী নাথ সাধু মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করা হউক।

Publisher's Certificate

Statement in Form IV of the Registration of Newspaper (Central) Rules 1956.

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's name	Sadhan Dhan Nag.
	Nationality	Indian.
	Address	67/1/1, Mahatma Gandhi Rd.
4.	Publisher's name	Sadhan Dhan Nag.
	Nationality	Indian.
	Address	67/1/1 Mahatma Gandhi Rd.
5.	Editor's name	Narayan Ch. Kundu. Haradhan Dutta.
	Nationality	Indian.
	Address	21C, Rajendra Deb Road. Calcutta-7
6.	Names and addresses of individuls who own the newspaper and partner or shareholders holding more than one per cent of the total.	It is a social paper of the Gandhabanik Community. It has no properietory right of any individual. It is run by the Gandhabanik Patra Publishing Society which is registered under Act XXI of 1860

I, Sadhan Dhan Nag hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 10th March, 1961. (Sd.) Sadhan Dhan Nag

গন্ধবণিক
মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪২শ ভাগ	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা	চৈত্র
২য় সংখ্যা	নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	১৩৬৭

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশে কাব্যসাহিত্যের মত না হোক নাট্যসাহিত্যও বেশ প্রাচীন। যাঁরা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা করেছেন—তাঁদের অনেকেই একথা স্বীকার করবেন। বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন চর্য্যাপদে ও এই নাটক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও নাটকীয়তা দুর্লভ নয়—স্বয়ং চৈতন্যদেব এই কাব্যের নাট্যরূপ আস্বাদন করতেন। মঙ্গলকাব্য বা মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যেও নাট্যরস আস্বাদনের বৈচিত্র কমেনি। অনুবাদ কাব্য রামায়ণ মহাভারত অনেক সময় নৃত্য সহযোগে অভিনীত হত। মঙ্গলকাব্যের গায়েনগণ অসংখ্য দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে চামর দুলিয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কাহিনীগুলির রসস্ফুরণ ঘটাতেন। আর মানুষের আনন্দবোধের যে আদিম প্রকাশ তা হচ্ছে নৃত্য। এই নৃৎ ধাতু থেকেই নাটক শব্দের উৎপত্তি। নাট্যশাস্ত্রের পূর্বকথা পরিবেশন করতে গেলে একটা প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়—এমন কি সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দুয়ারেও উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু সেকথা নয়। আমাদের নাট্য সাহিত্যের অপরূপ রূপান্তর ঘটেছিল পাশ্চাত্ত শিক্ষার যাদুমন্ত্রে। সেদিন নাট্যসাহিত্যের মধ্যে নীলাম্বু প্রসার ও জলকল্লোলের গুরু-গীতধ্বনি শ্রবণ করা গিয়েছিল। আর তারই ফলে গত ১৫০ বৎসরের একান্ত সাধনায় আমাদের নাট্য সাহিত্য অপরূপ কারুকান্তি লাভ করেছে। আর রবীন্দ্রনাথে এসে তার যেন একটা পূর্ণচ্ছেদ ঘটল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের জগতে সৃষ্টিধর্মী মহৎ প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল। তবু সাহিত্যের জলকল্লোলে উদাত্ত মৃদঙ্গধ্বনি শোনা না গেলেও কুলু কুলু গীতধ্বনির অভাব ঘটল না। এই কালেরই এক মহৎ প্রতিভার নক্ষত্রচ্যুতি ঘটেছে মাত্র কয়েক দিন আগে। তাঁরই কথা দিয়ে এবারের প্রসঙ্গ-কথার শুরু।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৬১)

সে যাই হোক বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার তুলনায় নাট্যসাহিত্য কিছু দুর্বল। এর যাত্রাধর্মিতা ও Melo-dramatic ভঙ্গি আজও দূরীভূত হলনা। আসল কথা বাংলার এই নরম মাটিতে ইউরোপীয় ধরণের নাটকের

কল্পন কম। এর মূলে জীবন ধর্মের পার্থক্য। নাট্যকারকে জীবন মহাকাব্যের কবি হতে হয়। কল্পনার Objectivity, উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ। নাটকে জীবনকে বর্ণনীয় না করে দর্শনীয় করে তুলতে হয়। আত্মগত রসকল্পনা যা এদেশের সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ—সেই রস কল্পনায় বস্তু সকলকে মণ্ডিত না করে বস্তু সকলের রস সত্তায় আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া এই সাহিত্যিক তথা জীবন প্রবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রাণ। দুর্ভাগ্য এদেশের এমন রসকল্পনা আমাদের নাট্যসাহিত্যে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ট্রাজেডিগুলিতে এবং দীনবন্ধু মিত্রের কতিপয় নাটকে সৃষ্টির এই প্রদীপ্ত শিখা অকস্মাৎ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। নাটকের এই তত্ত্ববস্তু সম্পর্কে যাঁরা উৎসাহী তাহাদিগকে আমি একটি রচনার কথা উল্লেখ করি—১, দুঃখের বিষয় রচনাটি মনস্বী লেখকের কোন গ্রন্থতেই স্থানলাভ করেনি। রচনাটি সুদীর্ঘও বটে, এই লেখকের প্রথম প্রস্তাবটি "সাহিত্য বিচার" গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। সদ্য পরলোকগত শচীন সেনগুপ্তের মধ্যে এই দুর্লভ প্রতিভার বিদ্যুৎ বিকীরণ দেখেছিলাম। সত্যি-কথা বলতে কি রবীন্দ্রোত্তর কালে যে কয়জন নাট্যকার বাংলার নাট্য সাহিত্যকে প্রাণবান করে রেখেছিলেন—নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বোধকরি তাদের মধ্যে প্রধানতম। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের খুঁটিনাটি আমরা বলতে চাইনা। জন্ম খুলনার সেনহাটীতে। শিক্ষা সেনহাটী, রংপুর, কলিকাতা আর, জি কর মেডিক্যাল স্কুল ও কটক মেডিক্যাল স্কুল।

চিকিৎসা বিদ্যা অসমাপ্ত রেখেই তিনি ময়মনসিংহের বিখ্যাত কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্তের নিকট আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে ছাত্রজীবনেই তিনি রাজনীতি ও বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। এবং এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মনীষী সখারাম গণেশ দেউস্করের কাছে সাংবাদিকতার দীক্ষা নেন। শচীন্দ্রনাথের জীবনের আদ্যন্ত তীব্র স্বদেশপ্রেম ও সাংবাদিকতায় দীক্ষিত। দেশবন্ধুর নারায়ণে' তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শ্রী অরবিন্দের আহ্বানে শচীন্দ্রনাথ "বিজলী" পত্রিকায় যোগদান করেন এবং পরে সুভাষচন্দ্র ও অগ্রজ শরৎচন্দ্রের অনুরোধে তিনি 'আত্মশক্তি' ও 'নবশক্তির' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।' এরপর একে একে বৈকালী, ঘরে বাইরে, কৃষক, ভারত, নটরাজ, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিজেকে নানাভাবে নিয়োজিত করেন। শচীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গ্রন্থ চিঠির আকারে লেখা কয়েকটি গল্পসমষ্টি। ১৯২৮এ তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তকমল' প্রকাশিত হয়। ১৯৩০এ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'গৈরিক পতাকা' প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৬১ সাল—এই সুদীর্ঘ কালে শচীন্দ্রনাথের লেখনী কখনও স্তব্ধ হয় নি। তিনি নিত্য নব নব নাটক সৃষ্টি করে বাংলার নাট্য সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন। তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকের নাম কে না জানেন। বাংলার ঘরে ঘরে এই নাটকের রেকর্ড আছে। এযাবৎ তিনি প্রায় ৪০ খানির অধিক নাটক রচনা করেছেন। এখানে তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। তিনি বাংলা রঙ্গালয় ও নাট্যকলা সম্পর্কেও একখানি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। নাট্য আন্দোলনে তাঁর অসামান্য দানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে কেন্দ্রীয় নৃত্য, নাট্য ও সংগীত একাডেমীর সদস্য করেন। তিনি পশ্চিম বংগের শান্তি পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। এই অসামান্য প্রতিভার অভাব আজিকার নাট্যজগতে সহসা পূরণ হবার নয়। কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় একস্থলে লিখেছিলেন—"জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতি গোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্তি পরিগ্রহ করে—যাহা আছে তাহাই তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয়—এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যাভিমান বিবর্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তুসকলের সুগভীর রহস্য-নিকেতনে লইয়া যায়, তখন এই যথাপ্রাপ্ত জগৎকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন

১। নাটকীয় কথা (দ্বিতীয় প্রস্তাব)—মোহিতলাল মজুমদার। শারদীয় আনন্দবাজার—১৩৫২।

করায়—নাট্য কবি সেই রসের রসিক।"২ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাট্য প্রতিভায় হয়ত এই গুণের সদ্ভাব সকল স্থলে ছিল না। কিংবামনস্বী ইংরাজ সমালোচক সেক্সপীয়র প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যা বলেছিলেন—"of all poets perhaps, he alone has pourtrayed the mental diseases, melancholy, delirium, lunacy—with such inexpressible, and, in every respect, definite truth, that the physician may enrich his observation from them in the same manner as from real cases."৩ এই গভীর গূঢ় জীবন সত্য হয়ত শচীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বত্র সুলভ নয় তবু ট্রাজেডি বা মহাকাব্য বাঙালীর স্বভাবগত না হলেও প্রাচীনকাল হতে বাংলা কাব্যে লিরিকের সোনার তারের সংগে এই উৎকৃষ্ট মানবধর্মের পরিচয়টি রূপার তারের মত জড়িয়ে আছে। ব্যঞ্জনে লবনের মত এই রস সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রেরণায় প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শচীন্দ্রনাথে তা আছে। তাঁর অকাল বিয়োগে আমরাও বিয়োগব্যথা অনুভব করছি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করছি।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব (১৮৬১-১৯০৭)

এই বৎসরে আমরা রবীন্দ্র শতাব্দ পালন করার জন্য অগ্রসর হয়েছি—সুখের কথা। এই বৎসরে আরও দুটি স্মরণীয় স্মৃতি আছে—মেঘনাদ বধ কাব্যের শতবর্ষ এবং উপধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবনের শতবর্ষ পূর্তি। বর্ত্তমান আলোচনায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধই আমাদের বিষয়বস্তু। আর এই উপাধ্যায় স্মৃতি রবীন্দ্র স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বিগত শতাব্দীতে যে সমস্ত ভারত সন্তান স্বাধীনতা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম। তিনি ছিলেন তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং প্রখ্যাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৬১তে হুগলী জেলায় তাঁর জন্ম। উনবিংশ শতকের অস্থির চিন্তা তাঁর মধ্যেও সংক্রমিত হতে দেখা যায়। তিনি বার বার ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরে খৃষ্টধর্ম এবং পরিশেষে তিনি ভারতের বেদান্ত ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন। মেট্রোপলিটান কলেজে ছাত্রজীবনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হন। ১৮৯৪ সালে বেদান্তধর্ম্মে মুগ্ধ হয়ে হিন্দুসন্ন্যাসীর গৈরিক বসন গ্রহণ করেন এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে অভিহিত হন। নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের সহযোগিতায় তিনি করাচীতে "Twentieth Century" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি আনি বেসান্টের থিয়োসফিকাল সোসাইটিতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে আমেরিকায় চিকাগো শহরে বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় বক্তৃতাতে তিনি আরও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং ইংলণ্ডে গমন করেন ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে অনেকগুলি বক্তৃতাদান করেন এবং পাশ্চাত্ত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এসেই সমাজসেবা ও অধ্যয়ন ও সারস্বত ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র আদর্শ ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে ধ্যান মনন ও ভাবনাকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। Twentieth Century নামক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের উপর তিনি একটি সুলিখিত রচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে Sophia, (Sept. 1900) পত্রিকায়ও তাঁর উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশিত হয়। আজকের রূপান্তরিত বিশ্বভারতীর জন্মলগ্নে ব্রহ্মবান্ধবের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে তিনিই এখানে 'সরস্বতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর নানাকারণে বিশ্বভারতীর সংগে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে পারেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর যোগাযোগ

২। আধুনিক বাংলা সাহিত্য (দীনবন্ধু, প্রবন্ধ)—মোহিতলাল মজুমদার।

৩। Characters of Shakespeare's Plays—(Preface)—William Hazlitt

বিচ্ছিন্ন হয়নি। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) এর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করে সেকালের সাহিত্যজগতে শঙ্খধ্বনি করলেন। অচিরে ব্রহ্মবান্ধব 'বঙ্গদর্শনের' বিশিষ্ট লেখকে পরিণত হলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তিনি দিনের পর দিন এই পত্রিকায় লিখে চললেন। এরই মধ্যে বাংলার জাতীয়তা বোধ তীব্রতর হয়ে উঠল। দিকে দিকে বাঙালী তারুণ্যের উন্মাদিনী প্রাণশক্তি দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞের আহুতি হল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯০৩ সালে তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রকাশ করলেন এরই দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Dawn পত্রিকা ও Dawn Society স্থাপন করলেন এবং জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন তীব্রতর হতে লাগল। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' ও মনীষী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের 'বন্দেমাতরম' দেশ ও জাতির সুপ্ত চিত্তে অগ্নি শলাকার স্পর্শ দিল। একালের আন্দোলনের কথা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থে* ব্যাপক আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া আরও কতিপয় কৃতবিদ্য মনীষীজনের গ্রন্থ ও রচনাদিতে সেকালের বিপ্লবাদের সংবাদ সুসমঞ্জস হয়ে ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় ঐকালের উপর আরও ৫/৬খানি সুলিখিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যাহোক 'সন্ধ্যা' পত্রিকাতেই ব্রহ্মবান্ধবের আত্মস্ফূর্তি ঘটে। অচিরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 'সন্ধ্যা' ও উপাধ্যায়কে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। বিপিনচন্দ্র পাল-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা পত্রিকা'কে স্বাগত অভিনন্দন জানান। স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসক অবিলম্বে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার কার্য্যালয় অনুসন্ধান করে। ব্রহ্মবান্ধব তেজোদ্বিতার সংগে সেদিন উত্তর করেছিলেন—'There is no British jail which can hold me'।" ব্রহ্মবান্ধব রাজদরবারে অভিযুক্ত হলেন। অভিযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব সেদিন পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট Kingsfordএর কাছে সদর্পে বলেছিলেন—'I accept the entire responsibility of the publication management and conduct of the newspaper 'Sandhya'..........But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God appointed mission of Swaraj. I am not in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interst is and must necessarily be in the way of our true national development." এই বিচার চলতে লাগল। অবশেষে সত্যিই বৃটিশ জেলকে পরাজিত করে ১৯০৭ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি পার্থিব জগৎ পরিত্যাগ করলেন। মনীষী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন—The first successful venture in popular journalism in the vernacular of our province.... .... It was this sturdy Patriot whose most unaided exertion has brought the people of Bengal to a practically resistful attitude today. Of all men it was he who had imputed a militant character to our Swadeshi Movement." ব্রহ্মবান্ধব বাংলা সাহিত্যের দরবারে অনেক ক'খানি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর "বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি" (১৩১৩), ব্রহ্মাসূত্র (১৩১৬), সমাজতত্ত্ব (১৩১৭), আমার ভারত উদ্ধার (১৩৩১) পালপার্বণ (১৩৩১) বাংলার মননশীল সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর গ্রন্থাবলী অধুনা একেবারে দুর্লভ। পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর অনেক রচনা আজও গ্রন্থস্থ হয়নি।

(শেষাংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়)

* । (ক) The origins of the National Education Movement—by Prof. Haridas Mookerjee and Prof. Uma Mookerjee

(খ) Studies in Bengal Renaissance—Ed. by Atul Gupta.

ফরাক্কা না ফক্কা

দুর্গেশ নারায়ণ দে

●

গঙ্গার উপরে বাঁধ দিবার পরিকল্পনা বহু বৎসর যাবৎ পেশ করা হইতেছে। সুদীর্ঘ দশ বৎসর লাগিল বিশেষজ্ঞদের মত দিতে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আশ্বাসবাণীও মাঝে মধ্যে শোনা যাইতেছিল। বাংলার সংবাদপত্রগুলিও চুপ করিয়া বসিয়াছিল না। ফরাক্কায় বাঁধ না দিলে কলিকাতা মরিবে। বাংলাদেশ মারলে বাঁচিবে কে? এই রকম নানাবিধ মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। কথাগুলি যে মিথ্যা তাহা বলিতেছি না। সত্যই তো পশ্চিমবঙ্গের সহিত উত্তরবঙ্গের সরাসরি যোগাযোগ নাই। যাহা আছে তাহা অনেক ঘোরা-পথ। ফরাক্কায় বাঁধ নির্মিত হইলে রেলপথ ও রাস্তা দিয়া মালদহ-দিনাজপুর প্রভৃতি ঘরের কাছে মনে হইবে তাহারা আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন তাহা বোধ হইবে না।

ইহাও সত্য যে ভাগীরথী নদীর পুনরুজ্জীবন দরকার। পলি পড়িয়া তাহার গর্ভ বুঁজিয়া আসিয়াছে— ফলে তাহার নাব্যতা খুবই হ্রাস পাইয়াছে। ফরাক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ দিলে ভাগীরথীতে বেশী জল প্রবাহিত হইয়া তাহার নাব্যতা বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া ভাগীরথীর জলের লবণাক্ততাও হ্রাস পাইবে। জলের গভীরতা অন্ততঃ পক্ষে ৯ ফুট হওয়াতে উত্তর প্রদেশ ও বিহার পর্যন্ত সরাসরি জলপথ সারা বৎসরের জন্য উন্মুক্ত হইবে।

গঙ্গার গর্ভ পলি পড়িয়া বুঁজিয়া না গেলে বন্যার প্রকোপ অনেক কম হইত। গঙ্গার স্রোত তীব্রতর হইলে কিংবা গঙ্গা দিয়া অধিক জল নিষ্কাশিত হইলে নদীর গর্ভ গভীরতর হইবে। ফলে বন্যার জল তীর ছাপাইয়া উঠিতে পারিবে না। গঙ্গার মোহানা অর্থাৎ সুন্দরবন অঞ্চলও ভরাট না হইয়া নাব্য হইবে।

ইহা ছাড়া, ক্ষেতে জলসেচের জন্য অধিক জল পাওয়া যাইবে। ফলে দেশে খাদ্যোৎপাদন বাড়িবে। নদীর নাব্যতা বাড়িলে মালপত্রের বেশ একটি বড় অংশ জলপথে চলাচল করিবে। ফলে রেলপথের উপর চাপ কমিবে। আবার বাঁধের উপর দিয়া রাস্তা ও ব্রড গেজ রেলপথ নির্মিত হইলে উত্তরবঙ্গ এবং আসামে যাত্রী, মাল, খাদ্যদ্রব্য এবং সৈন্যসামন্ত প্রেরণে বিশেষ সুবিধা হইবে। সুতরাং কেহ যদি বলে যে এই বাঁধের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত—তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় সরকার কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহেন। সেই কারণেই কি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেও ফরাক্কা বাঁধের স্থান হইল না? ইহা অপেক্ষা ঢের কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা হইল—তাহার জন্য ১২ কোটি টাকাও বরাদ্দ হইল। আমি বিহারের শোন নদীর বাঁধের কথা বলিতেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র হিসাবে সে বাঁধের উপযোগিতাও স্বীকার করিতেছি—কিন্তু তাহার গুরুত্ব ফরাক্কার তুলনায় অনেক কম। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হফ্‌ম্যান প্রতিনিধিদলও তো সেদিন রায় দিয়াছেন যে কলিকাতা বন্দর রক্ষা করা সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা শিল্পাঞ্চলের পক্ষে অপরিহার্য এবং উহারই সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তাঁহাদের মতে ভারতের পক্ষে চতুর্থ ইস্পাত কারখানার চাইতেও ইহার গুরুত্ব অধিক।

পাকিস্তানের সহিত এই বাঁধ নির্মানের ব্যাপারে বোঝাপড়া করিবার ব্যাপারটিও নিরর্থক। বার্সিলোনার আন্তর্জাতিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আর পাকিস্তানের মতের অপেক্ষা না করিলেও পারি। সুতরাং এ বিষয়ে পুনরায় কথাবার্তা চালানো বৃথা কালক্ষেপের কারণই হইবে—যাহা এই অবস্থায় একান্ত অসমীচীন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির চক্রে পড়িয়া বাঙ্গালী আজ আসামে মার খাইতেছে—বিহার তাহার প্রাপ্যের অধিক বাংলার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। বাঙ্গালীর ন্যায্য দাবী তাহার বাঁচিবার দাবী আজ ধূলায় লুটাইতেছে। সমবেত প্রচেষ্টায় এই অবিচারের প্রতিকার করিতে হইবে। ফরাক্কার দাবী স্বীকার করাইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শক্ত হউন—আমরা সঙ্গে আছি। ফরাক্কার দাবী ফক্কা হইলে আমরাও ডুবিব। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

মিঃ পুরকায়েৎ

অনিতা দেবী

ভোম্বল দা.......... ....

আঁৎকে উঠে চেঁচানিটা বোধহয় আমার খুব জোরেই হয়ে গিয়েছিল, ভোম্বলদার থাবড়ার চোটে হাঁ-মুখটা ঢাকা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদার চাপা গর্জ্জন—ননসেন্স্...............

হয়তো ভোম্বলদার কথাই ঠিক। গাঁয়ের সেই ভোঁদা মার্কা ভোম্বলদাকে পুরু ঠোঁটের কোনে পাইপটাকে কামড়ে ধরে থাকা অবস্থায় দেখে কোন সেন্সই আমার ছিল না। তাই ভোম্বলদা আমার 'পরে মহা খাপ্পা হয়ে পাইপটা আরও জোরে কামড়ে জুতোর মস্‌মস্ শব্দ করে ঘরের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত চলে বেড়াচ্ছে। একসময় দাঁতে দাঁত টিপে আমার দিকে চেয়ে বলে—তোদের জ্বালায় আমার লোকজনদের কাছে প্রেষ্টিজ্ আর থাকলো না।

কিসে যে প্রেষ্টিজ্ লুজ্ হলো ভোম্বলদার, আমার এ গোবরপোরা মাথায় তো কিছুতেই আসছে না। ভোম্বলদাকে, ভোম্বলদা বলেছি তাতে প্রেষ্টিজ্‌টা যে কি লুজ্ হলো ভগা নোজ্। বেশীক্ষণ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে হলো না আমার, ভোম্বলদাই টেনে তুললেন কূলে। বললেন জুতোটা টান মেরে খুলে ফেলে দিয়ে—সাহেবের সামনে 'ভোম্বলদা'। কতদিন বলে দিয়েছি বলবি 'মিষ্টার পুরকায়েৎ' না হয় 'শ্যামলদা'। তা নয়.....................

রাগে গস্‌গস্ করতে করতে থলথলে চেহারাটা নিয়ে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়লেন ভোম্বল দা। ছাঁচলেস ভোম্বলদার মুখখানি রাগে আরও কিম্ভুত কিমাকার লাগছিল। তা লাগুকগে, অনেকগুলো ডিগ্রির লেজ ঝুলোনো ভোম্বলদা এখন একজন অফিসার বলে কথা। পাত্রের বাজারে চড়া দাম। হোকনা থ্যাবড়া নাকের দু'পাশে কুঁৎকুতে দুটি চক্ষু। কালো রংয়ের সাথে এক-গুচ্ছের মাংস লাগা চেহারা। কিন্তু আর যা হোক অফিসারী কেতাদুরস্ত তাঁর বোকা বোকা চেহারাটা পাল্টে গেছে। আমূল পরিবর্তন ভোম্বলদার! কার সাধ্য ভোম্বলদাকে, ব্যাক ব্রাশ করা চুলে কোন এক কুমারীর ছাঁচ, গ্যাবার্ডীন আচ্ছাদিত দেহ, পোষাকের আভিজাত্যেই পরিচয়ের আলো জ্বালায়. তাকে দেখে বলতে পারবে এই সেই ছেলেটী যিনি, ছিটের জামার উপর কালচে রংয়ের কোটটি গায়ে দিয়ে, তেল চুকচুকে চাঁটুখানি চুলে চিরুনী বুলিয়ে কপালের ওপর দিয়ে আঁচড়ে, তেলামুখে, ভ্যাবলা চোখে বোকা বোকা ভঙ্গিতে বই কটি বুকে চেপে গুটিগুটি পায়ে গিয়ে বসতো গ্রামের স্কুলের লাষ্ট বেঞ্চিতে। চাষী বাসি গেরস্ত ঘরের ছেলে। খায় দায় ড্যাং গুলি চালায়, গ্রামের পুকুরে সাঁতার দেয়, আমগাছে চেপে আম পেড়ে খায় আর কাজের মধ্যে মহৎ কাজ স্কুলে যাওয়া।

এমনি করে ভোঁদা চেহারা ভোম্বলদা একটা পাশও করে ফেললো গাঁয়ের স্কুল হতে। বাড়ীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই। তবু বড়দাদা তণ্ডুলের পড়াশুনো হয়নি বেশীদূর। তাই বাড়ীর খায় আর একশো বিঘে জমি তদারক করে। নিজের প্রেষ্টিজ্ বজায় রাখার জন্যে দাদা চাইলেন আর পড়াশুনো করে শুধু পয়সা নষ্ট করে কি হবে, ইস্কুল থেকে ডাকছে তাকে মাষ্টারী করুক। দু একবছর পরে গুরু ট্রেনিং টা পাশ করলেই যথেষ্ট। বাবা হরিমোহন নির্বিকার মানুষ। খুব আনন্দ হলে অল্প একটু হাসেন, চরম আঘাতে মনে তুমুল ঝড় বয়ে গেলেও সহধর্মিনীও টের পান না, ওই একই করেন, ঠোঁটের কোণে একফালি হাসি। বড় ছেলেটা অমন মুখ্যু হয়ে থাকলো তাতেও তিনি কিছু বল্লেন না, ছোট ছেলটা ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করলো তাতেও তিনি হৈ চৈ করলেন না। হৈ হৈ করলেন শঙ্করী ঠাকরুন, ভোম্বলদার মা। ছেলের কৃতকার্য্যতায় বুক ফুলিয়ে এ বাড়ী ও বাড়ী বলে বেড়ালেন। তণ্ডুলদার পরামর্শ কানেই নিলেন না, বললেন—এখন পয়সা আনবার কোনই দরকার নেই। ভোম্বল কলেজে পড়বে।

—কত টাকা খরচ হবে জানো? খিঁচিয়ে উঠলো তণ্ডুল।

—হবে তো হবে—শঙ্করী দেবী নিস্পৃহভাবে বলেন—

তোর দ্বারা তো হলোনা। এখন হিংসে করে মরছিস তাই। ভোম্বল যতদূর পড়তে চায়, ওকে পড়াবো তাতে যত টাকা খরচ হয় হবে। এমন কি শান্ত ঠাকুরপোর মতো বিলেতেও যাবে।

—ফুঃ—অবজ্ঞাসূচক শব্দ মুখ দিয়ে বার করে ভণ্ডুল সে স্থান ত্যাগ করলে। শঙ্করী দেবী একাই একশো। স্বামীকে দিয়ে জরুরী টেলিগ্রাম করালেন জ্যাঠতুতো দেওর শান্তনু পুরকায়েতকে, যিনি এম, এস, সি, এজি (আমেরিকা)। জ্যাঠতুতো দেওরই হোক, আর আচরণ পুরোদস্তুর সাহেবই হউন শান্তনু ঘটক লেখকের নাম দেন। ধরতে গেলে এক-প্রকার তাঁর ডিগ্রিলাভের ক্যাশবাক্সে খুড়তুতো দাদারও অনেকগুলো টাকা আছে। শান্তনু এসে সব শুনলেন। বললেন—ছেলে আপনার সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট্ বটে বৌদি, তবে............

'তবে' টান শুনেই বৌদিদির মন গেল দমে। এত আশায় ছাই পড়বে তাঁর। তাঁর ধারণা শান্ত ঠাকুরপো যে কলেজে পড়ায় সে কলেজের মতো কলেজ আর নেই দুনিয়ায়। ছলোছলো চোখে তাই বললেন তিনি—কোন আশাই কি নেই ঠাকুরপো...........

একমুহূর্ত শান্তনু তাকালো বৌদিদির মুখপানে। সেই বৌদিদি, যাঁর লুকিয়ে দেওয়া টাকা না পেলে কলেজ জীবনের অনেক সখই অপূর্ণ থেকে যেতো তার। আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে যিনি লুকিয়ে দিয়েছিলেন চার ভরির বিছে হারটা হাতে তুলে। মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে চিবুকে তিনবার টোকা দিয়ে শান্তনু বৌদিকে আশ্বস্ত করলেন।—আচ্ছা, তোমার কোনো চিন্তা নেই, ভোম্বলকে আমার সঙ্গে দাও। দেখিগে চেষ্টা করে। তোমার ছেলের এবার যে কোটপ্যান্ট চাই, নইলে কলকাতার মতো কলেজে স্মার্ট লাগবে কেন?

—সেজন্যে তোমার চিন্তা নেই। —শঙ্করী দেবী হেসে চলে গেলেন। স্বস্তি লাভের নিঃশ্বাস পড়লো একটা।

পরের দিন ছেলে আর টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন শঙ্করী দেবী। তাঁর ভোম্বল এবার শান্ত ঠাকুরপোর মতো সাহেব হয়ে গাঁয়ে আসবে, লোকে চেয়ে চেয়ে দেখবে, গর্বে দশ হাত ফুলে উঠবে তাঁর বুকটা। ছেলের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে, প্রসাদী ফুল দিয়ে, গৃহদেবতার ঠাঁয়ে প্রণাম করিয়ে, চোখে জল নিয়ে গাঁয়ের সড়ক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন শঙ্করী দেবী। যতদূর দেখা যায় পেছন ফিরে চেয়ে চেয়ে দেখলো ভোম্বল' বার দুই হাতের তেলো দিয়ে চোখটাও মুছলো।

এ যুগে পায়া জোর থাকলে সবই সম্ভব। তাই অনেক গ্রাজুয়েট চান্স না পেলেও ম্যাট্রিক পাশ ভোম্বলদা চান্স পেয়ে গেল শান্তনু ঘটকদের কৃষি কলেজে। একে কলেজ তায় খাস রাজধানীতে, মার্বেল পাথরের মেজে, সবুজ, সাদা পাথরের কুচিতে মোজেইক করা দেয়াল। নতুন চকচকে রবার সোলের জুতো পরে পা টিপে টিপে হাঁটে ভোম্বল। পা হড়কাবার সম্ভাবনা খুবই যে বেশি। বন্ধুরা হাসাহাসি করলো প্রথমটা ভোম্বলকে নিয়ে। একেবারে মোষ্ট গাঁইয়া। তারপর নিজেরাই ওর সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করলো। জোর করে ওকে নিয়ে এদিক সেদিক বেড়ালো একটু 'চোখ ফোটানোর' জন্যে। চলতি ট্রামে উঠতে গিয়ে ভোম্বলের গা কাঁপে। গাদাগাদি ভিড়ে যখন তাকে ঠেলা দিয়ে 'লেডিজরা' ওঠে, লেডিজরা লজ্জায় অধোবদন তো হয়ই না, ভোম্বল আর মাথা তুলতেই পারেনা লজ্জায়।

বন্ধুরা হিমসিম খেয়ে গেল ওকে 'দো-নলা' পরাতে আর 'সাদা কাঠি' ধরাতে। প্যান্ট পরে হাঁটতে ভীষণ অসুবিধে হয় ভোম্বলের। মনে হয় এক্ষুনি খুলে যাবে, ধুতির মতো গিঁট দেওয়া নেই যে। বন্ধুরা অবশেষে বেলট্ বেঁধে দিয়ে ম্যানেজ করলো। কিন্তু সাদাকাঠি? হোষ্টেলে মাসান্তে ফিষ্ট্ হয়, দুটি মেয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে, তারাও যোগ দেয়, ভোম্বল 'জুলজুল' নেত্রে দেখে কি ফ্রি তারা। দিব্যি পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে খাচ্ছে, হাসছে, আবার এক এক-জনের গায়ে চাপড়ও কষাচ্ছে। আবার নিজে যেচেই কথা বলছে ভোম্বলের সঙ্গে সঙ্গে আপনি তো ভীষণ লাজুক মিঃ পুরকায়েত লজ্জায় বেঞ্চির সঙ্গে মাথাটা যে ঠেকে গেছে....

'মিঃ পুরকায়েত?' সারা দেহমনে শিহরণ খেলে যায়।

খাওয়ার শেষে সিগারেট অফার করার সময় ভোম্বলের সামনে ট্রে ধরতেই লজ্জায় কালোমুখ বেগুনী আকার ধারণ

করলো। ছিঃ ছিঃ সিগারেট, বাবা দাদা যা কখনও খায়নি। কিন্তু সহুরে বন্ধুরা আপ্-টু-ডেট্ বানাতে চায় ভোম্বলকে পুরোপুরি। প্রথম দিন সিগারেট না নিলেও মাস দুয়েক পরে নির্বিবাদে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলো ভোম্বল। প্রথম প্রথম সিগারেটে টান দিতে গিয়ে কেশে একাকার। করলেও এখন কাশি তো দূরের কথা দিব্যি রিং করতে শিখে গেছে ভোম্বলদা নয় শ্যামল পুরকায়েৎ। শ্যামল নামটা ওর বেনারসী সাড়ী। ঝেড়ে ঝুড়ে সযত্নে তোলা ছিল প্যাঁটরাতে। পোষাকী নাম ভোম্বলেই ও ছিল গাঁ প্রসিদ্ধ। নেহাৎ কাজ কম্মে বেরোতো শ্যামল নামটা। কলকাতার কলেজে পড়তে এসে আটপৌরে নাম ভোম্বল পড়ে রইলো অবহেলায় একপাশে, পোষাকী নাম 'শ্যামল'এ ঝলমল করতে লাগল গাঁয়ের ভোম্বলদা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল ভোম্বলদার। বুঝলো গাঁয়ের সকলে, এমন কি ভোম্বলদার মাও, ছেলে যখন মাসছয়েক পরে পূজোর ছুটীতে এলো সবন্ধু।

অঙ্গে স্যুট, কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, চোখে গগল্‌স শ্যাম্পু চুল হাওয়ায় উড়ছে ফুরফুর।

ছেলে পুরোপুরি শান্ত ঠাকুরপোর মত হয়ে গেছে দেখে শঙ্করী দেবীর আহ্লাদ দেখে কে। এবাড়ী ওবাড়ী বলে বেড়ান ছেলের সম্বন্ধে কত কথা। ভোম্বলও সহুরে হওয়ার দরুণ যাকে পায় তারই ফটো তোলে। বাল্যসঙ্গিনী ললিতা, সকলেই জানে যিনি হবেন জীবনসঙ্গিনী, ঠোঁট টিপে হেসে বলে—চুলে তেল দাওনি কেন ভোম্বলদা.........

আবার ভোম্বলদা। রাগে ছটফট করে ওঠে ভোম্বল। একেই বলে শিক্ষার মর্য্যাদা। কলেজসঙ্গিনী মীরা, রমার কি ভদ্রতাজ্ঞান। পরিচয় নেই, কিন্তু কি সুন্দর করে আলাপ করলো। মানুষের মর্য্যাদা, সম্মান দিতে জানে ওরা। অশিক্ষিতা ললিতার মতো 'ভোম্বলদা' বলেনা, কেমন সুন্দর করে বলে 'মিঃ পুরকায়েত'।

গম্ভীর স্বরে বলে ভোম্বল—আমাকে শ্যামলদা বলবে এবার থেকে।

—ওমা, চিরদিন তো তোমায় ভোম্বলদাই বলেছি........

—চিরদিন যা বলেছো, আজ তা বলবেনা। যেমন এতদিন তোমায় ভালবেসেছি বলে আজও যে ভালবাসতে হবে তার তো কোনো মানে নেই।

ললিতার চোখের তারাদুটো যেন চমকে উঠলো চরম আঘাতে। ভ্রুয়ে ভাঁজ পড়লো, কঠিন সংযমে দাঁত দিয়ে চেপে ধরলো নীচের ঠোঁটটা। থেমে থেমে বললো—ও:, ভুলে গিয়েছিলাম তুমি আজ সহুরে মানুষ। অনেক রং এখন তোমায় চোখের সামনে।

পরিবর্তন হয়েছে, চরম পরিবর্তন হয়েছে ভোম্বলদার, বোঝে ললিতা। তাই চলে যায় নিঃশব্দে।

শঙ্করী দেবীও দেখেন ছেলের পরিবর্তন। যে ছেলে আধসের চালের ভাত খেতো থাবা থাবা করে, একবাটী পোস্ত বাটার চাক্‌না সহযোগে, সেই ছেলে একপোয়া চালেরও ভাত খেলেনা। চাট্টি পড়ে থাকলো থালায়। বন্ধুদের খাওয়া তো আরও তাজ্জব ব্যাপার। এক ছটাক চালের ভাতও পড়ে থাকলো পাতে। আঙুলের ডগা দিয়ে নাড়লেন চাড়লেন বার কয়েক।

মনটা কেমন যেন খারাপই হয়ে গেল শঙ্করীদেবীর।

হাইস্পিডে উন্নতি হতে লাগলো ভোম্বলদার। তার সঙ্গে খরচা হতে থাকলো টাকাও। বন্ধুরা ভোম্বলদার ট্যাঁক খসিয়ে সিনেমা দেখে; বান্ধবীরা পকেট খালি করে রেঁস্তোরায় খায় আর ট্যাক্সি চেপে বেড়ায়।

একদিন পাশ করে বেরোলও ভোম্বলদা কলেজ হতে। চাকরী পেয়ে যেতে হোল সুদূর গ্রামাঞ্চলের থানায় এস. এ. ও. হয়ে। পরিপার্শ্ব দেখে ছোট্ট দুটি চোখে জল উপচে পড়লো ভোম্বলদার। কোথায় রাজধানী আর সেখান হতে নির্বাসন এই অজ পাড়াগাঁয়ে! যেখানে লোকজন গামছা পরেই এসে হাজির হয় অফিসে, শহরে যেতে হলে ছ' মাইল হাঁটতে হবে এক হাঁটু ধূলোয়, আকন্দ, আশ-শ্যাওড়ার, বাবলা, ছাগলনটের বন চারিধারে। মনটাকে স্থির করার জন্যে টাকার মায়া না করে দুহাতে খরচা করেই যায় শহরে। দিস্তে দিস্তে চিঠি লেখে বন্ধুদের। বন্দুক কিনে মাঝে মাঝে বেড়োয় শিকারে।

মা আকুল হয়ে চিঠির পর চিঠি দিয়েছেন ছেলেকে

একবার বাড়ী আসতে। ভোম্বল এককলমে তার উত্তর দিয়েছে 'ছুটী নেই'।

মায়ের কাছে যেতে ছুটী বা সময় না পেলেও মিস্ তাপ্তী সোমের কাছে যেতে সময় আছে যথেষ্ট ভোম্বলের। যৌবনে মায়ের ব্যাকুল দুটি চোখের চেয়ে ঢের বেশী রোমাঞ্চকর সপ্তদশীর উষ্ণ স্পর্শ। মা যে কেন বোঝেনা, তাই ভাবে 'ভোম্বলদা', এখানে কত বেশী মধুময় তাপ্তী সোমের ভঙ্গির কণ্ঠের মিষ্টি ডাক—মিঃ পুরকায়েৎ.........
ভোম্বলদার মনের যখন এহেন অবস্থা, আশে পাশে সকলে তাকে ডাকছে 'শ্যামল, 'শ্যামলবাবু' 'সাহেব' 'মিঃ পুরকায়েৎ' সে সময় ডাষ্টবিনে ফেলা নামটা 'ভোম্বলদা' করে ডাকলে রাগ হওয়াটা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। সব ব্যাপারটা বুঝে অপরাধ স্বীকার করতে আমার মোটেই লজ্জা হলো না। ভোম্বলদাও 'গ্লাড্' হয়ে গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ঠাকুর চাকর উভয়ই আবদুলকে ডাক দিলেন—আবদুল.........গড়গড়া টা দিয়ে যা..........

এর চেয়ে বিস্ময় বোধহয় আমার জীবনে নেই। তাই অস্ফুটেই টেনে টেনে বলে ফেলেছিলাম—আবার গড়......গ ......ড়া....। সিনিক হাসি হেসে ভোম্বলদা বলেন—কলেজে থাকতে নেশাটা করে ফেলেছি রে। পাইপে পোষায় না...........

তাজ্জব কি বাত। ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করেন আবদুলকে, কটা মুরগী কেটেছিস আজ? সুমন্ত, রমেন, অমিয় আসবে মনে আছে তো? আমার তো চক্ষু চড়কগাছ ততক্ষণে! আমার চোখের সামনে একি সেই গাঁয়ের বোকা ছেলে ভোম্বল, না তা তার কঙ্কাল মিঃ পুরকায়েৎ? আমি পরম হিন্দু সন্তান, আঁৎকে উঠেই বলি—ভো.......না.......না শ্যামলদা, তুমি মুরগী খাও?

—ও অভ্যেসটাও করে ফেলেছি রে— গড়গড়ার নলে জোরসে টান দিয়ে ভোম্বলদা বলে ওঠে—তাপ্তী আচ্ছা জিনিষ খাইয়েছে, মুখ থেকে ছাড়াতে পারিনা। আজকাল এমন হয়েছে মুরগী না হলে জোলো লাগে ভাত খেতে। ....হ্যাঁ, আবদুল! তাপ্তীও আসতে পারে। মুরগীটা 'হাইক্লাস' হওয়া চাই কিন্তু ....

দাড়িতে হাত বুলিয়ে আবদুল তো প্রস্থান করলেন, এখন আমি করি কি! জাতধর্ম সব গেল আমার। একে খোজা আবদুল, তাতে মুরগী। পৈতেটা জোরসে চেপে ধরি। রক্ষা করো হে বিপদ ভঞ্জন। ভোম্বলদার মন তখন চলে গেছে তাপ্তী অভিমুখে। কুঁৎকুঁতে চোখে আবেশ মাখিয়ে বিরহী যক্ষ তখন আউরে চলেছে মেঘদূত। অবশ্য কোন লাইনটাই পূর্ণতার পথে যাত্রা করতে পারছে না। মাঘের শীতের সকালে আওরাচ্ছে ভোম্বলদা—

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে........

ভুলে গেছে তারপরে। চোখ বুঁজে গড়গড়ায় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলে ওঠে—কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুণাঃ—

আবার ভুল। চোখের সামনে ভাসছে মিস্ তাপ্তী চ্যাটার্জী আলুথালু বেশ কেশ, শীর্ণা, ক্লান্তকণ্ঠা বিরহ বিধুরা, প্রতীক্ষারতা। ভোম্বলদার আবৃত্তি আবার শোনা যায়—তন্বী শ্যামা শিখরদর্শনা................

বাইরে মোটর থামলো যেন। আবদুল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দেয়—সাহেব, তাপ্তীদিদি...........

'অ্যাঁ', আঁৎকে উঠে গড়গড়া লুকিয়ে ফেলে খাটের তলায়। শ্যাম্পুচুলে ক্ষিপ্রহস্তে চিরুণী বুলিয়ে নেয়। অভূতপূর্ব পুলকের শিহরণে থরথর কাঁপে দেহ। এযুগেও মনের ডাক তাহলে ঠিক পৌছয় তো। বিরহী যক্ষের এত কাতরতা, এত ব্যাকুলতা হয়তো পৌছে দিয়েছিল বর্ষার মেঘ বিরহিনী প্রিয়ার কাছে। 'চোখের দেখার' আশায় ছটফটিয়ে মরলেও যক্ষপ্রিয়া মিলতে পারেনি প্রিয় সান্নিধ্যে। কারণ বিজ্ঞানের এমন প্রসারতা ছিলনা সেযুগে। আর আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মেঘদূত আওরাতেই বিরহিনী আর ছটফট করেনা বাড়ীতে বসে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের রায় মিলিয়ে দেয় উভয়কে কত শিগ্গীর।

তাপ্তী.......তার মানসী.......স্বর্গে দেখা কন্যা এসেছে অকস্মাৎ তার গৃহাঙ্গনে। দেখতে হয়তো তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন কিভাবে রূপ নেবে.........

—মিঃ পুরকায়েত...............

আবেশে আবেগে বিভোর চোখ অতি সঙ্কোচে তুলে ধরে

মিঃ পুরকায়েত তার করুণাময়ীর স্বপ্নমাখানো চোখের দিকে। দৃষ্টি পিছলে পড়ে সীমন্তে। চমকে ওঠে মিঃ পুরকায়েৎ।

—কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে ফেললাম অমিতাভকে। বিশেষ ব্যাপারে কারোকে খবর দিতে পারিনি। তাই আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আমার বন্ধুদের ডিনার দিতে ইচ্ছে করছি আমি। আপনি নিশ্চয় উপস্থিত থাকবেন মিঃ পুরকায়েৎ।

মিসেস তাপ্তী সেন হাসছে ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে। সইতে পারছেনা শ্যামল পুরকায়েৎ। মন যেন বলে বারবার এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল কালিদাসের যুগ। স্বপ্ন নিয়ে, কল্পনা নিয়ে কাটানো যেতো। রূঢ় বাস্তব এত শিগ্‌গীর এমন কঠিনভাবে আঘাত হানতে পারতো না।

'মিঃ পুরকায়েৎ' অসহ্য, জ্বালা ধরায় সর্বাঙ্গে। এর চেয়ে অনেক ভালো 'ভোম্বলদা'। শান্তির প্রলেপ যেন লাগে দেহে। ভোম্বলদা বুঝলো মায়ের ব্যাকুল চোখের কাছে কোনদিনই লাগেনা তন্বী শ্যামা শিখর দশনায় আবেশিত স্বপ্নমাখা আঁখি। ফিরে এলো ভোম্বলদা মায়ের কাছে।

অপ্রত্যাশিত, অভাবিতরূপে, অতিসাধারণ বেশে ভোম্বলদাকে দেখে ললিতা সবিস্ময়ে বলে ওঠে—ভো........ মানে শ্যামলদা তুমি? আগের দিনের ভোম্বলদা ডাষ্টবিন থেকে ঝেড়ে মুছে উঠে এসেছে। মৃদু হেসে বলে—চিরকাল যা বলে এসেছো, তাই বলে ডাকবে লতা।

কিন্তু তুমি যে........

—ভুল বলেছিলাম সেদিন। মিঃ পুরকায়েৎ ভেবেছিল সমুদ্রতীরে বালুবেলায় রেখে দিতে পদচিহ্ন। বোকা শ্যামল বোঝেনি সাগরের উন্মত্ত ঢেউ তার বুকে রাখতে দেয়না পদচিহ্ন। ভোম্বল কিন্তু বুঝেছে, নরম মাটীর বুকে পদচিহ্ন এ যে অক্ষয়, অমর, অবিনশ্বর! নয় কি?

ফাজিল চাঁদটা হাসছে ফিকফিক করে আকাশের এক কোণে থেকে।—

দোলন চাঁপা

শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত

দোলন চাঁপা ও তুলুনী
আমার কথা শোন্
মিথ্যেরে তোর বাঁকা হাসি
মিথ্যেই দিন গোণ।

তোর ভবনে ভুবন ছাড়া
তোর আকাশে আকাশ কই?
আমিরে তোর বন চামেলী
সেই প্রভাতের মরম সই।

তুই ভুলিলি রঙীন গানে
অংগে এঁকে রূপের রাগ
নবীনতার উড়িয়ে ধ্বজা
ছড়িয়ে দিলি ফাগুন ফাগ।

রূপার মলে ফেললি দূরে
ছিঁড়লি ও সই কানঝাঁপা
দোলন চাঁপা ও তুলুনী
তুইরে আমার কনক চাঁপা!

পথের পারে পথিক আসে
টুকটুকে লাল মুখখানি
লুটিয়ে বুকে পরশ পেলি
একফুলে হায় আধখানি।

নিঙড়ে দিলি রসটুকু সব
ফেরৎ পেলি গোপন দান
বিদ্রোহিনীর চটুল রাগে
আজকে বহাস মিথ্যে বান।

পূব গগনে দিচ্ছে উঁকি
এক ফালি মন সরিয়ে চিক
লজ্জা কিসের যাত্রিণী মোর
ভোর বাতাসের মত্ত পিক

তোর রাগিনী উথলে আনি
ভরিয়ে ফেলুক ধূলির পথ
দৃষ্টি পথে দখিণ হাওয়ায়
ছুটিয়ে দেব আমার রথ।

লাজহারাদের কানের কাছে
শুনিয়ে যাব তোমার গান
কুড়িয়ে পাওয়া এই জীবনের
সৃষ্টিটুকু নয়কো ম্লান।

স্নিগ্ধা

—শ্রীরাঘব দত্ত

পথে নেমেই মনকে বেশ শক্ত করে নিলাম। না,—আর কিছুতেই ছাড়বনা। যেমন করে হোক অন্তত কিছুটা শিখাতেই হবে। প্রফেসর দে ঠিকই বলেছেন,—ওদের শিক্ষার প্রয়োজন আগে।

এই প্রফেসর দে'ই আমার গুরু। বিয়ে করেননি, সংসার পাতেননি। আজীবন ছাত্র, পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকেন। বেশ সুখেই আছেন—অন্তত আমার তাই মনে হয়। তাই কলেজ ঢোকবার কিছু দিন পর যে সব কলেজ-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, বর্তমানে তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে,—বলা যায় না কে কি মতলব নিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যেখানে ছাত্ররা ওই সব মেয়েদের সম্বন্ধে আজগুবি এবং বিচ্ছিরী কথা বলে সেখানেও যাইনে। প্রফেসর দে বলেন, ওদের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

যাক্ ও-সব কথা। কিন্তু শ্যামাকে কি করে খানিকটা শিক্ষিত করে তুলবো এই সমস্যা। বেশ তো হোষ্টেলে ছিলাম। অবশ্য অসুবিধাও কম হত না। রুমের বন্ধুদের কুৎসিত আলোচনায় আরো অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম। কিন্তু ওই শ্যামা যদি এসে না জুটতো তবে মায়ের কোন কথাই শুনতাম না। মা তাকে আনিয়েছেন তার দুর্দশার কথা শুনে, বাড়ীতে আর দরকার নাই বলে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। আরবার শরীরটা বেশ একটু খারাপই হয়েছিল মা দেখে বললেন, হোষ্টেলে আর থাকতে হবে না, শ্যামাকে নিয়ে যা,—সে তোর আর জীবনের রান্নাবান্না করবে আর থাবে। কিন্তু ও ভিজে বেড়াল। মায়ের আদরে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। একটু বকলেই মা বলবেন, বাপ-মা নেই ছেলেটার, একটু যদি অন্যায়ই করেছে, তাতে হয়েছে কি ?

ছেলেটি কি কম বদমায়েস ! পড়তে বসালেই হি-হি করে হাসবে, বলবে, ও আমাদের দ্বারা হবে না ছোটবাবু, মা-বাবা কেউই নেই, লেখা-পড়া শিখে খাওয়াব কাকে ? কেন তুই খাবি। বিয়ে করলে বউ ছেলেদের খাওয়াবি। বাবা ! বিয়ে,—ও দরকার নেই বেশ আছি, আর আপনার কাছেই বেশ থাকবো।

কোনদিন চেপে বসালেই বলবে, ভাত হয়ে গেল, মশলাটা বেটে নি, নইলে দমটা হবে না। বলে ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু অদ্ভূত ভীতু। রাতে শত প্রয়োজনেও একা বার হবে না। সন্ধ্যে হলেই দরজাটাকে বন্ধ করে দেবে, কেউ এলেও বাইরে আসবে না, ঘর থেকে কথা বলবে।

যাক্ তিন ডাকেই শ্যামা দরজাটা খুলে রান্না ঘরে ঢুকলো; ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি নামানোর শব্দ পেলাম, বুঝলাম রান্নাটা শেষ হয়েছে। জোরেই ডাকলাম, শ্যা—মা—

ছুটে এসেই শ্যামা ঢোক গিলে বললে, ভুলে গিয়েছিলাম বাবু, স্নিগ্ধা দেবী এসেছিলেন, বলে গেছেন—তোর প্রণবদাকে বলবি, আমি দিল্লী থেকে কাল ফিরেছি।

স্নিগ্ধা দেবী ? আমি অবাক হয়ে যাই। সে আবার কে ?

শ্যামা বললে, কোথায় থাকেন বাবু তিনি !

আমি একেবারে চুপ। এ কী আপদ এসে জুটলো। চেনা-শোনা নেই, হঠাৎ জানিয়ে গেল তিনি দিল্লী থেকে ফিরেছেন. তাতে আমার কি ?

শ্যামা আবার বললে, কালকে সকালেই তবে জল-খাবারটা করতে হবে।

আমি বিস্ময়ে বলি, কেন ?

আপনি যদি দেখা করতে যান।

কার সঙ্গে ?

চালাকি হচ্ছে বুঝি ছোটবাবু। আমি কিছু জানিনে বুঝিনে, না ?

সব চুরমার হয়ে গেল। সর্বনাশ। ছেলেটা বলে কি ? রাগ হলো ওই স্নিগ্ধার ওপর। আচ্ছা মেয়েতো !

ভোরের আলো

ছোট বন্ধুরা !

বিগত দুমাস থেকে তোমাদের সংগে প্রাণখুলে কথা বলা হয়নি। এতে আমার মত তোমরাও নিশ্চয়ই দুঃখিত। বিগত দুমাস তোমাদেরও কঠিন তপস্যার মধ্য দিয়ে কেটেছে। পরীক্ষা বৈতরণী পার হবার জন্য। এখনও অনেকের পরীক্ষা শেষও হয়নি। আমরা তোমাদের সর্বাংগীন কুশল কামনা করবো। সাধনার ক্ষেত্রে—তপস্যায় তোমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে। বরেণ্য হবে। দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমাদের কিশলয় জীবনের মধ্যেই মহাসম্ভাবনার বীজ আছে। তাকে লালিত করার দায়িত্ব তোমাদের মাতাপিতাদের মত আমাদেরও আছে। সেজন্যই আমাদের এই শুভেচ্ছাবাণী। চলমান বৎসরের জীর্ণপাতা আজ খসে পড়তে চলেছে। চৈত্র শেষ হয় হয়। বৈশাখের আগমনী শোনা যায় দিকে দিকে। নব কিশলয়ে নব পত্রোদ্গমের ভিতর। বনভূমি—নতুন কুসুমে সমাচ্ছাদিত। সায়াহ্ন সন্ধ্যায় মলয় সমীরণে, বিহংগের কলকাকলিতে—স্রোতস্বিনীর গীত মূর্চ্ছনায়—মানুষের মুখাবয়বে। বসন্তযামিনীর কলহাসিনী জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীতে—আজ কার যেন পদধ্বনি শুনি।" এ পদধ্বনি নূতনের।

দুয়ারে দিল আসি ডাক—নব বৈশাখ।

—সারথি ভাই।

আমার ভ্রমণ কাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুমারী প্রার্থনা পাল

আমাদের অপর সঙ্গীরা যাহারা অম্বাজী মন্দির দেখিতে যান নাই তাঁহারা দিলোয়াড়া মন্দির দেখিতে চলিয়া গিয়াছেন শুনিলাম। যা হোক আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া উক্ত মন্দির যাইবার জন্য একটি বাসে গিয়া উঠি। কিন্তু উক্ত বাসে পূর্ব থেকে আসন সংরক্ষিত না থাকিলে বসিবার জায়গা না পাওয়ায় আমরা পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু পরের বাস ছাড়িতে অনেক বেলা হইত। সেই জন্য আমরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া যাত্রা করি। চমৎকার পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা পাহাড়টাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় ১৮ মাইল রাস্তা দেড় ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের উপরে দিলোয়াড়া মন্দিরের নিকট পৌঁছিলাম। এত সুন্দর নিখুঁত কারুকার্য্য শোভিত ভগবান বুদ্ধের জীবনী পাথরের ভিতর আঁকা, এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম পাথরের কারুকার্য্য দেওয়ালের চতুর্দিকে এবং শিলিংএর মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। তাহার বর্ণনা চোখে না দেখিলে বোঝানো যায় না! এই মন্দির প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে জৈনদের সর্ব্ব প্রথম প্রধান ব্যক্তির দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। ইহার পর কন্যাকুমারী চামুণ্ডা দেখিলাম। একটি সুন্দর হ্রদ দেখিলাম। আমরা উক্ত পাহাড়ের প্রায় চার হাজার ফুট উপরে অবস্থিত সূর্য্যাস্ত দৃশ্য দেখিলাম। এইখানে পাহাড়ের গা কাটিয়া কতকগুলি পাথরের বেঞ্চ আছে। এইখানে বসিয়া সূর্য্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া নয়ন ভরিয়া যায়। বাবা আমার জন্য একটি ঘোড়া ভাড়া করিলে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বেশ খানিকক্ষণ বেড়াইলাম। পুনরায় ট্যাক্সি করিয়া পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া ষ্টেশনে ফিরি এবং ঐ রাত্রেই উদয়পুর যাত্রা করিলাম। পরদিন আমরা বেলা ১১টায় উদয়পুর পৌঁছি। খাওয়া দাওয়া সারিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমে রাণাদের পুরাতন প্রাসাদ দেখি। এখানে রাণাদের সুসজ্জিত হাতী দেখিলাম। এবং গাইড সঙ্গে লইয়া পুরাতন প্রাসাদটি ঘুরিয়া দেখি। তারপর একটি হ্রদে অবস্থিত নূতন রাজ-প্রাসাদ নৌকাযোগে দেখিতে যাই। সুন্দর আসবাব পত্রে সুসজ্জিত ঘরগুলি দেখিতে ভাল লাগিল। চারিদিকে জল, মধ্যস্থলে নূতন প্রাসাদটির অপূর্ব শোভা। ইহার পর আমরা শহরের সবচেয়ে বড় জগন্নাথের মন্দির দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি এবং ঐদিন রাত্রে আমাদের গাড়ী চিতোরগড় অভিমুখে যাত্রা করিয়া পরদিন চিতোরগড় পৌঁছিলাম। ষ্টেশন থেকে চিতোরগড় দুর্গটি লম্বা পাহাড়ের মত দেখাইতেছিল। তারপর আমরা টাঙ্গায় চড়িয়া দুর্গ দেখিতে যাই। এই কেল্লাটি চতুর্দিক সুদৃঢ় পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। উপরে উঠিয়া রাজপুতদের প্রাচীন কীর্ত্তি এবং স্মৃতি বিজড়িত ধ্বংসস্তূপ দেখিলাম। মীরাবাঈ মন্দির এবং যে ঘর হইতে সম্রাট আলাউদ্দিন খিড়কীর দুয়ারে পদ্মিনীকে দেখিয়াছিলেন এবং বহু পুরাতন বৃহদাকার কামান গোলাগুলি এবং রাজপুত বীরাঙ্গনাদের জহর ব্রত স্থানগুলি দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি এবং ঐদিন রাত্রে আমাদের গাড়ী আজমীঢ় অভিমুখে যাত্রা করিল। পরদিন আজমীঢ় পৌঁছিয়া আমরা সকালে ৬মাইল দূরে অবস্থিত সাবিত্রী পাহাড় দেখিতে যাই। ভ্যান থেকে নামিয়া আমাদের মেয়েদের জন্য ডুলি ঠিক করা হইল। বাবা জেঠারা হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিলেন। প্রথমে বেশ খানিকটা রাস্তা বালি ভর্ত্তি। পাহাড়ের উপর উঠিয়া মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি দেখি এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নামিয়া আসি। পাহাড়ের উপর হইতে নামিবার পূর্ব মুহূর্তে বেশ তৃপ্তি সহকারে জলযোগ সারিয়া লই। ভ্যানের কাছে অবস্থিত অনেকগুলি সুন্দর মন্দির দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিবার পথে পুষ্কর তীর্থে স্নান সারিলাম এবং স্বর্ণমন্দির জৈন মন্দির, একটি বড় মসজিদ দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরি। ঐরাত্রে আমাদের গাড়ী জয়পুর যাত্রা করিল। পরদিন জয়পুরে পৌঁছিয়া বৃন্দাবনের আদি বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোবিন্দজী ও যশোরেশ্বরী কালীমাতা দেখিলাম। ইহার যাদুঘর, চিড়িয়াখানা

॥ ভাদ্র ॥

শ্রীশরৎ দত্ত

জলহারা লঘু মেঘের মিছিলে স্রোতের টান,
রাশি রাশি ঢেউ নীল সাগরেতে ডেকেছে বান।
ভাদ্রের রোদ জলে আর নেভে দিনের কূলে,
দুর্বার বেগে খরবায়ু বয় তুফান তুলে।

নদী খাল বিলে একটানা বাজে ঐক্যতান,
নতুন দিনের আশ্বাসে জাগে মাটির প্রাণ।
হংস বলাকা ঝাঁক বেঁধে ওড়ে কাশের বনে,
শাপলা শালুক চোখ মেলে চায় দীঘির কোলে।

বিকেল ঘনায় সোনার ছটায় ঝিলের জলে,
ভাদ্রের গান গায় ধান ক্ষেত সোহাগে গ'লে।
রঙিন আকাশে আবার কখন সন্ধ্যা আসে,
নিবিড় রাতের শিউলি ফুলের গন্ধ ভাসে।

তারার আলোয় ছায়াপথ কাঁপে অনুক্ষণ,
ভাদ্রের গাঢ় প্রেম ছুঁয়ে যায় হৃদয় মন।

●

বসন্তে

শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল

কোকিল কালো বসলো ডালে
ডাকছে সদাই তালে তালে।
কোথায় ছিলে ভয়ে শীতে,
বসন্তে এলে দেখা দিতে?
আমের মুকুল শাখে শাখে
মধুর লোভে লাখে লাখে
আসছে যত মৌমাছিরা
মধুর লোভে দিশা হারা।
দখিনের ঐ মধুর হাওয়া
বসন্ত আজ করলো ধাওয়া
গানের সুরে ভরলো কানন
খুসিতে তাই সবার আনন।

●

আমার ভ্রমণ কাহিনী

এবং সুদৃশ্য সহরটি চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম; এবং ঐদিন রাত্রে গাড়ী আগ্রা অভিমুখে চলিল। আগ্রায় দুইদিন ছিলাম। এখানে যমুনায় স্নান ও দয়ালবাগে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম মন্দির, শ্রীশ্রীকালীমাতা দর্শন ও সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ভুবন বিখ্যাত তাজমহল, দুর্গ, মন্ত্রী ইৎমৎদুল্লার অপূর্ব্ব সমাধি ও ভিক্টোরিয়া গার্ডেন দেখিলাম। পরদিন ট্যাক্সি চড়িয়া ফতেপুর সিক্রী দেখিতে যাই এবং ঐদিন রাত্রে এলাহাবাদ যাত্রা করি। পরদিন এলাহাবাদ পৌঁছিয়া এখানে শ্রীশ্রীদেবী ললিতা ও শ্রীশ্রীবেণীমাধব, অক্ষয়বট, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম দেখিয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিসংগমে নৌকায় করিয়া গিয়া স্নান সারিয়া ষ্টেশনে ফিরি। ঐদিন রাত্রে গাড়ী ছাড়িয়া হাওড়া অভিমুখে চলিল। পরদিন প্রাতে বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমরা অন্যান্য সহযাত্রীর সহিত পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ আদান প্রদান সারিয়া লই। পরে বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সহযাত্রীদের আর নাগালের মধ্যে পাইলাম না। কারণ যে যার আত্মীয় স্বজনকে অনেকদিন বাদে পাইয়া আনন্দে ব্যস্ত। আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে দাদু, দাদা এবং ছোটমামা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এত স্মৃতির ভিতর আমার আবু পাহাড়ে ঘোড়ায় চড়া স্মৃতিটা বেশ ভালভাবে এখনও আমার মনে পড়ে এবং ভবিষ্যতে মনে থাকিবে।

●●

রুমা

শ্রীসনৎ কুমার মুখার্জী

সন্ধ্যে প্রায় হ'য়ে এলো। মনটা আজ ভাল না থাকায় বাড়ীতেই আছি। সামনের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে অতীতের কোন স্মরণীয় ঘটনার কথা ভাববার চেষ্টা করছি। কেননা তাতে আর কিছু না হোক কিছুটা মনের পরিবর্ত্তন হবে। তাই এই জোর করে কিছু ভাবতে বসা।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখের সামনে যেন কার আবছা ছায়া দেখলাম। প্রথমে ছায়াটা দেখে চমকে উঠলেও বুঝতে বেশী দেরী হল না—কার এ ছায়া। দেখলাম একজোড়া করুণ চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—আমায় ক্ষমা করতে পারছনা রুমা? মনে হ'ল রুমা যেন আমায় বলছে, তোমার বিবেককে একবার সে কথা জিজ্ঞেস করনা। আমি বললাম, রুমা! সে কাজটা আমি আগেই সেরে নিয়েছি। প্রশ্ন এলো, কি বলে তোমার বিবেক? বললাম তোমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী নও তার জন্য দায়ী আমি নিজে। ক্ষণিকের উত্তেজনায় আমি সেদিন যে কাজ করে ফেলেছি আজ তুমি তার বিচার কর রুমা! রুমা হেসে উঠলো, পরে করুণভাবে, বলল বিচার? বিচারের অধিকার তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো যে। ভাবছো, কেমন ক'রে তা সম্ভব—না? তবে শোন; তোমাকে ভালবাসার অধিকার দিয়ে আমার সে অধিকার তুমি কেড়ে নিয়েছো। যাকে একদিন মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, আজ সেব তার বিচার করতে? না, না, সে আমি পারব না। বললাম তবে তুমি বার বার আমাকে ভয় দেখাতে কেন আস? বলতে পার তাছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সে শান্তভাবে বলল মাঝে মাঝে তোমায় বড় দেখতে ইচ্ছে করে, তাই এক একবার তোমায় দেখে যাই। এতদিন পাশাপাশি ছিলাম, আজ না হয় দূরে চলে এসেছি। তুমি আমায় ভুলে যেতে পার কিন্তু আমি তোমায় কেমন করে ভুলব? রুমে চলে গেল, যাবার সময় সে কেবল বলে গেল, "বেশ, আমার আসাতে তুমি যদি বিরক্ত হও বা ভয় পাও তাহ'লে আর আসব না। আমায় ক্ষমা কর। আমি চীৎকার করে উঠলাম রুমা! রুমা!

কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম জানিনা, হঠাৎ পাশ থেকে নিলাদ্রীর গলা শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। ডাকছে আমায়। কি ব্যাপার বলতো বীরু? অমন "রুমা রুমা" বলে চীৎকার করছিলি কেন? নিলাদ্রী জানতে চাইলো কে এই রুমা! আমি তাড়াতাড়ি খাটের উপর থেকে নেমে পড়ে তাকে বললাম, সে অনেক কথা ভাই, এখন সে সব কথা থাক। তার চেয়ে বরং চল গঙ্গার ধারটা একটু ঘুরে আসি। নিলাদ্রী আর কোনি প্রশ্ন না করে আমাকে অনুসরণ করলো। পথে আর কোন কথা হলো না। গঙ্গার তীরে এসে একটা উঁচু জায়গায় পাশাপাশি বসে পড়লাম। তারপর গঙ্গায় বয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট পানসীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম আমার অতীত দিনের ছোট্ট এক ঘটনার কথা।

প্রায় মাস আষ্টেক হল আমাদের বাড়ীতে এসেছে এক নতুন অতিথি। এক হারা চেহারা, দেখতে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি হবে না, তবে ভীষণ ছটফটে যেন পাহাড়ী ঝরণা, নাম তার রুমা। প্রথম আলাপেই তাকে আমার ভাল লেগে গেল, রুমাও আমাকে ভালবাসলো। সেই ভালবাসা আমাদের কখনো একজনকে আর একজনের কাছ ছাড়া করতে দেয়নি, ভাবতে দেয়নি যে আমরা পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের এই ভালবাসা কারও অগোচর রইলো না। কেউ কেউ আমাদের ভালবাসা সুনজরে দেখেনি বরং হিংসেই করেছে, মাঝে মাঝে দিয়েছে বাধা।

জানি মানুষের জীবনে সুখ কখনও স্থায়ী আসন পেতে পারেনা, দুঃখও আসে। হঠাৎ দেখা দিল এক অঘটন—যার পরিণতি আমার রুমার মৃত্যু। যদিও ঐ ঘটনার শেষ পরিণতি ঘটেছিল আমারই হাতে, তবুও প্রথমে আমি এ কথাটা বুঝতে পারিনি যে কেন এ ঘটনা ঘটলো আর কেনই বা আমি তাকে চিরতরে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু

সে সময় এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার সদ্য বিবাহিত মেজ জামাইবাবু রুমার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, আর তাই দেখে মেজদি ভয়ে পরিত্রাহী চীৎকার করতে লেগেছে। আমি তখন দোতলায় বসে পরিষ্কার করা বন্দুকটায় তাজা কার্ত্তুজ ভরতে ব্যস্ত। এমন সময় কানে এলো মেজদির বিশ্রী রকমের চীৎকার, সঙ্গে সঙ্গে লোড করা বন্দুকটা নিয়েই ছুটলাম। নীচে গিয়ে দেখলাম রুমা মেজ জামাইবাবুর কাঁধে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে আর সেখান থেকে অজস্র রক্ত ঝরছে। তখন কোনো হুঁস ছিল না আমার। বন্দুকটা তুলে নিয়ে দুবার ট্রিগার টার ওপর চাপ দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ধোঁয়া আর আগুন বার করে হাতের বন্দুকটা গর্জ্জে উঠলো। সামনে দেখলাম রুমার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, যাবার আগে শেষ বারের মত সে একবার আমার দিকে তাকাল, যেন বলতে চাইলো একি করলে? তারপর? পরের ঘটনা আর নাইবা শুনলি নিলাদ্রী। তবে পরে জেনে ছিলাম যে মেজজামাইবাবুর কোন বেয়াড়া রসিকতার প্রতিবাদ করায় ঐ ঘটনা ঘটেছিল যার পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়েছিল রুমা তার তাজা রক্ত দিয়ে। সেই ঘটনার পর থেকে প্রায়ই আমি যখন একা থাকি তখনই মনে হয় কে যেন এসেছে। আজও বাড়ীতে একা বসেছিলাম। সেও আমার কাছে এসেছিল। তাই আমার চীৎকার তুই শুনতে পেয়েছিলি।

আমার কথা একমনে শুনছিল নিলাদ্রি—হঠাৎ প্রশ্ন করলো, "বীরু, তোর মেজ জামাইবাবু তাহলে—?" আমি হেসে বললাম "না, না, তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন। সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন মাত্র রুমা তাঁর বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, তবে কয়েকটা ইন্‌জেকসান তাঁকে নিতে হয়েছিল। নিলাদ্রী আবার প্রশ্ন করলো আচ্ছা বীরু, এই 'রুমা' কে? কোথা থেকে এসেছিল সে? কি তার পরিচয় তা তো কৈ বললি না, কিছু বুঝতেও পারলাম না, আমি তার কথায় হেসে ফেললাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, আমার রুমাকে তুই জানিস না? তবে শোন ছোটকাকার মাধ্যমে আমাদের দুজনের আলাপ। ছোট কাকার সঙ্গেই সে এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। সে ছিল আমার বড় আদরের কুকুর।

●●

জাতীয় সংবাদ (৬৬ পৃষ্ঠার পর)

বন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে জীবনের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

স্বজাতীয় ছাত্রের সাফল্য

শ্রীমান কল্যাণ দত্ত

শ্রীমান কল্যান দত্ত বিগত উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বৎসরে ১৫৲ টাকার D.P.I. Scholarship লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইদানীংকালে আমাদের সমাজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীমানের এই কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমাদের সমাজ যে শিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রসর শ্রীমান কল্যান তার দৃষ্টান্তস্থল। গত ১৯৭০ সালের ১লা জুন হতে তার এই বৃত্তি ৩ বৎসরের জন্য কার্য্যকরী থাকবে। শ্রীমান কল্যাণ অতিবাল্যকাল হতে মেধাবী ছাত্র এবং তিনি রাণী ভবানী স্কুলের ছাত্র হিসাবে বিগত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। শ্রীমান দত্ত বর্ত্তমানে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র। গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির বিগত শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ উপলক্ষে হরিশঙ্কর পাল স্মারক রৌপ্য পদকে তাকে ভূষিত করা হয় এবং তিনি ২০ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিকরূপে লাভ করেন। শ্রীমান কল্যাণ ১৩নং বালকদত্ত লেন নিবাসী শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের পুত্র। আমরা শ্রীমান কল্যাণের আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করছি।

নতুন ধাঁধা
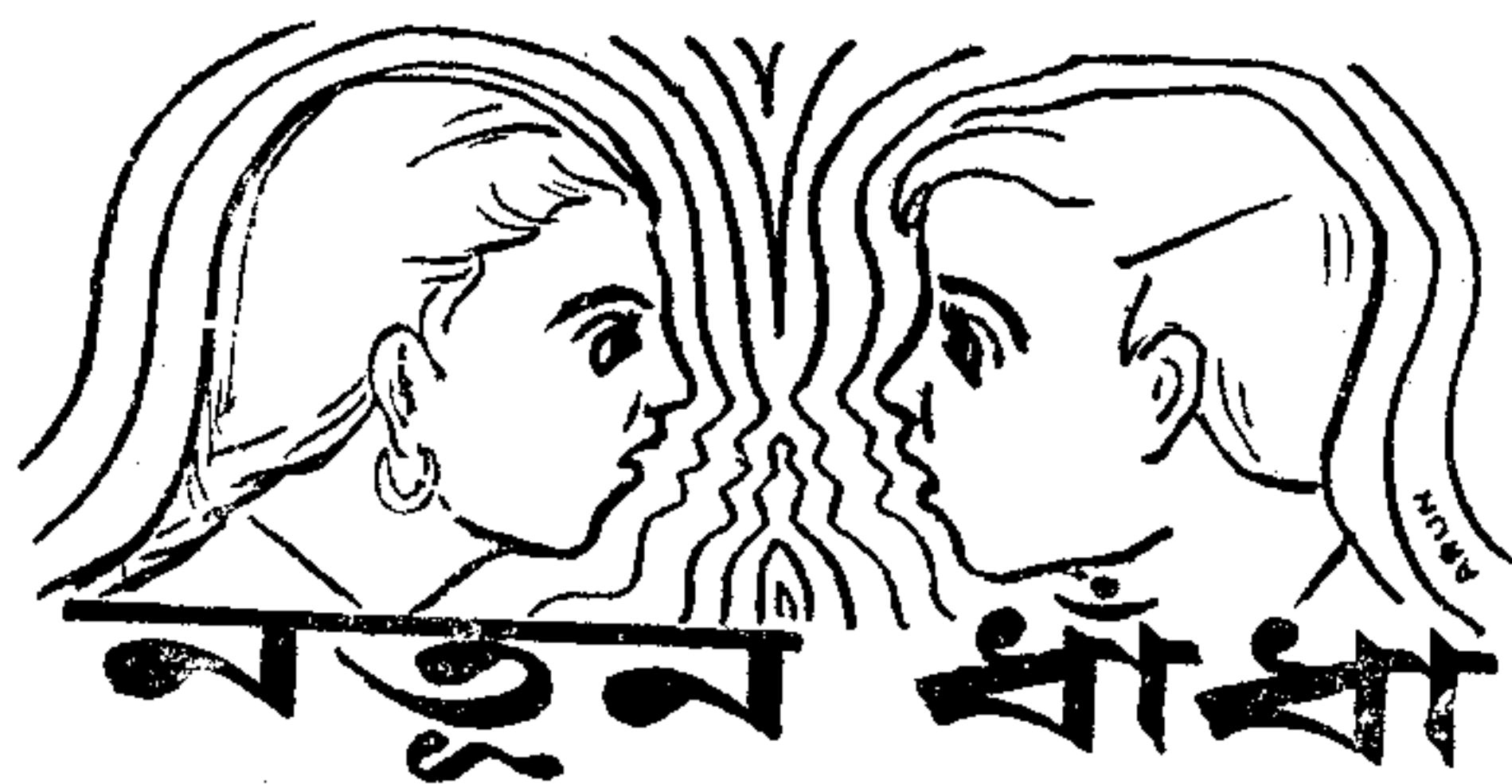
লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, নলিয়াপুর, বর্দ্ধমান।

১। অক্লান্ত কর্মী দরদী ও গুণী
জন্ম তাঁর বৈশ্য কুলে
তাঁর নামটিতে পাঁচ বর্ণ জুটে
রহিয়াছে যেন মিলে।
প্রথম দু'টিতে বারো বছরেতে
হইবে দেখিও সম।
চতুর্থ পঞ্চমে পাবে ভগবানে
উপাধিতে চারি বর্ণ।
সে চারের আধে দেখগো পাইবে
যন্ত্র কোনও নৌকার।
প্রথম চতুর্থে জুড়িয়ে গলেতে
পরিলে চমৎকার।
তৃতীয় অক্ষরে লোহার যন্ত্রে
দেখগো যাইবে মিলিয়া।
কেবা এই গুণী? বল দেখি শুনি
খোকাখুকি সবে ভাবিয়া।

২। জন্ম বৈশ্যকুলে সুলেখক বলে
খ্যাতি আছে চরাচরে।
না ধরে উপাধি তাঁহার নামটি
গঠিত সপ্ত অক্ষরে।
প্রথমের তিনে মিলে যাঁর নামে,
সগর কুলে সে জাত;
প্রভু শ্রীরামের শুভ জনমের
বহু আগে তাঁর রাজত্ব।
শেষ চারি বর্ণে পাবে সে মহানে
জগতের পতি তিনি।
ধাঁধার উত্তর বলতো সত্বর
কেবা পার আজ শুনি।

৩। উৎকৃষ্ট বাগ্মী, দরদী ও গুণী,
বৈশ্য কুলে তাঁর জন্ম।
রচিতেছি ধাঁধা বল দেখি দাদা
নামে তাঁর পাচ বর্ণ।
প্রথমের তিনে গোরক্ষকগণে,
শেষ দুয়ে উপগ্রহ।
দ্বিতীয় তৃতীয়ে জল কাদা রহে।
উপাধিটা শুনে লহ;
উপাধিতে দু'টি বর্ণ রহে জুটি'
তাহে বিষধর জন্তু।
বল বল সবে নামটি কি হবে,
বিলম্ব ক'রোনা কিন্তু।

৪। প্রসিদ্ধ লেখক, নামটি থাকুক বলবো না
ছদ্মনামেই ক'রবো আমি ধাঁধাঁটিকে রচনা
বলছি ধাঁধা সবাই শোন
ছদ্ম নামেই চারিটি বর্ণ।
প্রথমার্ধে হবে যাহা, শেষ দুটি তার বুকে
জনম নিয়ে বিলায় সুধা প্রাণের প্রেমিকে।
প্রথমে আর শেষেরটিতে
খেলবে সবাই পদাঘাতে।
চতুর্থ, প্রথম, দ্বিতীয়কে
যথাক্রমেই সাজিয়ে রেখে
পাবে গো এমন দ্রব্যটিকে
যাহার গুণে সব ব্যঞ্জনে হয় গো মধুর।
বল দেখি খোকা খুকি এ ধাঁধার উত্তর।

জাতীয় সংবাদ

পৌর নির্ব্বাচনে স্বজাতীয় প্রতিনিধির সাফল্য

আমাদের এই সমাজে ধনবান ও বিত্তবান ব্যক্তির সংখ্যা আজও নগণ্য নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ধন ও অর্থ অহমিকায় দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কঠিন। সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি ব্যবস্থায় প্রবেশ অধিকার না পেলে অর্থ দর্পের কোন মূল্যই থাকে না। রাষ্ট্র চেতনায় আমাদের সমাজ এখনও পশ্চাদপদ। বাংলা দেশের বিগত নির্বাচনের খতিয়ান দেখলে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। অথচ রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ অধিকার অর্জ্জন করলে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ ত করা যায়ই—নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের অনেক কল্যাণ করা যায়। দুঃখের বিষয় এই ক্ষেত্রে আমরা আজও অনেক পিছিয়ে আছি—একথা স্বীকার করতে কোনও কুণ্ঠা নেই। সুখের কথা বিগত কলিকাতা এবং উপকণ্ঠ নগরীর পৌর নির্ব্বাচনে দুজন স্বজাতীয়ের সাফল্যে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ

কলিকাতার বিগত করপোরেশন নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ ৩০নং কেন্দ্র হতে বিপুল ভোটাধিক্যে ইউ-সি-সি প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেছেন। এ বৎসরের জয়লাভের ফলে শ্রীযুক্ত দাঁ পরপর তিনবার জয়লাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করলেন। ইহা অতীব সুখের কথা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত দাঁ কলিকাতার জনপ্রিয় নেতা। তরুণ বয়সেই তিনি সমাজসেবা ও দেশসেবায় যে নিষ্ঠা এবং আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বিশেষভাবে অনুকরণীয়। তিনি একজন এ্যাডভোকেট এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় নীলমণি দাঁ গন্ধবণিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর এই জয়লাভে আমরা তাঁকে সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। জীবনের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত হোন আমরা এই কল্যাণ কামনা করছি।

এই কেন্দ্র হতেই কলিকাতা করপোরেশনের বিশ্রুত-কীর্তি স্বর্গীয় ডাঃ হরিধন দত্ত, রায়বাহাদুর মহাশয় একাদিক্রমে ৩০ বৎসর কাল অপরাজেয় হয়ে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই কনক উষায় কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর মহাশয় একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তিনি এই করপোরেশনের প্রথম Executive Officer এবং Last Chairman হওয়ার কৃতিত্বও অর্জ্জন করেছিলেন। বরেণবাবু সেই ঐতিহাসিক কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিও রায় বাহাদুরের মত সম্মানগৌরবের অধিকারী হোন—এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীমতিলাল দাঁ

বরাহনগর পৌর নির্ব্বাচনে ১নং ওয়ার্ড হতে শ্রীযুক্ত মতিলাল দাঁ মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে বিপুল ভোটাধিক্যে একজন কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মতিলালবাবুর ইহাই প্রথম নির্বাচন। তিনি স্বতন্ত্র পার্টির পক্ষে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন এবং প্রথমবারেই উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেন। তিনি বরানগর ডাচ কুটীরের স্বর্গীয় হরিধন দাঁ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। স্বর্গীয় হরিধন দাঁ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম গন্ধবণিকদের মধ্যে বিলাতযাত্রী হন এবং আমাদের সমুদ্রযাত্রার শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ইহা সেকালের কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। কলিকাতার প্রবীনদের মুখে একথা আজও শোনা যায়। শ্রীযুক্ত মতিলালবাবু "জহরলাল পান্নালাল" প্রতিষ্ঠানের একজন ডাইরেক্টর ও অংশীদার। তিনি যে দেশ ও সমাজসেবায় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন এই বর্ত্তমান নির্ব্বাচন তারই নির্দ্দেশক। আমরা এই নবীন আদর্শদীপ্ত সমাজসেবীকে সাদর অভি-
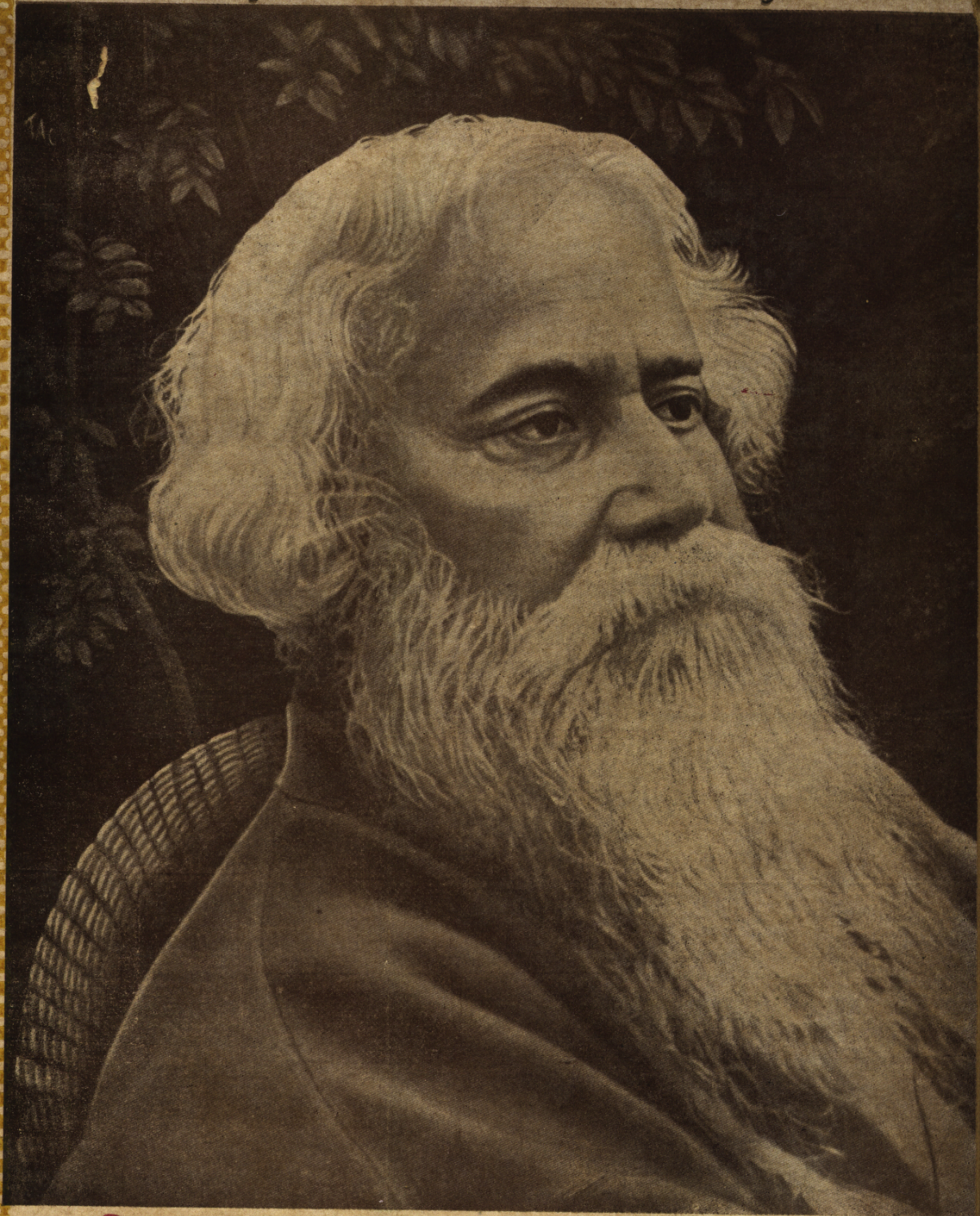
(৬৪ পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

রবীন্দ্র শতাব্দ সংখ্যা

১৩৬৮

গন্ধবণিক

রবীন্দ্র শতাব্দ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৬৮

সূচীপত্র

সম্পাদকদ্বয়

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু ঃ ঃ শ্রীহারাধন দত্ত

সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ

রবীন্দ্র শতাব্দ সংখ্যা, গন্ধবণিক' প্রকাশিত হোল। এ প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবের চিত্ত মথিত করে যে উদ্দাম আনন্দলীলা কর্ষিত চিত্ত মানুষ মাত্রকেই নিবিষ্ট মগ্ন ও বিলসিত করেছে—এর জন্মলগ্ন সেখানেই। সকলের মতই "গন্ধবণিক পত্র পাবলিশিং সোসাইটি"ও এই শ্রদ্ধার্ঘ্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছে। জানি আমাদের সামর্থ কম - রাজসিকতা প্রকাশের প্রাচুর্য নেই—সেজন্য আমাদের এ শ্রদ্ধা উপহার অতি সহজ ও অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিকতায় এবং গভীরতায় আমরা ছোট নই—এমন কি সেখানে আমরা অতলস্পর্শী। এই ক্ষুদ্র স্মারক সংখ্যাখানিতে আমরা মহাকবির শততম জন্ম জয়ন্তীতে আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। অতি তরুণ লেখক লেখিকাদের সংগে বাংলাদেশের কতিপয় খ্যাতিমান লেখকদের রচনা এখানে শোভিত হয়েছে। কোন কোন লেখক বিগত শতাব্দীর--এখন আর ইহলোকে নেই। তাঁদের রচনা স্বভাবতই একালে দুষ্প্রাপ্য মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সেরূপ রচনার গুরুত্বও কম নয় এই সংঙ্গে আধুনিক লেখক লেখিকাদের রচনাগুলিও পঠিতব্য। আমাদের এই শ্রদ্ধা উপহার সংখ্যায় রবীন্দ্র কবিজীবনের পূর্ণাংগ পরিচয় না হোক—সে প্রতিভার বিরাটত্ব ও সার্বভৌমত্বের আস্বাদ পাওয়া যাবে। এইটই আমাদের মূল বক্তব্য। অতি অল্প সময়ে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এই সংখ্যার মুদ্রণ সমাপ্তি ঘটাতে হয়েছে। সেজন্য মুদ্রণ প্রমাদ একেবারে দুর্লভ নয়। তৎসত্বেও এইরূপ দ্রুত মুদ্রণ কার্যের জন্য—মুদ্রণ কার্যের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সাধন ধন নাগ এবং প্রেসের প্রবীণ কর্মী শ্রীঅজিত কুমার রায়চৌধুরীকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। বাংলাদেশের যে সকল বরেণ্য কবি-সাহিত্যিক আমাদের রচনাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন- শতাব্দীর এই শুভ মুহূর্তে তাঁদের প্রত্যেককেই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি—বিশেষ করে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটকের মূল্যবান উপদেশের জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সম্পাদনা ব্যাপারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীচন্দ্রনাথ পাল। তিনি আমাদের সম্পাদনা বিভাগেরই একজন—তবু তাঁর নাম উল্লেখ করতে হোল। আমাদের সীমাবদ্ধ পরিসরের জন্য রবীন্দ্র বিষয়ক সকল রচনা এখানে গ্রথিত করা গেল না এজন্য দুঃখিত। আর সকল কৈফিয়ৎ এই স্মারক সংখ্যাখানির মধ্যেই রইল। আমাদের পাঠক সেগুলি বিচার করবেন। অলমঅতিবিস্তরেণ।

অন্যতর —সম্পাদক,

শ্রীহারাধন দত্ত

ভ্রম সংশোধন : ৯২ পৃষ্ঠায়, শ্রীহারাধন দত্ত লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সাহিত্যে" শিরোনামটি, 'সাহিত্যে' স্থলে 'সাহিত্য' পড়তে হ'বে।

গন্ধবণিক মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা	বৈশাখ
৪র্থ সংখ্যা	নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	১৩৬৮

প্র-ণা-ম

রবীন্দ্রনাথ, এই নাম অধুনা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শোনা যাচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ বললে বোধ হয় ভুল হ'বে—সমগ্র বিশ্বময় তাঁর স্মৃতিও স্মরণ উৎসবের আয়োজন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এই প্রকার ব্যাপক রবীন্দ্র-উৎসবের একটা তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ শতায়ু হতে পারেননি কিন্তু এই বৎসরে রবীন্দ্রজীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। ইতিহাস অনেক মহৎজীবনকেই শতবর্ষের সীমা রেখা পার করিয়েছে—কিন্তু এমন সৌভাগ্য সকলেই লাভ করেননি। রবীন্দ্রনাথ সেই সৌভাগ্যকে অর্জন করেছেন। এবং তার দ্বারা কেবল বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ কেন সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশকে মহনীয় করেছেন। আমাদের দিক থেকে আর ও শ্লাঘার কথা এই—রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন আর এই চিরশ্যামল বাংলার মাটি জল বায়ু ও আলোকে তার ব্যক্তি পুরুষের বিকাশ ঘটেছে। সাহিত্যেই মূলত তার আত্মস্ফূর্তি তবুও জীবন ও জগতের বহু বিচিত্রের মধ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ সার্বভৌম কবি। আবার একটা মহাদেশের শতাব্দীর অধিনায়ক। একটা যুগের জন্ম সম্ভাবনার অসীমশক্তি এই একটি মাত্র কবি হৃদয়েই মূর্ত হয়েছিল—সে হৃদয় আদিত্য হৃদয়। আমাদের পৃথিবীতে শতবর্ষে ও কদাচিৎ কখনও বা এমন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেই জীবনের খুটিনাটি আপনারা আমরা অনেকেই জানি—সুতরাং যে আলোচনার অপ্রয়োজনীয়তাকে আমি স্বীকার করি—কিন্তু আজকের বিশ্বজুড়ে সেই একটি পুরুষকে নিয়ে যে ভাবনার উদ্রেক হয়েছে সেই ভাবনার সংক্রামকতা হ'তে আমারাও যে রক্ষা পাইনি—এই লেখাই তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ এই দেশও জাতির যুগসূর্য। কিন্তু এই সূর্যের উদয় ও আবর্তন পথ এই বাংলাদেশ হতেই। সেই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে বাঙালী হয়েও তিনি ভারত-পথিক ও বিশ্বপথিক। খাঁটি বাঙ্গালীর মধ্যে ভাব জীবনের এই ব্যাপ্তিই তাঁকে মহত্বে মণ্ডিত করে। ভাবজীবনেই আমাদের এই জাতির সত্যকার পরিচয়। বাঙ্গালীর যাহা কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় তা এই ভাব বিপ্লবের কাহিনী। সে রাজনীতি অর্থনীতির সেবা করেনা নগর পত্তন করেনা। ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা শস্তশালী দেশলক্ষ্মীকে মণি-

মাণিক্যভূষণা করেছে বলেও শোনা যায়না। কিন্তু এমন কথাও ইতিহাসের মুখে শোনা যায় যে কোন নূতন ভাব বা আইডিয়ার আবেগে সে ঘর ছেড়েছে—হিমালয় লঙ্ঘণ করে তিব্বতে চীনে সে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছে সমুদ্র পার হয়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তালীবন ও লবঙ্গলতার দেশে—সে তার প্রাণের সৌরভ ছড়িয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গ চুড়ায় বাঙ্গালীর নগ্নশির কোথায় কতগুলি দেখা গেছে বলা দুরূহ কিন্তু ভাব রাজ্যের তাণ্ডব প্লাবনের ফলে তার অলস কর্মকুণ্ঠমন ও বৈভব বিমুখ, স্বচ্ছন্দলোলুপ প্রাণ যে প্রয়াস প্রযত্নের পরিচয় দিয়েছে তার প্রভূত নিদর্শন বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের আত্মস্ফূর্তির মূলে দেশ ও জাতির হৃদয় মথিত এক প্রবল তরঙ্গাঘাত বা ভাব প্লাবন লীলা বিলাস করেছিল সেকথাটাই আর একটু বলা প্রয়োজন। আর্যের ইতিহাস বাঙালার ইতিহাস নয়। তবু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙালী একবার আর্য সংস্কৃতির শরণাপন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য ও বাঙালার বৈষ্ণবধর্ম এই যুগেই বিকাশ ও লালিত হয়। ইহা বাঙালীর প্রথম ভাব বিপ্লব বা নব জন্ম। তখন দেশে মুসলমান শাসন। মুসলমান প্রভাবের তাড়নায় বাঙালা তার সর্বশক্তি উদ্বুদ্ধ করে আত্মরক্ষায় অগ্রগামী হয়। সেকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে বাঙ্গালী গ্রহণ করে বটে কিন্তু বর্ণ বিভাগের অন্তরালে বৌদ্ধ সংস্কার একেবারে লুপ্ত হ'লনা। সেই ভাব বিপ্লবের কালে বাঙালা ইসলামের কাছে গ্রহণ করেছিল তার উদার নীতি অপূর্ব সাম্যবাদ ও মানুষ মাত্রের প্রতিই শ্রদ্ধা। সেকালে এই ভাব হিন্দু-ভাবুকতায় মণ্ডিত ও তান্ত্রিক মহাজন্মা তত্ত্বে রঞ্জিত হয়ে একটি বিশিষ্ট ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করে। তবু ব্রাহ্মণ্য আদর্শের শাসন পরধর্মের মধ্যেই তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে রোধ করেছিল, আর ঐ প্রেমধর্ম সমগ্র জাতিকে দাস মনোভাবে আচ্ছন্ন করে। সেকালের ঐ ভাব বিপ্লবের মধ্যে যে বিপুল ব্যর্থতার পরিচয় আছে ভালকরে চাক্ষুষ করলে সেকথা অস্পষ্ট থাকেনা। বাঙালী ভাব প্রবণ ও স্বচ্ছন্দ সুখাভিলাষী, কল্পনা বিলাসী। তর্কশাস্ত্রে তার অধিকার যত অসামান্যই হোক জীবনের দিক থেকে কোন যুক্তি ও কঠিন নীতির সে পক্ষপাতী নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাঙালী ভাবের অধীন। জ্ঞানচর্চা এদেশে বিলাস মাত্র, এ বস্তু বাঙালীর প্রবল ও কামনা বাসনার নিরামক নয়। এমনি করেই অর্দ্ধজাগরণে বাঙালীর ইতিহাস কালের পৃষ্ঠাগুলি উল্টে চলেছিল। এমনি সময়েই পশ্চিমের পাল তোলা জাহাজ এসে ভিড়ল আমাদের বন্দরে গঞ্জে—নদীতীরের শ্যামছায়ায়। ইংরাজ ভারতবর্ষের শাসক হ'ল। তাদের শাসন আমাদের প্রবৃত্তিকে দু'দিক থেকে আঘাত করল। সে শাসন ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের বন্ধন ভিতরে ভিতরে শিথিল হয়ে এল। বাঙালীর প্রকৃতিগত ভাব স্বাধীনতা প্রশ্রয় পেল। অপর দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ফলে যুক্তিবাদ নীতি ধর্ম প্রভৃতি মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার আবার নূতন করে জাগ্রত ও উদ্যত হল। এই নূতনকেই আবার পুরাতনের অন্তর্গত করার জন্য অসীম উন্মাদনায় বাঙালী হল অধীর। এই কাল বাঙালীর ঊনবিংশ শতাব্দী। তখন বাঙালাদেশ রেনেসাঁস বা নবজন্মের গূঢ়গম্ভীর জীবন মন্ত্রে মন্ত্রিত।

আজকের নবজাগ্রত ভারতের জন্ম সেই উনিশশতকে। নবজাগরণের ধাত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের কনকঐশ্বর্য কেন্দ্র কোলকাতাতে তখন সরগরম। নূতন অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তখন এই কোলকাতাতে। রাম-মোহন এসে বাসকরছেন কোলকাতাতে,নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে শহর কোলকাতায়। স্বাতী নক্ষত্রের দীপ্ত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতির্ময় পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এই মহর্ষির যোগ্য উত্তরাধিকার—যুগসূর্য রবীন্দ্রনাথ। ১৮৬১তে এই কোলকাতাতেই তাঁর জন্ম। উনিশশতকের প্রথমার্দ্ধ অতিক্রান্ত। রামমোহন, দেবেন্দ্র নাথ, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভৃতি বংগ মনীষীগণ নবজীবনের মন্ত্র উচ্চারন করেছেন ইতিপূর্বেই। জাতির ভাব উন্মাদনা এবং রামমোহনের জ্ঞানপন্থী শিক্ষায় শিশু রবীন্দ্রনাথ,অবগাহন করেছেন। যুগের এই দ্বিমুখী প্রবনতা রবীন্দ্রনাথ গণ্ডুষে গ্রাস করেন। ভাবপন্থা ও ভারতপন্থা এই দুই পন্থাই রবীন্দ্রনাথে সমভাবে প্রশ্রয় পেল। সেকালই

পরবর্তীকালে তিনি বাঙালীর কবি হয়েও বিশ্বের কবি হ'তে পেরেছিলেন। ১৮৭৮ এ রবীন্দ্রনাথের "কবি কাহিনী" প্রচার হ'ল। ১৯১০ সালে বাংলা 'গীতাঞ্জলি' ১৯১২ তে ইংরাজী গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর ১৯১৩তে রবীন্দ্রনাথ নবেল পুরস্কার লাভ করলেন। নবেল পুরস্কার লাভের আগেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতন ও সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে সম্বর্দনা দান করল। নবেল পুরস্কার লাভের পর বিদেশ হাতে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। ইউরোপ পরিভ্রমান্তে তিনি আবার সম্বর্দ্ধিত হোলেন সাহিত্যের জগতে তিনি হ'লেন কবি সার্বভৌম। এই খ্যাতির অনেক আগেই রবীন্দ্র বন্ধু দার্শনিক প্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখলেন —Along" with the waxing and waninglight the rising or setting sun comes floating to the poet's soul aerial phantasms and drowsy enchantments, memories of days of fancy and fire, ghastly visitings and flashes Maenad like inspiration which the poet seizes in many a Page of delicate silver lined introspection or imaginative verse. In these songs Bengali Poetry rises to the height of Neo romanticism. ব্রহ্মবান্ধব 'Sofia' ও '20th century' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানালেন।

তিনি তাঁর মনোরত্নশালার নিভৃত মণিপ্রকোষ্ঠহতে নানাবিধ মহার্ঘ্য ও অমূল্যরত্নরাজি আহরণ করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গভূষিত করতে লাগলেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর, প্রভৃতি বিদ্যাভরণ ভূষিত তরুণ বাংলা সাহিত্য বিশ্বমানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হ'ল। দীনা বাংলা সাহিত্যকে তিনি আগিয়ে দিলেন—অনেক দূর। দুশো বছরের সামগ্রিক সাধনাও হয়ত একটা জাতিকে এতদূর আগিয়ে দিতে পারেনা। বাংলা সাহিত্যে, সংগীতে, চিন্তায়, মনীষায় বৈদগ্ধ্যে এই কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের অবদানের কথা পৃথক আলোচ্যবিষয়—এমন কি এখানে তা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বংগ ভারতীর সাধক ও সেবক। কিন্তু সাহিত্যের লীলা বিলাসের মধ্যেই তাঁর অধিষ্ঠান নয়। তিনি জাতির জাগ্রত মানসের প্রতিমূর্তি। সারা বিশ্বে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ শাসকদের তখন কি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। ভারতও সেই যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। নবজন্মের প্রসব বেদনায় জাতি তখন দিন গুনছে। কবি সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকেই ভেরী বাজালেন। নবজাতককে অভিনন্দিত কোরলেন। মানুষের স্বরাজলাভে তিনি হলেন উদগ্রীব। ১৮৯০ সাল। কংগ্রেসের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন। রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ১৯০৫ সালের বংগ ভংগ ও স্বদেশী আন্দোলনে কবি কণ্ঠ জাগ্রত থাকল। জালিওয়ালানাবাগ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের অপমানে ক্ষুব্ধ হলেন। লিখলেন "Crises in Civilization" কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়—শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের শক্তি কামনা করলেন কবি। সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশের পরাধীন মানুষ—তাঁর বাণীতে বিলসিত হল। এই রবীন্দ্রনাথ এবং কর্মী, শিক্ষাব্রতী, সংগঠক, দার্শনিক ও ঋষি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও তাঁর সাহিত্যের সাম্রাজ্যে। তিনি এই নূতন ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি সর্বোত্তম নরদেবতা।

সেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয় তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারতার মধ্যেই তাঁর অমরত্ব। সাম্প্রতিককালের দেশ ও জগতে এই দিকটির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। আজ ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাপক রবীন্দ্রপূজার মধ্যেও এই অতি মূল্যবান বিষয়টি উপেক্ষিত আছে। তাঁর সৃষ্টিতে যে মহার্ঘ্য, অজস্রতা, বৈচিত্র্যের বর্ণচ্ছটা—তার উপলব্ধি কেবলমাত্র নাচ গানের দ্বারা সম্ভব নয়। যদিও সংগীতের সহজবোধ্যতা, ও গ্রাহ্যতা স্বীকার্য। কবিতা ও গান তাঁর সাহিত্যের সার হ'লেও সর্বস্ব নয়। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সমালোচনায়, ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রায় সকল দিকের আলোচনায় যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন তাতে সকল রসের যে সমাবেশ— সকল [illegible]

যে প্রকাশ—তাকে এক মানুষের রচনা বলে বিশ্বাস করা কঠিন। মানুষের যা কিছু মহৎ, তাঁর পূজা পেয়েছে। যা কিছু হীন তাকে বেদনা দিয়েছে। বিশ্বমানবের মৈত্রী তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যে দেশ তাঁর জন্মভূমি তার অশিক্ষা,দারিদ্র ও দুর্দ্দশা তাঁকে কর্মী করেছে।প্রাচীন যেখানে বড়, নবীন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববোধকে টলাতে পারেনি। নবীন যেখানে সত্য, কোন প্রাচীনের মোহ তা গ্রহণ করতে তাকে বাধা দিতে পারেনি। সমস্ত মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের তিনি ছিলেন প্রতীক।

আজ শতবর্ষ পরে সকলের মত আমরাও রবীন্দ্র ভাবনায় কিছুটা কালক্ষেপ করেছি। কিন্তু আমরা একালের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে অতি দূর হতে বিস্ময় দৃষ্টিতে অবলোকন করেছি। একথাও বুঝেছি—সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা সদৃশ ভাস্বর ঔজ্জ্বলতার পাশে আমরা বহ্নি বিক্ষুব্ধ পতঙ্গ মাত্র। তবু সে আলোকে পুড়ে মরতে আমাদের সাধ। তাই এই সামান্য সাহিত্য সন্দেশের আয়োজন। শতবর্ষ পরে রবীন্দ্রজীবনের বসন্ত দিন—রবীন্দ্রনাথেরই বসন্ত গানে আজ ধ্বনিত হচ্ছে—আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে এসেছে—সেই চিরকালের কবিকে আমরা কতটুকু জানি—তাঁর সৃষ্টির সুগভীর জলধিতে আমাদের অবগাহন অতি সামন্যই। তবু শতাব্দীর অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের সংগে ক্ষণ পরিচয়েই—যেন একটা যুগ ও জাতির ইতিহাস আমাদের সম্মুখে নানা বর্ণচ্ছটায় এসে উপস্থিত হয়। কারণ বাংলার উদার আকাশ ও অবারিত মাঠে আমাদের চিত্তের প্রসার তাঁর কাব্য থেকে। শুভ্র বালুচরের নীচে পদ্মার কালো জল তাঁর কাব্যের কথাই আমাদের কানে কানে বলে। ভোরের প্রথম আলোতে তাঁর কাব্যের মোহ। গোধূলির রক্তরাগে তাঁরই কাব্যের রং। বাংলার নরনারী আমাদের অন্তরতম তাঁর কাব্যের বন্ধনে। বাঙালীর ভাবপ্লাবনের বা নবজন্মের যুগন্ধর নায়ক—আমাদের রেখে অস্তাচলে গেলেন। সে ১৯৪১ সাল। তাঁকে জীবন্ত প্রদক্ষিণ করার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আশা মেটেনা তবু কবির ভাষাতেই বলি—

তোমার কীর্তির চেয়ে, বলিব না, তুমি যে মহৎ—
বলিব না সৃষ্টি হতে স্রষ্টা আছে উর্দ্ধে, বহুদূরে।
জানি, সে কায়ার ছায়া মিলাইয়া যাবে স্বপ্নবৎ,
অজর অমর যাহা—বেঁচে রবে এই মৃত্যুপুরে।
সেই তব মূর্তিখানি ; ছায়া যার আলোক মুকুরে
পড়িলে সরে না কভু, যত দূরে দেহ থাক সরি'
মহান তাহার চেয়ে আছে কিবা? জন্ম জন্ম ধরি'
কে লভিবে হেন প্রাণ, হেন রূপ স্বর্গ মর্ত্য ঘুরে?

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আমরাও আজ আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

—শ্রীহারাধন দত্ত

অর্ঘ্য *

জগদিন্দ্র নাথ রায়

যে সুমহৎ কার্য্য সমুদয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত আজ আমাকে এখানে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহার যোগ্যতা আমার আছে কিনা তাহা বলা নিস্প্রয়োজন এবং সে বিচার বিবেচনা করিয়া নিজের অযোগ্যতা দেখাইয়া আহ্বানকারী পরিষদের হাত এড়াইবার ইচ্ছা আমার মোটেইছিলনা ও নাই। জানি, এবং বহুস্থানে দেখিয়াছি যে প্রায়শঃ অযোগ্য হস্তেই কার্য্যভার ন্যস্ত হয় এবং ভার বহনকারী অযোগ্য পুরুষকে পশ্চাৎপদ হইতেও কমই দেখিয়াছি। যদি জগতের প্রথাই এই, তবে আমিই বা অন্যকে পথ ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ বিনয়ী, স্বার্থত্যাগী, জিতাত্মা, যোগী হইয়া উঠিব কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইলামনা। তাই আজ পরিষদের আহ্বাহন অনুসারে সে আদেশ মস্তকে লইয়া বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যগুরু কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অর্ঘ্যবহণ করতঃ আমি অদ্যকার সভায় সমুপস্থিত হইয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি।

যুগ অতীত হইয়াছে কিনা জানিনা, কিন্তু বহুকাল পূর্বে একবার ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মনন্দনের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষ্যে অর্ঘ্যাধিকারীর নির্ব্বাচনে বড় গোলই বাধিয়াছিল। কুরুরাজ যুধিষ্ঠীর বড়বিপদে পড়িয়া, সর্ব্বনীতিজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, ত্যাগধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত মহাবীর পিতামহ ভীষ্মের শরনাপন্ন হইলে তিনি পুরুষোত্তমকেই অর্ঘ্যাধিকারী নির্বাচন করিয়া দেন, অবশিষ্ট গোলযোগ যাহা কিছু ছিল সে ভার চক্রপাণি যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পিতামহ কল্প পরিষদকে অর্ঘ্যাধিকারীর অনুসন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ আজ বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্তরু পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষন করিলে সর্ব্বদা যোগ্যপাত্র একই এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে অদ্বিতীয়। দুরাশার দুঃসাহসিক প্রেরণায় অধীর হইয়া স্পর্দ্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইবেন এইরূপ দাম্ভিকুলতিলক, শিশুপালকল্প উন্মাদ কেহ বঙ্গদেশে আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়না। সুতরাং আরব্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান বিঘ্নবিহীন হইয়া নিষ্পন্ন হইবে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ভরসা।

জাতীয় জীবন গঠিত হইবার পূর্ব্বে বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন সাধন জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্মের পুরস্কার দিবার ক্ষমতা মর্ত্ত্য মানবের সাধ্যাতীত, তাহদের ঋণ অপরিশোধনীয়। সরস্বতীর সেবককে যথাসাধ্য পুরস্কার দিবার মত ধন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাই, তবে সাধ্যানুসারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্যম দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, মনে হয় ভক্তি ভাজনকে ভক্তি করিতে, শিক্ষাগুরুকে সম্মান করিতে, যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহাকে তাহা দিতে যখন শিখিয়াছি, তখন আমরা নিঃশেষে মনুষ্যত্ব বিহীন আজও হই নাই, এবং কোন দিন জীবন সংগ্রামের পথে পৃথিবীর দশের সম-পাদবিক্ষেপে চলিতে পারিব এ আশা আমাদের একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

ভারতের সুপ্তিজাল জড়িত নিশীথে বিপুলা বঙ্গভূমি বহুকাল নিস্তব্ধ হইয়াছিল। রামমোহনের গভীর ঔপনিষদিক মন্ত্রে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আমরা নিশীথিনীর শেষ যাম বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের উপলব্ধি করিয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু তখনও তরুণ অরুণের প্রথম কিরণপাতে কোকিল কূজন সূচিত হয় নাই। মধুসূদনের মেঘনাদ আমাদের নিদ্রা জড়িতচক্ষের ঘুমঘোর একেবারে বিদূরিত করিতে পারে নাই, হেমচন্দ্রের শৃঙ্গ নিনাদে আমরা জাগিলামনা দেখিয়া তাহা বাজিয়া বাজিয়া নিঃশেষে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তার পরে জাতীয় জীবন প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল—অরুণালোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সুধা বিপ্লবী কণ্ঠ নিঃসৃত অমর সঙ্গীতে বঙ্গভারতীর কুঞ্জ-কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল প্রভাবে

* বংগদর্শন, মাঘ ১৩১৮, হ'তে সংকলিত।

তিনি যে অভূতপূর্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গের নহে দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিচারে সমস্ত বিশ্বের হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে। এই নিরানন্দ দেশে আনন্দ-উৎসের অপরূপ সৃষ্টি তাঁহারই এবং আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বসুন্ধরার বন্দনাগীতি তাঁহারই কণ্ঠে প্রথমোচ্চারিত।

প্রচণ্ড কালের অখণ্ড নিয়মে যখন তিনি অন্তর্হিত হইলেন, তখন ক্ষণিকের জন্য একবার মনে হইয়াছিল বুঝি পোষনাভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বঙ্গ সাহিত্য শিশু অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর মত অসময়েই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব কার্যকারণের নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর ভগবানের কৃপায় আজ পরমানন্দে বলিতে পারিতেছি যে তিনি আমাদিগকে সে দুঃখ দেন নাই।

বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই যে কিশোর রবির কিরণ সম্পাতে বংগভারতীর কবিতাকুঞ্জে কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে সেই রবির উজ্জ্বল তেজে আজ সমগ্র ভারতভূমি উদ্ভাসিত, সেই সাহিত্যরাজরাজেশ্বর তাঁহার মনোরত্ন শালার নিভৃত মণি প্রকোষ্ঠ হইতে নানাবিধ মহার্ঘ্য ও অমূল্য রত্নরাজি, আহরণ করিয়া শিশু-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করতঃ বিশ্বসাহিত্য সমাজের নিকটে আজ তাঁহাকে দাঁড় করিয়াছেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর, প্রভৃতি বিত্তাভরন ভূষিত তরুণ বঙ্গসাহিত্যের রূপচ্ছটায় দশদিক যে আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে, ইহা, কবিবর, একক তোমারই কৃতিত্বে, তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠিত মুক্তদানের ফলে। আজ তোমার বীনার অমৃত নির্ষ্যন্দি ঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্য কুঞ্জের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত; তোমার অনুগামিগণ তোমার সুরে গান গাহিয়া, তোমার ছন্দে কবিতা পড়িয়া, তোমারই অনুকরণে গদ্য রচনা করিয়া নিজ নিজ শ্রমের সাফল্য লাভ করিতেছেন। সাহিত্য নিকুঞ্জের প্রত্যেক পত্র পুষ্পে, বল্লরী ও কিশলয়ে, আজ তোমার সুধাময় সুর অনুরণিত রহিয়াছে।

কবীশ্বর তোমার সম্বর্দ্ধনার জন্য আজ আমরা সমবেত হইয়াছি। কিন্তু জানি না কেমন করিয়া তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্য সম্রাটের সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়। আমাদের এ 'অর্ঘ্য' দীনের অর্ঘ তাহা তুমি জান। কিন্তু প্রীতির দান বলিয়া গ্রহণ করিও। সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বফলদাতা বিশ্বপিতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তোমার শতায়ু বিধান করিয়া দেশ ও সাহিত্যের মঙ্গলপথে তোমাকে সতত নিয়োজিত রাখুন।

●●

কবি সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে টাউনহলের সভায় লেখক নাটোরের মহারাজা কর্তৃক পঠিত।

১৩১৮ সালে কবির পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত যে রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা সভা হয়—তার অন্যতম নায়ক ছিলেন কবি মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ রায়। এই সভাতেই পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'অভিনন্দন' পাঠ করেন। কবি তখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নি। ১৩২৮ সালের সম্বর্দ্ধনা সভাতেও মহারাজ সভাপতিত্ব করেন।

রবীন্দ্র রচনার প্রসার ও প্রচার

প্রাণতোষ ঘটক

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীর এই দেশব্যাপী উৎসবে কবিকে স্মরণ ও মনে করা হচ্ছে নানা ভাবেই; কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে কথা স্বতঃই মনে জাগে তা হল কবির স্মৃতি চির অম্লান রাখতে আমরা কি সত্যই কিছু করছি ?

নাচ গান আবৃত্তি ও অভিনয়, রবীন্দ্র স্মৃতি পূজার এগুলিই হল প্রধান অঙ্গ কিন্তু সাময়িকভাবে সাড়া জাগলেও রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে বুঝতে হলে যে বস্তুটি অপরিহার্য তা হল তাঁর সাহিত্যের সহিত অন্তরঙ্গতা; রবীন্দ্র রচনার প্রচার ও প্রসারই এই অন্তরঙ্গতা সাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা; তাই মনে হয় এই পুণ্য লগ্নে কবির রচনা যাতে সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সকলকেই সম্যক ভাবে অবহিত হতে হবে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খানিকটা উদ্যোগী হয়েছেন যার ফলে রবীন্দ্ররচনাবলীর সুলভ এক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন মিটাতে হলে দেশের সাধারণ লোক যাতে সহজেই এই সুলভ সংস্করণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হলে, বিশ্বভারতীকেই নিতে হবে প্রধান দায়িত্ব মূল্যবান রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে পর্য্যাপ্ত ভাবেই।

রবীন্দ্ররচনার সাথে সম্যক পরিচয় না থাকলে, জাতিমানসে তাঁর প্রতিভার সম্যক সাক্ষর যে পড়তেই পারেনা এ কথা আশাকরি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন।

রচনাবলী সাধারণের হাতের মুঠোয় না আসা পর্য্যন্ত স্মৃতিরক্ষার্থে যত হৈ চৈ ই আমরা করিনা কেন তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য।

প্রতিমা পূজার মতই, পাথরের দেবতা হয়েই প্রতিভাত হবেন কবি সাধারণ মানুষের অন্দরমহলের মণিকোঠায় যদি তাঁর প্রকৃত বন্দনা না হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে একটা অভিযোগ বহু প্রচলিত, তা হল তিনি নাকি বড় দূরের মানুষ, আভিজাত্য ও উন্নাসিকতার বেড়ায় নাকি তিনি সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে চিরদিন; বলাবাহুল্য একথা যাঁরা বলেন কবির রচনার সাথে পরিচয় তাঁদের স্বল্প; না হলে আর সব রচনার কথা বাদ দিলেও তাঁর সঙ্গীতকে তাঁরা ভোলেন কি করে।

ক্ষুদ্রতম দীনতম মানুষের ও অন্তর কি সাড়া না দিয়ে পারবে তাঁর সাঙ্গীতিক আবেদনে ?

রবীন্দ্রনাথের গানে কি সকল মানুষের সর্ব্বপ্রকার আনন্দ বেদনাই রূপায়িত হয়ে ওঠেনি ?

তাঁর বাউল গানগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য; 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' 'আমার মনের মানুষ যেরে' 'বাদল বাউল বাজায় রে বাজায় রে একতারা' শীর্ষক গানগুলি এমন কে আছে যার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে ?

রবীন্দ্ররচনার সাথে সম্যক পরিচিতি যে কত প্রয়োজনীয় ,উপরিউক্ত দুর্বোধ্য তার অভিযোগ থেকে শুধু তাই প্রমাণিত হয়; তাই মনে হয় বিশ্বসভায় গর্ব করার ধন এই মহাকবি, মহামণীষীকে জানার চেষ্টা করা বোঝার চেষ্টা করাই তাঁর দেশবাসীর আজ প্রধান তম কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের শুভ মুহুর্তে, কবির রচনার প্রসার ও প্রচার করার দায়িত্ব জাতীয় সরকারেরই শুধু নয়, আমরা তাঁর দেশবাসীরাও যেন এই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে নিজেদের সম্যক অবহিত করে তুলতে পারি আজকের দিনে তাই আমাদের ব্রত হোক।

অভিনন্দন *

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহণ করিয়া আপনি নিবিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্বায়তন এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে!

পরিষৎ নানা প্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহ দানে ইহাকে পোষণ করিয়া ছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া ইহার শ্রী ও সম্পদ বর্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম সুহৃৎ সখা'। যখন অমিত্র নারীদের ঘন ঘটায় পরিষদের পক্ষে পন্থ বিজন অতিঘোর' হইয়াছে তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া আপনি ইহাকে ঋত মার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেইজন্য পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল। যাঁহার অর্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্যপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে বরণ্যে আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ যুগান্তরে সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্তসরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেইজন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেইজন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণীর সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্ব সঙ্গীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয় বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতিচ্যে সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযূষ পান ভিন্ন কোনমতে তাহার অদম্য ব্রহ্ম তৃষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে মহর্ষিসন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন!

বিদ্যাপক্ষীনির দুই পক্ষ দর্শন ও বিজ্ঞান এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া সে প্রজ্ঞানের পরব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক। এই আদান প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে" সেইজন্য আপনি "বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে গ্রথিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে কবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্কর জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরম জ্যোতিঃ যাঁহার ঊর্জিত বিভূতি আপনাকে সেই সত্য শিব সুন্দর দেদীপ্যমান আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ।

* সবুজপত্র, ভাদ্র-১৩২৮ থেকে সংকলিত।

[স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিগতকালের বাংলাদেশের একজন বিশ্রুতকীর্তি মনীষী। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সম্বর্দ্ধিত করেন সাহিত্য পরিষদ তার দু বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ পরিভ্রমণে বার হন। ইউরোপ পরিভ্রমান্তে সাহিত্য পরিষৎ পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা দেন। সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট ব্যক্তি হীরেন্দ্রনাথ উক্তসভায় এই অভিনন্দনটি পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়।]

রবীন্দ্র-চিন্তা ঃ জন্মদিনে

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

রবীন্দ্র চিন্তার সূত্র ধরে সহজেই ঋগ্‌বেদের বহ্নি-বৃহস্পতির কথা মনে পড়ে। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে—

ওঁ জনস্থ গোপা অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্নিঃ সুদক্ষঃ সুবিতায় নব্যসে। ঘৃতপ্রতীকো বৃহতা দিবিস্পৃশা দ্যুমদ্বি ভাতি ভরতেভ্যঃ শুচি॥ ওঁ বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্। সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি॥ ওঁবস্তস্তম্ভ সহসা বি জ্রো অন্তান্ বৃহস্পতি স্ত্রিষধস্থো রবেণ। তং প্রত্নাস ঋষয়ো দীধ্যানাঃ পুরো বিপ্রা দধিরে মন্দ্রজিহ্বম্॥

— ৫।১১।১;৪।৫০।৪;৪।৫০।১

অর্থাৎ— জাগ্রত লোকরক্ষক সুদক্ষ বহ্নি নবতর মঙ্গল সাধনের জন্য জন্মেছিলেন। দীপ্তমূর্তি অগ্নি তাঁর আকাশস্পর্শী বিরাট মহিমায় ভারতীয় জনগণের সম্মুখে দীপ্যমান আছেন। পরম ব্যোমের মহা-জ্যোতি হতে প্রথম জন্ম গ্রহণ করেই সেই সর্বতোমুখ অমিত-বীর্য অভিজাত বৃহস্পতি এক হুঙ্কারে সকল অন্ধকার দূর করেছিলেন। যে বৃহস্পতি সর্বত্র-ব্যাপী নিজপ্রভাব আর বিভব দ্বারা সর্বস্থান নিয়ন্ত্রিত করতেন, সেই মন্দ্রকণ্ঠ বৃহস্পতিকে চিন্তা ও জ্ঞান-বৃদ্ধ প্রবীণ পণ্ডিতগণ সম্মুখভাগে স্থাপন করেছিলেন।

ভারতের সূর্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বেদের এই কথাগুলি আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। কোন মানুষকে কেন্দ্র করে যদি সমস্ত মানুষের কথা প্রকাশ পায়, তবেই সেই মানুষটিকে নিয়ে মহোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র-নাথকে কেন্দ্র করে আমাদের জাতীয় উৎসবটি এমনি একটি মহা মহোৎসব। এই দিনটিতে একটি বিশেষ মহামানবকে উপলক্ষ্য করে আমরা মনুষ্যত্বের পরম শক্তিকে স্মরণ করি, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে নিত্যকালের অ-প্রয়োজনে আপানাদের উন্নত করি, অল্পের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে অন্-অল্পের মধ্যে নিজেদের অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরই নতুন করে চিনে নিই।

রবীন্দ্রনাথ আজ কোন বিশেষ ব্যক্তি নন। তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা তাঁর তিরোধানের পর নৈর্ব্যক্তিক সর্বজনীনতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই সিদ্ধশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্র-নাথ, শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ— এই বহু রবীন্দ্রনাথের একগাছি মালার আজ সর্ব-হৃদয়-গ্রাহ্য পরিচয় হল, মানুষ রবীন্দ্রনাথ। এই মানুষ রবীন্দ্রনাথেরই আমরা উৎসব করি। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমাদের মিল। তাঁর ভিতর দিয়ে আমরা এবং আমাদের ভিতর দিয়ে তিনি প্রকাশিত। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একজন সুসম্পূর্ণ মানুষ, আমাদের একান্ত আত্মীয়। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সেই জন্যই মানুষেরই জয়োৎসব।

মানব-বন্দনাই হ'ল মানুষের ধর্ম। সমগ্র ধরিত্রীতে বিস্তৃত এই মানব-ধর্মের কোন 'ইজম্' (Ism) নাই। ভারতবর্ষ এই মানব-ধর্মের দেশ। এই ভারতবর্ষ রূপ লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনিই যথার্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁর জাতীয়তা স্বাদেশিকতা নয়, আন্তর্জাতিকতা—তাঁর ধর্ম গোষ্ঠী-গত উপধর্ম নয়, মানবিকতা—তাঁর জীবনদর্শন

নাথের 'সকল বিশেষ পরিচয় তাই অনায়াসেই সার্বভৌম-সত্তা লাভ করেছে। এই সত্তা 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে'। তিনি নিজেই বলেছেন —

আমি চলিলাম—
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সঙ্গমে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের কালে জন্মেছি, রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। যুগ যুগ ধরে ভারতীয়েরা যে সাধনা করে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই চির-পুরাতম কথাকেই নতুন করে শুনেছি। এই 'অমৃতবার্তা'-র জন্য যথার্থই আমরা গৌরবিত।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ বিশ্লোক এতু পথ্যের সূরেঃ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

শোন বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

মানুষের এই পরম বিশ্বাসের বাণী কোনদিনও পুরাতন হ'ল না। পুরনো হয়ে যাচ্ছে বাইরের আবরণ, দেশে-দেশে কালে-কালে তার বদল হচ্ছে। কিন্তু যে মানুষটি ভিতরে রয়েছে, সে নিত্য, শাশ্বত, তার কোন পরিবর্তন নাই। তপোবনে ও জনপদে, কুটিরে ও প্রাসাদে এই 'অন্তরময়' মানুষটিই বাস করছে। সেই 'অন্তরময়' অবিনশ্বর মানুষটিকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বারংবার অবলোকন করে ধন্য হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী।

আজ হিংসায় পৃথিবী উন্মত্ত। নর-দানবীয় সভ্যতার নখাঘাতে মেদিনীর বক্ষ দীর্ণ, তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ধরিত্রীর শ্যামলিমা সাহারার উষ্ণ-প্রদাহের জ্বালাময়ী রিক্ততায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই পরিত্রাণের জন্য মানুষ আবার সাধনায় বসেছে। যুগে যুগে যখনই গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, তখনই মানুষ মন্ত্রোচ্চারণ করেছে—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব॥

অর্থাৎ— হে প্রভু! সমস্ত দুঃখ দূর করে যা কল্যাণকর তাই আমাদের দান কর। এ প্রার্থনা নিত্যকালের। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই প্রার্থনা— 'শুধু এক সেই আছে নাহি অন্য পথ'—বিঘোষিত হয়েছিল। আজ লক্ষ মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমনি ভাবেই প্রার্থনা করে চলেছেন সেই মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্র।

বর্তমান বিশ্বের অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কামনা করি। ইংলণ্ডেও এমনি একদিন চিন্তানায়ক মিলটনের উপস্থিতি কামনা করে ইংরাজ কবি বলেছিলেন—

Milton, Thou shouldst be living
At this hour, England has need of thee.

অর্থাৎ—মিলটন! আজ আপনার বাঁচা আবশ্যক ছিল, ইংলণ্ডে আজ আপনার প্রয়োজন। আমরা কিন্তু ঠিক এইভাবে বলি না। বলি না— রবীন্দ্রনাথ! দেশের এই চরম দুঃসময়ে আপনার থাকা উচিত-ছিল। আমরা বাঙালী, ভারতীয়। আমাদের জীবন-বেদে মৃত্যুর স্থান নাই, মৃত্যু আমাদের 'পুনরাগমনায় চ'; জীবন ও মৃত্যুর সংযোগেই আমাদের মহাজীবন-সংহিতা। রবীন্দ্রনাথ নাই,

এ কথা আমরা স্বীকার করি না। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং 'আজি হতে শত বর্ষ পরে'-ও তিনি থাকবেন। যত দিন পৃথিবীতে একটি বাঙালী, একটি ভারতবাসী, একটি মানুষও বেঁচে থাকবে তত দিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সর্বদাই উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের কর্মে ও চিন্তায় তাঁর এই উপস্থিতি আমরা নিয়তই অনুভব করি। তাঁর মধ্যে যে অভ্রংলেহী চিরন্তনী শক্তি একদা প্রকাশিত হয়েছিল, সর্বকালের মানবলোকের মধ্যে সেই শক্তিকেই প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনার মধ্যে, তাঁর সমস্ত কৃতির মধ্যে যে কথাটি ব্যক্ত হয়েছিল, সেই নিত্যকালের কথাটিই আমাদের মনের কথা—

দাও ভক্তি শান্তিরস
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে, সর্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহ-হীন।

পঁচিশ বৈশাখ। এই বিশেষ দিনটিতে বিধাতা আমাদের একটী রত্নদীপ দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বছরের মধ্যে এই দিনটীর একটী বিশেষত্ব রয়েছে। এ বিশেষত্বটি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বলে নয়, এ দিনটির বৈশিষ্ট্য হ'ল—এটি আত্ম-উপলব্ধির দিন। এদিনটি হচ্ছে, 'আত্মানং বিদ্ধি'র দিন; 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাজগৎ'—এই পরম বোধের পুণ্য লগ্ন। প্রতিদিন মানুষ স্বীয় একাকিত্বকেই নিয়ে থাকে। কিন্তু এক একটি বিশেষ দিনে মানুষ নিজের মহত্ত্ব, নিজের বিরাটত্বকে অনুভব করে। মানুষ্যত্বের এই সুমহতী শক্তি অনুভবের দিন হল পঁচিশে বৈশাখ। তাই আমরা ঐ দিনে উৎসবের আয়োজন করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি 'মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব আনন্দ-সঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তন শক্তিকে প্রত্যক্ষ' করি। এই উৎসব একান্তপক্ষে আমাদেরই শুভ উৎসব। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই যে মানুষের শুভ মহোৎসব, এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ? "নানারূপে রূপান্তরে কালস্রোতে", যে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়, সেই রবীন্দ্রনাথ? অথবা, 'আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত, বাহিরে বহুর সাথে জড়িত, অজানা তীর্থ-গামী' রবীন্দ্রনাথ এই রবীন্দ্রনাথ আমরা প্রত্যেকেই। তাই পঁচিশে বৈশাখ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই জন্মোৎসব নয় আমাদেরও জন্মোৎসব। এই দিনটিতে বাস্তবের রবীন্দ্রনাথ আদর্শ হয়ে আমাদের কাছে অধিকতর সত্য হয়ে দেখা দেন। সেই আদর্শের আলোকের ঝর্ণাধারাতেই আমাদের অন্তঃকরণ বিধৌত হয়ে স্নিগ্ধ শুচি শুভ্র হয়ে ওঠে। তাঁর জন্মদিন নিত্যকালের মানুকেই স্মরণ করি। এই দিনটিতে বিশেষ করে মনুষ্যত্বের পূজারী, মানবতা-বোধের উদ্‌গাতা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আপন-আপন অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি।

সংশয়াচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে যাঁরা প্রাণের অনির্বাণ দীপ জ্বেলে রেখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। এই বর্তিকার আলোকের নিশানা ধরে চলেছে অগণিত জনতার মিছিল। তাদের মন্ত্র এক, হৃদয় সমান, আদর্শ অভিন্ন, তাদের সম্মিলিত শক্তির বিকাশে পরম কাম্য ক্ষণে ক্ষণে আসন্নতর হচ্ছে। তাই এই পথপ্রদর্শক মহামানব পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মধ্যে বারংবার অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি, তাঁর উদ্দেশে আমার সর্বান্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি॥

রবির প্রতি

মোহিতলাল মজুমদার

হে রবি, তোমার তাপে এই নিত্য-আর্দ্র ভূমিতলে
উষ্ণ হ'ল খাল বিল। আর যত পঙ্কিল পল্বল;
বাড়ে শুধু লালা ক্লেদ, শেহালায় ভরে' গেল জল,
মরেছে কলমীলতা, সুষুনি শুকায় দলে দলে।
জন্মে শুধু ডিম্ব কীট, তাই হ'তে ফুটি পলে পলে
উড়িছে পতঙ্গকুল— ক্ষণজীবী উন্মত্ত চঞ্চল!
আসন্ধ্যা প্রভাত করি' বায়ুভরে নৃত্য কোলাহল
নিঃশেষে মরিবে সবে তুমি যবে অস্তাচলে!

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়া
করিছে কূজন বটে— দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!
কে শোনে তাদের গান? মাছিদের কল্লোলে হারায়
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ! তুমি রবি, তবুও হা ধিক!
তোমারে আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়।

* * * * * * *

"আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সহিত তুলনা করিয়াছি, দূর আকাশে তুষার পুরীর মধ্যে তাহার শৃঙ্গরাজি যেমন কখনও আবৃত কখনও প্রকাশিত হইয়া থাকে, ঋতুচক্রের আবর্ত্তন এবং আলো আঁধারের ইন্দ্রজাল যেমন তাহাকে শতরূপে শতবর্ণে বি[illegible]সিত করে, অথচ নভোনীলিমার পটভূমিতে তাহার শুভ্রশেখর অবিকৃত হইয়াই আছে, তেমনই, রবীন্দ্র প্রতিভার বিচিত্র বিকাশের মধ্যে একটা মূল প্রকৃতি বা স্থির রূপ নিশ্চয় আছে, কিন্তু কাব্য রসিকের পক্ষে সে রূপ আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই; আমরা তাহার বর্ণ বৈভব ও রূপবৈচিত্রের জন্যই সেই গিরিশিখরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

আজ আমরা কবির কণ্ঠে যাহা শুনিতেছি তাহাতে একদিকে যেমন স্মৃতিস্বপ্নময় অতীত জীবনের একটি উদাসমুখর রাগিনী ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া উঠিতেছে তেমনই অনন্তের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রার নিশ্চিন্ত নির্ভীক পদধ্বনিও তাহাতে শুনিতে পাই—সে গানের পদচারণে ছন্দ ও নিশ্ছন্দের দ্বন্দ্বও লোপ পাইয়াছে। জানি এ কণ্ঠ একদিন নীরব হইবে, অন্ধকারের একমাত্র দীপশিখা একদিন কালের ফুৎকারে নিবিয়া যাইবে, তথাপি সমগ্র বাঙালী জাতির এই প্রার্থনা যে, সেদিন যেন এখনি না আসে"।

মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্র কাব্যে নদী

॥ শ্রীমতী ভারতী দত্ত ॥

ভিক্টোরীর যুগের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, সচ্ছল ঠাকুর পরিবারের স্নেহ নিবিড়তায় পালিত, উপনিষদীয় ভাবধারা পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ 'শান্তম্ শিবম সুন্দরম্'-এর পূজারী। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য, উদার আকাশ, অতলান্ত সমুদ্র, ঘনকৃষ্ণ নদীজল, ধূসর পর্বত; হরিৎ শস্যক্ষেত্র, বিহগ-কলগুঞ্জনকে তিনি লীলাময়ের সৃষ্টি মনে ক'রে, পরিপূর্ণ রোম্যান্টিকতার অঞ্জন-লিপ্ত আঁখিতে দেখেছেন। প্রকৃতি তাঁকে এক বন্ধন হীন-গ্রন্থি দিয়ে মাটির পৃথিবীতে বেঁধে রাখতে চেয়েছে, এবং তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছেও

The nurse
The guide, the guardian
Of my heart and soul
Of my moral being (Tintern Abbey)

নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে নদী একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সমগ্র রবীন্দ্র কাব্য সংসারে 'আপন বেগে পাগল পারা' এই নদী অসামান্য প্রভাব ছড়িয়ে আছে। সে একদিকে রবীন্দ্রনাথের মন-মাটিকে রসের প্লাবনে উর্বর ক'রে অজস্র সোনার কাব্য-ফসল ফলিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সে-সুন্দরী সুদূরের আহ্বানে কবিকে নিয়ে জানা থেকে অজানা লোকে পাড়ি জমিয়েছে।

একদিন 'সন্ধ্যা সঙ্গীতের' রজনী পোহাল, এলো 'প্রভাত সঙ্গীতের' সুপ্রভাত। এই শুভ মুহূর্ত্তে কবির হৃদয়-দুয়ার অকস্মাৎ খুলে গেল—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

কবি লিখলেন ......"আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" (জীবন স্মৃতি) সে-নির্ঝরের অন্তর আবেগে কঠিন শিলা ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ মুক্তির উল্লাসে পর্বত বিদীর্ণ করে আত্মহারা হ'য়ে সে জগৎ মাঝারে প্রবাহিত হ'তে চায়। নির্ঝর প্রাণের সাধক, তাই নির্ভয়ে সকল বাধা অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হ'তে থাকে, কণ্ঠে ধ্বনিত হয় উদ্দীপনার সঙ্গীত :

"আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া, বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
.... শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।"
(নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরিণী ক্রমশঃ পাহাড় অতিক্রম ক'রে সমতল ভূমিতে নেমে এলো—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির যুগে। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ের প্রভাবই পড়েছে, কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশী কার্য্যকর হয়েছে যার প্রভাব, সে হ'লো পদ্মা সুন্দরী। প্রণয়িনী পদ্মার সান্নিধ্যে এসে কবি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মাধুরী এবং সুধা-রস তাঁর অনুরাগ-রাঙা হৃদয়ে 'তিলে তিলে নূতন হোয়।' সূর্যোদয় সূর্য্যাস্তে লাল, ঘন ঘোর মেঘে স্নিগ্ধনীল, পূর্ণিমার জোৎস্না-স্নাত পুষ্প শুভ্র কত দিন রাত্রির রূপলাবণি কবি অনুভব করেন আর প্রকৃতি তিলোত্তমাকে কবিতা-গল্পের রঙীন শিশমহলের ভিতর দিয়ে শতসহস্র রসিকের তৃষিত আঁখির সামনে তুলে ধরেন।

পদ্মা কবির কাছে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত সে-রূপ বার বার দেখেও তাঁর 'নয়ন না তিরপিত ভেল'। কবি বলছেন—"প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধহয়

পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই স্রোতে ভাসিয়ে দিই চারিদিকে জল কুলকুল ক'রে ওঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন, কম্পন আলোক আকাশ, মৃদু কল ধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সঙ্গীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন ক'রে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়," (৬৭ নং পত্র) আবার পদ্মার স্রোতের মধ্যে কখনও তিনি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বিষাদ বৈরাগ্যের দর্শন পান। রোদনার্ত বালিকাকে নৌকা করে স্বামীর ঘরে যেতে দেখে তাঁর মনে হয়—"সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হ'তে লাগলো।....বিদায়কালে এই নৌকো ক'রে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আর-ও একটু বেশী করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া।" (৩০ নং পত্র)

পদ্মার দুকূল প্লাবিনী উদ্ধত ভামিনী রূপটিও কুশলী কবি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন—"সে মেয়ে একেবারে উন্মাদ হয়ে খেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে.... ... তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়, নৃত্য করছে, ভাঙছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলছে .... তীব্র স্রোত যেন চক্চকে খড়্গের মতো, পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়।" (৬৩ নং পত্র)

টেনিসনের 'Brook' নৃত্য চপল ছন্দে যেমন ওড়না দুলিয়ে চলে যায়, বলে—

> "I wind about and in and out
> With here a blossom Sailing,
> And here and there a lusty trout
> And here and there a grayling"
>
> (The Brook)

তেমনি পদ্মাও সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যায়, আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যায়। তার "কোথাও খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানক্ষেতের মাথা; খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে, পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে। ....দ্বীপের মতো অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে।" Brook এর মতো ভরা যৌবনের মত্ততায় পদ্মাও ছলছল্,খলখল শব্দে বলে চলেছে 'Men may come and men may go but I go on fore ver.' এই তরুণীর প্রতি আকর্ষণের কথা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন কবি—"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা। ....ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।" (৭৯ নং পত্র)

রবীন্দ্র সাহিত্যে পদ্মানদীর একটি বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয়। অদৃষ্টের অভাবিত লীলায় রবীন্দ্রনাথ জনবহুল কোলকাতায় পনেরো আনা মানুষের পূর্ণ পরিচয় পেলেন না। যে পনেরো আনা লোক তৃণদলের মতো পৃথিবীকে শ্যামল কোমল স্নিগ্ধ ক'রে রেখেছে তাদের তিনি জানলেন প্রকৃতিঘেরা নির্জন পদ্মাতীরে এসে। শহর থেকে সরিয়ে এনে মানস-সুন্দরী তাঁকে নিয়ে পদ্মায় যে তরী ভাসিয়েছিলেন তা মানুষেরই কূলে গিয়ে ভিড়েছে।

পদ্মার কল্যাণে আমরা তাই একদিকে চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালির মধুভরা কবিতাগুচ্ছ পেয়েছি, অন্যদিকে পেয়েছি গল্পগুচ্ছের রসোত্তীর্ণ অজস্র ছোটগল্প, যেগুলিতে পদ্মা-লালিত জনপদ জীবনের অপরূপ প্রসন্নতা ও ছায়ালোক স্নিগ্ধ রমনীয়তার মিলন ঘটেছে। আর এই কবিতা ও গল্পের মহাভাষ্যকার রূপে পেয়েছি আমরা ছিন্নপত্রাবলীকে, যা'—"চিঠি হয়েও উপকরণ, উপকরণ হয়েও রস, রস হয়েও মানুষের অন্তরাত্মার ছন্দায়িত আন্দোলন।" (মদন মোহন কুমার)

'সোনার তরী'—পর্বে নৃত্যের তালে তালে সৌন্দর্যের গান, প্রেমের গান গেয়ে গেছে যে পদ্মা, তাকে কবি ভালবেসেছেন, সেই সঙ্গে ভালবেসেছেন তিনি সমগ্র মর্তভূমিকে। তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে বলেছে 'আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে'।

'খেয়া'-পর্বে এসে দেখি কবির কাছে অতীন্দ্রিয় জগতের ডাক এসেছে। তাঁর চিত্তে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে ইন্দ্রিয়

ও অতীন্দ্রিয় লোকের মধ্যে। তাঁর দোলায়মান চিত্ত একবার চাইছে এপারের মাটিকে আলিঙ্গন করে থাক্‌তে, আর একবার চাইছে ও-পারের দেহাতীত রহস্য ধামে যাত্রা করতে। 'খেয়া এই দোলায়িত মনের প্রতীক। খেয়া'র রূপ ও অরূপলোকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল গীতাঞ্জলি গীতালি-গীতিমাল্যের যুগে তার অবসান ঘটেছে, কবি অসঙ্কোচে পরিপূর্ণ অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যখন তিনি দেখেছেন 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি' ঈশ্বরের দয়া প্রেমের দ্বারা স্নিগ্ধ তখন তিনি সেই নদীতেই খেয়া ভাসানো স্থির করেছেন—

"এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
.... শূন্য মনে কোথায় তাকাস ? সকল বাতাস,
সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশীর সুরে উঠে শিহরি।"
(ভাসান-গীতিমাল্য)

এখন কবির দুর্বার উচ্ছ্বাস ও আবেগ শান্ত হয়েছে, তারুণ্যের চপলতা আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যে অভিষিক্ত হয়েছে। কবি পৌঁছেছেন সেই 'সব পেয়েছির দেশে', যেখানে 'নাইকো পথে ঠেলাঠেলি নাইকো হাটে গোল'। 'Far from the madding crowd's ignoble strife' এর স্বর্গে কবি নিজেকে স্থাপন করেছেন।

কিন্তু লীলাময়ের সঙ্গে অনন্ত মিলন-বাসর যাপন সম্ভব হ'লোনা, তখনও কর্তব্য বাকি ছিল। তাই যখন ঈশ্বরের 'শঙ্খ' বেজে উঠলো, কবিকে 'ঝঙ্কার মুখরা ভুবন মেখলার অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'র সঙ্গে পা মেলাতে হ'লো। 'বলাকার' যুগে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী এক অনন্ত গতিচঞ্চল প্রবাহ অনুভব করলেন, বিশ্বাস করলেন স্থিতি-হীন গতি বা Eternal flux ই জগতের একমাত্র সত্য। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর creative evolution স্বীকার ক'রে তাঁর সঙ্গে ঘোষণা করলেন "To exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly"। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের চলিষ্ণু বাণী 'চরৈবেতি' মিলে কবিকে নবদীক্ষা দিলো। কবি এখন বিশ্ব ভুবনে যে নদীকে দেখলেন তা'গতি সর্বস্ব কাল নদী।

হংস বলাকার ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত ডানার যাত্রাধ্বনি যখন সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের নিশ্চল তপস্যা ভঙ্গ করলো, তখন কবি সেই নদীতে এবং চতুর্দিকের পরম নৈঃশব্দ্যের অন্তরে অন্তরে চিরচঞ্চলের আবেগ অনুভব করলেন। আর তখনই ভবনদীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—

"হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

এবং শুধু ধাও শুধু ধাও শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও
ফিরে নাহি চাও
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও!
(চঞ্চলা)

জীবন-দেবতা স্বর্গমর্ত্যব্যাপিনী এক বিশাল কালনদীর মুক্তধারায় অভিজিৎ কবিকে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে'।

কিন্তু 'পুনশ্চে'র যুগে দেখি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে কবির খেয়া আকাশ গঙ্গার পথ বেয়ে আমাদের পরিচিত জনপদ জীবনের 'কোপাই নদীতেই এসে পড়েছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Skylark' এর মতো 'Heaven' থেকে 'Home'-এ ফেরবার জন্য কবির মন তখন ব্যাকুল। 'পুনশ্চের' কোপাই নদীর মধ্যে নির্ঝরের শৈশব চাপল্য নেই, নেই পদ্মার রোম্যান্টিক ঐশ্বর্য্য। 'খেয়া'র মিষ্টিক তাৎপর্য্য অথবা 'বলাকার বিশ্বচারী গতিবেগ ও এখানে মিলবেনা ক্লাসিক আভিজাত্যের বদলে কোপাই নদীর আছে সহজ, সরল নিরাভরণ সৌন্দর্য্য, একটি শান্ত, সুষম, সংযত শ্রী। তাই পদ্মা যেখানে তার দুরন্ত, তার যৌবন সম্ভার নিয়ে মোহ-অনিবার্য আকর্ষণ জাগায় সেখানে কোপাই, প্রতিবেশিনীর সান্নিধ্য নিয়ে মিতালি পাতাতে আসে।

পদ্মা সম্পর্কে কবি বললেন :

"ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করেনা।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান" (কোপাই)

কিন্তু কোপাই—"প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার
অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ। (ঐ)

কোপাই নদীই এখন থেকে কবির কাব্য ধারাকে নিয়ন্ত্রন করলো।

পুনশ্চে কোপাই-এর সমগোত্রীয় আর-ও হু'টি নদী ময়ূরাক্ষী এবং ধলেশ্বরী কবির মানস নেত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে চিত্তে মধুর আবেশ ঘনিয়ে তুলেছে। কর্মের অবসরে তাঁর অবসন্ন তনু-মন ছুটির মধু খুঁজেছে ময়ূরাক্ষীর মধ্যে :

"আমার মন বসবেনা আর কোথাও
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে :" (বাসা)

সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানী হরিপদর কানে যে মুহূর্তে কর্ণেটের সুর ভেসে আসে, ঠিক সেই সোনা-জড়ানো শুভক্ষণটিতে তার মনে প'ড়ে যায় ধলেশ্বরী তীরের বিপ্রলব্ধা বাসক সজ্জিকাকে।

"সেইখানে বহি চলে ধলেশ্বরী
তীরে তমালের ঘন ছায়া
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। (বাঁশী)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভূমিতে যে নির্ঝর একদিন স্বতোৎসারিত হ'য়ে ছিল সে-ই ক্রমশঃ পদ্মা চঞ্চলা, কোপাই রূপে সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে। কখনও সে লোকালয়ের ভিতর দিয়ে নূপুরের শিঞ্জিনী বাজিয়ে চলেছে, কখন ও বা নিঃশব্দে দ্রুত 'বয়ে গেছে জনদৃষ্টির অন্তরাল বর্ত্তী কোন ভূমির উপর দিয়ে। কবি আপন বীণা হাতে সর্বত্র তাকে অনুসরণ করেছেন।

একদিন সে নদী সকল দৃশ্য পিছনে ফেলে মোহনায় এসে পৌঁছলো—তখন বিহগ-কূজিত, তরুলতা পুষ্প সমন্বিত বনানী, জনকলকাকলি মুখরিত জনপদ কিছুই নাই; সীমার জগৎ অবসিত, সম্মুখে বিসর্পিত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। সেই পরম লগ্নটিতে সমুদ্র ব্যাকুল বাহু বিস্তার ক'রে আহ্বানের সুরে 'দুলে উঠলো—অভিসারিনী নদী পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনে বিলীন হ'য়ে গেল।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ পুরবী রাগে শেষ গান গাইলেন—

"সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরনী হে কর্ণধার।"

ছিন্নপত্রে কবি পরিচয়

রাণী বণিক

●

রবীন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্র সুবিশাল এবং তা অতলগর্ভ। সেই বিশাল প্রাংগণে কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন যেন মাঝে মাঝে দুর্লভ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই ব্যক্তিজীবনের কথাও নানাভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। এমনকি ঘরোয়া চিঠিতেও। তবুও তার সাহিত্যিক মূল্য কমেনি। ১৮৭৮এ রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' প্রকাশের সংগে সংগেই তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু। 'ছিন্নপত্র' তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে নূতন রস নববৈচিত্রের দ্যোতনা করে।

১৮৮৫ খৃঃ থেকে ১৮৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত দশ বছরের লেখা পত্রাবলী ছিন্নপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে কবি তাঁর কাব্যজীবনে কড়ি ও কোমলের পর থেকে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালীর কিছু অংশ রচনা করেন। তা ছাড়া চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ ইত্যাদি খণ্ডনাট্যগুলিও সমসাময়িক কালে রচিত হয়। কাজেই, কাব্যজীবনে কবি এই সময়ে যে ভাবচক্রে অবস্থান করছিলেন তারই আভাস যে আমরা ছিন্নপত্রেও পাব সে কথা বলাই বাহুল্য। যে বিচিত্র ভাব রাজি কাব্যগুলিতে বিকাশ লাভ করেছে কবি মানসে সেগুলি বীজাকারে কেমন করে সেগুলি অবস্থান করেছিল তারই সম্যক পরিচয় লাভে ছিন্নপত্র আমাদের সহায়তা করে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নশাখাকে বিচিত্র সম্ভাবনায় পূর্ণ করে তুলেছেন কিন্তু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের এই বিভিন্ন শাখায় যেখানেই তিনি স্পর্শ করেছেন সেখানেই তাঁর কবি পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রেও রবীন্দ্রনাথের কবিমানস আপনাকে ব্যক্ত করার চেষ্টায় উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একসময় ইন্দিরা দেবীকে লিখে ছিলেন যে তিনি যেন পত্রগুলিকে নকল করে তাঁকে একবার পড়বার সুযোগ দান করেন যার ফলে বৃদ্ধ বয়সেও কবি নিজ যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে পুনরায় দর্শন করবার সুযোগ পেতে পারেন। সুতরাং লেখক নিজেই এই আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে কবিস্বপ্নের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে যে ভাবনা তাঁর অন্তরে এসে আঘাত করেছে পত্রে তা স্থান পেয়েছে এবং এই প্রকাশের যে ভঙ্গী তাও গদ্যগন্ধী নয়।

রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি। তিনি যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে ব্যক্ত করছেন তখনও সেই রোমান্টিক কবি মনের পরিচয় স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। অজ্ঞাতের জন্য, সুদূরের প্রতি একটা রোমান্টিক ব্যাকুলতা কবি মানসে শৈশবেই জাগ্রত হয়েছিল, ৫৬ সংখ্যক পত্রে আমরা এই উপলব্ধির প্রকাশ দেখছি—"গভীর রাত্রে যে দিন ঘুম নেই, সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত, মাঝে মাঝে গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এই সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতর কল্পনা স্রোত বইতে থাকে এবং তাহার দুই পারের তটদৃশ্যের মত নব নব আকাঙ্খার চিত্র দেখা দিতে থাকে।" এই রোমান্টিক কবি মনের সাক্ষাৎ আমরা পত্রাবলীর অনেক পত্রেই পাই। আর তারই ফলে কবি মন কাব্যে যেমন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিমুখে যাত্রা করেছে পত্রাবলীতেও ঠিক অনুরূপভাবেই রোমান্টিকতা বিলাসী রবীন্দ্রমানস সুদূর সৌন্দর্যের প্রতি অভিসার করেছে। আদর্শ সৌন্দর্য্য চিরদিনই বাস্তবাতীত কেবলমাত্র স্বপ্নচারী মন বিশ্ববন্ধনকে অতিক্রম করে এর সন্ধানে ব্যগ্র আকাঙ্খার বেরিয়ে পড়ে। কবির কাব্যে আমরা এই স্বপ্নচারী মনের সন্ধান পাই। পত্রাবলীর ২৩ সংখ্যক পত্রে তারই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি—"এখন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তি অর্ধচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়া মিশ্রিত, বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর এবং মনে করা যেতে পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

কবির প্রকৃতি প্রীতির পরিচয়ও পত্রাবলীর মাধ্যমে আমরা লাভ করছি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য রসিক কবি। কাজেই সৌন্দর্যের যে নিরন্তর প্লাবন প্রকৃতির মধ্যে বয়ে চলেছে তাকে তিনি অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। জ্যোৎস্নায় প্রতিফলনে বিস্তৃত মাঠের আলোকোজ্জ্বল মূর্তি, নদীর জল, সমতল তীর, ধান্য ক্ষেত্রের সবুজ, সুন্দর মূর্তি, গ্রামের গাছ পালা গুলির বর্ষারসানে সতেজ ও নিবিড় শ্যামস্নিগ্ধ পত্রের অনেক জায়গাতেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু কেবল প্রকৃতির এই বহিরঙ্গ সৌন্দর্য্য নয় এর অন্তর্লীন সৌন্দর্য্যর যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন পত্রগুচ্ছে তাকেও তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতির মধ্যে এক সুমহান সত্তার সন্ধান কবি পেয়েছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে কবি মনের একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগ-রক্ষার ব্যাকুলতাও পত্রগুচ্ছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কবির কাব্য জীবনে প্রকৃতির যে রহস্যময়তা তাঁকে বারংবার আকর্ষণ করেছে কবির সচেতন জীবনেও সেই প্রকৃতি প্রীতি কী গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে ছিন্নপত্রে তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ছিন্নপত্রের অধিকাংশ পত্রই সোনারতরী, চিত্রার যুগে রচিত। এই সময়ের কাব্যগুলি কবির মর্তপ্রেম বিশালতার পরিচয়ে বহন করে। তৎকালীন কবিমন সুলভ এই মর্ত্য প্রীতি পত্রাবলীতেও দেখা দিয়েছে। কান্নাহাসির দোল দোলানো এই জীবনের প্রীতি আকর্ষণ কবির এই সময়ের কাব্য গুচ্ছের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য। এই জগতের প্রতি অনুপরমাণুর সঙ্গে তাঁর মন যে নিগূঢ় বন্ধনে জড়িত পত্রাবলীতে কবি অকুণ্ঠ ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। ১১০ নং চিঠিতে তিনি তাই লিখছেন—"এই যে আমরা কয়েকজন প্রানী জড় মহাসমুদ্রের বুদবুদের মত ভেসে এক জায়গায় এসে ঠেকেছি অপূর্ব এই সংযোগ টুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত আনন্দ তা আবার শত যুগেও গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।" সমস্ত পৃথিবী যে অসীম স্নেহ বন্ধনে পরস্পরকে আবদ্ধ করে রেখেছে সেই বন্ধন ছিন্ন করবার বেদনা যে কী গভীর তারই প্রকাশ ঘটেছে আবার 'যেতে নাহি দিব কবিতায়'। কাজেই এই মানব জীবনের ক্ষুদ্র স্নেহ টুকুর বন্ধনে পরস্পরকে বেঁধে রাখবার যে ঐকান্তিক আগ্রহ এই যুগের কাব্য কবিতায় প্রকাশিত, ছিন্নপত্রেও সেই একই ভাবের স্ফুরণ ঘটেছে। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি কাব্য যে কবি মানসের প্রকাশ, ছিন্নপত্রেও সেই একই কবিমন ভিন্নতর পাত্রে আপনাকে প্রকাশ করেছে।

রোমাঁ রোলাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচন্দ্রনাথ পাল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রোলাঁর জন্ম হয়। ১৮৬১ সালে কবিগুরু আর ১৮৬৬ সালে রোলাঁর জন্ম হয়। উভয়ের মৃত্যুও হয় মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে যথাক্রমে ১৯৪১ সাল এবং ১৯৪৪ সাল। রোমাঁ রোলাঁ জাতিতে ফরাসী। আজীবন সাহিত্য, সংগীত, শিল্পের পূজা করে এসেছেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডেই কাটান। প্রাচ্যদেশের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধাশীল রোলাঁ। যখনই কোন ভারতীয়র সংগে পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছে তখনই তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। যে কজন বিশিষ্ট ভারতীয়দের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ঘটে তারমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাগান্ধী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, তাঁর মতবাদ তিনি তাঁর দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করেন। 'Inde' নামক বইটিতে সে সব কথা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগে আলোচনায় মুখ্যত বিষয় ছিল, সাহিত্য, সংগীত এবং মানবহিতকর বিষয় সমূহ। ধর্মও আলোচিত হোতো তার সঙ্গে। রোমাঁ রোলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণর এবং বিবেকানন্দের জীবনী লিখেছিলেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা কেমন ছিল তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এই বই দুটিতে। আলোচ্য প্রবন্ধে রোমাঁ রোলাঁর এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচিত হোলো।

—লেখক

ভারতবর্ষের প্রতি রোমাঁ রোলাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মনোভাব রোলাঁকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহশীল করেছিল। বিভিন্ন সময়ে রোলাঁ বিশিষ্ট ভারতীয় মনীষীদের সংগে পরিচয়লাভ করে ভারতকে জেনেছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিশেষভবে লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট ভারতীয় বন্ধু হিসাবে তিনি পেয়ে ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় একই সময়ে উভয়েরই জন্ম। ১৮৬১ সালে কবিগুরু এবং ১৮৬৬ সালে রোমাঁ রোলাঁ জন্মেছিলেন। একজনের জন্ম হয় বাংলার মাটিতে অন্যজন জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সের ক্র মেসীতে ফরাসী শিল্পের আবহাওয়ার। দুজনের পটভূমিকার পার্থক্য ছিল কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একই।

কবিগুরুর সংগে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অনেক আগেই রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯১৬ সালে সমগ্র পৃথিবী উপনিবেশ স্থাপন আর তার রক্ষনাবেক্ষণ করতে ব্যস্ত। এই সময় রবীন্দ্রনাথ টোকিওর ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে 'জাতীয়তাবাদ' সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দেন উপনিবেশবাদকে লক্ষ্য করে। নির্ভীক এই ভাষণের উত্তরে আপন পরিচয় দিয়ে রোলাঁ লিখলেন,—

"The reading of 'Nationalism' has been a great joy for me, for I entirely agree with your thoughts and I love them even more now than I have heard them expressed by you with this noble and harmonious wisdom which being your own, is so

(and I might say, remorse, if I did not consider myself a human being rather than a European) when I consider, monstrous abuses which Europe makes of her power, this havoc of the Universe, the destruction and debasement of so much material and moral wealth of the greatest forces on earth which it would have been in her interest to defend and to make strong by uniting them to react. It is not only a question of injustice, it is a question of saving humanity.

Inde—Romain Rolland)

দুই মহান দেশের এই দুই মণীষী শিল্প, কলা সংগীত মানব দর্শন এবং বিশ্বশান্তির উপাসক ছিলেন। আর ঠিক সেই কারণেই তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। রোমাঁ রোলাঁ চেয়েছিলেন তাঁর ক্রীস্তফ এবং অলিভিয়েব একই ব্যক্তি হবে। যোগ হবে সহজাত প্রবৃত্তি, মেধা; সৎচিন্তা এবং কর্ম। কবিগুরুর সংস্পর্শে এসে রোলাঁর মনে সেই প্রকৃত মানবের বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি রূপ রেখা তিনি কবির মধ্যে খুঁজে পেলেন। কবিগুরুও কয়েক যুগধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ইয়োরোপের এমন একজনকে যার মধ্যে ছিল সৎপ্রাণ, সদিচ্ছা, সাহস, নিষ্ঠা এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব। অবশেষে রোলাঁকে পেলেন আদর্শ মানুষ হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি রোমাঁ রোলাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি কবিগুরুর সংগে একমত হোয়ে ছিলেন বিশ্বের চির শান্তির উপায় উদ্ভাবন করতে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রোলাঁ নিজমাতৃ ভূমি থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হোয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে যেখানে তিনি রেডক্রসের মাধ্যমে মানবের সেবা করেন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগেই কবিগুরু দেখেছিলেন ভবিষ্যতের যুদ্ধের ভয়াবহতা, অমানুষিকতা কবিগুরুর অনেক কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ একজায়গায় লিখেছেন, "....He has been for us the living Symbol of the spirit of Enlightenment and of Man, the great bird of freedom, circling above us admist the tempests,—the Song of Eternity which vibrates from golden harp, above the sea of unchained passions.

But his sovereign art has never dissociated itself from human misery and the heroic struggles of people for freedom. In the hours of tragedy he was the Calm and intrepid sentinel of his people and of the world.

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্বের সংগঠণ রোলাঁকে মুগ্ধ করে। কবিগুরুর স্বপ্ন সার্থকতায় মণ্ডিত হয় বিশ্বভারতীর মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চত্যের মিলন ঘটিয়েছিলেন এখানে তিনি। বিশ্বভারত নামেই এর পরিচয়, নামই এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। সর্বজাতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি এখানে। সেই কারণেই ভারত ভ্রমণকারী প্রতিটি বিদেশীর কাছে বিশ্বভারতী একটা অবশ্য দর্শনীয় স্থান। শান্তি নিকেতন সত্যই শান্তির নিকেতন। শান্তি নিকেতন এবং বিশ্বভারতী সম্বন্ধে রোলাঁ এক জায়গায় লিখেছেন—

"তিনি (ঠাকুর) ভারতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছেন। সেখানে প্রায় সব দেশের অধ্যাপকেরাই অধ্যাপনা করেন। এবং বিদেশী এবং ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক সমাজগত, সংস্কৃতিগত ঐক্য স্থাপিত হোয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান, শিখ, পার্শী বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান, ইহুদী সকল ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা সমাদরে গৃহীত হয় এবং প্রত্যেকেই সুযোগ পায় বিশ্বভারতীকে তাদের নিজনিজ বৈশিষ্ট্য সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস জানাবার। ছাত্রাবাসে এবং খাবার ঘরে

পেয়ে থাকে। জাতি, ধর্ম, এবং দেশীয় মনোভাবের ঊর্দ্ধে থাকে। সকলে শিক্ষালাভ করে।" (Inde)

রোমাঁ রোলাঁ শান্তিনিকেতনে এসে কিছু সময় কাটিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ১১ই জুন ১৯২৩ সালে লেখা একটি চিঠিতে তিনি গুরুদেবকে লিখেছিলেন।

'প্রিয় বন্ধু আমি আপনাকে ভারতে গিয়ে দেখবার জন্য খুব উৎসুক। আমার মনের সব ইচ্ছা এখন ঐ দিকেই গিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় এ বছরে বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু আমার আশা আছে একবার সাগর পাড়ি দিয়ে কাটিয়ে আসব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে। আপনার কাছে আমার শেখবার অনেক আছে। আমার বিশ্বাস আমার পূর্বপরিকল্পিত কাজগুলি আমার জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারব। আগামীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মিলন ঘটবেই। আমার কাছে ভারতবর্ষ আর বিদেশ নয়। .... (Inde)

রোলাঁ চেয়েছিলেন প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিক সংযুক্তি। তিনি লিখেছিলেন, "There is neither occident nor orient for the naked soul. They are the garment. The world is his home. His home being for all and to all.

বাংলার কবি পৃথিবীর জনগণের হৃদয় জয় করে তাঁর মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই তিনি পৃথিবীর জনগনের হৃদয় জয় করেছিলেন। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সংগঠনের প্রারম্ভেই তাঁকে বিশ্বের বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধা পেতে সাহায্য করেছিল। মানবতার জন্যই তাঁর ঐক্যের প্রচেষ্টা সর্বজন পূজিত ছিল! এই ঐক্যস্থাপনার মধ্যেই জীবনের সর্বনাশ রোধ করার উপায় বর্ত্তমান। সমস্ত পৃথিবীই তাঁর ঘর—

"দেশে দেশে আছে মোর ঘর আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া" কবির, বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হোয়েছে এই কবিতায়।

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হোতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে,
যাবেনা ফিরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

আজ পঁচিশে বৈশাখে
পিক কী গান গাহে শাখে
মুখে মুখে শাঁখে শাঁখে
ওঠে কিসের হুলুধ্বনি!
ফোটে কুসুম বিপিনে
ছোটে শিহর তৃনে তৃনে
বন বীনায় মনোবীনে
বাজে কাহার আগমনী?

এল' একদা এই দিনে
কবি ধরার পথ চিনে
স্মরি' সে চির নবীনে
আজি হাসিছে প্রকৃতি
যত সুখ দুখ আশা
যত নাহি বলা ভাষা
যত না-মেটা ভিয়াসা
ঘর নাহি-গাওয়া গীতি।

সব সুরে লয়ে তানে
সারা নিশি দিন মানে
ওঠে বেজে গানে গানে
সেই কবির বীনা তারে;
আজো সে গানের রেশে
সেই সুরে ভেসে ভেসে
কাল কাটে কেঁদে হেসে
এই কালের কারাগারে।

সেই বৈশাখ পঁচিশে
শুধু সেবার আসেনি সে
আজ কালের স্রোতে মিশে
তার চির আসা যাওয়া;
কান পাতিয়া অবনী
শুনে তারি পদ ধ্বনি
হয় তারি আগমনী
তার সুরে সুরে গাওয়া।

তোমারে প্রণাম

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

●

সীমা অসীমের কবি প্রণাম তোমারে।
তোমার মাটির গান দূর শূণ্য পারে
আজো চলে তরঙ্গিয়া। সুন্দরের সাথে
শিব, সত্য রাঙারাখী বাঁধে হাতে হাতে।
মানুষের মনোভূমি রহস্যতে ভরা।
নিতি সেথা জমে উঠে স্বপ্নের পশরা।
নিগূঢ় জীবন রস জাগে গাছে গাছে।
অশোক মঞ্জরীগুলি আন্দোলনে নাচে।
রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, জাগে যেন গতির আবেগ।
পর্বত হইতে চাহে নিরুদ্দেশ মেঘ।
বাঙ্ময় বিচিত্র রূপ তোমার লেখনী
এ সকল ব্যক্ত করি হ'ল শিরোমণি।
কবি সার্বভৌম, জানি কালজয়ী তুমি।
শতাব্দি প্রভাতে তাই তোমারে প্রণমি।

●

শীত সংগীতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীর কুমার হালদার

সুর দিয়েই প্রধানত সংগীতের সার্থকতা বিচার্য। কথা তো সাহিত্যের এলাকার জিনিষ। রবীন্দ্র সংগীত ও কথা নিরপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সুরগুলি জনগণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে কিনা, তার চূড়ান্ত পরীক্ষা আজও হয় নি, যেটুকু হয়েছে তা শুধু সিনেমায়। কিন্তু অন্যান্য সংগীতের মতো রবীন্দ্র সংগীতের রূপ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এই সংগীতের অমরতা লাভ করতে পারবে কি? তাই রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে বলে গেছেন যত ভালো জিনিষই হোক, জাতির অন্তরের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। আরো বলেছেন জাতিকে তার গান গাইতে হবে, গাইতে হবে ঘরে ঘরে। বলে গেছেন যদি কোন রচনা নিয়ে অমরত্বের অহঙ্কার করতে পারি, সে আমার সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত রচয়িতা-গণের অন্যতম। আবার ঋতুসংগীত রচনা কালে প্রাচীন রীতি অনুসারে রাগ-রাগিনীর নিয়মকে প্রাধান্য দেন নি কোথাও। বরং বাঙ্গালী মনের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে ভাব আর সুরের সমন্বয়ে যে ঋতু সংগীত তিনি রচনা করলেন তা হোল অনবদ্য, মর্ম্মস্পর্শী।

অন্যান্য গানের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের শীতের গান খুবই অল্প তবু তারই মাঝে পাই শীতের রিক্ততা, শীতের তীব্রতা, ভাবুক শিল্পীর মনে যে কি অপরূপ ভাবের তরঙ্গ তোলে তার একটা সম্পূর্ণ ছবি আমরা পাই। হেমন্ত শেষে আসন্ন রিক্ততার আভাস পেয়ে শিল্পী কাতর সুরে উদ্বেলিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন—

> হায় হেমন্ত লক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
> হিমের ঘন ঘোমটা খানি ধূমল রঙে আঁকা ?
> সন্ধ্যা প্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে
> কণ্ঠে তোমার বাণী কেন করুণ বাষ্পে মাখা ?

কিন্তু হেমন্ত কিছু উত্তর দেবার আগেই শীতের পীড়ন এসে পড়ে প্রকৃতির বুকে তাই কবি গেয়ে ওঠে—

"শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকীর ঐ ডালে ডালে
পাতাগুলি শির শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।"

তবু অবসানের ব্যাথাও শিল্পের দৃষ্টি এড়ায় না, তাই শুনতে পাই—

> "শীতের পরশ থেকে যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে।
> সব খোয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন সকালে

শীত এগিয়ে চলে আপন গাম্ভীর্য্যে, আপন তীব্র, রুদ্রযোগী রূপে। কবির কণ্ঠে। করুণ সুরে ধ্বনিত হয়—

> আমল কি ডাল সাজাল কাঙাল
> খসিয়ে দিয়ে পল্লব জাল
> কাশির হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে।

আকস্মিক কবি দৃষ্টি ঘোরান দিগন্ত বিস্তৃত—প্রান্তরের দিকে যেখানে বসুমতী নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছে সোনালী ধানের মাঝে তাই দেখে কবি কণ্ঠে ওঠে আনন্দের সুর—

> "এলো যে শীতের বেলা বরষ পরে
> এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে"

তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—

> "কর ত্বরা কর ত্বরা, কাজ আছে মাঠভরা।"

অধীর আগ্রহে তিনি আকুল উদাত্ত কণ্ঠে আবার আহ্বাহন করেন—

> "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
> আয় আয় আয়,
> ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
> মরি হায় হায় হায়।"

অবশেষে ধান কাটা সারা হোলে প্রান্তরও শূণ্য, এই রিক্ততায় কবির মন বিষন্ন হয়ে ওঠে। তাই তিনি শীতকে প্রার্থনা জানান—

"নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি, পালাবে শীত ভাবছ বুঝি ?
ওসব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দখিন হাওয়ার পর।"

শীতের ছদ্মরূপ ধরা পড়ে, কবি আনন্দাকুল গেয়ে ওঠেন—

শীতের আর নাই যে দেরী, নাই যে দেরী
সামনে সবার পড়ল ধরা, তুমি যে ভাই আমাদেরি।

কিন্তু দেরী হয় তাই আকুল কবি আবেদন জানান শীতকে—

একী মায়া লুকাও কায়া, জীর্ণ শীতের মাঝে
আমার সয়না প্রাণে কিছুতে সয়না যে,
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ
আপন ধারার মাঝে ?
রিক্ত পাতার শুষ্ক শাখে, কোকিল তোমার
কই গো ডাকে
শূণ্য সভা মৌন বাণী আমরা মরি লাজে।"

এরপর শীতকে তাই বিদাই নিতে হয়—

"ছাড় গো তোরা ছাড় গো
আমি চলব সাগর পার গো।"

শীতকে চলে যেতে দিতে কবি নারাজ, তাই শীতের চলে যাওয়া দেখে কবি বিরূপ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—

নির্দ্দয় অতি করুণ বন্ধু তুমি হে নির্মম,
যা কিছু জীর্ণ, করিবে দীর্ণ দণ্ড তোমার দুর্দ্দম।"

শীতকে তিনি শাসন করেন—

"ভাঙবো তাপস ভাঙ্গাবো তোমার কঠিন তাপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন।

তিনি আত্মশাসন ও করেন—

আয় কবি চল সঙ্গে ছুটে, কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে
গানে গানে উদাস প্রাণে জাগাবে উন্মাদন
পলাশ রেণুর রঙ মাখিয়ে নবীন বসন এনেছি
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরোনো আচ্ছাদন।"

তাই কবি বুঝিতে পারেন যেশীত বসন্তেরই অগ্রদূত ন
এ তো বসন্তেরই রূপান্তর। তিনি গেয়ে ওঠেন—

"আমরা নূতন প্রাণের চর'।

●

কবির জন্মদিনে

●

আকাশে বাতাসে পথের প্রান্তে তোমারি নামের গানে,
কাঁদিয়া ফিরিছে মর্তবাসীরা বিরহ ব্যাকুল প্রাণে ;
পরিচয় তব 'কবি সম্রাট' কীর্তি যে সুমহান,
তুমি কি তবুও শুনিতে পাও না তোমার নামের গান !
তোমার সাধনা হয়েছে সফল, ধন্য হয়েছে দেশ,
তোমার স্নেহের দান যে আজিও হয়নিক' নিঃশেষ।
তাই তো আজিকে ভক্তি ধূপেতে স্মৃতির স্মরণী জ্বালা,
দিলাম আজিকে তোমার চরণে প্রণাম পুষ্প ডালা।

নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি যাচ্ছে পড়ে তবে তাও বরণীয়। বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্র হচ্ছে অকৈতব্য ও অকপটতা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ উনিশ ও বিশ শতকীয় বাংলাসাহিত্যের সার্থক প্রতিনিধি। একদিকে তিনি আগাগোড়া মন্ময়—বাহ্ বিলাসও ছিল তার প্রাকসাধনায়। তবু অন্তর্মুখী যেসব বিলাসীদের অন্যতম তিনি নন। ফ্রয়েডএর মতে সাধ বা সাধ্য থাকলেই, মানুষ মহাপুরুষ পদে পৌছায় না উক্ত সম্মান সে তখনই পায়, যখন তার মূল উপলব্ধি সাম্প্রদায়িক আদর্শের শাসন মানে। যখন তার মনোমুকুরে স্বদেশের মানচিত্র ফোটে, যখন তার ব্যক্তিস্বরূপের জাতিরূপ সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বদলে যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অবিশিষ্ট বলেই তিনি বাংলা দেশকে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির ভাগী করে তুলেছেন; এবং সে অনুভূতি এমনই বিশ্বজনীন, এতখানি সার্বভৌম যে তার অভিব্যক্তি শুধু স্বজাতীয় বোধগম্য নয়, আপাতত বিদেশীরাও তার মর্ম গ্রহণে সক্ষম। সেই রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা প্রাদেশিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বচেতনার বাহন হয়ে উঠেছে এবং এই উৎক্রান্তির ফলে যে ভাষা বৈচিত্র দেখা গেছে তা প্রাক রৈবিকযুগে স্বপ্নের অগোচর ছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি প্রাও মোগল যুগে। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাঙালী কবিতা লিখেছে—কিন্তু তিন চারজন সর্ববাদি সম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে আমাদের ভাণ্ডারে কিছু থাকে না। রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান প্রভৃতি যাদের কলম থেকে বার হয়েছিল—তারা কল্পনায় শোচনীয় অভাবকে উৎভাবনার আতিশয্যে ঢাকা দেওয়ার প্রয়াস পর্যন্ত পাননি। ফলে আমাদের আধ্যাত্ম কবিতায় আত্মদর্শন বা অমৃত পিপাসা নেই—আছে কুসংস্কার, আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি। আমাদের নিসর্গ কাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগবাহুল্য বাংলায় কবি কাহিনী এমনই চলেছিল। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রণীশোভন অধ্যবসায়ের ফলাফল যদি আমরা না পেতাম তাহলে বাংলা পদ্য আজও ঈশ্বর গুপ্তের পদাঙ্কে চলত। আর বাংলা গদ্যে শোনা যেত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি। অবশ্য তাঁরা উভয়েই যে বাঙালীর পক্ষে চিরস্মরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আরও অনেক দোষ প্রাচীন বাংলা কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। সেকালের কবিতা যেহেতু সঙ্গীতের অনুগত, তাই তার ভাবাস্পষ্টতা যেমন জনতার অনুমোদনে পূর্ণতা পেত, তেমন তার ছন্দ শৈথিল্য ঢাকা পড়ত গায়কের স্বরবিস্তারে। এমন কি বিদ্যাপতির মত স্বভাব কবি ছন্দো ব্যাপারে সুবিধাবাদী। ভরতচন্দ্রের অন্যতম অবদান এই যে তিনি অব্যবস্থিত বাংলা ছন্দোকে শৃঙ্খলা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে শৃঙ্খলা স্বাতন্ত্র্যশাসন থেকে জন্মায়নি। তার পিছনে ছিল সংস্কৃত ছন্দো শাস্ত্রের নির্দেশ সেইজন্য লঘুগুরু ছন্দে ভারতচন্দ্র শুধু স্তোত্রই লিখেছেন তাঁর অতুলনীয় বস্তুবিলাস ব্যক্ত হয়েছে পয়ারে বা পয়ারের অপভ্রংশে। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রাগরৈবিক আদর্শের নাম গন্ধ নেই—তার বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রনাথেরই সাধনা লব্ধ।

রামমোহনী যুগ থেকে পাশ্চাত্ত ভাবনায় চর্বিত চর্বন বুদ্ধিমান বাঙালীর আত্মকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববর্তীদের তফাৎ এই যে তিনি তাদের মতো ভাব আর ভাষার মধ্যে ব্যবধান রাখেননি। ভাবের গতিকে ভাষার গতিপরিবর্তন অনিবার্য বুঝে সাধু বাংলার কাঠামোকে এমন করে বদলেছিলেন যাতে তার স্বধর্ম বজায় থাকে, অথচ প্রকাশের বিকার না ঘটে। হয়ত সেই জন্যই 'পঞ্চভূত' ও 'আত্মশক্তিতে' বৈদেশিক সুর বাজে। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক গদ্য সাধনা মোটের উপর বঙ্কিমী। তার মধ্যে বিদ্রোহের উন্মাদনা নেই—তৎসত্ত্বেও তাতেই তিনি স্বীয় ব্যক্তিস্বরূপের ছাপ ফুটিয়েছেন। আসলে বাঙালী গদ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমই সর্বাগ্রে গতানুগতিকের উৎপীড়নে ধৈর্য্য হারিয়েছিলেন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ছিলেন—আবার তাঁর বঙ্কিম বিরোধিতাও সেই কারণেই মেকী নয়। বস্তুত রবীন্দ্র রচনার উত্তর কাণ্ড একটু বেশী

শুদ্ধ। প্রকরণকে প্রসঙ্গের উপরে প্রাধান্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। ঘরে বাইরের সন্দীপ, যোগাযোগের মধুসূদন, অনাত্মীয় বলেই, নিখিলেশ বিপ্রদাসের চেয়ে জীবন্ত। তাঁর এই যুগের গদ্যকে ক্ষুরধার করবার সহায়তা করলেন—তাঁর ফরাসীবিদ দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথ—পরে প্রমথ চৌধুরীও তাঁর সবুজ পত্র। সে ইতিহাস অনেক—এখানে বলার অবসর নেই। আবার কবিতার দিকে ফিরি। পয়ারের পদ্মমধু পান করে বঙ্গ ভারতী কম বিপদে পড়েনি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধ হয় অশেষ, তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন এবং পোষাকের এমনই গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাঞ্চল্যের হিল্লোল উঠলো। পয়ারের সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গার কথা কবি মোহিতলাল এক সার্থক সনেটে সুন্দর লিপিবদ্ধ করেছিলেন একদা। কবিতাটি পাঠ করি।

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ বিলাসিনী।
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে
চপল চরণ ভঙ্গে মজাইবে মুকুতহাসিনী।
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদপদ্মাসনে—
সে বাণী আকাশে উঠে। শিখা যার হোমহুতাশনে,
পশে পুনঃ রসাতলে - মানুষের মর্মনিবাসিনী।

করি উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পায়াদের মুক্ত ধারা এ বঙ্গের কপিল আশ্রমে ;
বলাকার মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর সঙ্গমে!
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর নিক্কণ ?
কোথায় জাহ্নবীধারা ? কূলে যার দেবতারা ভ্রমে।

বস্তুত বাংলা কাব্যের হাওয়া বদলে মধুসূদনের দান অনেক—সেকথা বলতে গেলে কবি সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন ও মোহিতলালের বাণী উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা করে। বাংলা কাব্যে মাইকেল কেবল নিয়ামক হিসাবেই অদ্বিতীয় নন, চরিত্র গুণের অনটনে তাঁর বিরাট কবি প্রতিভার অংশখানি যদিও অপ্রকাশিত, তবু তিনি একজন মহাকবি এবং যতদিন বাংলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, ততদিন তাঁর নামকীর্ত্তনে লোকাভাব ঘটবে না। মাইকেল শুধু ম্রিয়মান বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলে ঝিমিয়ে পড়েননি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে বাঁচিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না পেলেও বঙ্গ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অভিষেক হয়ত যথাসময়ে ঘটত এবং তাঁর সমান কবি যেমন শতবর্ষে একবার জন্মায়, তেমনিই তাদের আগমন ধূমকেতুর মত স্বয়ংবশ ও স্বতঃসিদ্ধ। তৎসত্ত্বে এ কথা অতি সত্য যে মাইকেলের বৈফল্য তাঁর সামনে যদি জাজ্জ্বল্যমান না থাকতো তবে অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শক্তি ফুরাত। রবীন্দ্র আলোচনায় মাইকেলী প্রসঙ্গ অবান্তর। তাই এ প্রসঙ্গ রাখা গেল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের যে হর্ম্যসোপান রচনা করেছেন—তা যেমন মনোহর তেমনই জীবন ও কালভূয়িষ্ঠ।

যে কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বকে আশ্রয় নেয়, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক। তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্প-প্রকরণের কোন গতানুগতিক আকার ধরা পড়ে না। যারা মহত্ত্ববোধকে কাব্যের যোজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন—প্রথা তাদের কাছে স্বভাবতই তুচ্ছ। মহত্তের এতাদৃশ নিয়ম লঙ্ঘণই রসিক সমাজে আর্ষ প্রয়োগ নামে পরিচিত। আমাদের রবীন্দ্রনাথও আর্ষ প্রয়োগক্ষম কবি। সেই জন্য তিনি আবাল্য কাব্যকে মুক্তির বিজনপথে তাড়িয়েছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার অত্যাশ্চর্য গুণ হচ্ছে তার প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য, তার অশেষ পরিবর্ত্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি।

২৫শে বৈশাখ ভারতবর্ষের জাতীয় পঞ্জিকার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়-দিন। এই স্মৃতি দিবসের নায়ক এত বড় যে আয়াসে তার সম্পর্কীয় সব কথা বলা যায় না। এই কবি প্রতিভার বিরুদ্ধেও বিরোধিতা এসেছিল— [illegible]

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

যামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে অল্প পরিসরে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার মূল কথাগুলি এই।—(১) রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে, সুতরাং তাঁর ছবি বোঝবার যাঁরা চেষ্টা করবেন, তাঁদের পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের ক্রমবিকাশ জানতে হবে। (২) ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিল্প-ইতিহাসের পর পর স্তরগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ ছবিগুলি দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন; তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্য্য রকমে আয়ত্ত করেছিলেন। এই নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে পতন ঘটেছিল তাঁর। যাঁরা তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই দিকে তাঁরা সজাগ থাকলে ভাল হ'ত। আশ্চর্য্য সক্ষমতার সঙ্গে অক্ষমতার মিলন দৃষ্টিকটু। সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে আঁকা অবাস্তব ছবির মধ্যে এখানে ওখানে রিয়ালিষ্টিক ছোঁয়াচ লাগাতে রসাভাস হয়েছে। (৩) রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় তাঁর সবলতার জন্যে, ছন্দবোধের জন্যে, যে বস্তু দুটির অভাব বাংলা দেশের আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি সতেজ শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে কারবার করেছেন। (৪) রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সুর চাইতে বিস্ময়কর, তাঁর কল্পনার বিরাটত্ব। সর্ব্বত্রই দেখি, তিনি বৃহৎকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

সেই প্রবন্ধে আরও অনেক-কিছু দোষ গুণের আলোচনা করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর তিন চার মাস আগেকার লেখা হ'লেও আমার সৌভাগ্য এই যে তিনি সেটি প'ড়ে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং পত্রযোগে সে কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। সেই পত্রটি আমি এখানে মুদ্রিত করলাম।—

শান্তিনিকেতন; ২৫।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নয়, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মত গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিষ্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্‌খানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্য্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমার দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলে মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্য্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এই জন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনও হয়নি সে কাজ করতে হ'লে ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ব্যক্তির প্রয়োজন। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন অন্ধভক্তি এবং অকারণ বিরূপতা এই দুয়ের মধ্যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে দোল খেতে হবে।

—'শনিবারের চিঠি' সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সাহিত্যে

শ্রীহারাধন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ কবি। ভারত আত্মার মহাকবি। তিনি বর্তমান কালের উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রধার, এমন কি তাঁর বাণী ব্যতিরেকে ব্যবসা বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্র প্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়। শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সাফল্য যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। অন্ততঃপক্ষে স্বকীয় মণীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজিতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাষে কেবল সুধীসমাজ সমুজ্জ্বল নয়, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত। সেইজন্য রাবীন্দ্রিক বিশ্ববিক্ষাই অনেকের মতে তরুণ সাহিত্যের মূলধন।

রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই আধুনিক বাংলা কাব্যে উৎশৃঙ্খলতার ব্যপদেশ। অতিশয়োক্তির মত শোনালেও তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অগ্রণীরা যে সার্বভৌম সংস্কৃতিক স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পাননি, সেই কল্পনা বিলাসকে এই পাণ্ডববর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন বাংলা কাব্য ও রবীন্দ্র সাহিত্য জগৎ—দুটোই ভিন্ন প্রকৃতির। সে কথাটাই সংক্ষেপে বলা দরকার। কাব্য অনাদি। বলা যেতে পারে আদিম মানুষ যবে নানাপ্রকার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিবিধ বস্তু ও আবেগের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পারলে সেইদিনই কাব্যের জন্মতিথি, সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা। তারপর মানুষের ভাষা ক্রমশঃ বাড়লো। সংঘ হল। অল্পে অল্পে যখন সংঘ জাতিতে পরিণত হল, দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলোকে মানুষ বৃত্তিতে বেঁটে নিল, তখন গাথা পরিচালকদের অনির্দ্দিষ্ট স্থান এল চারনের দখলে। আধুনিক কবি সেই চারনের উত্তরাধিকারী। কাব্য কবির পূর্বপুরুষ। কবি কাব্যের জন্মদাতা নয়। প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল কোন ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানব সমষ্টির মনে। কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপর নয়, সমগ্র জীবনের উপরে। প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সংকলন। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে ও বিশ শতকে মনুষ্য সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি বড় হ'ল। ব্যক্তির মধ্যেই বিশ্ব মুক্তস্নান করলো। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে এই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির অগ্রপথিক। তাঁর পূর্ব ও উত্তর জীবনের সাধনায় দুই প্রান্তীয় যুগের সাধনা-সিদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তিনি পর্বগ্রাহীর পদাঙ্কচারী নন।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না। শিল্প ত সৃষ্টি ছাড়া নয়—সৃষ্টির অঙ্গ মাত্র। তাই শিল্পোৎকর্ষের অনন্ত পরীক্ষা সামরিক জীবনের কষ্টি পাথরে তার যোগ্যতা কষে দেখা। অবশ্য এর মানে এ নয় সকল কবিই মহাকালের ক্রীতদাস। বহু পূর্বেই ইংরেজী সাহিত্যে ব্রাউনিং অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে নটরাজের নৃত্যের তাল সব সময় শ্রবণসুভগ নয়—সৃষ্টির সুরে আসন্ন প্রলয়ের আর্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যায়—একমাত্র তিনি জেনেছিলেন যে শিল্প সমৃদ্ধের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়ত আড়ম্বরের অভাব ঘটে। কিন্তু নিঃস্ব নাস্তিকদের আপাংক্তেয় ভাবলে — স শোভাযাত্রার সঙ্গে শবযাত্রার কোন প্রভেদ থাকে না। উল্লিখিত অতিবাদের মাঝে বিংশ শতাব্দী চোখ খুললো। সকলেই বুঝলো সত্যের শৃঙ্খলা আনতে গেলে—আড়ম্বর মোহ অবশ্য পরিত্যাজ্য। অন্তঃসারশূন্য বস্তু মাত্রেরই আমূল উচ্ছেদ আবশ্যক। শুধু নূতন অট্টালিকা নির্মানে সার্থকতা নেই। হর্মখানাকে বাসোপযোগী, কালোপযোগী করা চাই। কেবল নগর সৌন্দর্য্যের জন্য ইটের পর ইট সাজানোতেই যথেষ্ট নয়। বাড়ীতে যারা থাকবে তাদের ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তমাংসে গড়া, দুঃখ আনন্দের দাস, পরিবর্ত্তনশীল, বহিমুখ। তাকে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার। তাতে যদি

—চন্দ্রনাথ বসু—সমাজপতি আরও অনেকে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে তার সর্বাপেক্ষা দুর্বিনীত শিষ্য বলতেন—সেই মোহিতলালও ১৩৪৫এর জ্যৈষ্ঠে তাঁর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সহিত তুলনা করিয়াছি। দূর আকাশের তুষারপুরীর মধ্যে তাহার শৃঙ্গরাজি যেমন কখনও আবৃত কখনও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঋতুচক্রের আবর্তন এবং আলো আঁধারের ইন্দ্রজাল যেমন তাহাকে শত বর্ণে বিলসিত করে, অথচ নভোনীলিমার পটোভূমিতে তাহার শুভ্র শেখর অঙ্কিত হইয়াই আছে; তেমনই, রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ বৈচিত্রের একটা মূল প্রকৃতি বা স্থির রূপ আছে; কিন্তু কাব্য রসিকদের পক্ষে সেরূপ আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই, আমরা বর্ণ বৈভব ও রূপ বৈচিত্রের জন্যই সেই গিরি শিখরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধন্য হইয়াছি।" রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার এই বিচিত্রতার জন্য তাঁর গীতিকবিতা সর্বজয়ী হয়েছিল। তাঁর সিদ্ধিও এইখানে; তাঁর প্রকাশভঙ্গি জীবনের মতই পরিবর্তনশীল, এর বিশ্ব-ব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্বভূক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্য তার আসঙ্গ নিরাপদ নয়। চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে মরে। যিনি অম্লান থাকেন তিনি বসুধার দুহিতা সীতা। তাই তপস্যা কঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়ত সর্বনাশের সূত্রপাত। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে একদা এই বিশৃঙ্খলাই ঘটেছিল—অক্ষম অনুকারীদের হাতে তবু রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদী। বাংলা সাহিত্যের এক সংস্কৃতি সংকটে কবি বুদ্ধদেব বসু তার "An Acre of Green Grass" গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছিলেন—সেই আশার প্রতিধ্বনি করেই আজিকার প্রসঙ্গ শেষ করছি।

Anarchy, has been bitter in Bengal, sanity sabotaged. and dark, now, with confusion is our literary scene....But time the incrutable scene shifter, is tirelessly at work and history teaches us to hope that the bligth will soon be over. Specially now that our political freedoom has been attained, there is every reason to look forward to a time when our literature, released from the obligations of public service. freed from froth, cured of sobs and bravado will become adult, fully mature. The soil is rich, the waters are sweet, and the sands of Rabindranath can not have been cast ni vain.

খুকুর রবি ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আসবে কি-মা রবিঠাকুর
বল আমায় সত্যি করে,
ছবিতে তাই ফুলের মালা—
পরিয়ে দিলে আজকে ভোরে?
দু'পাশে ঐ ফুলদানিতে
সাজিয়ে দিলে ফুলের তোড়া,
আমের পাতায় গাঁথলে মালা
ঝুলিয়ে দিলে সকল দোরে?

* * *

ধূপের ধোঁয়ার পরশ ছোঁয়া
বাড়ী যে, আজ লাগছে ভালো,
পঁচিশ তারিখ বোশেখ মাসের
আরতি দীপ তাই কি জ্বালো?
দাও সাজিয়ে বইগুলি তা'র
ছবির কাছে যতন করে,
ফুলভিজানো জলের ধারা
পথে পথে আজকে ঢালো।

* * *

জান কিমা স্বপ্নে আমার
রবি ঠাকুর নিত্য আসে,
বকুলবনের ছায়ায় যে তার
পায়ের ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে।
দেয়ার ডাকে গোপন পথে
কেয়া যখন ধরায় ফোটে,
ছায়া ঘনায় বনে বনে
রবিঠাকুর দাঁড়ায় পাশে।

* * *

শরৎপ্রভাত ভরছে যখন
অরুণ আলোর অঞ্জলিতে
মাঠে মাঠে ধান ধরেনা,
দোয়েল-কোয়েল-শ্যামার গীতে
আকাশ বাতাস উঠছে কেঁপে,
কোন অতিথি দাঁড়ায়ে দ্বারে,
রবিঠাকুর ছাড়া কে আর?
—এল বুঝি আশিস্ দিতে।

গগন ভরে কেদিল আজ
এলোচুলের বাধন খুলি'?
চরণে কার জড়িয়ে গেল
বনফুলের পাপড়িগুলি?
কেয়াপাতার নৌকা নিয়ে
কে যেন আজ ডাক্‌লমোরে,
নতুন ধানের মঞ্জরীতে
গানখানি কার উঠলদুলি'?

* * *

বাঁধভাঙ্গা ঐ চাঁদের হাঁসি
উছলে পড়ে আকাশ জুড়ে,
হাঁসজোড়াটি সন্ধানে কার
দিক্‌বিদিকে চল্‌ল উড়ে।
প্রদীপজ্বালা ঘরে যে আজ
ফাল্গুন বাতাস ঘুমায় বুকে,
রাজার দুলাল আসবে কি আর
অচিন্ পথে ঘুরে ঘুরে?

* * *

সত্যি মা আজ আমার মনে
রবিঠাকুর দেয় যে সাড়া,
স্বপনভাঙ্গা নির্ঝরেরা
ভাঙ্‌ল বুঝি পাষাণ কারা?
কোন তারকা ঝাপিয়ে পড়ে
ধরার বুকে মরণ নিয়ে?
আজো কারে বেড়ায় খুঁজে
নিশীথ রাতের বাদল ধারা?

* * *

রবি ঠাকুর আসবে কি-মা?
ভাল করে দেখবে কাছে,
চোখ মুছে তাই কাঙাল মেয়ে
ধনীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে!
আমিও মা তাকিয়ে আছি
পথের পানে আপন মনে,
পঁচিশ তারিখ আজ বোশেখের,
লগণ বয়ে যায় বা পাছে!

সমকালীন রবীন্দ্র অনুধ্যান

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মহান কবি এবং গদ্য লেখক। তিনি মহর্ষির পুত্র এবং নিজেও ঋষি সাধক। তিনি এমন এক বংশোদ্ভূত যাঁদের বাংলার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দান আছে। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও শাখা নেই যা তিনি স্পর্শ করেননি, যা তিনি শোভিত করেন নি, মানোন্নয়ন করেন নি, উদ্দীপনায় ভরিয়ে তোলেন নি, এবং প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত করেননি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাঁর যৌবনোত্তর কালের বিশাল কার্য্যাবলীর তালিকা পেশ করা সহজসাধ্য নয়— কারণ তিনি বহুমুখী, এবং উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন,—এমনকি তাঁর সাহিত্য জ্ঞানের, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের পরিধি ব্যাপক ও বিশাল।

রবীন্দ্রনাথের অনেক বাংলা রচনার ইংরাজী অনুবাদ এখনও হয়নি কিংবা অন্যান্য পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যভাষাতে অনূদিত হয়নি। অনুবাদ অংশের সব না হোলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংগীতাংশের ভাষার মাধুর্য্য অনেক নষ্ট হোয়ে যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনূদিত কবিতা বা নাটকের মধ্যে কিছু আসল মাধুর্য্য পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা এবং সৃজনী ক্ষমতা, সাহিত্যে তাঁর অবদান, প্রভৃতির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে তাঁর বাংলা রচনা বা তার অনুবাদ এবং তাঁর ইংরাজী রচনা যেমন Personality, Sadhana এবং The Religion of Man পড়া উচিত।

তাঁর কবিতা, গান এবং কোন কোন গদ্যলেখা বাহ্যিক শ্রবনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি আনে, মানব প্রকৃতির অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়—বিশ্ব সঙ্গীত যা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রকাশ, যা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান এবং তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। কত বিচিত্র রংয়ের বাহার তাঁর রচনায়।

অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনাই তাঁর একমাত্র অবলম্বন যার শক্তিতে তিনি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে থাকেন এবং তাঁর পাঠকবর্গকেও নিয়ে যান। তাঁর রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের প্রাদেশিক গণ্ডির বাইরে গিয়ে বিশ্ব সাহিত্যের সংগে মিতালি করেছে বহির্বিশ্বের চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিকতা বাংলাদেশে তার রচনাবলীর মাধ্যমে প্রবাহিত।

দর্শনশাস্ত্রে তিনি কোন বিশেষ ধারার উদ্ভাবক ছিলেন না। তিনি আমাদের প্রাচীন ধর্ম দর্শনের আচার্য্য যাঁদের ধর্ম এবং দর্শন উভয়ই সমভাবে প্রকাশ পেত তিনি তাঁদের সমপন্থী ছিলেন। তাঁর কবিতা এবং গদ্য উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর দর্শনের প্রকাশ।

কিন্তু তিনি শুধুমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন না, যদিও তাঁর রচনাবলী পড়ার জন্যে বাংলাভাষা শিক্ষা করা যে কোনও বিদেশীর কাছে মূল্যবান।

তাঁর সংগীত প্রতিভা এতই উন্নত ছিল যে তিনি অনেক বিজ্ঞ লোকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। শুধু তাঁর অসংখ্য ভক্তিমূলক দেশাত্মবোধক এবং অন্যান্য গানগুলির রচনা এবং তার সুরারোপ সত্যিকারের সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। তিনি যে শুধু গানের কথার সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় তাঁর রচনার ভাব এবং মাধুর্য বাঙ্ময় হয়েছিল।

একথা সত্য যে ব্রাহ্মসমাজের জন্য তার সংগীতাবলীর পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিলো, অবশ্য এই ব্যাপারে সব থেকে বেশী গৌরব ঠাকুর পরিবারের এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অভিজাত মহিলাদের দ্বারা অভিনয়ের ব্যাপারে জন সমাজে তাঁরাই অগ্রণী ছিলেন। কবি নিজে অভিজাত মহিলাদেরদ্বারা নৃত্যগীত বাংলা দেশে প্রথম পরিবেশন করেন।

সংগীত এবং ছোট ছোট কবিতা উভয়ই দেশ গঠনের সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনেদিয়েছে এবং বাংলার

শিক্ষিত অশিক্ষিত সমাজের গ্রামীন নাগরিকদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রেও অনেক প্রভাব বিস্তার করেছে। কবির সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতারাজি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান সবই জাতীয়কর্ম। তিনি বয়ন শিল্পের এবং শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনে এবং গ্রামীন জীবনের পুনর্গঠনে তাঁর দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর আন্তর্জাতিকতার উৎস ছিল বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলন। কিন্তু তাঁর বাল্যকালের রচনাবলীতে মানবতা নির্দেশক তাঁর ভালবাসা এবং অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে তাঁর চরিত্রের প্রকাশ পেয়েছিলো তাঁর "প্রবাসী" নামক কবিতায় যাতে তিনি বলেছেন, "দেশে দেশে আছে মোর ঘর।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর উদার হস্ত সমভাবে প্রসারিত হোয়েছিল। তাঁর ভূমিকা কেবলমাত্র প্রার্থিতের নয় তা বন্ধুত্বও মহত্বের। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বন্ধুত্বও ঐক্যবন্ধনে তাঁর ভূমিকা ছিল বৃহৎ। তিনি জাপান, চীন, শ্যাম, এবং ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শন করে ভারতের সংগে তাদের মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে ছিলেন।

শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণত করে তাঁর আদর্শ বজায় রেখে ছিলেন। ভারতের প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাদর্শ তার সহজ ভাব, কৃচ্ছ্রতা, বিশুদ্ধতা, চরিত্রাদর্শ তার অধ্যাত্মিকতা তার প্রাকৃতিক বাস্তবানুগ অনুভূতি সবগুলিরই স্ফুরণ হয়েছিল এখানে। কবির বহির্দৃষ্টি আন্তর্জাতিক। তিনি সকলের জন্যই চান জ্ঞান এবং উন্নতি।

শান্তিনিকেতনে কয়েকবার বেশ কিছু সময় কবির কাছে থাকবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। এই রকমই এক সময় সেখানে আমার থাকবার এবং কাজকরবার ঘর থেকে কবির আবাসস্থল একটি ছোট দোতালাবাড়ী নজরে আসতো। দুটো বাড়ীর মাঝে মাত্র একটা ছোট মাঠ ছিল। সে সময় আমি কখনও কবিকে আমার আগে নিদ্রা যেতে দেখিনি। এবং প্রভাতে যখন আমি বাহিরে বেড়াতে যেতাম যদি খুব ভোর হোতো সেদিন কবিকে দেখতাম উপরের বারান্দায় মগ্ন। কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই তাঁকে দেখতাম তার উপাসনার চোখে কাজে মগ্ন থাকতে। মধ্যাহ্নে দিবানিদ্রা ত' দূরে থাকুক সাময়িক বিশ্রাম নিতেও কখনও দেখিনি। সারাদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্নান, খাওয়া এবং নিদ্রায় ব্যয় করতেন। বাকী সময় তিনি কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। আমার থাকবার সময় কখনও তাঁকে হাত পাখা ব্যবহার করতে দেখিনি এবং তিনি কাউকে বাতাস করতেও দিতেন না। যদিও শান্তিনিকেতনের গরম অবিস্মরণীয়।

আমি চিরকাল তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান সাধক ভাবেই দেখে এসেছি। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও নন কারণ তাঁর জীবনের আদর্শ ভিন্ন ছিল। তিনি বলতেন— "Liberation by detachment from the world is not mine."

[কবির ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে কবিকে যে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়—সেই উপলক্ষ্যে প্রবাসী ও Modern Review-এর জগৎ বরেণ্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "Golden Book of Tagore" স্মারক গ্রন্থখানি উপহার দেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা এই স্মারক গ্রন্থ প্রাচ্য পাশ্চাত্ত মনীষীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য সহ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়—সে ১৩৩৮ সালের কথা। উক্ত সংকলনে "A Contemporary study of Rabindranath শীর্ষক রামানন্দের একটি রচনাও মুদ্রিত হয়। বর্তমান রচনাটি উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ—কিন্তু আক্ষরিক বা পূর্ণ অনুবাদ নয়। প্রয়োজনবোধে কিছুটা সংক্ষিপ্তও করতে হয়েছে। অনুবাদ করেছেন, শ্রীচন্দ্রনাথ পাল।]

—সম্পাদক

জন্ম শতবার্ষিকী

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

আজি হতে শতবর্ষ আগে যে মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল জোড়াসাঁকোর সূতিকাগৃহে, সেদিন থেকে শতবর্ষ পরে সেই শিশুর জন্ম-শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশ, সারা ভারতবর্ষ, সমগ্র বিশ্ব আজ আনন্দে উৎসবে অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছে—এই পরম সত্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন জেগেছে মনে: কেন এই উৎসাহ ও উত্তেজনা? কবির জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের প্রয়োজনীয়তা কি? কিসে তার সার্থকতা?

এ-প্রশ্নের একটা সহজ জবাব আছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত লোকত্তর মণীষী। তাঁকে স্মরণ করে তাঁর স্মৃতিপূজার আয়োজন করে আমরাও বুঝিবা তাঁর মহত্ত্বের অংশভাগী হতে চাই। চারিদিকে সর্বপ্রকার দীনতা ও ক্ষুদ্রতার পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষের দল যেন এই রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজার ভিতর দিয়ে একটা মিথ্যা আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে চাইছে। তাই এই উৎসাহ ও উত্তেজনা, রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাই এত উৎসব-সমারোহ।

কিন্তু মন বলছে, এর চেয়েও একটা গভীরতর কারণ আছে। আছে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর কোন গভীরতর তাৎপর্য।

মাত্র তের বছর আগেও ভারতবর্ষ ছিল পরশাসনের অধীন। আর সেই পরবশ্যতার ভূমিকা রচিত হয়েছিল আরও প্রায় দুশো বছর আগে। শুধু পররাষ্ট্রের শাসন নয়, এক বিজাতীয় ভাবধারার, পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ভারত-জীবনে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ভাবনার সদম্ভ আঘাতে ভারত-জীবনের তটপ্রান্ত সেদিন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠেছিল। আচারে-আচরণে, ভাষায়-চিন্তায়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পাশ্চাত্য শাসকের অন্ধ অনুকরণের কীট প্রবেশ করেছিল জাতির অস্থি-মজ্জায়। তার নিঃশব্দ ও সশব্দ আক্রমণে জাতীয় জীবন কটিদষ্ট কুসুমের মত বিবর্ণ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। বুঝিবা মৃত্যু তার আসন্ন হয়ে উঠেছিল।

জাতীয় জীবনের সেই দারুণ দুর্দিনে সহসা একদিন ফিরে দাঁড়াল নবজাগ্রত ভারতবর্ষ। গ্রহণ করল আত্মস্থ হবার সাধনা। ভারতবর্ষের সেই আত্ম-উদ্বোধন-বাণীর মুখর কবি রবীন্দ্রনাথ। ভারত-আত্মার বাণী-মূর্তি তিনি। ভারত-জীবনের প্রকৃত শিক্ষার ভাস্বর আলোয় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা আত্মঘাতী। ছিন্নমস্তার মূর্তি তার স্বরূপ। তিনি বুঝেছিলেন, অসুর শক্তি ও বস্তু-সম্পদের আহরণে মানুষের কল্যাণ নেই। মানুষের পরম কল্যাণের বাণী বিঘোষিত হয়েছে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনায়।

'রক্তকরবী' নাটকে কবির এই গভীর উপলব্ধিই সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় ঘোষিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কবির কণ্ঠ তাই শুনতে পাই নব সভ্যতার আবাহন-বাণী।

'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।'

তারপর প্রায় দুটি যুগান্ত পরেও কবির কণ্ঠে সেই একই আর্ত ঘোষণা:

'আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন,
শ্যাম-বনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুনঃ।'

এই বাণী প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী। তপোবন-সভ্যতার বাণী। রবীন্দ্রনাথ সেই বাণীরই উত্তর সাধক। অহিংসা ও মিলন মন্ত্রের নব-উদ্গাতা।

মানুষের কবি তিনি। জীবনের কবি তিনি। তাই তিনি মানব-সভ্যতায় বিশ্বাসী। তাই তিনি বলেন:

'ধরার কথা: চিরিয়া চলুক বিজ্ঞানী হাড়গিলা।
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর একদিন হবে ঢিলা।'

তাই তিনি সগর্বকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তাঁর গভীর আত্মপ্রত্যয়:

রবীন্দ্রনাথ ও তানসেন

কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু

অসমান্য সৃজন প্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল মহামানব মাঝে মাঝে আবির্ভূত হন এই মাটির পৃথিবীতে। ধন্য হয় এই পৃথিবী। তারপর কালের অমোঘ নিয়মে, বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের অবসানে তাঁরা মিলিয়ে যান প্রকৃতির কাল সমুদ্রে। থেকে যায় স্মৃতি, যার হৈমদ্যুতি যুগান্তের ম্লান স্বর্ণচ্ছায় সন্ধ্যালোকেও চিরভাস্বর চির উজ্জ্বল থাকে।

এঁদের মধ্যে দুটি স্তর আছে। দুটিতে প্রচুর ব্যবধান। প্রথমটির প্রকাশ অন্তর্মুখী অর্থাৎ আপন সৃষ্টিতে আপনি বিভোর। বিশ্বমানবের তা কতটুকু মঙ্গল সাধন করল তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ নাই। দ্বিতীয়টির প্রকাশ সৃষ্টিমুখী অর্থাৎ নিজের সৃজন প্রতিভার পবিত্র আলোকে, সমগ্র মানব জাতির অন্তরে উন্নততর জ্যোতির্ম্ময় পথের সন্ধান তাঁকে দেন। এরাই হলেন বিশ্ববরেণ্য মহামানব। এদের সৃষ্টি অক্ষয় অমর হয়ে মানুষের অবচেতন মনের মণিকোঠায় বিরাজ করে; হৈমদ্যুতির প্রোজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করে তাঁদের স্মৃতি।

মহাকালের সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাস অনুধাবন করলে এই সব প্রতিভাধর মহামনিষীদের পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁদের স্মৃতি আজও অম্লান দীপশিখার মত মানবের মনবনে ফুল ফুটিয়ে চলেছে। তাঁরা হলেন মহাকবি ব্যাস ও বাল্মিকী; প্লেটো ও পিথাগোরাস; সেক্সপীয়ার ও কালিদাস। কালের রথচক্র সমানে 'ঘুরছে; কত উত্থান পতনের সঙ্গে তার পরিচয়। নির্ম্মম, নির্দ্দয় হয়ে সব কিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে পাথিব অবিনশ্বরতার জয়গান করছে। কিন্তু কালের এই নিয়মকে যাঁরা নিজ শক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা কালজয়ী বর্তমান প্রবন্ধে দুজন কালজয়ী প্রতিভাধর ব্যক্তির সঙ্গীত কলার নবরূপায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। একজন অপরাজেয় সঙ্গীত শিল্পী মিঞা তানসেন অপরজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

তাপসভূমির পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত ভারতবর্ষ। তাঁর সঙ্গীত সাধনার কাল সেকাল। আকবরের রাজত্বকাল, মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ; সেটাও সেকাল। কিন্তু এই দুই কালের মধ্যে বিরাট ব্যবধান এই বিশাল সময়ের মধ্যে একমাত্র তানসেনই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী আকবরের সভা কবি বিখ্যাত আবুল ফজল দ্বারা ইহা স্বীকৃত। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিশ্বজন স্বীকৃত। ভারতবর্ষের গীতি কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর স্থান সবার উর্দ্ধে। কিন্তু তানসেন শুধু শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক ছিলেন বা অপূর্ব্ব রাগ রাগিনীতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয় তাঁর সঙ্গীত রচনায় ছিল

জন্ম শতবার্ষিকী

'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।'

তিনি বলেছেন: 'আশা করে আছি, পরিত্রাণ-কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।'

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কাছে আত্ম-প্রতিষ্ঠ ভারতবর্ষের এই নতুন জীবন-বাণীর কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি বিশ্বকবি, কবি সার্বভৌম। আর এই বাণীর উপলব্ধি ও অনুশীলনেই রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

কাব্যের অমৃত ঝঙ্কার। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলি অপূর্ব্ব সুর মাধুর্য্যে ছিল সুসমৃদ্ধ। এই দুই স্রষ্টাই স্বীয় কাব্য কলিকাগুলিকে অমৃত সুর মাধুর্য্যে স্নান করিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুগায়ক, মধুর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রকৃত পক্ষে যৌবন কালে এই গায়ক কবি যখন মহর্ষির গৃহের শোভাবর্দ্ধন করছিলেন। তখন কেহই ধারনা করতে পারেনি এই অসামান্য প্রতিভার স্ফুরণ কোন পথে হবে। সুর ও সঙ্গীতকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হবে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ না কাব্য কলিকার অনন্ত হিল্লোলে বিকশিত হবে কবি রবীন্দ্রনাথ।

অপরূপসুর সমৃদ্ধ কণ্ঠ ছিল তানসেনের। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ ছিল সুরসম্মোহিত। তানসেন নিজেকে সমাহিত করে ছিলেন "নাদ" ব্রহ্মের পূজায়। আত্মস্থ হয়েছিলেন "নাদব্রহ্মের" চরন মূলে। তাই যে রাগ রাগিনীর মহাজাগতিক সুর মূর্চ্ছনায় অব্যয় প্রতিচ্ছবি তার উৎস মূলে স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।
হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের মাধ্যমে তাঁর উদাত্তকণ্ঠে চরমও পরম প্রকাশের পথবেয়ে প্রাণবন্ত হয়েছিল রাগ লহরী।

যৌবনে বাংলা ধ্রুপদ গানের রচনায় রবীন্দ্রনাথ তান সেনের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীত রচনায় যেগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন তানসেনের রচনাশৈলী ও প্রাণবন্ত। এই রাগ সঙ্গীত গুলি যদিও তানসেনের প্রভাব মুক্ত নয়, তথাপি ইহাদের সাধারণ অনুকরণ বলে ছোট করা যায়না; ইহারা আপনভাবে সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনের সকল রকমের শত শত কাব্যগীতি রচনা করেছেন। রাগ সঙ্গীত ছাড় নাট্য সঙ্গীত, কাব্যগীতি। লোক সঙ্গীত কীর্ত্তনও অন্যান্য বহু রচনা তিনি করেছেন। তাঁর অরূপণ লেখনী কিছুই বাদ দেয় নি। যা ছুঁয়েছেন তাই সোণা হ'য়ে উঠেছে। তাঁর বহুমুখী প্রতিভাতে প্রকাশের কোন সীমা রেখা ছিলনা। তিনি একাধারে ছিলেন মহাকবি দার্শনিক, উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক। বিশিষ্ট লেখক খ্যাতি ছাড়াও তিনি ছিলেন দক্ষ নট, গায়কও চিত্রকর। প্রতিটি বিষয়েই তিনি স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন যা "কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল" হয়ে দ্যুতিমান থাকবে।

এদেশের অনেকের ভ্রমমূল ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ রাগমূলক ধ্রুপদ সংগীত বা ব্রহ্মসংগীত তাঁর সংগীত প্রতিভার শৈশব কালের সূচক। ঐগুলির মূল্য তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের বিপুল কাব্য সংগীত সম্ভারের কাছে অতি ক্ষীণ। অনেকে একথাও বলেন যে ঐ সকল সংগীত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রতিভার উপর গুলি আরোপিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু কবিগুরু স্বয়ংই আমাদের নিকট বলেছেন যে তার রাগ সংগীতে অনুরাগ বা "ধ্রুপদ" রচনা একটি আনুষঙ্গিক ব্যাপারে নয় তাঁর সমগ্র সংগীতিক সৃষ্টির মূল উৎস তাঁর তরুণ বয়সে লব্ধ যদুভট্টের ধ্রুপদী সংগীতের গভীর ও বিপুল অনুপ্রেরণা। পরবর্ত্তী জীবনেও কীর্ত্তন বাউল, লোকসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত ও নাট্য সঙ্গীতের অন্তরালে সেই অনুপ্রেরণা তাঁর জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে স্বচ্ছন্দ আবেগে। বিভিন্ন বিচিত্র ভাবধারার উপযোগীরূপে তাকে সঙ্গীতের বিচিত্ররূপ দিতে হয়েছে কেননা তিনি কাব্যকেও তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মর্ম্মকথা যাঁরা উপলব্ধি করতে চান তাঁদের আমরা অনুরোধ করি তাঁরা যেন কবিগুরু নিজে তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অনুধাবন করতে।

গন্ধবণিক মহাসভা

ছাত্রাবাস

উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারীগরী শিক্ষার জন্য দুঃস্থ ও মেধাবী গন্ধবণিক স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি ও বাসস্থান দেওয়া হইবে। ১৫ই জুলাই ১৯৬১ তারিখের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ফরমে আবেদন করিতে হইবে। ফরমের জন্য সম্পাদক, গন্ধবণিক মহাসভা ২১সি, রাজেন্দ্র দেব রোড, কলিকাতা—৭ এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

গন্ধবণিক মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ ৫ম সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

প্রসঙ্গ কথা

বৈশাখ মাস আমাদের দেশে পুণ্যমাস। এ বৎসরের বৈশাখ আমাদের কাছে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য প্রতিভাত হয়েছিল, বিশেষ করে এই মাসেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মজয়ন্তী পালন করার আহ্বান ছিল। নানা দিক দিয়ে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন ও ছিল—বিশেষ ইহা জাতীয় কর্ত্তব্যও বটে। বিগত শত বৎসরের যে অসীম শক্তি একটি ব্যক্তি পুরুষের মধ্যে আর্তনাদ করেছিল, প্রকাশের বেদনায় সমগ্র জাতির মানস বৃন্ত গূঢ়তর রক্তরাগবর্ণে রঞ্জিত হয়েছিল তার মূর্তপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম অতি আন্তরিকতার সঙ্গে "রবীন্দ্রশতাব্দ সংখ্যা" তার নির্দেশক। সেইজন্য এই জগৎ প্রপঞ্চের অনেক কথাই আমরা ইচ্ছা করেই স্মরণ করিনি—পালন করিনি। বাঙ্গালার নববর্ষ উৎসব, জাতির গন্ধেশ্বরী পূজা উৎসব, এবং চলমান পৃথিবীর অনেক ঘটনা এমন কি আমাদের মাসকাবারি 'প্রসঙ্গ কথা' যেগুলির উপর আমরা পথ চলার কালে চকিত দৃষ্টিতে অবলোকন করি, বিগত সংখ্যায় তার অপ্রকাশ দুর্ঘটনা জাত নহে তা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আজ জ্যৈষ্ঠের কিস্তিতে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এর মধ্যেই আমরা আরও অনেক কথা ভুলে-ছিলাম—দিনে দিনে মাসে মাসে প্রকৃতির যে পট পরিবর্তন হয়—আমাদের অলক্ষিতে সে অনেকদূর এসে গেছিল। তাকিয়ে দেখি সূর্য্যের উত্তরায়ন প্রায় সমাপ্ত। প্রচণ্ড কিরণ সম্পাতে অরণ্যশ্যামল বাংলা দেশে নিম্নচাপের বলয় সৃষ্টি হয়েছে, ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে এসেছে। আমাদের 'উত্তরশাং দিশি'তে তখন মেঘের উৎসব। শুষ্ক পৃথিবীর বনরাজি বৃক্ষমালা উর্দ্ধবাহু হয়ে মেঘের বন্দনা করছে। হিমাদ্রি শৃঙ্গের জমাট তুষারের প্রাসাদ দরবিগলিত ধারায় মাটির পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। বনবৃক্ষের মুখে আজ যুগ যুগান্তের সেই বনবাণী নাদিত হচ্ছে। এর পরেই মনে পড়ে রামায়ণে বাল্মীকির সেই গ্রীষ্ম ও বর্ষা বন্দনার কথা পঞ্চবটিতে রামলক্ষ্মণ সীতা যে যৌবনদীপ্ত ঋতুরাজিকে উপভোগ করেছিলেন সে ঋতুর প্রকাশ এখনও আছে, এখন তাদের আবির্ভাব হয়। কিন্তু আমরা

ঐশ্বর্যের অতি পার্থিব মানুষ সেদিকে তাকাবার সময় পাইনা। আমাদের একালে ঝড় আসে,—প্লাবন আসে বর্ষা আসে কিন্তু সেই ঋতুরাজের অপূর্ব সৌন্দর্য্য সমারোহের মধ্যে নয়—মানুষের দুঃখ দারিদ্র লাঞ্ছনা বঞ্চনার এবং সভ্যতার অকপট সংকটের মধ্যে আমরা সেগুলিকে চাক্ষুষ করি। প্রকৃতির দুয়ারে বর্ষার পূর্বাভাষ দেখেছি কিন্তু এ অপেক্ষাও আর এক ভয়াবহ প্লাবন যা সেদিন সমগ্র দেশ ও জাতিকে চকিত করে ছিল—এখন সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি। আসামের ভয়ঙ্কর জাতীয় বিপ্লবের কথা বলছিলাম।

বাংলা ভাষা ও আসাম

জাতির সংস্কৃতিজীবন আজ মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। ভারতবর্ষের সংহতি আজ মহাবিপর্যয়ের পথে। পরাধীন ভারতবর্ষে যে সংহতিবোধ যে অখণ্ডত্ব ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষে কেন তা বিপন্ন হতে চলেছে আজ তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। ইংরাজের কাছে আমরা মুমূর্ষ ভারতবর্ষকে পেয়েছিলাম। সে ভারতবর্ষ ছিল দারিদ্রে মলিন—ক্ষুধায় ক্লান্ত। এই সুবৃহৎ জনপদের ম্রিয়মান মুখে আশা ও ভাষা ধ্বনিয়া তোলার জন্য তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনই প্রায়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের সরকার সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন। পরন্তু বিগত ৫।৬ বৎসর পূর্বে এই ভাষা আন্দোলনকে জিইয়ে তুলেছিলেন সরকারই রামালুর সত্যাগ্রহ ও অনশনের মৃত্যুর পরই নূতন অন্ধ্ররাজ্য প্রতিষ্টিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সুপ্ত ভাষা প্রীতি যেন অগ্নি স্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। ভারত সরকার ভাষা কমিশন বসালেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন নূতন ভাষাভিত্তিকে প্রদেশ গঠনের জিগির উঠল। ভারতবর্ষের মানচিত্র পরিবর্তিত হতে লাগল। ভাষাভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সংহতির অনুকূল। কিন্তু সমস্যার নিস্পত্তি হয়নি আজও? মারাঠা ও গুজরাটীদের বিবাদ আমরা জানি। পাঞ্জাবী সুবার' আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি। বরং নূতন উদ্যমে আবার সুরু হবে। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় কাজাগ্রাম আন্দোলন শুরু হয়েছে। এমনি করেই জাতীয় সংহতি বিপন্ন হতে চলেছে। ভাষা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের অঙ্গরাজ্য আসাম দ্বিবা ভাষাত্মক ভাষাভাষী প্রদেশ। সুতরাং সে প্রদেশে দ্বিবা ভাষাত্মক ভাষাই প্রশ্রয় পাওয়া উচিত। প্রসঙ্গতঃ যদি এরূপ প্রদেশে একটি ভাষাই স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা প্রচুর। এতেকরে একটি ভাষাভাষীদেরই সুবিধা। কারণ তাদের রাষ্ট্রভাষা হিন্দিও প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা করলেই চলে কিন্তু অন্য ভাষাভাষীদের আর ও একটি ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করতে হয়। এতে করে সংখ্যা লঘুদের উদ্যম ও শক্তির অপচয় হয়। সরকারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠা দুর্লভ হয়ে পড়ে আপন ভাষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারেনা। এসম্পর্কে স্বর্গীয় যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রবাসীতে' কিছুকাল পূর্বে চিন্তাপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন. সেই মূল্যবান কথা গুলো আজ স্মরণ করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এতক্ষণ যা বলা গেল এগুলি ভাষা সম্পর্কে মৌল কথার আসামের বিবাদের কথা বলি।

গত বৎসর এমনি সময়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালী রক্তস্নান করেছিল। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আসাম সরকারের বর্বরোচিত গুলি চালনায় কাছাড়ে ১১ জন বাঙালীর জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছে। এই সংবাদ সমগ্র দেশ ও জাতিকে চকিত করে দিয়েছে। আসামে আসামী ভাষা কোন কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। বরং সেখানে বাংলা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়--এছাড়া আছে প্রভৃত পার্বত্য উপভাষা। এই সমস্ত ভাষাভাষীদের দাবীকে অগ্রাহ্য করে গত বৎসর আসাম সরকার জোর করে আসামী ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা দেন। বাঙালী ও পার্বত্য জাতিদের ন্যায়সংগত দাবীকে তারা এমনি করে উপেক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া আসামী ভাষাকেই বাংলার উপভাষা বলে চলে। ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ববিদদের কথায় তার প্রমাণ আছে। বাংলা ভাষাভাষীদের দাবীর পিছনে যে যৌক্তিকতা আছে—তা কেবল মাত্র পশু শক্তির দ্বারা রুদ্ধ করা যায় না। পশু

শক্তি কখনই কোন অমিতবীর্য শক্তি বা আত্মশক্তিকে দমন করতে পারে না। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বাংলা ভাষা যতদিন প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত না হয় সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রাম ততদিন চলবে। স্বাধীনতা লাভের বহুপূর্ব হতেই অসমীয়ারা ঐ চক্রান্তের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর আসামে যে এই ভাষার প্রশ্ন উঠবে এই ভেবেই তারা বছরের পর বছরে লোক গণনা করে বাঙালীদের সংখ্যা কমিয়ে এসেছে। দুই বা ততোধিক ভাষার স্বাধীন সক্ষম দেশ জগতে বিরল নয়। অনুসন্ধানী মাত্রেই একথা জানেন। আসামের এই মদমত্তার পিছনে আর একটি শক্তির উৎস আছে—সেটি কেন্দ্রীয় সরকার। বাঙ্গালী বিদ্বেষী মাড়োয়ারীরাজ আর এই শক্তির বলেই তারা সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করছেন। গত বছর এই শক্তির বলেই তারা হাজার হাজার শান্তিপ্রিয় অসহায় বাঙ্গালীকে ভিটেছাড়া করেছিল—এবার তারা জালিওয়ানাবাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নিরস্ত্র শিশু-নারীকে নির্বিবাদে হত্যা করে আসামের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করেছে। আমরা ত পূর্বেই বলেছি—এইপশুশক্তির দ্বারা অমিতবীর্য বাধাবন্ধহীন শক্তিকে রুদ্ধ করা যায় না। বাঙালীর আত্মৎসর্গ তা প্রমাণ করেছে—ভাষা প্রীতির বেদীমূল শোণিতে লাঞ্ছিত করেছে। বাঙ্গালীর এই বিক্রম আজ হতে নয়। সভ্যতার উষা লগ্ন হতেই বাঙ্গালী তার স্বাতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে এই স্বাতন্ত্র সংকীর্ণতায় মণ্ডিত নয়—এই স্বাতন্ত্র ভারতপন্থা তথা বিশ্বপন্থার আধার। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাকেই জগতে প্রচার করেছেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমে কপট অহিংস সৈনিকদের কি নির্লজ্জ প্রকাশ। একদিকে রবীন্দ্রউৎসবের জন্য তাদের মেকী করতালি, অপরদিকে নির্মম ভাবে বাঙালী হত্যা—ও বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ। কিন্তু বাঙালীর সংগ্রামের কথা তাদের বোধহয় মনে আছে। সেই মহানায়ক শশাঙ্ক এমন কি তার বহু পূর্ব হতেই বাঙালী সংগ্রাম করেছে তার সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য, বৌদ্ধযুগ, হিন্দুযুগ—পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের যুগেও বাঙালী বীর দর্পে সংগ্রাম করেছে। মোগল—পাঠান যুগেও বাঙালী বারে বারে শক্তিমানের আধিকারকে অস্বীকার করেছে। বাঙলার বার ভূইয়াদের প্রকোপে মোগল সম্রাট আকবর বিপদ গুনেছিলেন। তারপর সেদিনের স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম জগৎবন্দিত। সেই বাঙালীই পাকিস্থানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণদিয়ে ভাষার গৌরব রক্ষা করেছিল—সেও এক নয়া ইতিহাস। আসামের সংগ্রামেও বাঙালী সত্যভ্রষ্ট হয়নি। সেদিন পশ্চিমবংগের সম্মিলিত ধিক্কারে দিল্লীর মসনদ কেঁপে উঠেছিল। এ সংগ্রামের শেষ নেই। এ প্রলয়ের নর্তনে বাঙালী ভীত নয়, আসামে বর্বর নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সত্যের এই সংগ্রাম ব্যর্থ হবেনা। ভারতবর্ষ যদি তার সংহতিকে এখনও অটল রাখার প্রয়াসী হয়, তাহলে আসামের এই অত্যাচারের আশু প্রতিকার প্রয়োজন। পরিশেষে একথা ও স্পষ্ট করে বলতে চাই ভাষার মধ্যেই সংহতি। হিংসায় সংহতি ও অখণ্ডতা বিপন্ন হয়। আমরা এখানে একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর বচন উদ্ধৃত করছি এবং শোক মুহ্যমান আসামের বাঙালীদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য আমরা অন্য প্রসাঙ্গিক আলোচনা থেকেও বঞ্চিত থাকছি।

"It is extraordinary inconvenient to administer together the affairs of peoples speaking different languages and so reading different literatures and haviag diffierent general ideas, the people who talk German and base their ideas on German literature, the people who talk Italian and base there ideas on Italian literature, the people who talk Polish and base their ideas on polish literature will all be far better off and most helpful

and least obnoxious to the rest of mankind if they conduct their own affairs in their ideas within the ringfence of their own speech. Is it any wonder that one of the most popular songs in Germany during this (Napoleonic) period declared that wherever the German tongue was spoken there was the german fatherland ?

There is a natural and necessary political map of world.......... There is a best possible way of dividing any part of the world into administrative areas, and a best posssible kind of Government, for every area, having regard to the speech and race of its inhabitants."*

এই পাশ্চাত্ত্য মণীষীর কথাগুলি যে ভুয়া নয়—ইহার পিছনে যে একটি গূঢ়তর সত্য আছে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ জাতির এই সংস্কৃতি সংকটে আসাম-ও কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত চিন্তানায়কদের এবিষয়ে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

—শ্রীহারাধন দত্ত

●●

বিশ্বকবি

শরৎ দত্ত

●

স্থলে জলে আর আকাশে বাতাসে উচ্ছল অভিলাষে,
একটি মধুর ক্ষণ বারেবারে ফিরে ফিরে আসে।
সাহারায় ফোটে ফুট অপরূপ রঙের হিল্লোলে,
প্রথম বৃষ্টির মত স্নিগ্ধ তার সুশীতল ঢলে,
মধুর রোমাঞ্চ লাগে, বিমোহিত এ মাটির ধরা,
তোমার সোনার ধানে তোমার তরণীখানি ভরা।

ধরার দূলির তলে চিরন্তন পরম বিস্ময়,
তোমার বীণার তারে বেজে ওঠে জীবনের জয়।
তুমি আছ উর্দ্ধলোকে অবিচল জ্যোতিষ্কের মত,
বিশ্বমানবের লাগি যুগে যুগে নিয়ত জাগ্রত।
অমৃতের আশীর্বাণী অবিরল আজো তাই ঝরে,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব কলঙ্কিত হিংস্র পৃথ্বীপরে'।

তাপদগ্ধ পৃথিবীর অগণিত নগরে ও গ্রামে,
অনির্বাণ দীপ জ্বলে তোমারি পবিত্র ওই নামে।

●

* Outline of History—H, G. Wells—Chapter 36, Section 6.

শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ

মুরলীধর দত্ত খণিক

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে কোন এক লেখকের একটি কথাই আমার বার বার মনে আসে—"প্রতিভা এমনি জিনিষ উহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিরাট প্রতিভার অধিকারী যাহার স্পর্শে প্রতিটি বস্তুই সজীব হইয়া উঠে; আলোকিত হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের এই বহুমুখী প্রতিভা লইয়া এখানে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র, তিনি ছিলেন একধারে কবি, সাহিত্যিক চিত্রশিল্পী, রাজনীতিজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি। শিক্ষাবিদ রূপেও যে তিনি কবির ন্যায় বিখ্যাত তাহা আমরা অনেকেই জানিনা, তাই শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই আমি এখানে দুই একটি কথা বলিব। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার "তোতা কাহিনী" নামক প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝা যাইবে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,....কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না. মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। .... খাঁচায় দানা নাই, পাণি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে, গান ত বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বন্ধ, দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।..... ......রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্ খস্ গজ গজ করিতে লাগিল।

এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমালোচনা করিয়াই তিনি বিরত হইতে পারিতেন কিন্তু তাহা তিনি হন নাই। এই ব্যবস্থার সংস্কার করিবার জন্য তিনি নিজেই আগাইয়া আসিলেন, এবং তার আদর্শের উত্তর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন, উহাই আজ বিশ্বভারতী নামে পরিচিত এবং উহা একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার মত এবং অনেক দেশেই তাঁহার এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশংসিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রামকৃষ্ণ মিশন ব্যতীত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাঁহার এই আদর্শকে হইতে দূরে জন বিরল স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, পরিবেশটি হইবে তখনকার দিনের মুনি ঋষিদের আশ্রমের মত সেখানে তাহারা দিনের পর দিন নিরুপদ্রবে ঈশ্বর ও তপস্যায় দেহমন নিয়োজিত করিতেন। বিদ্যাভ্যাসও তপস্যা, কাজেই উহা বর্ত্তমান যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বারা ব্যহত হয়; শিক্ষা ব্রতীদের মন বিক্ষিপ্ত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও ঠিক এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন তাহার Lucy নামক কবিতার মধ্যে।

তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হইবে আবাসিক, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৫ ঘণ্টা শিক্ষকদের সংস্পর্শে আসিলেই আদর্শ ছাত্র গড়িয়া তোলা যায় না. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি আবাসিক না হয় তবে শিক্ষার্থীগণ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের জীব হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সমাজই তাহাদের কলুষিত করিয়া তুলিবে। আজকাল ছাত্রসমাজের যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতেছে; আমরা তাহার জন্য ছাত্র সমাজকেই দোষারোপ করি কিন্তু তাহা ঠিক নয় পরিবেশ ভাল হইলে খারাপ ছেলেও ভাল হয়। সে বিষয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, লণ্ডনে বিভিন্ন কুখ্যাত পরিবার হইতে ১২০টি ছাত্রকে বোর্ডিংএ রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয় এবং দেখা যায় ৫টি ছাত্র ব্যতীত সকল ছাত্রই আদর্শ হইয়া গড়িয়া উঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন তাহাও আবাসিক বৈদিক যুগে যেমন ছাত্রগণ গুরুগৃহে বাস করিতেন এবং সেখানে তাহারা শুধু বিদ্যাভ্যাসই করিতেন না, সকল প্রকার কাজকর্মের মধ্যে দিয়া তাহারা প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি পাঠ্য পুস্তকের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; উহার সঙ্গে তিনি নানা সুকুমার বিদ্যাও সংযুক্ত করেন, এক কথায় রবীন্দ্রনাথ চান যে তাহারা বাস্তব জগতের প্রকৃত মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় গৃহের সীমাবদ্ধ চারি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাহাকে মিশাইয়া দিয়াছেন বিশ্বের সঙ্গে, সুন্দর প্রকৃতির পরিবেশে মুক্ত বায়ুতে আম্রকুঞ্জের নীচে ক্লাস বসিত। তিনি জানিতেন দেহকে জোর করিয়া চারি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলেও তাহাদের মন চালিয়া যাইত সেই রামায়ণ মহাভারতের দেশে, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত মুক্ত বায়ুর স্বাদ নিতে। এই সীমাবদ্ধ চারি দেওয়ালের মধ্যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার একটি করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন। কবি কালিদাস তাঁহার "ছাত্রধারা কবিতার মধ্যে কবি বলিয়াছেন ;—

কেহ বা বেত্রের ডরে　　বন্দী হয়ে রয় ঘরে

—　　....　　....

কেহ বা জানালা পাশে　　চেয়ে রয় নীল আকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নিজেই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি এখানে একজন নিয়মিত শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের দিকে তাকাইলেই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তখনকার দিনের বৃটিশ সরকারের কেরানী তৈয়ারী করিবার এই কারখানা গুলিকে তিনি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইলেন। আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন এবং দেখিতেন যে ছাত্রগণ প্রশ্ন কঠিন বলিয়া চেয়ার টেবিল ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা গৃহে দক্ষযজ্ঞ বাধায়, নকল ধরিলে শিক্ষকের গৃহে আগুন দেয়, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হইলে বোর্ডের অফিসে, পুস্তকের দোকানে ইট পাটকেল ছোড়ে, স্কুল কলেজ পলাইয়া সিনেমা গৃহে লাইন দেয়; তবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন জানিনা। তবে তাহার বিরাট প্রতিভা ইহার ও একটা সমাধান খুজিয়া বাহির করিতে পারিত। শিক্ষাবিদ্ রূপে ও রবীন্দ্রনাথ রুশো ফ্রোবেল ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদের সঙ্গে অমর হইয়া থাকিতে পারিতেন।

●

'উর্বশী' ও আধুনিক চিন্তা

শ্রীগোপীনাথ দাঁ

"উর্বশী" কবিতাটি বাংলা গীতিকবিতার (lyric poetry) জগতে একটি আশ্চর্যতম সৃষ্টি; এবং রবীন্দ্র কবি কল্পনার মহত্তম সৃষ্টির অন্যতম। কবিতাটির কাব্য সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কোনপ্রকার মতদ্বৈধের অবকাশ নেই ছন্দ সৌন্দর্যে, শব্দঝংকারে, অপরূপ চিত্রকল্পসৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি ভাবকল্পনার চিরন্তনত্বে ও তার আশ্চর্য্য মৌলিক রূপমূর্ত্তি নির্মাণে কবিতাটি অনন্য শিল্পগৌরব লাভ করেছে। অপূর্ব এর গীতিঝংকার, আশ্চর্য্য এর ভাবচিত্রাবলী, প্রবল আবেগ গভীর লিরিক্ আবেদন! রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবি কল্পনা যে নিরুদ্দেশ রস সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি চিত্রা পর্যায়ে প্রগাঢ় পূর্ণতা ও ভাবস্থির অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে কয়েকটি কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে—'উর্বশী" তাদের মধ্যে অন্যতম, সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠতম।

কবিতাটির কাব্যোৎকর্ষ সন্দেহাতীত হলেও প্রখ্যাত সমালোচক লক্ষ্য করেছেন; এবং অভিযোগ এনেছেন যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যকল্পনা দ্বিধাযুক্ত হ'য়ে কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাববিরোধ ঘটিয়েছে। তাঁর বক্তব্য হোল উর্বশীর বন্দনার মধ্য দিয়ে তার যে রূপ-কল্পনা কবি করেছেন তা হোল মানব সংসারের সকল সম্পর্কের অতীত, মর্তপৃথিবীর কামনা বাসনার উর্ধলোক চারী, নির্বিশেষ নিরুপাধি আদর্শ সৌন্দর্যসত্তা-খাঁটি aesthetic beauty বা আদর্শ রস সৌন্দর্য্যের সংগে লৌকিক বাসনা কামনা—বিচ্ছেদ ক্রন্দনের কোন সম্পর্ক নেই, সেখানে বাসনা কামনার পরম নির্বান (complete annihilation) সে সৌন্দর্য্য মদন 'বিজয়িনী'।

অভিযোগটির পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু মনে হয় কবিতাটির রসবিচারের কালে উক্ত সমালোচকের দৃষ্টি বহিরংগাশ্রয়ী এবং পূর্ব নির্দিষ্ট তত্ত্বনির্ভর হ'য়ে পড়ায় কবি ও সমালোচকের মধ্যে যথার্থ অন্তর সাযুজ্য ঘটেনি; আর তারই ফলে কবিতার ভাব বিরোধ কল্পিত হয়েছে। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রখর স্বাতন্ত্র ও তাঁর কবিকল্পনার একান্ত নিজস্ব মৌলিকত্বের দিকে দৃষ্টিরেখেই, এবং বৃহত্তর রোমান্টিক কবিগোষ্টিভুক্ত হলেও তাঁর কাব্যের যথার্থ বিচার ও রস রহস্যের উপলব্ধি সম্ভব আর সে প্রয়াসে আমাদের দীপালোক বর্তিকা সেই নেপথ্যচারী স্বপনমূরতি কবিব্যক্তিত্ব (poetic personality) আর রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের, তাঁর কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্যের আলোকেই তাঁর কবিতা বিচার্য।

সহজাত প্রকৃতি প্রেম কবিমনের সে প্রবল সৌন্দর্য্য ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছিল, তারই নিরুদ্দেশ আকর্ষণে কবির রূপাভিসার আমরা লক্ষ্য করেছি 'সোনার তরীতে' আর চিত্রা' কাব্যে সেই নির্বিশেষ সৌন্দর্য-উপলব্ধির পরিপূর্ণতার সংগে উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা (Imagination) যুক্ত হয়ে 'উর্বশী কবিতাতেই কবির ব্যাকুল সৌন্দর্য্যবাসনা-জাত abstract সৌন্দর্য্যের সত্তার বিধৃতিই কবিতাটিকে, মহৎ কাব্য মর্য্যাদা দিয়েছে "এক হিসেবে সৌন্দর্য্যমাত্রেই অ্যাবসট্রাক্‌ট্; সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রসসঞ্চার করে"—বলেছেন কবি দৃঢ় প্রত্যয়ের নির্ভরতায়—আর সেই abstract ও ideal beauty 'উর্বশীর' নারীরূপকল্পনার বিধৃত হয়েছে;—ফলে মানসকল্পনাহৃত বস্তু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য সত্তা 'ideal physical beauty'তে রূপান্তরিত হয়েছে—উর্বশীতে সেই দেহ সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে।

বিশ্বের অন্তরালশায়ী এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপিনীর কল্পনা সাহিত্যের নিত্যবস্তু। সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলক্ষ্মী যুগে যুগে ভিন্ন কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রেছে। কখনো সে বিয়াত্রিচে, কখনো 'La Belle dame Sans merci' কোথা ও বিশ্বের কামনা রূপিনী Approdiate কখন ও 'উর্বশী' কখনো—Intellectual Beauty' (শেলী) কখনও 'সারদা' (বিহারীলাল) এখানে

ও বা বনলতা সেন' (জীবনানন্দ দাস), এ সেই ক্ষণশাশ্বতা, অথবা যাকে নিয়ে বিশ্বের অনন্ত ক্রন্দন, অথচ যে 'চিরদিন হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি ; অথবা এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাক আর। বিভিন্ন কবিকল্পনার বিশিষ্টতায় সেই একই ক্ষণচারিণী, মনোললিতার বিচিত্র রূপাশ্রয়ণ।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৌন্দর্যকল্পনা ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যগত অপরূপ সৌন্দর্যকল্পনার শাশ্বত আধার 'উর্বশী'কে আশ্রয় করেছে এবং ভাগবত সৌন্দর্য উপলব্ধির অভিনব রূপকল্পনা কবির স্বরাট স্বাতন্ত্র্যকে আর ও দীপ্ত মহিমা দান করেছে।

এবার কবিতাটির বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম স্তবকে কবি 'উর্বশী লৌকিক বন্ধন বিমুখ সর্বসম্পর্কচ্যুত, অবিমিশ্র মাধুর্যরূপ মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনা করেছেন ; আর সেই কল্পনাকে চিত্রায়িত (visualise) করেছেন অপূর্ব কল্পচিত্রের poetic (imagerney) মাধ্যমে। উর্বশী নিত্যকালের মোহিনীমায়া—সে নিছক নারী—মাতা, কন্যা বা গৃহিনী, সে নয়, যে নারী সাংসারিক সম্পর্কের অতীত, মোহিনী, সেই।"

পরবর্তী স্তবকে কবি সেই লৌকিক সম্পর্কবিহীন পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্যরূপের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন সমুদ্র মন্থনের কালে 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে' সেই অনন্ত যৌবনা উর্বশীর আশ্চর্য আবির্ভাব, তরংগিত মহাসিন্ধু পদপ্রান্তে অবনত হয়ে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল যে অপরূপ সৌন্দর্যমূর্ত্তির সম্মুখে—কুন্দশুভ্র, নগ্নকান্ত সে মূর্ত্তি উর্বশীর।

পরস্তবকে কবির কল্পনা সমুদ্রের গোপন গহন গভীরে, অবতরণ করেছে, 'মণিদীপ্তকক্ষে বালিকাবয়সী 'উর্বশীর বাল্যলীলাকে কল্পনেত্রে অবলোকন করেছে, আশ্চর্য চিত্রকল্পের প্রসারে সব লোক বিহারী কবিকল্পনা তার উদার ব্যাপ্তি পেয়েছে।

পরবর্ত্তী স্তবকে ঐ অপরূপ রূপসৌন্দর্য মর্তপৃথিবীর বাসনা লোকে কি তীব্র আলোড়ন ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, অথচ ক্ষণচারিনী, অথবা উর্বশীর গতিচাঞ্চল্য মর্তমানবের আকুতিকে কেমন নির্মোহ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা দিয়ে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে তারই বর্ণনা করেছেন।

পরস্তবকে সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যের সারভূতা উর্বশীর আশ্চর্য নৃত্যরূপকল্পনার মধ্য দিয়ে বিশাল গম্ভীর ব্যাঞ্জনা এসেছে। উর্বশীর বিশ্বব্যাপিনী সত্তার রূপাংকন অপরূপ হয়ে উঠেছে।

সেই 'উর্বশী'কে নিয়ে যুগে যুগে বিশ্বমানবের উদ্বেল ক্রন্দন "জগতের অশ্রু এ স্থূল লালসা নয় ; সৌন্দর্যের প্রতি মানবের স্বাভাবিক বাসনা বা ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত হলেও স্থূল দৈহিক লালসা নয় তার" বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দু মাঝখানে। অতি লঘুভাব পাদপদ্ম রেখে উর্বশীর অনন্ত যৌবনলীলা কামনায় দেহকে আশ্রয় করে ও ভাবের প্রাধান্য"—বলেছেন কবি। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় আদি রসের আলম্বন থেকে সৌন্দর্যবোধকে বিচ্ছিন্ন না করে ও কবি 'আদির বাসনা থেকে মুক্ত হ'তে চান।

এবং তারপরেই 'নিষ্ঠুরাবিধিবা উর্বশীর চঞ্চল বিদায়ের জন্য বিশ্বজগতের চিরন্তন ক্রন্দনকে অভিব্যক্ত করেছেন কবি—আশা করেছেন কবি—'উর্বশীর' পুনরাবির্ভাবের। কিন্তু পরক্ষণেই রোমান্টিক সৌন্দর্য্য বীরত্বের তীব্র বেদনা ব্যাকুলতা ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে—কিন্তু মানসমোহিনী, পূর্ণ সৌন্দর্যসত্তা, অথবা নারীর জন্যে অনিধান আকাংক্ষার প্রদীপে আশার শিখাকে জ্বেলে রেখেছেন কবি প্রাণের ক্রন্দনে—"তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল কবিতাটিতে উর্বশীর আদর্শ সৌন্দর্য মূর্ত্তির রূপকল্পনা কী অপরূপ গীতি মাধুর্যে বিমথিত হয়েছে ; এবং সৌন্দর্যব্যাকুল মর্ত্তপৃথিবীর অন্তর ক্রন্দনের ব্যাঞ্জনা কী অপরূপ হয়ে উঠেছে।

রোমান্টিক কবি কল্পনার একদিকে থাকে একটি Centripetal force, কেন্দ্রবিভাগ শক্তি আর অপরদিকে থাকে কেন্দ্রাতিক শক্তি centrsfigul force) রবীন্দ্রনাথেও ছিল। এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য স্থাপনের

কবির আশা

শ্রীরাঘব দত্ত

●

কবির জীবন ভোর
আছে শুধু আশা
চিরদিন সকলের
পাবে ভালবাসা।
বাঁধিবে নিজের ঘর
ছোট সেই গ্রামে,
কুলু কুলু যেথা বয়
নদী অবিরামে।
আনিবে কোয়েল পাখী,—
গাহিবে সে গান
ডাকিবে সে থাকি থাকি'
সারা দিনমান।
পুষিবে কুকুর ছানা
সাদা কালো মাথা
কচি তার মুখখানি
মনে রবে আঁকা।
দূরের শ্যামল মাঠে
রহিবে সে চেয়ে
নিজের বাঁধানো গান
যাবে গেয়ে গেয়ে।
চরিবে ধবলা ধেণু
ঘরের অদূরে,
রাখাল বাজাবে বেণু
অজানারী সুরে।
আঁকিবে সে শিল্পী হয়ে
ধরি' নানা তুলি,
জীবনের দেখা তার
নানা ছবি গুলি।
গাঁয়ের চাষীর কাছে
আসিবে সে রোজ
কাদের কি প্রয়োজন
লয়ে যাবে খোঁজ।
তারপর যতদূর
সাধ্য আছে তার
করিবে পূরণ সে
দরিদ্র চাষার।
এরি মাঝে যতটুকু
পাবে সে সময়
লিখিবে গাঁয়ের কাব্য
আর কিছু নয়।

●

'উর্বশী' ও আধুনিক চিন্তা

প্রচেষ্টাই রবীন্দ্র কাব্য সাধনায় প্রধানতম প্রয়াস। কবি এ সত্যকে স্বয়ং স্বীকার করেছেন অন্যত্র অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centrifugel force ideal এর দিকে Real কে দিয়ে যায়, এবং অনুরাগের centripetal force real এর দিকে Ideal কে আকর্ষণ করে। আর বিদগ্ধ রসিকের সংক্ষিপ্ত উক্তিতে এ সত্য পরিস্ফুট হয়েছে যে "এই দুই শক্তির লীলা ও ছলনায় রবীন্দ্র কাব্যের মৌলিক রহস্য।" আর রবীন্দ্র কাব্যের সংগে পূর্ণ পরিচয়ের ভিত্তিতে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে ঐ centrifugal force* রবীন্দ্রনাথে সমধিক —তারই ফলে শেলীর সংজে তাঁর প্রকট সাদৃশ্য।

●

বিজ্ঞানের ভয়াবহতা

কুমারী প্রতিমা দাস

বিজ্ঞানের অর্থ বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ। শৈশবে পড়িয়াছিলাম যে পুস্তক পাঠে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই বিজ্ঞান। কিন্তু শৈশবকে যখন অতিক্রম করিলাম তখন বুঝিলাম বিজ্ঞানের অর্থ ইহা অপেক্ষা ব্যাপক। বিজ্ঞান হইল এমন জিনিস যাহার সাহায্যে মনুষ্যের জাতীয় জীবন ক্রমেই উন্নততর হয় ও যাহার দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সক্ষম হয়। মনুষ্য প্রকৃতির রহস্য নিত্যই উদ্ঘাটিত করিতেছে সত্য, এমন কি প্রকৃতিকে অনেকখানি আপনার বশেও আনাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবন কি সত্যই উন্নততর হইয়াছে? মনুষ্য কি সত্যই সভ্যতার উচ্চমঞ্চে অধিরূঢ় হইতে পারিয়াছে? ইহার উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মনুষ্য সত্যই পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে সেচের জন্য খাল খনন হইল। ডিনামাইটের আবিষ্কার হইল পাহাড় পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারীর নিমিত্ত। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন টেলিভিসাণ, ট্রেন, ষ্টিমার উড়োজাহাজ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এইভাবে নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। মনুষ্য ক্রমেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে লাগিল।

কিন্তু অপরদিকের প্রতি চক্ষু ফিরাইলে দেখা যাইবে যে মনুষ্যজীবন উন্নতিরপথে অগ্রসর হইতেছে। আদিম যুগ হইতে মনুষ্য আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অপরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কত পাশবিক হানাহানি ঘটিয়াছে, কত অস্ত্রের ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু সেসকলঅস্ত্র প্রযোগ করা হইত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুষ্টের দমণের জন্য ও সত্যকে জয়যুক্ত করার জন্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের পরিচয় ছিহ বাহুবলের, বীরত্বের। তখন মনুষ্য তাহার ধর্ম্মবোধ ও মানবত্তাকে হারায় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমাণের সংগ্রাম কি ভীষণ রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! এ যুদ্ধে ধর্ম্মবোধের, সত্যের কোন স্থান নাই। মনুষ্য আজ তাহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া পশুতে পরিণত হইয়াছে। সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই কথাটি মনুষ্য আজ ভুলিতে বসিয়াছে। সবল দুর্ব্বলের রক্তপানে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন :—

> "ক্ষুধাতুর আর ভুরীভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দ্দ হন।"

বর্ত্তমাণের সংগ্রাম বীরের সংগ্রাম নয়, বর্তমানের সংগ্রাম মেঘনাদের ন্যায় মেঘের অন্তরালে থাকিয়া কাপুরুষের সংগ্রাম। মনুষ্য বাহুবল পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রবল ধরিয়াছে। অবশ্য অস্ত্র পূর্ব্বেও ছিল। কিন্তু সে অস্ত্র ইহা অপেক্ষা ভাল। আজকাল বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্য ভয়ঙ্কর মরনাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে তাই জনসাধারণের মনে আজ প্রশ্ন জাগিয়াছে বিজ্ঞান কি চায়—সভ্যতার অগ্রগতি না বিনাশ?

প্রথম মহাযুদ্ধের পরও মারনাস্ত্র এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। পরিখার অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করা আর দূর পাল্লার কামানে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করাই ছিল সে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহার পর আসিল এ্যাটম যুগ। অমনি যুদ্ধের গতি অন্যদিকে ফিরিল। নিরপরাধ শিশু বৃদ্ধ সকলেই নিহত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাত্র দুইটি আনবিক বোমার বিস্ফোরণে জাপানের দুইটি শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই কি সভ্যতার উদাহরণ? আত্মরক্ষার জন্য মানুষ ক্রমেই নিত্য শক্তিশালী অস্ত্র আবিষ্কার করিতেছে। বোমারু বিমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিমান বিধ্বংসী কামান আবিষ্কৃত হইল। ট্যাঙ্ককে প্রতিরোধ করিতে সৃষ্টি হইল ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্রের, সাবমেরিণের

টরপেডো আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে আসিল ডেপথ চার্জ। এইভাবে একটিকে প্রতিরোধ করিতে তদপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্রের আবিষ্কার হইতে লাগিল। সম্প্রতি আমেরিকায় হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার হইয়াছে। ইহার শক্তি কাহারও অজানা নয়। পুনরায় শোনা যাইতেছে ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী নাইট্রোজেন বোমা আবিষ্কৃত হইবে।

এই সকল মারণাস্ত্র কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের পরাজিত ও নিহত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না; ইহারা এরূপ ভয়ঙ্কর যে ইহাদের বিষবাষ্প কয়েক বৎসর ধরিয়া বাতাসে মিশিয়া থাকে এবং তাহার ফলে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্তন ও তৎসহ জনস্বাস্থ্যও ক্রমে পীড়িত হইতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় দেখা যায় যে ইহার অন্তরালে রহিয়াছে মুষ্টিমেয় মনুষ্যের সীমাহীন লাভ, পরজাতিকে শাসনের নামে হিংস্রভাবে শোষণ। বর্তমানে উগ্র দেশপ্রেমিকতা দেখাইয়া গিয়া বা আপন দলের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া মনুষ্য অপর দেশকে বা দলকে নির্মমভাবে পীড়ন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। ইহা দর্শনে বা শ্রবণে কি বলা যায় যে জাতীয় জীবন উন্নততর হইয়াছে? আজ মনুষ্য:—

"ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাহাদের এই রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর একদিন হবে ঢিলা।' অত্যাচার অবিচারই মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে বিবেকবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ নাজীবাদ পৃথিবী হইতে একদিন বিদায় লইবেই। সেদিন পুনরায় স্বাধীন চিন্তা মানবতা ও ধর্মবোধের উদ্বোধন হইবে। তখনই মনুষ্যের মধ্যে শান্তি প্রেম ও মৈত্রী স্থাপিত হইবে। তখন মনুষ্য মনুষ্যকে যুদ্ধের দ্বারা বশীভূত করিতে চাহিবেনা, তখন প্রেমের দ্বারা বশীভূত করিতে চাহিবে না, তখন প্রেমের দ্বারা মনুষ্য মনুষ্যকে বশ করিবে। তখন জাতীয় জীবন উন্নত হইয়াছে বলা যাইবে। তখনই প্রকৃত সভ্যতা দেখা দিবে। আশাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—

"যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।"

অর্ঘ্য নিবেদন*

নৃত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন এম-এ

হে অতীতের যশোদীপ্ত গন্ধবণিক! আজি তোমার মুখ ম্লান কেন? তোমার কার্য্যাবলী শৃঙ্খলা-রহিত চিত্ত জড়িমা-বিজড়িত, আকাঙ্খা ক্ষুদ্র কেন হেরিতেছি? হে শ্রেষ্ঠি! হে গন্ধবণিক! হে ধনপতি! তুমি ধনকুবের হইয়া আজি তোমার এ দারিদ্র্য কেন? তুমি যে স্মরণাতীত কালেও ধন আহরণার্থে দেশ বিদেশে গমণ করিতে (ঋগ্বেদ ৫, ৩১, ৭) আজি এ জড়তা কেন বল দেখি? হে বাণিজ্য-কম্মিন্। তোমার বাণিজ্যেই দেশ রক্ষা পাইত, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকিত; কি করিয়া সমাজে এমন অবহেলিত হইলে? তোমার সেই যশঃ-প্রদীপ্ত কর্ম্মময় জীবন কোথায় গেল? তুমি শুধু দেশের মধ্যেই ব্যবসা করিয়া ত সন্তুষ্ট হইতে না, পরন্তু তোমার সুদৃঢ় তরী সমুদ্র মধ্যে অনবরত যাতায়াত করিত ঋগ্বেদ ১, ৫৬, ২), বাড়ীর কাছে এই সিংহল ত তোমার ধন আহরণের স্থান ছিল, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ত তোমার সতত গতাগতি ছিল যবদ্বীপে আজিও তোমার কীর্ত্তিকথা বিঘোষিত রহিয়াছে; হে শ্রেষ্ঠি বল দেখি কোন্ ক্রূর দেবতার অভিসম্পাতে সে সমুদয় তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? শুধু অদৃষ্টকে দোষ দিওনা, পুরুষাকারকে আশ্রয় কর। সুদৃঢ় প্রযত্ন কর, সিদ্ধিলাভ করিবে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উঠ, জাগো।

বিদেশের কর্ম্মময় জাতিগণের কথা না হয় বাদই দাও, তোমার প্রতিবেশীগণের প্রতি নিরীক্ষণ কর দেখি। সকলেরই উদ্যম আছে, প্রযত্ন আছে; স্বল্প হউক, অধিক হউক, সিদ্ধি সকলেই লাভ করিতেছে। আর তুমি—বল দেখি কেন তোমায় এ বিজাতীয় আলস্যে পাইয়া বসিয়াছে? কেন তোমার এই মন্থরগতি, পরিম্লানদৃষ্টি শথিলপ্রচেষ্টা! অতীতের সেই কর্ম্মময় জীবন পরিস্মরণ কর, জড়তা পরিত্যাগ কর, জগতের জিগীষুগণের প্রোদ্দাম গতিতে যোগ দাও। হে শ্রেষ্ঠি! তোমারই কর্ম্মময় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তোমারই ব্যবসা লইয়া দেশ বিদেশে বহু জনেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, আর তুমি তন্দ্রিতের ন্যায় অর্থহীন দৃষ্টিতে তাদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ! কিন্তু শুধু এমনি করিয়া চাহিয়া রহিলে চলিবে না; বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ভুলিয়া যাও, অতীত স্মরণ কর। তাহা হইলেই চিত্তে উৎসাহ আসিবে, বাহুতে বল আসিবে। তোমায় স্মরণ রাখিতে হইবে তুমি কর্ম্মে চিরনবীন, ধর্ম্মে চিরপ্রবীণ। তোমার কর্ম্মপ্রচেষ্টা শিথিল হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রাচীনযুগের আচারনিষ্ঠা এখনও যেন কেবল তোমারই মধ্যে দেখিতে পাই। হে কর্ম্মি! শ্রেষ্ঠি সঙ্কল্প কর তোমার সেই ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বক্ষে লইয়া সমাজে অগ্রসর হইতে হইবে পরস্পর পরস্পরকে আনুকূল্য করিতে হইবে, ঈর্ষা দ্বেষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

হে গন্ধবণিক! হে আমার স্বজাতি নারায়ণ! তোমায় প্রাচীন কথা শুনাইবার জন্য, বর্ত্তমানের ভূমিকা দেখাইবার জন্য, কত আবদার অত্যাচার করিবার জন্য, তোমারই সমাজের মুখপত্র 'গন্ধবণিকের' সম্পাদক রূপে আজি আমি তোমায় অর্চ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে তোমার চরণোপান্তে এই অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।

(গন্ধবণিক, জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৪ হইতে)

---

* অর্ঘ নিবেদনের লেখক স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রুদ্র বেদান্ত রত্ন এম, এ। আজিকার শিক্ষিত তরুণ গন্ধবণিক সন্তানদের কাছে এই নাম একপ্রকার অজ্ঞাত। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে তিনি বঙ্গীয় গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে একজন স্মরণীয় পুরুষ। আজ তিনি জাতির অতীত সংস্কৃতি সাধকদের মধ্যে মাহার্ঘ্য আসনের অধিকারী। কিন্তু ভুলে গেছি সে নাম। এই অর্ঘ নিবেদন রচনা দিয়েই ম্রিয়মানজাতির কর্ণকুহরে বজ্রকণ্ঠে সে উদাত্ত আহ্বান সেকালের সমাজকে চকিত করেছিল। যে আহ্বান আজও দুয়ারে দুয়ারে হেঁকে ফেরে

সত্যকথা বলতে কি সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন অনন্য। এই গন্ধবণিক জাতির সেবায় তিনি প্রাণপাত করেছিলেন। ১৩৪৪ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হতে তিনি এই গন্ধবণিকের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। জাতির সে এক শুভদিন। তাঁর করস্পর্শে এই পত্রিকা যে সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সেকালের আজিও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা আরও ভালকরে বলতে পারেন। নিত্যগোপাল সেকালের বিদ্বৎ জনসমাজে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুরসিক সাহিত্যিক ছিলেন। অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্রের পর নৃত্যগোপালের ন্যায় যোগ্য সম্পাদকের হাতে এই পত্রিকার মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি রাণীগঞ্জ সম্মিলনীতে সভাপতির যে অভিভাষণ দেন তা পাঠ করলে তাঁর আন্তরিকতা ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বাংলা দেশের সাহিত্যচর্চ্চা ও গবেষণার ইতিহাসে একটি অমর নাম। তাঁর কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্গীয় শব্দকোষ। স্বর্গীয় বসুর সংগে একযোগে নৃত্যগোপাল শব্দকোষের সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় শব্দকোষের সহসম্পাদক। সেকালের সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাতে তার অসংখ্য রচনাদি প্রকাশিত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাধারী গ্রামের বিখ্যাত রুদ্রপরিবারের সন্তান। "বিশিষ্ট বংশমালা" (গন্ধবণিক, শ্রাবণ-১৩৪৪) শীর্ষক একটি রচনায় তিনি নিজবংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আজিকার এই শুভলগ্নে সেই পূর্বসূরী সুপণ্ডিত সম্পাদকের নাম স্মরণ করে বর্তমান সম্পাদক কৃতার্থ বোধ করছে। সম্পাদক পদে বৃত হওয়ার পর, এইটিই ছিল তাঁর প্রথম রচনা। তা পুনর্মুদ্রিত হোল। তার চিন্তাপূর্ণ রচনাগুলি পরে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।]

—শ্রীহারাধন দত্ত, সম্পাদক

আরো বুঝি এক পাক ঘুরে গেল চাকা

শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত

আরো বুঝি এক পাক ঘুরে গেল চাকা
জীবনের পরিক্রমা বাড়িল ক্ষণিক
লজ্জাহত সঙ্কোচের এতটুকু ফাঁকা
রচি গেল সর্ব্বহর উজ্জ্বল মানিক।
ক্লান্তি ও কামনার দুটো সুর ঠিক
সমভাবে বর্দ্ধমান পিচ্ছল পথে
ঝিলমিল ঝলসান রোদ ঝিকমিক
নিদাঘের বেলা শেষে জীবনের রথে।
স্বর্ণরশ্মি অসংবৃত কর রশ্মি জিনি
অগোছাল গৃহকোণে দুর্নীতি বন্ধন
দাঁড়ায় সন্ধিক্ষণে জটিলতা আনি
জীবনের ইতিহাসে গ্লানির ক্রন্দন।
প্রখর উজ্জ্বলালোকে পান্থ দিশেহারা
ওগো নব কালদূত একি প্রহসন
শুধুই কি পথে পথে হবে ঘোরা ফেরা
বাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে জীবন বাসন?
সত্য ও অসত্যের পাশাপাশি খেলা
তবু হে অনন্তকাল চির সত্য তুমি
অগ্রসরি নব পথে হেরিবারে লীলা
স্বাগত জানায় কবি বায়ে বা[illegible]ম ।

ভোরের আলো

রক্তস্নানের পরে

ছোট বন্ধুরা আমার।

এবারের বৈশাখ চলে গেল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এবারকারের বৈশাখ মাসটি নানা কারণে স্মরণীয়। বৈশাখ মাসেই ভারতবর্ষের- মহামানব বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই মাসেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। শতবর্ষ পূর্বে এক বৈশাখে কোল-কাতার এক অভিজাত বংশে তাঁর উদয় হয়েছিল। আজ একশো বছর পরে সেই রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী হচ্ছে দেশে বিদেশে। আমাদের পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা সেইজন্যই রবীন্দ্র সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখেই আমাদের জাতীয় উৎসব গন্ধেশ্বরীমাতার পূজা উৎসব। এ সবই একে একে শেষ হয়ে গেল; কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা প্রীতি ও সাহিত্য প্রীতি জগৎবন্দিত। কবি বন্দনার মাধ্যমে তা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের অহিংস সরকার ও বিশ্বকবির নামগানে দেশ দেশ নন্দিত করে তুলছিলেন. এমনই সময়ে আমর মহাপ্লাবনের সম্মুখীন হলাম। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ ভারতপথিক বাঙালীকেই আঘাত হানল সেদিন। অহিংসার আবরণের মধ্যে বীভৎস হিংসার অকপট প্রকাশে সারা দেশ ও জাতি স্তব্ধ হয়ে গেল। আসামে রবীন্দ্র পূজার বেদীমূলে. বংগ সন্তানের রক্ত অর্ঘ্যহিসাবে নিবেদিত হোলো বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতির জন্য প্রাণ দিল, আমাদের বাঙালী সন্তান। ন্যায় অধিকার নিয়ে যে অহিংস সত্যাগ্রহ সেখানে চলেছিল বর্বর পুলিশের অত্যাচারে সেখানে রক্তের বন্যা বইল। কাছাড়ের অরণ্যশ্যামল পর্বত পরিবেষ্টিত ভূখণ্ড বংগ সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হোল। কেবল আমরা নয় সারা জগৎ এই অহিংস কপটতা দেখে স্তম্ভিত হোল। যা সেদিন মূল বাংলা দেশের ছেলেরা পারেনি ভাষার জন্য সংস্কৃতির জন্য আমাদের বাঙালী তা দেখিয়ে দিল। ভাষা প্রীতির জন্য খাঁটি তেজোদীপ্ত মানুষের অর্ঘ্য ..

ইতিহাসে অনন্য। এ যেন ঘুম ভাঙানোর এক প্রদীপ্ত আহ্বান। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালীই ত্যাগ করেছিল অধিক কিন্তু তারা পেয়েছে সর্বাপেক্ষা কম। তবু এই স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের যেন অস্তিত্বই নেই। ইদানীং কালের দিল্লীর বাঙালা পদলেহীদের নির্লজ্জ প্রকাশের পরও বাঙালী কিন্তু জাগেনি। বাঙালী ম্রিয়মানও প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। ভাষার বেদীমূলে খাঁটি প্রাণের বিনিময়ে আমরা নবজাগরণের মন্ত্র লাভ করেছি। আমরা জাগ্রত হবার স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এই বর্বর অত্যাচারের কথা আমাদের মনে পড়ে। ১৯১৯ সালে জালিওয়ানবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা। সেদিন অহিংস সত্যাগ্রহীদের নৃশংস ভাবে হত্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথই প্রতিবাদ করে ছিলেন প্রথম। সেদিনের সেই অহিংস সত্যাগ্রহীদেরই আজিকার এই সরকার সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেই বধ করতে চলেছেন। এ যেন নিয়তির পরিহাস। অথচ সেই ভারত সরকারই রবীন্দ্র-শতবর্ষের উদযাপন করছেন এবার। কপটতার কি অপূর্ব প্রকাশ। বন্ধুরা আমার। আজ এই সংস্কৃতি সংকটে এস আবার আমরা মন্ত্র গ্রহণ করি। এস দীক্ষা গ্রহণ করিভাষা আন্দোলনের শহিদদের ও তেজোদীপ্ত আদর্শের কাছ থেকে। আমরা ও সকলের মত তাঁদের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আশাকরি তোমরা এ কাহিনীতে অনুপ্রাণিত হবে।

—সারথি ভাই—

জন্মদিনে

শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল

২৫শে বৈশাখ আজ
মা তাই ফেলে সকল কাজ
সাজিয়ে দিলে রবির ছবি ফুলের সাজে আজ
ফেলে সকল কাজ॥
মা সত্যি করে বল নাগো আসবে কিগো রবিঠাকুর আজ?
আমের পাতায় গাঁথছো মালা সাজিয়ে দিয়ে বরণ ডালা
হাতে লয়ে ধূপধুনার থালা॥
যাচ্ছ প্রতি ঘরে ঘরে আলপনা দ্বারে দ্বারে।
রবিঠাকুর আসবে কি আজ বলগো আমারে
শুনেছি একশো বছর আগে
জন্মেছিলো রবি ঠাকুর এ ধরণীর পরে
আবার কি মা আসবে ঠাকুর মোদের ঘরে?
একশো বছর পরে।
এলে ঠাকুর প্রণাম করে বলব তারে
যেওনা আর চলি বারে বারে
চাঁপাফুলে পা দুখানি ভরিয়ে দেব তার
পরিয়ে দেব গলার পরে তাঁর কবিতার হার,
করব নমস্কার।

তুলসী কম্পাউণ্ডার

ধীরাজ কুমার দত্ত

●

গাঁজা কিংবা গুলি খাই বলুন না কেন আমি কিন্তু একটুকুও অতিরঞ্জিত করছিনে। তুলসী কম্পাউণ্ডার এর মুখে যা শুনেছি, অবিকল তাই তুলে দিলাম। বিশ্বাস না হয় আসুন আমার সঙ্গে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে যান। হ্যাঁ আর একটা কথা, তুলসী কমপাউণ্ডার বললে কিন্তু গ্রামে ওকে কেউ চিনিতে পারবেনা, বলবেন,—"নাড়িটেপা ডাক্তার এর ডিসপেনসারী কোথায়?" একটা ছ' বৎসরের বাচ্চা অবধি দেখিয়ে দেবে। ওর বাড়ীর কথা যদি জিজ্ঞেস করেন আমিও বলতে পারবনা। পাঁচ, সাত বৎসর হল এসেছে এই গ্রামে বাড়ী নাকি কোলকাতা অঞ্চলে। অতীতে বাবা মার দেওয়া একটা মোটা গোছের নাম ছিল। "তুলসী চরণ কারফরম" ও নামটা এখন সবাই ভুলে গেছে। এখন দেহাতের লোকে ওকে নাড়িটেপা ডাক্তার বলেই জানে। ওই যে সামনে ঐ পদ্মপুকুরটা দেখছেন না, ওটাকে বাঁয়ে ফেলে ঐ মেঠো পথটা ধরে চলে যান, একটা বড় রাস্তা পাবেন ঐ রাস্তা ধরেই মিনিট দশেক হাঁটতে থাকুন দেখবেন একটা বড় বটগাছ। ঐ বটগাছের সামনের খোড়ো ঘরে যে কিট-কিটে ভদ্রলোকটি, চৈতনে একটা ফুল বেঁধে গলায় একটা ষ্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে নড়বড়ে একটা টেবিলের সামনে একটা টিনের চেয়ারে বসে থাকতে দেখবেন, উনিই আমাদের তুলসী কমপাউণ্ডার ওরফে নাড়িটেপা ডাক্তার, গিয়ে আলাপ করে দেখুন আমি মিথ্যে বলছি কিনা।

* * *

"এই তোর কি হয়েছে শুনি।" নাড়ি টিপতে টিপতে জিজ্ঞেস করে নাড়িটেপা ডাক্তার

আজ্ঞেবাবু দুদিন হতে রক্ত বাহ্যি হচ্ছে' কমপাউণ্ডার বাবু মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠেন।

'আজ্ঞে তা আছে'।

আজ্ঞে তা আছে যাবে, থাকিতেই হবে আমি যে নাড়িতেই পাচ্ছি। তোদের treatment করার difficulty টা কি জানিস তোরা সিম্পটম গুলো চেপে যাস। এই নাড়িটিপে তোদের Symptom খুঁজে বের করতে হয়। পারবে তোদের ঐ পাশ করা বিলেত ফেরৎ ডাক্তার অমিয় বাবু। বলবে X Ray. করতে না হয় অমুক কর না, হয় তমুক কর। ওরে আমরা নাড়িতে হাত দিয়ে যে যে কথা বলবো ওদের X Ray তে ঠিক সেই কথায় বলবে বুঝলি।

ঔষধটা একটু তাড়াতাড়ি দিন বাবু রোগীটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, কমপাউণ্ডার বাবুর বক্তৃতা শুনে।

দিচ্ছিরে দিচ্ছি, একটু চিন্তা করতে দে। আমিত আর তোদের ঐ পাশকরা ডাক্তার অমিয় বাবু নয় যে এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে দিয়ে বললাম, এই নে মিকশ্চার রোগ সারুক না সারুক দেখবার দরকার নেই। শুধু ভিজিটের টাকাটা পেলেই হল। আমি বাবু তা পারিনা। আমাকে তোদের কাছে বাস করতে হবে। দিন দুপুরে দেখা, কি করে তোদের ফাঁকি দিই বল" বলেই তাকা আলমারীর ভিতর হতে ছুটে বড়ি বের করে দেয় রোগীর হাতে। এই নে দে আটগণ্ডা পয়সা।"

আজ্ঞে আটগণ্ডা কিছু কম করুন না।

এই আটগণ্ডা শুনেই মাথায় হাত দিলি, না তোরা আর আমাকে এখানে টিকতে দিবিনে ভিজিট না হয় ছেড়েই দিলাম, তা বাপু ঔষধের দামটাও যদি না দিস তাহলে আমাকে পাততাড়ি গুটাতে হয়" অগত্যা রোগী-টিকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে বিদায় নিতে হয়। এই তুই এদিকে আয় কি হয়েছে তোর? আর একটা রোগীকে লক্ষ্য করে বলে—

আজ্ঞে বাবু দাঁতে ব্যাথা রোগীটি জবাব দেয় "ঠিক ধরেছি। ওরে আমাকে রোগ বলতে হয়না, আমরা

রোগী দেখেই আঁচকরে নিই বুঝলি। দেখি তোর হাতটা কাছে নিয়ে আয় ....

আজ্ঞে দাঁতে ব্যাথা আর হাত নিয়ে যেতে বলছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলব তাই কর। আমিত আর তোদের বিলাত ফেরৎ ডাক্তার নয় যে বলব দাঁতে ব্যথা হয়েছে ত কি হয়েছে, এইনে ঔষধ বলে একটা যাতা দিয়ে দিলাম পয়সাটা পেলেই হল "আগে নাড়ি দেখতে দে। রোগটা কেন হ'ল কিসের জন্ত হল, এগুলো জানতে দে, তারপর treatment."

*　　　　*

সেদিন তুপুর বেলা হাতে কোন কাজ ছিলনা, একাই বসেছিলাম নদীর ধারে। শরতের হাল্কা মেঘ এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। ঝির ঝিরে হাওয়া নদীর ধারে কাশের বনে দিচ্ছিল দোলা। একটা মোঠোপথ এঁকে বেঁকে বহুদূর অবধি চলে গেছে। ঐ পথেই একটা চামড়ার ছেঁড়া ব্যাগ হাতে করে, পায়ে একটা নতুন কেট্‌স লাগিয়ে হন হন করে চলে আসছিল তুলসী কম্পাউণ্ডার। আমাকে দেখে একগাল হেঁসে বলল কি ধীরাজবাবু বলি একা একা যে নদীর ধারে কি ব্যাপার বলুন ত।

এই শরীরটা তুদিন হতে ভাল যাচ্ছেনা তাই।

ও আর বলতে হবেনা ও আমি দেখেই ধরেছি। তা বলি ঔষধপত্র খাচ্ছেন টাচ্ছেন ত। জানেন ত prevention is better than cure. ঐ একটু থেকেই লঙ্কা কাণ্ড বেঁধে যেতে বেশীক্ষণ লাগেনা। কৈ দেখি নাড়িটা, বলে এক রকম জোর করেই আমার নাড়িটা টিপে ধরে তুলসী কমপাউণ্ডার।

বাহ্যে টাহ্যি হচ্ছে ত? জিজ্ঞেস করে আমাকে

তা এক রকম না হওয়াই জবাব দিন।

ঠিক যা ধরেছি বলেই ব্যাগ খুলে তুটো বড়ি দেয় আমার [illegible] রাত্রিতে শোবার সময় খেয়ে নেবেন বলেই চলতে [illegible]রে

কমপাউণ্ডার বাবু

আপনার পয়সাটা ....

ও ছয় গণ্ডা পয়সা আর আপনাকে কি চাইব। মাজ্জিমত একবার দিয়ে আসবেন ঐ সঙ্গে দর্শন আর পায়ের ধূলিটাও।

*　　　　*　　　　*

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গোধূলি বাঁশরির সর্ব্বশেষ সুরের রাগিণীটুকু প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল পথে প্রান্তরে। সমস্ত আকাশটাই আবীর ছড়ানো। ঠিক যেন সদ্য বিবাহিত কোন মেয়ের সিঁথি। সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত মানুষ তাদের অবসাদ গ্রস্থ দেহ মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তাদের নীড়ে। ঝির ঝিরে সাঁঝের হাওয়া কিসের যেন গন্ধ বহে আনছিল। ভারি মিষ্টি লাগছিল সদ্য প্রত্যাগত কত জানা অজানা নাম না জানা পাখীর কল কাকুলী। আপন মনেই বাড়ী ফিরছিলাম্। "এইযে ধীরাজ বাবু আসুন, দেখলাম তুলসী কমপাউণ্ডার তার ডিসপেন সারী হ'তে আমায় হাত নেড়ে ডাকছে।

ভাবলাম কালকের ছয় আনা পয়সার তাগাদার জন্য হয়ত! ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, খুব মনে করে দিয়েছেন যা হোক। না ডাকলে কালকের পয়সার কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম বলেই ছয় আনা পয়সা এগিয়ে দিই। নিঃসংকোচে পয়সা গুলো পকেটে গলিয়ে নিয়ে আমার নাড়িটা টিপে ধরে নাড়িটেপা ডাক্তার।

তারপর কেমন আছেন তাই বলুন?

যদিও সকালের দিকে একটু জর হয়েছিল তা অস্বীকার করি আবার নতুন কোন ফ্যাসাদে ফেলবে বলে।

আজ বেশ ভালই আছি।

ভাল আছি মানে আলবাৎ থাকবেন। কাল যে কড়া ডোজের ঔষধ দিয়েছিলাম। কেবল গাঁয়ের উপর দরদ আছে বলে....এখানকার মাটি আঁকড়ে থাকা, নইলে ....। একটা আত্মতৃপ্তির হাঁসি হাঁসে নাড়িটেপা ডাক্তার। ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয়লাভ করেও এত আত্ম তৃপ্তির হাসি হাঁসতে পারেন নি স্বয়ং সেনাপতি "ওয়েলিংটনও"। ঐ অমেটা বিলেত থেকে খেতাব নিয়ে এসে ভাবছে যেন ও কি হয়ে গেল। 'কিন্তু এ' শর্মা যে কি 'চিজ' এখনও

চিনলনা। আরে আমাদের শিরায় শিরায় বইছে ডাক্তারের রক্ত আমরা তিন পুরুষ অবধি ডাক্তার।

তাহলে কমপাউণ্ডার উপাধি আপনাদের বংশানুক্রমিক, পাশ করা খেতাব নয়? আমি জিজ্ঞেস করি।

কি হবে পাশ করে বলতে পারেন? একরকম খেঁকি য়েই উঠে কমপাউণ্ডার বাবু।

যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থেকে শেখা যায় কি হবে বইএর কতগুলো বাঁধা ধরা বুলি মুখস্ত করে। জানেন সত্যেন বোস নিজে ডক্টরেট ছিলেন না কিন্তু ডক্টরেট এর খাতা দেখতেন। ওই নিলুদার কথাই ধরুন না।—নিলুদা? কোন নিলুদা—আমাদের ঐ গোবর ডাঙ্গার নিলে বাগদি নাকি? আমি জিজ্ঞেস করি।

আরে ও নিলে বাগদি হতে যাবে কেন আপনাদের ঐ নিলরতন সরকারের কথা বলছি। সবে মাত্র বিদেশী খেতাব নিয়ে কলকাতায় ফিরেছে। কলকাতার এক মাড়োয়ারীর সাংঘাতিক অসুখ। ডাকপড়ল নিলুদাকে। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম। নিলুদা অনেক পরীক্ষা করে বললেন ম্যানেঞ্জাস ডিসিস। নিলুদা ইংজেকশান দিতে যাচ্ছেন, আমি হতাটা চেপে ধরে বললাম "দাঁড়াও নিলুদা" একি করছ তুমি! এ কেস্ ম্যানেজার ডিসিসের নয়। এপিওর হিষ্টিরিয়া। তারপর সিম্পটম গুলো হুবহু মিলিয়ে দিলাম হিষ্টিরিয়ার সঙ্গে। নিলুদা আমার পিট চাপড়ে বলল সাবাস্ ভাই"

তা আপনি কলকাতা হতে চলে এলেন কেন? আমি জিজ্ঞেস করি'.

আরে এসেছি কি সাধেই....সে অনেক কথা। একদিন পার্কে বসে আমি সুভাস আর চিত্তবাবু গল্প করছি। চিত্তবাবুকে দেখে আমার সন্দেহ হল, আমি ওঁর নাড়িতে হাত দিয়েই বলে দিলাম আপনাকে slow poison দেওয়া হয়েছে। আমার কথা শুনে চিত্তবাবু কলকাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তারকে দিয়ে ব্লাড এগজামিন করালে, কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের দেশের কারুরই রক্তে ধরা পড়ল না সেই মারাত্মক বিষ। চিত্তবাবু ত আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। সেদিন যদি আমার কথাটা সিরিয়াসলি নিতেন, হয়ত তাকে বাঁচাতে পারতাম একটা দীর্ঘনিশ্বাষ ছাড়ে তুলসী কম্পাউণ্ডার।

তারপর একদিন তার মৃতদেহ শিয়ালদা স্টেশনে নামানো হল, দেশের লোক জানল ইংরেজের ষড়যন্ত্র! সুভাস আমার হাত ধরে বললে দাদা আপনি গ্রামে যান। গ্রামে গিয়ে অজ্ঞ দেশবাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুণ। সমূলে উৎপাটন করে দিন মারাত্মক ব্যাধিগুলো—আমাদের পল্লী ভাইদের জীবন হতে। তাই আসা নইলে ....। একটা সিগারেট ধরাল তুলসী কম-পাউণ্ডার। আমার দিকেও একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়। একবার কি হয়েছে জানেন লুই পাস্তুর এল ইণ্ডিয়াতে দিল্লীর অশোক হোটেলে ওকে রিসেপশ্যান জানাতে গেলাম আমি নিলুদা, বিধান।

লুই পাস্তুর কোন কালে ভারতবর্ষে এসেছে বলে শুনিনি।

শুধু আমি কেন সারা ভারতের লোকই জানেনা। তুলসী কমপাউণ্ডার এর মুখে প্রথম শুনিলাম।

তবুও প্রতিবাদ করলাম না।

তুলসীকমপাউণ্ডার বলে চলে—তারপর হয়েছে কি, আমি খাবারের টেবিলে বসে বসন্তের টীকা সমন্ধে এক তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিলাম ঠিক তার দুবৎসর পরে একদিন সংবাদ পত্রের পাতা উলটিয়ে দেখি বড় বড় হরফে লেখা পাস্তুর কর্তৃক বসন্তের টীকা আবিস্কৃত। কিন্তু পৃথিবীর লোক আজও জানলনা তার মাথায় এই আইডিয়াটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল কে। ইতিমধ্যে একটা রোগী এসে বলে বাবু আজ দুদিন হতে পেটে ব্যাথা তুলসীকমপাউণ্ডার পেটে দুটো দুটো কিল মেরে নাড়িটা চেপে ধরে বলে "আরে এযে পিওর সার্জিক্যাল কেস" আমিও বেয়াই পায়।

• • •

তারপর অনেক দিন তুলসী কমপাউণ্ডারের কোন খোজ রাখিনি। পুরো দুটো বৎসর জীবনের ধকল

খাতায় খরচের পাতায় লিখিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে রাজভবনে একটা চাকুরী দখল করে বসে আছি। পূজোর আর বেশী দেরি নেই চারিদিকে বেজে উঠেছে আগমনী সুর মূর্চ্ছনা শরতের মধুযামিনী আর মোহময়ী হয়ে উঠেছে কৌমুদ প্রলেপে। আমন ধানের শ্যামলিমা সারা পৃথিবীর বুকে বিছিয়ে দিয়েছে সবুজ কার্পেট। প্রবাসীরা গৃহে ফিরে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। পদ্মদীঘির চণ্ডিমণ্ডপে গ্রামের ছেলের দল, এতক্ষণ হয়ত হৈ হল্লো করে ছুটে বেড়াচ্ছে, বড়রা তাসের আড্ডা বসিয়েছে। আর আমি কলকাতার এই দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় দিনের পর দিন কলুর বলদের মত কলম পিষে চলেছি। মনটা খারাপ হয়ে গেল, সেই দিন চলে এলাম পদ্ম-দীঘিতে বৈকালে তাসের আড্ডা থেকে ফিরছি। বন্ধুদের মুখে শুনলাম্ তুলসী কমপাউণ্ডার এর ওখানে বিরাট জলসা হবে। নিতাই বললে তাহলে যাচ্ছিস ত জলসায়?

তুলসী কমপাউণ্ডার কে দেখবার লোভটা সামলাতে পারলাম না বললাম, "নিশ্চয়ই!

বেশ শীত পড়েছে, তার চেয়েও বেশী পড়ছে শিশির। গলায় গলাবন্ধ মাপলার আর গায়ে ব্যাপারটা জড়িয়ে নিয়ে গেলাম জলসায়। কাতরে কাতারে লোক বসে আছে ফাঁকা জায়গায়। শুধু আসর টুকুতে ত্রিপল খাটানো। কোথায় বসব ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে এই যে ধীরাজ বাবু বলেই তুলসী কমপাউণ্ডার আমাকে তার ডিসপেন-সারীর দুয়ারে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে।

"তারপর; কি ব্যাপার হঠাৎ জলসার খাবর করলেন যে?" হঠাৎ নয়ত! প্রায়ই করি। এই লোকের মনে একটু আনন্দ দেওয়া আর কি। এই আজ পাড়া গাঁয়ে মানুষের মনে রিক্রিয়েশ্যান হবার ত উপায় নেই তাই মাঝে মধ্যে করতে হয়।

"তুলসী কমপাউণ্ডার কি তবে সত্যিই পরের হিতার্থে এই গ্রামে এসেছে?"—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি। অনুষ্ঠান সূচী পড়লাম। সারা রাত্রির ব্যাপি অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠান আরাম্ভ হবার কথা হয়েছিল রাত্রি সাতটায়; আরাম্ভ হতে রাত্রি নটা হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত বিচিত্রানুষ্ঠান।

একঘন্টার বেশী থাকতে পারলাম না। বাড়ী চলে এলাম। পরের দিন বৈকালে বেড়াতে গেছি, দেখি তুলসী কমপাউণ্ডারের ডিসপেনসারীতে বহু লোক জড়ো হয়ে আছে হয়ত কালকের আনন্দের জন্য সবাই তাকে স্বতস্ফূর্ত্ত চিত্তে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম আরে এরা সবাই যে রোগী। তুলসী কমপাউণ্ডার এর একটুকুও ফুরসৎ নেই। দুই হাতে বড়ি বিলি করে যাচ্ছে। এই দে তুই আটগণ্ডা, তোর পাঁচগণ্ডা, কাশ বাক্সটা ছাপিয়ে গেছে খুচরো পয়সায়। এতক্ষনে বুঝতে পারলাম কালকের জলসার উপরে কেন কোন ছাউনি ছিলনা।

●●

সৃজন ও বিসর্জন

শ্রীঅনন্ত কুমার দত্ত

শিল্পি আঁকে মনোরম ছবি
মনের পরশ দিয়ে
তুলির আঁচড়ে
বিচিত্র বর্ণের সুষমায়?
সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা
বিশ্বের আনন্দ যাতে
আপন অংকন খানি
দেয় বিসর্জন—
অপূর্ব আনন্দ নিয়ে, তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

কবি আঁকে মরমের ছবি—
লেখায় লেখায়—
বর্ণে বর্ণে, কথায় কথায়
রূপ পায় অরূপ জগৎ।
আপনার সৃজন আনিবে
অতীন্দ্রিয় আনন্দ সত্তায়—
দেয় বিসর্জন
আবেগের মূর্ত প্রতিষ্ঠায়।

শিল্পী আমি নই,
কবির অন্তরলোকে
যে আনন্দ করে বিচরণ,
পাই নাই তাহার ইসারা;
রেখা আর লেখা,
আনন্দ বিতরে নাকি?—হয়নিকো দেখা।

তবু,
প্রগাল্‌ভতা ক্ষমা করো,
আমার অন্তর লোকে পেতেছিনু তোমার আসন
আয়োজন ছিলো না কিছুই
নৈবেদ্য চন্দন ধূপ দীপ—
শুধু তুমি ছিলে—
তোমারে ঘিরিয়া
প্রেমের মূরতি মোর উঠেছে গড়িয়া—
দিনে, দিনে মাসে মাসে, বরষে বরষে।
সৃজনের স্পর্ধা রাখি নাকো,
তবু তোমায় এঁকেছি হৃদয়েঃ
উচ্ছল প্রাণের রক্ত দিয়ে?

বিসর্জন দিতে হবে তার—
হৃদয় জুড়িয়া তাই উঠে হাহাকার।
বলিয়াছি—
কবি নই, শিল্পী আমি নই;
আপন সৃষ্টির বিসর্জনে—
যে দাক্ষিণ্য প্রয়োজন
তার সে নাই—আমার
সে আনন্দ নাই—
সৃজন করিয়াছিনু—বিসর্জনে তাই ব্যথা পাই।

জাতীয় সংবাদ

গন্ধবণিক মহাসভা

ছাত্রাবাস

উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, কারীগরী শিক্ষার জন্য দুঃস্থ ও মেধাবী গন্ধবণিক স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি ও বাসস্থান দেওয়া হইবে। ১৫ই জুলাই ১৯৬১ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করিতে হইবে। ফরমের জন্য সম্পাদক, গন্ধবণিক মহাসভা ২১সি, রাজেন্দ্র দেব রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শুভ বিবাহ

গত ২৪শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৬৭ সাল, খিদিরপুর ৬২।এ, মনসাতলা লেন নিবাসী স্বর্গীয় পাঁচু গোপাল দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বলাই কুমারের শুভবিবাহ উপলক্ষে মাতা গন্ধেশ্বরীর সেবা ভাণ্ডারে ৫৲ এবং দাতব্য সভায় ২৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা মাতা গন্ধেশ্বরীর নিকট নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

গত ১৪ই বৃহস্পতিবার ১৩৬৮ সাল বহুবাজার নিবাসী শ্রীবটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান দিলীপ কুমারের সহিত শোভাবাজার নিবাসী শ্রীবদরি নারায়ণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা সবিতারাণীর শুভ বিবাহ উপলক্ষে উভয় পক্ষ মাতা গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারে ৫৲ হিসাবে মোট দশটাকা প্রদান করিয়াছেন—আমরা মাতা গন্ধেশ্বরীর নিকট নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

মাতা গন্ধেশ্বরীর নিত্যপূজা বাবদ আদায়

১। হরিঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত ২৫৲

২। পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীভূপেশ চন্দ্র দত্ত ১০৲

৩। খিদিরপুর নিবাসী ৺পাঁচুগোপাল দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা নলিনী বালা দত্ত ৩০৲

গন্ধেশ্বরী মাতার স্থায়ীভাণ্ডারে অলংকারদান

১। ১৩৬৭ সালের গন্ধেশ্বরী পূজার দিনে মাতা গন্ধেশ্বরীর চার গাছা তামার পাতের উপর সোনার শাঁখা
—দাতা শোভাবাজার নিবাসী

শ্রীজহরলাল দত্ত

২। ১৩৬৮ সালের গন্ধেশ্বরীর গলার ১টী আনুমানিক ॥৶০ আনা ওজনের সোনার হার।
—দাতা বহুবাজার নিবাসী (স্কট্ লেন)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

শ্রীমতী কৃষ্ণা সাধু

ঊনিশ শতকের ঊষালগ্নে বাংলা দেশের নারী শিক্ষার আন্দোলন হয়। এর মানে এই নয় যে বাংলার কুলললনারা অশিক্ষিত ছিল। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বাঙ্গালী গৃহস্থ বধূরা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবু জাতির মানসিক আনন্দ আসে মাঝে মাঝে ইসলামী শাসনের যখন সমাধি হতে চলেছিলে—ঠিক তার পূর্বেই নারীশিক্ষার সনাতন প্রবাহটি নানা কারনে স্তব্ধ হয়েছিল। জোয়ার আসে জাতির জীবনে। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার শমীস্পর্শে বাঙালীর চিত্তদাহ ঘটল। প্রমিথিয়ুস, যেন বন্ধন মুক্ত হয়ে আলোর দিব্য মূর্চ্ছনায় ভূষিত করল। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই এমনকি ১৮১৫ সালের পর রামমোহনের পর থেকে বাংলা দেশে নবশিক্ষার ভাবনা দেখা গেল। সেকালেই যাঁরা নারীর প্রগতির জন্য চিন্তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার, জন ড্রিকওয়াটার বেথুন এবং পূন্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কলঙ্কারের নাম স্মরনীয়। সেই প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা এই যুগের সীমান্তে এসে আরও ভাস্বর হয়েছে। দেশ ও জাতির সকল শ্রেণীর মানুষ নূতন শিক্ষায় মুক্তিস্নান করে বেঁচেছে। নারী প্রগতির রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হয়েছে।

আমাদের সমাজ সেখানে পিছিয়ে নেই। সরস্বতীর আরাধনায় বাণীর পূজায় আমাদের মেয়েরা ও আজ অগ্র পথিক। আমাদের পত্রিকায় সংবাদ সাহিত্যে একথা আমরা বারে বারে উল্লেখ করেছি এই প্রসঙ্গে শ্রীমতি কৃষ্ণা সাধুর সাফল্য সংবাদ স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীমতী কৃষ্ণা সাধু ইদানিং কালে বঙ্গীয় গন্ধবণিক সমাজের মুখোজ্জল করেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের এম. এ. (সংস্কৃত)পরিক্ষার তিনি প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। এই বৎসরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের L.L.B. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি উজ্জায়ীণীর সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনে কালিদাসের নাটকে অভিনয় করে রাষ্ট্রপতির নিকট হতে সম্মান লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপিকা। গত শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। তিনি কলিকাতার বিশ্রুতকীর্তি আইন ব্যবসায়ী ৺রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর কনিষ্ঠ পুত্র ৺মিহির লাল সাধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং শ্রীযুক্ত জলধিনাথ সাধু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বিশিষ্ঠ সামাজসেবী শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্রী। আমরা শ্রীমতী সাধুর আরও গৌরবময় ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

●●

গন্ধবণিক সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

●

●●

গন্ধবণিক

মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা	আষাঢ়
৬ষ্ঠ সংখ্যা	নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	১৩৬৮

প্রসঙ্গ কথা

জ্যৈষ্ঠের "প্রসঙ্গ কথা"র কিস্তিতে আমরা সর্বভারতীয় সংবাদ আসামের ভাষা আন্দোলন তথা রাজনৈতিক চক্রান্তের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলেছিলাম। এই অভ্যুত্থানের পিছনে সত্য-অসত্য, যুক্তি-অযুক্তির যে প্রশ্ন ছিল—তাও সবিস্তারে বলেছিলাম। আসামের এই আন্দোলন সম্প্রতি আবার দিক পরিবর্তন করেছে—সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জাতীয় জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে। কম্যুউনিষ্ট চীন, পাকিস্তান, নাগা অধ্যুসিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অতি নিকটে এই অনৈক্য ও বিভেদ স্বভাবতই জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ভারত সরকার এই সংকট হ'তে পরিত্রানের কোন সন্তোষজনক পন্থা আজও আবিষ্কার করতে পারেননি। স্বর্গত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যে পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন—তাও সমাধানের ছিদ্রপথে হিন্দী প্রচারের কৌশলমাত্র—এই সূত্র স্বভাবতই বঙ্গ ভাষাভাষী সমাজ গ্রহণ করিবে না। আসামে এই ভাষার চক্রান্ত বহুকাল পূর্ব হতেই—১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময় হতেই ব্রনসন নামক বিদেশী পাদ্রীর প্ররোচনায় আসামে আসামী ভাষার হীন প্রচার চলতে থাকে। "শনিবারের চিঠি"র গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সংবাদ সাহিত্যে' আসামের ভাষা আন্দোলনের পিছনে অনেক ইতিহাস আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। আসামের বাংলা ভাষীদের এই সংকট ও সমস্যা একহিসাবে বাঙালীর সমস্যা। স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় আন্দোলনের ঋত্বিক ও নবভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা বাঙালী নানাভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছে। সমস্যা কণ্টকিত বাঙালীর জীবন আজ একপ্রকার দুর্বিসহ। সেই খণ্ডছিন্ন বাংলার মধ্যাকাশ উজ্জ্বল করে আজও যে দু'একটি জ্যোতিষ্ক জাতিকে পথ নির্দেশ করছিল—মহাপ্রয়াণের আহ্বানে সে দেউটিও একে একে নিভে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ

কিছুদিন পূর্বে পরলোক গমন করেছেন—ইহাও এই জাতির পক্ষে অপরিমেয় ক্ষতি। তাঁর কীর্তিকলাপ, সাহিত্যিক জীবন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জীবন—কৃষি ও কুটীর শিল্পে তাঁর উৎসাহের কথা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অল্পবিস্তর জানা আছে। আমরা এখানে এই রবীন্দ্রাত্মজের সম্বন্ধে অধিক আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যুগন্ধর নায়ক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে বিদায় নিলেন। দেশ হতে দেশান্তরে এমনি করে কত সংবাদ রচিত হচ্ছে—আমরা সে সংবাদের সংগে পরিচিত হয়ে শিহরিত হচ্ছি। যেগুলি আমাদের প্রাণকে দোলা দিচ্ছে—সেগুলির উপরই আমরা ক্ষণকালের জন্ত চোখ বুলিয়ে নিই। যেহেতু জাতি গঠন ও প্রগতিমুখী করাই এই পত্রিকার অন্যতম গুরুদায়িত্ব—সেজন্যই স্মরণীয় ব্যক্তিদের আমরা স্মরণ করে থাকি। বিশেষ করে স্বজাতীয় ব্যক্তিত্বকে আমরা স্মরণ ও মননের দ্বারা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। এই প্রসঙ্গেই বক্ষমান আলোচনায় আমরা দুজন পরলোকগত স্বজাতীয় ব্যক্তিকে শ্রদ্ধারতির ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

স্যার হরিশঙ্কর পাল।

৩রা, আষাঢ় স্যার হরিশঙ্করের তিরোধান কাল—এই দিনটি জাতীয় ইতিহাসের একটি লাল তারিখ। সাম্প্রতিক কালে গন্ধবণিক তার জাতীয় বৃত্তি ব্যবসা হতে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে—এমন কথা সকলেই বলে থাকেন। অথচ বিগত শতাব্দীতে হরিশঙ্করের পূজ্যপাদ পিতৃদেব পুণ্যশ্লোক বটকৃষ্ণ পাল বাণিজ্য ও ব্যবসাতে যে কৃতিত্ব দক্ষতা ও সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন—তা ইতিহাসের সামগ্রী। পুত্র হরিশঙ্কর পিতার প্রতিষ্ঠানকে আরও শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন ও লোকপ্রিয় কোরে তোলেন। কেবল তাই নয়। অর্জিত ঐশ্বর্যকে স্তূপীকৃত করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি—দান, ধ্যান, লোকহিতকর ও জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করে বৈশ্যবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছিলেন। বাংলাদেশের বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানেই বটকৃষ্ণ হরিশঙ্করের দানের কথা কাহারও অবিদিত নয়। হরিশঙ্করের অন্যতম কীর্তি—রাজনীতিতে সিদ্ধি। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র তথা প্রথম ও প্রধান নাগরিক হিসাবে তাঁর অত্যুজ্জল কীর্তির কথা বার বার আমাদের মনে পড়ে। মনে পড়ে এই কারণে যে আজিকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে গন্ধবণিক সন্তানদের কোন প্রতিষ্ঠা নেই। অথচ ইতিহাস খুলে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি রাজশাসনে বৈশ্য বণিকদের কি প্রভাব ছিল। এখন ভারতবর্ষ গণতন্ত্র শাসিত। এই গণতন্ত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন—তা না হলে স্বাধীন জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করা বা কোনরূপ কল্যাণ প্রচেষ্টা একপ্রকার অসম্ভব। সেজন্ত বাংলাদেশের এই দুর্দ্দিনে এবং জাতির রাজনীতি বিমুখতার কালে আমরা স্যার হরিশঙ্কর পালকে স্মরণ করছি। তাঁর কীর্ত্তি ও আদর্শ আমাদের জাতির চরিত্রকে প্রভাবিত করুক আজ এই আমাদের কামনা।

ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ পাল

বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ জিতেন্দ্র নাথ পাল অবশেষে গত ৪ঠা আষাঢ় ১৩৬৮ পরলোক গমন করেছেন। তিনি এককালে কলিকাতার চিকিৎসা ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জিতেন্দ্রনাথের জন্ম কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর (বাংলা ১২৯৪ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ)। বাল্যকাল হতেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে হিন্দু স্কুল হাতে এণ্ট্রান্স এবং ১৯০৮ সালে জেনারেল এসেমব্লীজ ইনসটিটিউসন হ'তে ফার্ষ্ট এগজামিনেশন ইন আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯১৫ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপরেই তাঁর কর্মজীবন সুরু। ১৯১৫ সালেই তিনি লরেন্স জুট মিলে মেডিক্যাল অফিসার হিসবে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্য গ্রহণ করেন—এখানে তিনি হেলথ ভিজিটারের পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্মহতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল গন্ধবণিক দাতব্য সভার সহিত গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নি পঙ্কজিনী পাল এবং দুই পুত্র এবং এক বিবাহিত কন্যাকে রেখে গেছেন। আমরা তার পরলোকগত আত্মার কল্যান কামনা করছি।

উড়িষ্যার নির্ব্বাচন

স্বাধীনতা অর্জনের পর হতে উড়িষ্যার রাজনৈতিক জীবন কখনই নির্বিঘ্ন হয়নি। নবকৃষ্ণ চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ মহতাব প্রভৃতির নেতৃত্বে উড়িষ্যায় যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়—তা কখনই আইন সভার সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেনি। সেজন্য দীর্ঘকাল থেকে উড়িষ্যায় রাজনৈতিক জীবনে বিঘ্ন চলছিল। এজন্য সমগ্র প্রদেশ উন্নয়ন মূলক সুবিধা হ'তে নানা কারণে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। গণতন্ত্র পরিষদ, ঝাড় খণ্ড প্রভৃতি উড়িষ্যার রাজণ্যবর্গের স্বার্থ পরিপুষ্ট দলগুলি সেখানকার জনসাধারণের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল—ফলে বিধানসভা ও লোকসভায় তাঁদের প্রতিষ্ঠা নগণ্য ছিল না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উড়িষ্যার জনসাধারনের সমস্যার সমাধান হচ্ছিলনা। সামন্ততান্ত্রিক দল, কমুনিষ্ট ও প্রজাসমাজতন্ত্রীরা সেখানকার মানুষের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অবশেষে উড়িষ্যার এই রাজনৈতিক ব্যাধির অবসান ঘটালেন তরুণ কংগ্রেস সেবী শ্রী বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক ও শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র। বিজয়ানন্দ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস ও গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অবসান ঘটান এবং অন্তবর্ত্তীকালীন নির্বাচনের আহ্বান জানান। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। কম্যুউনিষ্ট ও প্রজাসমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্র পরিষদ, প্রভৃতি দলগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আশাকরি নূতন মন্ত্রীসভার দ্বারা উড়িষ্যার সর্বাংগীন কল্যাণ সাধিত হবে।

শ্রীহারাধন দত্ত।

রূপময়ী

শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম, এ, কবিশেখর

চঞ্চল যৌবন বন করে উন্মন, সুন্দরি, বাঁধবে না হিন্দোল ?
পুষ্পের সৌরভে কিশলয় গৌরবে অন্তরে সে যে আজ দেয় দোল্।
অশোকের মঞ্জরী লও অঞ্চল ভরি' কবরীর কর রূপসজ্জা,
বকুল বীথির ছায়া চলে' এস পা'য় পা'য় ভুলে যাও ক্ষণিকের লজ্জা।
বল আজ রূপকথা, পে'ল যাহা মুখরতা অতীতের কৈশোর তন্দ্রায়,
বল আজ রূপকথা, যৌবন-আকুলতা যেথা চির-তৃষ্ণার গান গায়।
ধূপছায়া-অঞ্চল হোক আজ চঞ্চল, সুর দিক মঞ্জীর-কঙ্কণ ;
রূপে আর গানে গানে দু'টী তৃষা-ভরা প্রাণে কর শুধু রূপকথা অঙ্কন।
তুমি আছ আমি আছি, পাশাপাশি কাছাকাছি, হিন্দোল দিক দোল বক্ষে,
পুলকের বন্যায় রূপরাজকন্যায় মায়ার কাজলে দেখি চক্ষে !
ঝরা বকুলের পথে চড়ি' স্বপনের রথে এলে যদি অভিসার-যাত্রী,
আজি মায়া নদী কূলে হিন্দোলে দুলে' দুলে' পোহাও এ পূর্ণিমা-রাত্রি !
সুন্দরি, কথা কও, মালাখানি তুলে' লও, রূপকথা শুন'ও গো কর্ণে,
আজি অশোকের ছায় রূপ দাও সে-কথায় হৃদয়ের রামধনু বর্ণে !
হিন্দোল দিক তাল, অতীতের মায়াজাল আজ মোরা বসে' বসে' বুনব,
সাতটি সাগর পারে তেরোটি নদীর ধারে স্বপনের ঢেউ আজ গুণব।
হারাণো যুগের কথা প্রাণে আনে মদিরতা এলায়িত কবরীর গন্ধে,
আঁচলে ফেলো না ঢাকি' ও দু'টি সলাজ আঁখি হৃদয়ের উচ্ছল ছন্দে !
রূপের পরম তৃষা কথাতে হারাবে দিশা, রূপকথা মনে আজ দিক দোল্,
দুল্‌ব যে চিরদিন বক্ষের নীড়-লীন, সুন্দরী, বাঁধবে না হিন্দোল ?

সাধুবাবা

শ্রীশৈলেন্দ্র মোহন দত্ত

●

লোকে ব'লে কানাই মাষ্টারের বিল। বিলের ধারে উঁচু পাড় কানাই মাষ্টারের বাড়ী। তাইতেই হয়তো ঐ নামেই ডাকে সবাই। কবে থেকে—কেউ বল্‌তে পারেনা। নামেই বিল। জল নেই একফোঁটা। বরষায় ছোট্ট নদীর দুইকূল যখন কাণায় কাণায় ভ'রে ওঠে, সেই সময়ই তা'তে একটু জল থাকে। নইলে, বোশেখ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্‌নো নীচু ঢালু জমিটাই পড়ে থাকে। ছোট নদীটিও তখন আরও ছোট্ট হ'য়ে যেন লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে জমাট বাঁধা কচুরীপানার নীচে দিয়ে কুলকুল ক'রে বইতে থাকে। তখন নদী ব'লে মনেই হয়না তাকে। যেন একটা সরুমত ডোবা। ওরই মধ্যে স্নান করা, কাপড় কাচা সবই হয়—এমনকি ছোট ছোট নৌকাগুলো ওরই মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে দূর দূরান্তে পাড়ি দেয়।

বিল এসে যেখানে নদীতে মিশেছে সেখানে ধান-পাটের জমির শেষ কোনটাতে কালী আর শীতলার থান। বৈশেখ মাসে প্রথম জল পড়বার পর পাড়ার মাতব্বরেরা চাঁদা তুলে সেই থানে পূজো দেয়। থানের পেছ'নে একটা কদম গাছ, কতকাল থেকে—কে জানে—দুই থানের উপর যেন রাজছত্র মেলে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার কোন এক বিত্তশালী কালীর মন্দির আর শীতলার থানের সাথে কদম গাছের গোড়াটার চারপাশ বাঁধিয়ে দিয়েছে। যেখানে পাড়ার সাথে কদম গাছের গোড়াটার ছোট ছেলের দল সময়ে অসময়ের ছুটির দিনে এসে জটলা করে। কালীর থানের সামনে আগে নাকি শ্মশান কালীর থান বলে। ছেলে বুড়ো তার সামনে দিয়ে চল্‌তে ফির্‌তে প্রণাম জানায়। সে ভক্তিতে না ভয়ে, জানিনা রাতের বেলায় কেউ শ্মশান কালীর নাম করলে জিব্‌ কেটে মনে মনে তাঁকে স্মরণ করে তাকে প্রণাম জানায়। বিপদে আপদে বা কেউ কঠিন রোগে পড়লে তাঁকে মানত করে পাঁচআনা পয়সা ভক্তিভরে আলাদা ক'রে তু'লে রাখে। থানের পেছন দিকে অনেক দিন আগে একজন সাধু কুড়ে বেঁধে থাক্‌ত। সে নাকি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিল। এখন কোথায় গেছে কেউ বল্‌তে পারে না। তবে অনেকে নাকি দেখেছে আমাবস্যার নিশীথ রাতের সেই তান্ত্রিক শবাসনে যখন ধ্যানমগ্ন হ'য়ে থাকত তখন মা কালী তার সামনের ঐ থানে এসে নৃত্য কর্‌তেন। তাঁর সাথে ডাকিনী যোগিনীরাও। এখন সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করেনা। কিন্তু কথা উঠলে জিব কেটে ব'লে—'কাজ কি ভাই ওসব কথায়? থাকে থাক্‌ আমাদের তো কোনও ক্ষতি হয়নি! এমন যে ভয়াবহ থান, সেখানেও আজ এই শনিবারের কাঠ ফাটা রৌদ্রে পাড়ার গুটি কয়েক ছেলে এসে জুটেছে। কি একটা উত্তেজনা পূর্ণ আলোচনায় তারা রীতিমত ঝগড়া বাধিয়ে তুলেছে। আশে পাশে গুটি কয়েক মেয়ে কাঁচা আম নুন দিয়ে খেতে খেতে তাদের সে আলোচনায় বাধার সৃষ্টি করছে। দেখে মনে হয় এই ভয়াবহ থান সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ অথবা ভয় ব'লে কিছু নেই এদের মনে।

(২)

মেয়েদের মধ্যে বয়সে একটু বড় যে তার নাম মণিমালা। এক হাতে একটা আস্ত আম নিয়ে আর হাতে কাটা টুক্‌রা নুনদিয়ে চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এসে বল্‌ল,—তোমার যে কত মুরোদ বাটুদা, সে আমার জানা আছে। তুমি যাবে সেই মহাশ্মাশানে। হ'ত কমলদা—হ্যাঁ, সাহস আছে! সে যেতে পারে। কিন্তু তুমি?—হাতের আমটি দেখিয়ে মুচকে হেসে বলল আমি এই আম বাজি রেখে বল্‌তে পারি, তুমি সেখানে যেতেই পার্‌বেনা—ভয়েই মরে যাবে।

যাকে লক্ষ্য করে বলা—তার নাম গোবিন্দ। বয়স অনুপাতে সকলের চেয়ে একটু মোটা আর বেঁটেমত। সাহস যদিও তার কিছু আছে কিন্তু বুদ্ধিটা ঠিক দেহেরই

মত মোটা। বেঁটে ব'লে সবাই ডাক্ত বেঁটে গোবিন্দ। বেঁটে দা' থেকে সংক্ষেপে 'বাটুতে' দাঁড়িয়েছে।

মণিমালার কথা তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। সে রেগে বল্‌ল, থাথ্‌ মালা বাজে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস্‌ না। যা এখান থেকে। তোদের এখানে কি দরকার রে? ওদিকে বোধ হয় আমের ভাগ নিয়ে ঝগড়া সুরু হ'য়েছিল। একবার সেদিকে তাকিয়ে ভেংচি কেটে মালা বল্‌ল—উহ্‌ আমাদের আবার কি দরকার? কিস্‌স্যু না। তারপর বড় বড় চোখ মেলে টেনে বল্‌ল—তবে তুমিই আগে আমাকে সাক্ষী মেনে কথাটা বল্‌লে কি না! তা-ই-ই বল্‌লাম। কিন্তু যা-ই বলনা কেন বটুদা, ও তোমার জন্য নয়।

ওদিকে গোলমালটা বেড়ে উঠ্‌তেই মালা তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। গোবিন্দ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বিড়্‌ বিড়্‌ করে বল্‌ল—কমলটাই ওকে মাথায় তুলেছে। তারপর তপনের দিকে ফিরে বল্‌ল—তপু, তোর না ছোট বোন!—কিছু বলতেও পারিস্‌ না?

তপন মনে মনে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিল। জামা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে রাগত স্বরে বল্‌ল—আমি কি বল্‌ব? লঙ্কা খাবি তুই আর ঝাল বুঝব আমি, না? ওকে জেনে শুনেও তুই ওরই সাথে লাগ্‌তে গেলি—আমি কি বল্‌ব? মার আদুরে মেয়ে—কিছু বল্‌লেই খ্যাঁক্‌ করে উঠ্‌বে সবই তো জানিস্‌—

তপনের কথার সুরে একটু অভিমান ফুটে উঠল। কারণ মণিমালাই এখন বাবা মার আদরের মেয়ে। একটা ছোট কাহিনীর মত তপনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায় সেই ঘটনা। ওর ঠাকুরমা বাবা আর মাকে খুব ভাল বাস্‌তেন। তাই তিনি মারা যাবার পর বাবা-মা দু'জনেই শোকে অধীর হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু একদিন স্বপ্নে ঠাকুরমা নাকি বলেছিলেন—'দুঃখ করিস্‌নে—আমি আবার তোদের কাছেই আস্‌ছি।' এর পরই মালার জন্ম। সবাই ভাবলেন ঠাকুরমাই এসেছেন। তাই শুধু বাবা নয় মায়েরও চোখের মণি সে। নামটিও আদর ক'রে রেখেছেন মণিমালা। এতদিন যে তপন ছিল তাঁদের আদরের দুলাল, এখন সে-ই হ'য়েছে যেন আস্তাকুড়ের জঞ্জাল। মালা ছোট হ'য়েও তাই অনেক সময় তাকেই শাসিয়ে থাকে—তপন শাসন করবে মালাকে?

পাশের ক্ষেতের পাটগাছের একটা পাতা ছিঁড়ে হাতে মল্‌তে খোঁটন বল্‌ল,—তাহলে কি করবি? যাবি? না এখানেই বসে থাক্‌বি? আমি বাপু রোজ রোজ স্কুল পালাতে পারবনা। এতক্ষণ ছুটিই হ'য়ে গেল বুঝি। ভাগ্যি সেকেন্‌ মাষ্টার আজ আসেনি। নে, যাবি তো চল্‌। না—তো আমি এই চল্‌লাম—বল্‌ল বটে কিন্তু বই তুলে নিয়েই খোঁটন আবার সেখানে বসে পড়ল। এত তাড়াতাড়ি তারও বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই মোটেই। ছুটীর দিন অমনিতেই কাট্‌তে চায় না—তায় দলছাড়া হ'য়ে যাবেই বা কোথায়? একটু পরে আবার উঠে দাঁড়াতেই গোবিন্দ জামার একপ্রান্ত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বল্‌ল, ইস্‌, আর একটু বস্‌না। কখন যাব—কমল এলেই ঠিক করব। অতদূরে একা যাওয়াটা বুঝলি কিনা—জানিস্‌ তো! শ্মশানের সাধু সন্নেসীরা তন্ত্রমন্ত্র তুক তাক্‌ অনেক কিছু জানে।—যদি কিছু করেই বসে যা—ই বলিস্‌ একটু ভয় কি আর না করে?

নাটু মুচকে হেঁসে বল্‌ল—তবে কেন আর এত বীরত্ব করছিলি ঐ একরত্তি মেয়ে মালার কাছে? মেয়ে ব'লে একটু ঘেন্না হয় না? মালা তোর অনেক ছোট। কিন্তু মনে রাখিস্‌ তোর চেয়েও অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে ও।

গোবিন্দ আর তপন একসাথে নাটুর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নাটুর অবশ্য এ কথাটা না বল্‌লেও চল্‌ত। কিন্তু মালার সপক্ষে এ রকমের ওকালতী এই-ই প্রথম নয় ওর। কারণ সে কমলের একজন অন্ধভক্ত, আর যে মালাকে ওর দাদা তপনও ভয় করে সেও ঐ কমলের কাছে কেঁচো। গোবিন্দ আর তপনকে তার দিকে ওভাবে চেয়ে থাক্‌তে দেখে নাটু স্নেহের হাসি হেসে বল্‌ল,—ইস্‌-স্‌,

ভস্ম ক'রে দিবি নাকি? তোদের চোখের ঐ চাহনিতে আমি তো কোন্ ছার্ ভাট্ কাণ্ডি মহাশ্মশানের সন্নেসিও ভস্ম—

নাটু মুখের কথা শেষ করবার আগেই হঠাৎ সকলকে সচকিত করে দিয়ে ভেসে এল এক তীব্র কণ্ঠস্বর—বোম শঙ্কর্ র্ র্। সাথে সাথে আবিভূত হ'ল এক খুদে সন্নাসী। তার একমুখ কালো কুঁচ্ কুচে দাঁড়ি মাথায় জটাজাল, কপালে সিন্দুরের প্রলেপ, সমস্ত শরীর ভস্মাচ্ছাদিত—হাতে ঝক্ঝকে একটা বিরাট ত্রিশূল।

"এই আমার রূপ"। ত্রিশূল হাতে এগিয়ে এল সন্ন্যাসী। চীৎকার করে ব'লে উঠল—ভস্ম করবি? আয়—কর্ ভস্ম।

বটু, তপু, থেঁপু নাটুর দল ততক্ষণে গায়ে গায়ে চেপে দাঁড়িয়ে গরমে ভয়ে ও আতঙ্কে ঘাম্তে শুরু করেছে। ভয়টা বাটুর চেয়ে নাটুরই বেশী। এইমাত্র সেই-ই তো সন্ন্যাসি কথা নিয়ে ঠাট্টা করছিল। নাটু ঘেমে নেয়ে উঠ্ল। তার মনে হল—সন্ন্যাসির যেন তারই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এত ছোট হ'লে কি হয় তান্ত্রিক তো বটে।—ওরা যে অন্তর্যামী। সব জেনে ফেলেছে আর রক্ষা নেই। সাধুর চোখে চোখ পড়তে তার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল।

বড় বড় চোখ মেলে সন্ন্যাসী আবার চীৎকার করে উঠল—'তোরা কে'? কিন্তু হায় কে উত্তর দেবে? গলা যে শুকিয়ে কাঠ। মনে হ'ল ঐ অদূরে ব'য়ে যাওয়া ক্ষীণকায়া করতোয়ার সমস্ত জল ঢাল্লেও ও গলা আর ভিজবেনা। মরুভূমির মত আবার শুকিয়ে উঠ্বে।

হঠাৎ একটা গোলমালের আভাষ পেয়েই মালা দলবল শুদ্ধ ছুটে এল। সন্ন্যাসী বেশী আমাকে দেখেই হঠাৎ থম্কে দাঁড়াল। তারপরেই হাসি। হাস্তে হাস্তে সে লুটিয়ে পড়ল। আমারও তখন হাসি ফুটে উঠেছে মুখে। কিন্তু আর সকলে তখন ভাবছে—সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই মালাকে তুক্ করেছে। সাধু সন্নেসিরা সুন্দরী মেয়েদের তুক্ করে নিয়ে যায় এ কথা ঠাকুমার কাছে কে না শুনেছে! সে কথা মনে পড়তেই গা শিউরে উঠ্ল। মালা হোক্ না ছোট, সকলের থেকে সুন্দরী তো নিশ্চয়ই, যেমন গায়ের রং তেমনি টুকটুকে চেহারা। আর আর মেয়েরা যখন ভয়ে ভয়ে তপু খেঁচুর গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মালা তখন হাস্তে হাস্তে তান্ত্রিক সাধুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলে যেন এক সাথে মালাকে ডেকে বাধা দিতে চাইল। কিন্তু কারও গলা দিয়ে একটু শব্দও বেরোল না। ভরা দুপুরে কেন যে সকলে মরতে এসেছিল এই শ্মশান কালীর থানে এই ভেবে সকলের মন ভেঙ্গে পড়্ল।

মালা ততক্ষণে আমার কাছে। হাত থেকে ত্রিশূলটা কেড়ে নিয়ে বল্ল—বোম্ র্ র্ র্ তারপর হাত ধরে টেনে এনে কদমতলার বাঁধানো যায়গায় ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বল্ল, চমৎকার! খুব সেজে ছো তো কোথায় পেলে এগুলো?

সকলে অবাক্। তখনো বুকের ঢিপ ঢিপ্ শব্দ থামে নাই কারও। একপা একপা করে ওরা এগিয়ে আস্তেই চীৎকার করে বল্লাম্—বোঠ্ যা!

স্প্রিংএর পুতুলের মত যেন যাদুমন্ত্রে সব বসে পড়ল। নাটু ভাল করে দেখছিল এতক্ষণ। হঠাৎ চীৎকার করে লাফিয়ে উঠ্ল—কমলদা!

—ক্যামাল্ দা—আমি ভেংচে উঠলাম। বল্লাম—বৈঠ!—তোর নাম নাটু হায়? নাটু বোকার মত হাসি হেসে বসে পড়ে বল্ল— হাঁ বাবা, আমি তো নাটু হায়।—তারপর একটু ঢোক গিলে বলল—তুমি তো কমলদা হায়।

হাসির রোল উঠ্ল। হাসির শব্দে ওর সব কথা শোনাই গেলনা। সকলের ভয় কেটে গেছে ততক্ষণে। মালার এক সঙ্গিনী এগিয়ে এসে বলল,—ও ও সাধুবাবা হাত দেখ্তে জানো?

—আমি সব জান্তা হায়। দাও—মেয়েটার হাত টেনে নিয়ে নেড়ে চেড়ে বললাম,—তুমি নুন দিয়ে আম খাতা হায়।

—ইস, হাতে তো নুন লেগেই আছে তাইতে না?

আমি ব'লে চল্লাম—তোমার নাম গৌরী হায়—তোমার বাবার নাম পরেশ চক্রবর্ত্তী।

হায়—তোমার—

হাত টেনে নিয়ে হেসে বলল—ও সাধুবাবা, হাতের মধ্যে বুঝি নাম লেখা থাকে? তুমি কিছু জানোনা।

হেসে বললাম—আলবৎ জানি। আচ্ছা দাও হাত টেনে দেখে বললাম—তোমার অনেক বড় বাড়ী হোগা—অনেক টাকা হোগা। যাও।

আর একটা মেয়ে আম খাওয়া হাত ফ্রকে মুছে এসে বলল—ও সাধুবাবা। আমার হাতটা দ্যাখোনা।

হাত টেনে নেড়ে চেড়ে বললাম—তোমার নাম কল্পনা হায়।

হাত টেনে নিয়ে সে বলল—ও সাধুবাবা সাধু হ'য়েছে ক' ঘণ্টার? বলতো?

সাধুবাবা? চক্‌খড়ির গুঁড়ো যে ঘামে ধুয়ে নেমে গেল এরই মধ্যে—

নাটু যেন আমার এ অপমান কিছুতেই হজম করতে পারছিলনা। সত্যি আমিও পরচুল দাঁড়িতে ঘেমে উঠেছি। আমি উঠে দাঁড়াতে নাটু এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। পেছনে আর সকলে।

যেতে যেতে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লাম—আয় মালাকে কেমন জব্দ করছি। নাটু জিজ্ঞেস করল—কিন্তু এগুলো পেলে কি করে?

(৫)

—জানিস্ না পরশু দাদাদের থিয়েটার? পঁচিশে বৈশাখ? মেজদা বাড়ীতে রেখেছিল। স্কুল থেকে এসেই—

বিলের ওপারে শুকনোয় কাত হ'য়ে পড়ে থাকা আমার হাফ বোটটায় এসে বস্‌লাম। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। বল্‌লাম—নাটু তোর হাত দে।

নাটুর হাত টেনে নিয়ে বল্‌লাম—তুমি খুব বড় বিদ্বান হোগা—তোমার অনেক টাকা হোগা। মালা এসে নাটুর মাথায় থাবড়ে দিয়ে বল্‌ল—আর অনেক কিছু হোগা। ও সাধুবাবা সকলের টাই তো দেখ্‌লে। আমারটা একটু দ্যাখোনা। আমার কি কি হোগা?

—তোমার কিছু নেহি হোগা।

—ইস্! তোমার কিছু নেহি হোগা!—অনুনয়ের সুরে বললে—দ্যা-খো-না। মালার ডানহাতটা টেনে নিতেই ও চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ও সাধুবাবা ওদের সকলেরই তো ডান হাত দেখলে—মেয়েদের আবার ডান হাত দেখে কবে?

— ঠিক হায় বাঁ হাত দাও।

হাত বেশ কিছুক্ষণ দেখে বললাম—বলব?

বলো।

একটু দেখে আবার বললাম—বলব?

রেগে মালা বলল—বলবে তো বলো—নয় ছাড়ো শুধু বলব? বলব?

—বলব?

—আবার?

—তবে বলি-। ইয়ে আল্লা বিসমল্লা ওঠে লাঠি করে বক্ ধেৎ তেরি

—কি অসভ্যপনা শুরু করলে, বলবে না?

—বলব? আচ্ছা বলি বলেই ফেলি এ্যাঁ—

—বলো—

—তোমার দু'টো বিয়ে হোগা।

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। মুহূর্ত্তে মালার চোখ মুখ রক্ত রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। হাত টেনে নিয়ে ঠাস্ ক'রে গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে ওপাশে গিয়ে রাগে ফুলতে লাগল।

সকলেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠল আমার এ অপমানে। তাদের কমলদার অপমান ওরা সইবেই বা কেন? আমি কিন্তু নির্বিকার। সাধুবাবা তো? মালার কাছে উঠে গিয়ে বললাম—মালা! রাগ করলি!

—করবই তো! তুমি ওকথা বললে কেন? মেয়েদের আবার দু'টো বিয়ে হয় কবে?

ও হয়না বুঝি! সেটা আগে বলতে হয়?

না, উনি জানেন না। ন্যাকা।

আচ্ছা আর বলবনা।

মালা ভেংচে উঠল—আ বলব না! আর না বললেই বা কি? তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে।

'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ দে

জ্ঞানের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন তাঁর কিছুই জানা হয়নি। পৃথিবীব্যাপী সফরের পর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে বল্লেন তাঁর কিছুই দেখা হয়নি। এ অতৃপ্তি জ্ঞান-বৃদ্ধ, জ্ঞান-ভিক্ষুর। এ ক্ষোভ সন্তোষের গভীরতা হতে উৎসারিত। এ অজানা বহু জানার আনন্দমিশ্রিত। কিন্তু এতেও কবির মরমী মন তৃপ্ত হয়নি। এই অতৃপ্তিই কবির সৃষ্টিশক্তিকে প্রেরনা জোগাতো বারংবার। কবির হৃদয় অতৃপ্তির 'অক্ষয় উৎসাহে' কুড়োতে দেখি।

প্রকৃতির তারে তারে যত মীড়ের খেলা হয়, রবিকবির বাঁশীতেও তত সুর বেজে ওঠে। তাই তিনি 'পৃথিবীর কবি'। মনের মধ্যে আনন্দের মধুচক্র ছিল বলেই কবির প্রাণের বাঁশীতে লেগেছিল সকল ভাবের আঘাত। তারই প্রকাশ জেগে উঠেছিল 'নবনবরূপে।' 'অজানার দুত' তাঁকে 'নিয়ে যায় দূরে অকূল সিন্ধুরে নিবেদন করিতে প্রণাম।' 'দক্ষিণ মেরুর উর্দ্ধে যে অজ্ঞাত তারা' 'দুর্গম তুষারগিরি'—সবই তাঁকে হাতছানি দেয়। 'মনের গহনে' এনে দেয় আনন্দের সুধারসধারা। 'নিখিলের সংগীতের স্বাদ' পেয়ে কবির অন্তর আজ ধন্য। 'গীতভারতীর" প্রসাদে কবি আজ পুণ্য।

"আপনার উচ্চতট হতে

নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গংগাস্রোতে"

উচ্চ-নীচ সকলের সঙ্গে অন্তরের যোগ রাখতে পারেন না। 'বাধা হয়ে" থাকে তাঁর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার। 'প্রকৃতির ঐক্যতানস্রোতে" কবি গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরের 'প্রবেশের দ্বার" তাঁর কাছে অবরুদ্ধ। তাই অস্তাচলগামী কবির কাছে 'আজ সব কথা, মনে হয়। শুধু মুখরতা।" কবি জানেন 'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা। কিন্তু হায়! কবি যে নিরুপায়। তাই তিনি মেনে নিয়েছেন 'সে নিন্দার কথা' তাঁর 'সুরের অপূর্ণতা। কবির মনে সংশয় জেগেছে।

"এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।"

কবির মন তাই চলে যেতে চেয়েছে 'দূরে বহুদূরে"—

"যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,

আমার আমির ধারা যেথা মিলে যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।"

কবি অন্তরে অনুভব করছেন

"আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে।

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কবির হৃদয় আজ আশায় দোদুল্যমান। তাঁর চোখে আশার আলো—'পাই যদি দেখা। কবি উন্মুখ হয়ে বসে আছেন 'পশ্চাতের কবি'র পথ পানে চেয়ে। সেই 'ভাবীকালের কবি" আসবে। 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে" কবি যা দিতে অক্ষম হয়েছেন, নতুন কবি তা' দেবে। উদ্ধার করবে 'অখ্যাতজনের নির্ব্বাক মনের মর্মের বেদনা যত।" তার পরে 'আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত; দেখিব তারে আমি।' কিন্তু বাহিরে বহুর সাথে জড়িত' ভাবীকালের কবির প্রতি কবির কঠোর নির্দেশ 'শুধু ভঙ্গী নিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' কারণ

"সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয় ভালো নয় [illegible]

— এরপরেই নতুন কবির কাছে কবির অনুনয়—

"সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়

একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—

চাষী, জেলে, মজুর এদের 'অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক' হৃদয়ে ভাবীকালের কবি যেন এনে দেয় নবীন জলধারা; যেন 'মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।' 'অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে' থেকে কবি দেখতে পাচ্ছেন 'মূক যারা সুখে দুঃখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে' তাদের 'আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ।' এসব দেখে কবির মানস-সরোবর দুলে উঠেছে, হৃদয়ের মৃণালে টান পড়েছে। তাই তো কবি ভাবীকালের কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন।

"ওগো গুণী

কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,

তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি।

আর সময় নেই। দিনান্তের শেষ পলে' এসে কবি পৌঁছে গেছেন। সুদূর সিন্ধুপারের 'তীর হতে' তাঁর ডাক এসেছে 'সকল কিছুর মাঝে।' 'অসীম পথের পান্থ' এবার চলে যাবে 'সে পথের ধারে।' তাই যাবার আগে কবি রেখে গেলেন ভাবীকালের কবির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম আর নিয়ে গেলেন এই সান্ত্বনা,—

"সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়

এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।"

'বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি' কবি করে গেছেন। কিন্তু বৃথা সে সময়ের অপচয়। বাক্যের অতীত' যা তাই তো পড়ে আছে। কিন্তু আর যে সময় নেই। পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে দিনরবি। কালপ্রবাহের অনন্তগর্ভে যে আয়ু নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা আর ফিরানো যাবেনা। একথা স্মরণ করে কবিহৃদয় গভীর ধিক্কারে মর্ম্মরিয়া ওঠে। বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস যখন হু হু করে বেদনায়, অপচয়ের গ্লানিতে তখনই প্রকাশিত হয় "জন্মদিনের" প্রতিটি ছত্র কবিহৃদয় হতে লেখনীতে—

●

নববর্ষ

॥ শরৎ দত্ত ॥

●

পুরাতনের জীর্ণতা আজ যাক্।
নতুন বছর নতুন সুরে দিলরে ডাক।
গাছে গাছে নতুন পাতার সমারোহ,
উছলে পড়ে সবুজ প্রাণের অচেল স্নেহ।

ফুলের বনে মৌমাছিদের গুনগুনানি,
সূর্য ছড়ায় স্বর্গলোকের আশীর্বাণী।
নিখিল জনের প্রাণে প্রাণে রঙীন আশার,
দোলা লাগে সোহাগভরা ভালবাসার।

দেশের বুকের দুখের নিশা পোহায় আজি,
স্থলে জলে মধুর বীণা ওঠে বাজি।
চলাপথের বাধা বাঁধন হেলায় টুটি,
বিপুল প্রাণের জোয়ার আজি এল ছুটি।

আকাশপারে গাইল পাখী মধুর রবে,
নতুন দিনের নতুন প্রাণের মহোৎসবে।
কেদিল আজ নিখিল ধরা সুধায় ভরে,
কে দিল আজ শূণ্য হৃদয় করে।

●

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি

ডক্টর অনিল কুমার দে

গত মে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রীষ্ট মাস দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ সরকার কর্তৃক হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমালোচনা সর্বত্রই আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা হয়ে বিজ্ঞানীরা সমবেত-কণ্ঠে পরমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন কারণ মানব-সমাজের উপর ইহার সুদূর প্রসারী অনিষ্টকর প্রভাব রয়েছে।

পরমাণু বা অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা এই দুইটি হচ্ছে দুই শ্রেণীর পারমাণবিক মারণাস্ত্র অবশ্য এদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিশেষ নেই।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ভিত্তি হচ্ছে ইউরেনিয়াম—২৩৫ বা প্লুটো নিয়াম—২৩৯ পরামাণুর দ্বিধাভাগ-করণের অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল প্রক্রিয়া (Runaway chain reaction) বিস্ফোরণের মুহূর্তে অত্যধিক চাপ ও তাপের সৃষ্টি হয়, কয়েক লক্ষ ডিগ্রী তাপের মাত্রার প্রায় সমকক্ষ। প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি পরীক্ষা-মূলক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল এই পরীক্ষাগুলি থেকে বিস্ফোরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বিস্ফোরণের মুহূর্তে এক চোখ-ঝলসানো দীপ্তি আকাশ উদ্ভাসিত করে। বোমার আচ্ছাদন ও আভ্যন্তরীণ বস্তু প্রচণ্ড তাপে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয় একটি অগ্নিগোলক উপর দিকে উঠতে থাকে। তারপর দেখা যায় ছত্রাকের আকারে সাদা বাষ্পের মেঘ যাহা প্রথমদিকে সেকেণ্ডে প্রায় ২৫০০ ফুট হারে ঊর্দ্ধ দিকে উঠতে থাকে। মাটির কাছে বিস্ফোরণ হ'লে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ অগ্নিগোলকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তেজস্ক্রিয় বাষ্প সহজেই ধূলিকণার উপর ঘনীভূত হয়ে থাকে। যখন মাটির অনেক ঊর্ধে বিস্ফোরণ ঘটে তখন বাষ্প ঘনিভূত হওয়ার সুযোগ পায় না—তাই অতি সুক্ষ্মকণা রূপে বিরাজ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ৭।৮ মাইল পর্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠে থাকে। তেজস্ক্রিয় মেঘের মধ্যে থাকে ফিসন্ প্রডাক্ট অর্থাৎ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি। ফিসন্ প্রডাক্টের অর্থাৎ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি। ফিসন্ প্রডাক্টের মধ্যে থাকে স্বল্পায়ু কয়েকটি মৌলিক পদার্থ। দীর্ঘায়ু মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ক্রুপ্টন, জেনন, বেরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম ইট্রিয়াম, হারকনিয়াম্ সিজিয়াম ও আয়োডিন উল্লেখযোগ্য। এইগুলির জোরালো বিটা ও গামা তেজস্ক্রিয়তা আছে। ইহারা বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে ও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইহাদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি।

হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের মূলে আছে হাইড্রোজেনের দুই আইসোটোপ ডিউটারিয়াম ও ট্রিটিয়াম-এর সম্মেলন। এই সম্মেলন ঘটে থাকে অত্যধিক উত্তাপে বিস্ফোরণের উপযোগী তাপ সৃষ্টি হয় ইউরেনিয়াম পরমাণু দ্বিধাভাগকরণ থেকে। পরিশেষে ডিউটারিয়াম-ট্রিটিয়াম প্রক্রিয়া থেকে আবার ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়া থেকে আবার ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর দ্বিধাভাগকরণ করা হয়। এই তিনটি ধাপে হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে ইউরেনিয়াম নিহিত থাকায় বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি নির্গত হয়। ইউরেনিয়ামের দাহিকাশক্তি ছাড়া যদি হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা হয় তবে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি নির্গত হবে না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস যে, তাঁরা চার পাঁচ বছরের মধ্যে এই এলাকার বাহিরে থাকলে জনসাধারণের কোনও অনিষ্ট হবে না।

মানবদেহের উপর তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির প্রভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। মানব দেহের প্রধান উপকরণ হচ্ছে জল তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে এই জল নানারকম জটিল প্রক্রিয়ার

মধ্যে দিয়ে শেষে আয়নায়িত হয়ে থাকে এবং এইভাবে জীবদেহের উপর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। তেজস্ক্রিয়তার মৌলিক প্রভাব হ'ল দেহের অভ্যন্তরস্থ কোষকের উপরে। কোষকের প্রোটিনগুলি আক্রান্ত হয় এবং উহাদের গঠন বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে শেষে কোষক নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য কোষক নষ্ট হয় কেবল অতিরিক্ত মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে। ক্রোমোসোমের গঠনও অনেক পরিবর্তিত হয়—বিভাগের ফলে উৎপন্ন কোষকদুহিতা- গুলির মধ্যে পাওয়া যায় পরিবর্তিত গুণাবলী যার জন্য বংশধারায় অস্বাভাবিক বিপর্যয় দেখা যায়। মানবদেহের উপর তেজস্ক্রিয়তার সুদূর-প্রসারী অনিষ্টজনক প্রতিক্রিয়া হ'ল মানুষের বংশধারায় বিকৃতির সৃষ্টি।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলে। যারা বিস্ফোরণের কেন্দ্রের কাছে ছিল তাদের সকলেই অত্যধিক তাপ ও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে জ্বর, বমি, রক্তপাত ইত্যাদ ভুগে দুই এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। যারা মাঝামাঝি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা পেয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন দুই এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। যারা তেজস্ক্রিয়তার কবলে পড়েও প্রাণ হারায়নি তাদের মধ্যে নানারকম ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়। এই ব্যাধির মধ্যে লিউকিমিয়া, রক্ত শূন্যতা, চোখের ছানি পড়া, ক্যানসার এবং সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত অন্তঃসত্বা নারী তেজস্ক্রিয়তার প্রকোপে পড়েছিল তাদের মধ্যে মৃতসন্তান প্রসবের হার অত্যন্ত বেশী ছিল।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে তেইশজন জাপানী জেলে নৌকায় মাছ ধরছিল বিকিনি থেকে কয়েক মাইল দূরে। তারা বিস্ফোরণ-সঞ্জাত সাদা মেঘ দেখে ছিল—পরে শ্বেত ভস্মরাশি পাঁচ-ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত সমুদ্রের জলে ও নৌকাটির উপর পড়তে থাকে ঐ জেলেরা তখন মাছধরা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরতে থাকে। তিনদিন পরে তারা যখন বাড়ী ফিরল তখন তাদের সারা মুখ গলা ও হাত লাল ও ফোলা ফোলা দেখাল গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেল যে নৌকাটির ডেকে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে প্রায় ৬০ গুণ বেশী। নৌকার ডেকে শ্বেত তেজস্ক্রিয় ভস্ম বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ইহার উৎপাদন হচ্ছে তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়াম, স্ট্রণসিয়াম, ইট্রিয়াম, জারকনিয়াম, বেরিয়াম, ইত্যাদি। তিন চার সপ্তাহের মধ্যে জাপানী জেলেগুলির মাথায় সমস্ত চুল উঠে যায় স্ট্রণসিয়ামের ক্রিয়ার অস্থির মধ্যে ক্ষয় সুরু হয় এবং রক্তকোষক বিদীর্ণ হওয়ার ফলে রক্তপাত হ'তে থাকে। তিন মাসের মধ্যে যকৃতের গোলযোগে দরুণ জণ্ডিস (Jundice) দেখা যায় ১৩ জন জেলের মধ্যে। সাত মাসের একজন জেলে রক্তের গোলযোগের মারা যায়। অন্যান্য জেলেরা ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। তাদের চিকিৎসা করা হয় রক্তদান, এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ, পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও সুষম খাদ্যের ব্যবস্থার দ্বারা।

তেজস্ক্রিয়তার ক্রিয়ার মনুষের দেহের মধ্যে অনেক ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে—যেমন লিউকিমিয়া, রক্তশূণ্যতা, কেশ শূণ্যতা, বন্ধ্যাত্ব, ক্যানসার, চোখের ছানি পড়া, অস্থিক্ষয় এবং বংশধারায় বিপর্যয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মারাত্মক পরিণাম হচ্ছে একটা শোচনীয় অভিশাপ। তেজস্ক্রিয়তার অনিষ্টকর ক্রিয়া প্রতিরোধ করার উপযোগী কোনও রকম চিকিৎসা আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি। গত দুই মাস যাবৎ সারা এশিয়া যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকাপ চলেছে অনেকের ধারণা যে বৃটেন বিজাণুর উৎপত্তি। এই বিষয় যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ রয়েছে। আমেরিকান ও বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা একমত যে পরমাণবিক বিস্ফোরণগুলির ফলে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা বিপজ্জনক হয়নি। অবশ্য তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির সংস্পর্শে যে নানরকম ব্যাধি সৃষ্টি হয় তা বোঝা গেছে হিরোসিমা ও নাগাসিক এবং তেইশজন জাপানী জেলেদের দৃষ্টান্ত থেকে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ-সঞ্জাত তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির অভিশাপ থেকে মানব-সমাজকে মুক্ত করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রাখা। তাই বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও বৃটেন সরকারকে আবেদন জানিয়েছেন পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রেখে মানব-সমাজকে বাঁচাতে।

(২০শে আষাঢ় ১৩৬৪ যুগান্তর হইতে উদ্ধৃত)

পরিহাস

শ্রীবীরেন দত্ত

বিজয় দাদার বিয়েতে গিয়ে বৌদিকে দেখে যত আনন্দ পেলে তার চেয়ে মুগ্ধ হল বৌদির বোন লেখাকে দেখে, কবির মত যত কিছু কল্পনা, শিল্পীর মত কিছু নিপুণতা যেন এই কমল কামিনী লেখার মাঝে হারিয়ে গেছে। বিজয় নিজে সুন্দর। চিরদিন ও সুন্দরের পূজারী

বৌদির কাছে পরিচিত হবার আগে লেখার সঙ্গে বিজয়ের আলাপ হল ঘনিষ্ঠভাবে। পরিচয় হতেই রেখা বুঝলো দেওরের আকর্ষণ কোন দিকে। মুখে না বললেও নব পরিচিত দেওরের মনোভাব রেখা অন্তরের কামনা দিয়ে সমর্থন করলো। বিয়ের একদিন পরে নব পরিণীতা রেখা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলো বিজয়কেও যেতে হল বাধ্য হয়ে।

বিজয়ের দাদা সঞ্জয় বনগাঁ কলেজের প্রফেসার বিজয় কলিকাতা মেসে থেকে সিটি কলেজে আই এ পড়ে। বৌদি আসার পর থেকে সব ছুটীতে বিজয় বাড়ী আসে। বৌদি লেখার বোন বলেই যেন বৌদিকে তার খুব ভাল লাগে ও বেশী ভালবাসে। লজ্জায় সব সময় লেখার কথা বৌদিকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে না।

রেখা বিজয়ের চাইতে দু' এক বছরের ছোট, তাই তাকে ছোড়দা বলে ডাকে। রেখা একদিন বিজয়কে ডেকে বলে—"ছোড়দা লেখা চিঠি লিখেছে—বিজয় আনন্দে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বৌদির হাত থেকে চিঠি কেড়ে নিয়ে একটু লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়—"তুমি ভারি মিথ্যুক—এত তোমার চিঠি ?"

চিঠিটা ফেলে দিয়ে বিজয় ঘরে ফিরে। কিছুক্ষণ পরে রেখা এক রেকাবী খাবার নিয়ে বিজয়ের ঘরে এসে উপস্থিত বিজয় বৌদিকে দেখেও গম্ভীর হয়ে বই পড়তে থাকে। রেখে আপন মনে একটু হেসে বিজয়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলে—"ছোড়দা! আমার উপর রাগ করেছ না ? বি, এ, পাশ তাড়াতাড়ি করে নিলেই লেখা আপনি এসে যাবে।"

বিজয় মুচকি হেসে উত্তর দেয়—"বৌদি বেশী গোলমাল করোছ বলছি! পড়ার অসুবিধা হচ্ছে।

পূজোর ছুটীতে বিজয় বাড়ী আসতেই রেখা দৌড়ে এসে তার হাত ধরে যে ঘরে লেখা ছিল সেইখানে নিয়ে গেল। লেখাকে দেখে আনন্দে বিজয় বলে উঠলো—"বৌদি! আমায় আগে জানাওনি কেন ?

রেখা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—অপ্রত্যাশিত দর্শনের আনন্দটাই সবচেয়ে মধুর ভাই।

লেখার সাহচার্য্যে ও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে পূজোর ছুটিটা বিজয়ের বেশ আনন্দেই কাটতে লাগলো। কোনদিন লেখা ও বৌদিকে নিয়ে বিজয় ঝুমা নদীর তীরে বেড়াতে যায়, অথবা ঝাড়বনের পাশ দিয়ে যে লাল কাঁকড়ের পথটি এঁকে বেঁকে সাওতাল পল্লীটার পাশ দিয়ে চলে গেছে, সেই পল্লী দৃশ্য দেখবার জন্য কখনো তাঁরা গাড়ী করে বেড়িয়ে পড়ে।

আমোদের মাঝে দিনগুলো কেটে যায় যেন কোন দিক দিয়ে জলের স্রোতের মত। লেখাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে বিজয়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠে লেখা এখন থেকেই বিজয়ের খুব বাধ্য হয়েছে, বিজয় যা পছন্দ করে সেও তাই পছন্দ করে। বিজয় একদিন লেখাকে বলে—"লেখা এখানে থাকলে তোমার রংটা একটু ময়লা হ'য়ে যায়। যাবার আসবার সময় তোমার জন্য স্নো, নিয়ে আসবো কেমন ?

(৩)

লেখা হেসে বলে—"বিজয়দা! আমি যদি ঐ সাঁওতালদের মত কালো হতাম তাহলে আমার সঙ্গে হয়তো কথাই বলতে না। "কি চুপ করে রইলে যে ? উত্তর দেবেতো ?

বিজয় রূপ লাবণ্য মণ্ডিত লেখার আপদ মস্তক দেখে নিয়ে উত্তর দেয়—"তাহলে তুমি বৌদির বোন লেখা হতে না। হতে ঐ গ্রাম্য বালিকা শেফালি কি

কমলা। কথা কেড়ে নিয়ে লেখা বলে—ওঃ ভারী যে দিদির প্রশংসা করা হচ্ছে। প্রেমে পড়লে নাকি—এমন সময় রেখা ঘরে ঢুকতেই লজ্জায় দুজনেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সে বছর দেশে ভীষণ বসন্ত দেখা দিয়েছে। বাংলার কোন গ্রাম বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পেল না। ধনী, দরিদ্র, সুখের আসুন্দরকে যে প্রবল ভাবে আক্রমণ করলো।

এক পূর্ণিমার গভীর নিশীথে সুন্দরী লেখা ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হল সকলেই তাহার দেহে চিহ্ন দেখা গেল। বেঁচে থেকে আজীবন এই ব্যাধির গ্লানি বইতে হবে তা ভেবে রূপসী লেখা ভীতা ও সন্ত্রস্তা হ'ল বিজয়কে লেখার সে অপরূপ সৌন্দর্য্য আর ফিরে পাওয়া গেল না।

কোন অজানা হতাসার বাণী নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটী এগিয়ে আসতে লাগলো। সৌন্দর্য্য দর্শনাভিলাষী বিজয় ছুটীতে বাড়ী আসতেই লেখা সসঙ্কোচে যখন তার সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো কোন কথা না ভেবেই রূপ গর্ব্বিত বিজয় বলে উঠলো—লেখা এ চমৎকার রূপের ডালি এনে আমার সম্মুখে হাজির না করাই তোমার উচিত ছিল।

অপমানিত লেখা গম্ভীর ভাবে এই উত্তর দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল—বিজয়দা চাঁদের ও কলংক আছে। কমলেও কীট আছে ....

প্রায় ছয়মাস অতিবাহিত হয়ে গেল বিজয় লেখার আর খবর নেবার দরকার মনে করেনা। সেই থেকে একরকম বাড়ীতে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। রেখাও বিজয়ের এই রকম আচরণে দুঃখিত। লেখাকে বিয়ে করবার জন্য বিজয়কে রেখা আর অনুরোধ করবে না ঠিক করেছে।

কিছুদিন পরে কলিকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে লেখার বিয়ে ঠিক হলো। লেখার বিয়ের আর মাত্র একমাস বাকী সেই সময় রেখা খবর পেলো বিজয়ের বসন্ত হয়েছে। ইদানীং রেখা বিজয়ের উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল কিন্তু অসুখের খবর শুনেই সে কেঁদে ফেল্‌লো। রেখা বিজয়কে ছোট ভাইয়ের মতই ভালবাসে।

এই যন্ত্রণার মাঝে বিজয় রেখাকে পরিহাস করে লেখার প্রাণে ব্যথা দেবার কষ্ট বিশেষভাবে অনুভব করলো। লেখার মুখে গোটা কয়েক বসন্তের দাগ দেখে বিজয় তাকে পরিহাস করেছিল কিন্তু আজ এই বসন্তের জন্য বিক্ষত বিজয়ের দৃষ্টিশক্তি একটু হ্রাস পেলো। এর জন্য বিজয় মোটেই দুঃখিত নয়। একটু ভাল হতে— বিজয় বাড়ী আসতেই শুনলো লেখার বিয়ে, তাই বৌদি বাপের বাড়ী গেছে। বিজয়ের দীর্ঘ নিশ্বাস বিজয়কেই মর্ম্মাহত করল।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে লেখা স্বামী প্রবীরের সঙ্গে একদিনের জন্য দিদির বাড়ীতে এলো। শঙ্খ ও উলুধ্বনি বিজয়কে জানিয়ে দিল (নববধূ লেখা এসেছে। সেদিন লেখা আর বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলো না। বিজয়ই এলো লেখাকে স্নেহ-শীর্ব্বাদ জানাতে লেখার দিকে তাকিয়ে বিজয় বললে— "আমার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীন হলেও লেখা তোমায় যেন আজ আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। এ সৌন্দর্য্য পাপের নয়— তোমার ঐ সরল অন্তরের সুনির্ম্মল প্রতিচ্ছবি। এর অসম্মান পরিহাস্‌ করতে পারে না কেউ—আমি করে-ছিলাম—তাই তার শাস্তি ত ভগবান দিয়েছেন হাতে হাতে।"

মন্দ্রমুখরের হালখাতা
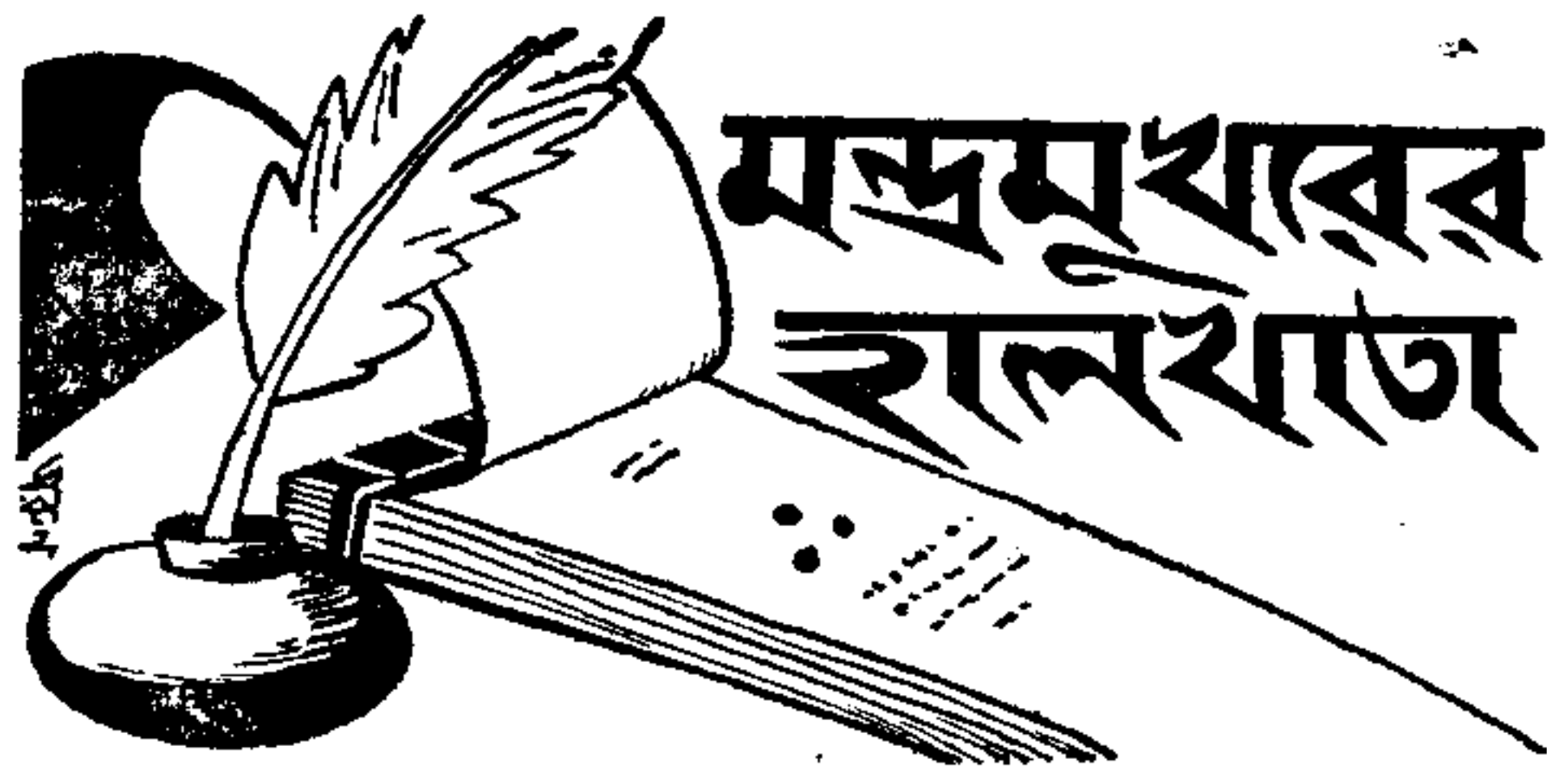
সুদীর্ঘ অর্ধবর্ষকাল বিরতির পর পুনরায় "হালখাতা" লিখতে বসেছি। কৈফিয়ৎ হিসেবে বলতে পারি কর্ম-জীবনের হেরফেরই এর জন্যে দায়ী। সুতরাং পাঠক বর্গের ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবো না, আশাকরি।

এখন ভাবছি কী লিখবো! প্রথমেই মনে পড়ে অসমীয়া বর্বরতার কথা। দলবদ্ধ গুণ্ডামির যে কুৎসিৎ ও উলঙ্গ রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ববাসী—হাইলাকান্দির অধিবাসিবৃন্দের স্মৃতিপটে তা বহুদিন জেগে থাকবে এক বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো। কিন্তু অশান্ত মন জানতে চায় এর প্রতিকার কোথায়—কে করবে এর বিচার? নেতারা ফর্মুলার নেশায় আচ্ছন্ন ক্ষমতার মোহে মশগুল। জানি তবু বাংলাভাষা মরবে না—শহীদের রক্ত বৃথাই ক্ষরিত হয়নি। কিন্তু, কতদিন আমরা আশায় আশায় থাকবো আর?

বিগত ছয়মাসের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে। ইংল্যাণ্ডের রাণী ভারত পরিভ্রমণ করে গেলেন। রাশিয়ার গ্যাগারিন প্রথম মানুষ মহাশূণ্যচারী হিসেবে সম্মান পেলেন—সেই সঙ্গে ঘোষিত হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার নবতম অধ্যায়। অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজ বর্বরতার মতো কুকীর্তিও ঘটে গেছে। আমেরিকা এক নম্বরের বোকামী করে ফেলেছিল কিউবার ওপর হামলা চালাতে গিয়ে। অসমীয়া বর্বরতার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উদযাপন। এমন ব্যাপার আকারে পৃথিবীর কোনো মনীষির স্মৃতিপূজা এর আগে কোনওদিন হয়নি। সে পরের বিবরণ সম্পূর্ণ বা খণ্ডিত আকারে আমাদের সব পাঠকেরই গোচরীভূত হয়েছে নিশ্চয়। তাই সে বিষয় লিখিবার অবকাশ নেই।

* * *

আজ তাই বাংলার ওপর কেন্দ্রের বিমুখতার নজীর হিসেবে দুটো ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটা হল, সাহিত্য একাডেমী এবারকার পুরস্কার গুলো বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের জন্যে দিয়েছেন। বাংলায় নাকি গত দু বছরে পুরস্কার যোগ্য বই বেরোয় নি! আসল কথাটা কী, সেটা তো সবাই জানে। তবে আঞ্চলিক বিচারকপদে যাঁরা আসীন, তাঁদের মতানৈক্য যদি কারণ হয়—তাহলে তাঁদের উচ্চপদ থেকে টেনে কাদায় নিক্ষেপ করা হবে না কেন? অপর যে ঘটনার উল্লেখ করবো সেটা হ'ল চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এতে মামুলীধরনের একটা হিন্দী ছবিকে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছবি "গঙ্গা" "ক্ষুধিতপাষাণ" "দেবী" ইত্যাদির ছবির তুলনায় "অনুরাধার" নেহাতই দুর্বল চলচ্চিত্র। কিন্তু বারবার বাংলা ছবি সম্মানের অধিকারী হবে এটা সহ্য হবে কী করে? তার ওপর মেজরিটির ষ্টীম রোলার তো আছেই। ধন্য মেজরিটি—তোমারই জয় সর্বত্র! কোয়ালিটির দর নেই কেবল কোয়ান্টিটিই সার!

* * *

দুটো খবর প্রায় কাছাকাছি সময়ে পাঠ করেছিলাম মনে পড়ছে। একটা পাঞ্জাবের অপরটি মধ্যপ্রদেশের। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে চিঠি লিখতে বলা হয়েছিল—সে চিঠি যেমন তেমন নয়, প্রেমপত্র! তুমি

॥ কনে দেখা ॥

শ্রীচণ্ডীচরণ পাল

আমাকে একটা ফুল দাওনা
সাজিতো আছে ভরা
লাল নীল
থরে থরে থোকা থোকা।
বাঁধবো খোঁপাটি
সাজবো একটু
বিকালে ওরাতো আসবে
এসেছে যেমন বারে বারে।
খুঁটিয়ে দেখবে
রূপের যাচাই চলবে,
গুনে গুনে
চাইবে জানতে আমার মূল্য কি ?
মাথাতে ফুলটি থাকলে
এক মুঠো তারাদের মত
জ্বল জ্বল করবে।
দেখেছি আয়নায়,
আমাকে আরো ভালো লাগবে।
ওদের চোখে লাগলে
ঘরে তুলবে।
তা না হলে—
গরীব মা বাপের বুক জ্বলবে।

মন্ত্রমুখরের হালখাতা

অমুককে ভালবেসেছো, অথচ বিয়েতে বাধা দিচ্ছেন বাবা-মা—কী করবে—এধরনের ইঙ্গিতও দেওয়া ছিল। একেবারে যাকে বলে বাস্তবানুগ শিক্ষা! দ্বিতীয় ঘটনাটি হল এক ইস্কুল মাষ্টারের সিনেমা প্রীতির পরাকাষ্ঠা। একটি হিন্দী ছবির নাম উল্লেখ করে তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন তার নায়িকা কে হয়েছেন। ক্লাসে এই প্রশ্ন যিনি করতে পারেন তাঁকে গরু চরাতে না দিয়ে শিক্ষকতা করতে কেন দেওয়া হয়েছিল—এ প্রশ্ন শুধাজন মাত্রেই করবেন। কিন্তু কারণটা গভীর। আসলে যার কিছু জোটে না—সেই এখন শিক্ষকতা করতে যায়—আগে এমন ছিল না। সুতরাং আর্থিক দিকটা আকর্ষনীয় না করলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ গলদ দূর করা অসম্ভব। সত্যিকারের গুণীলোক শিক্ষকতা গ্রহণ করবে কেন—বিশেষ করে এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতার দিনে ?

—মন্ত্রমুখর

নতুন ধাঁধা

শ্রীদীলিপ কুমার দত্ত।
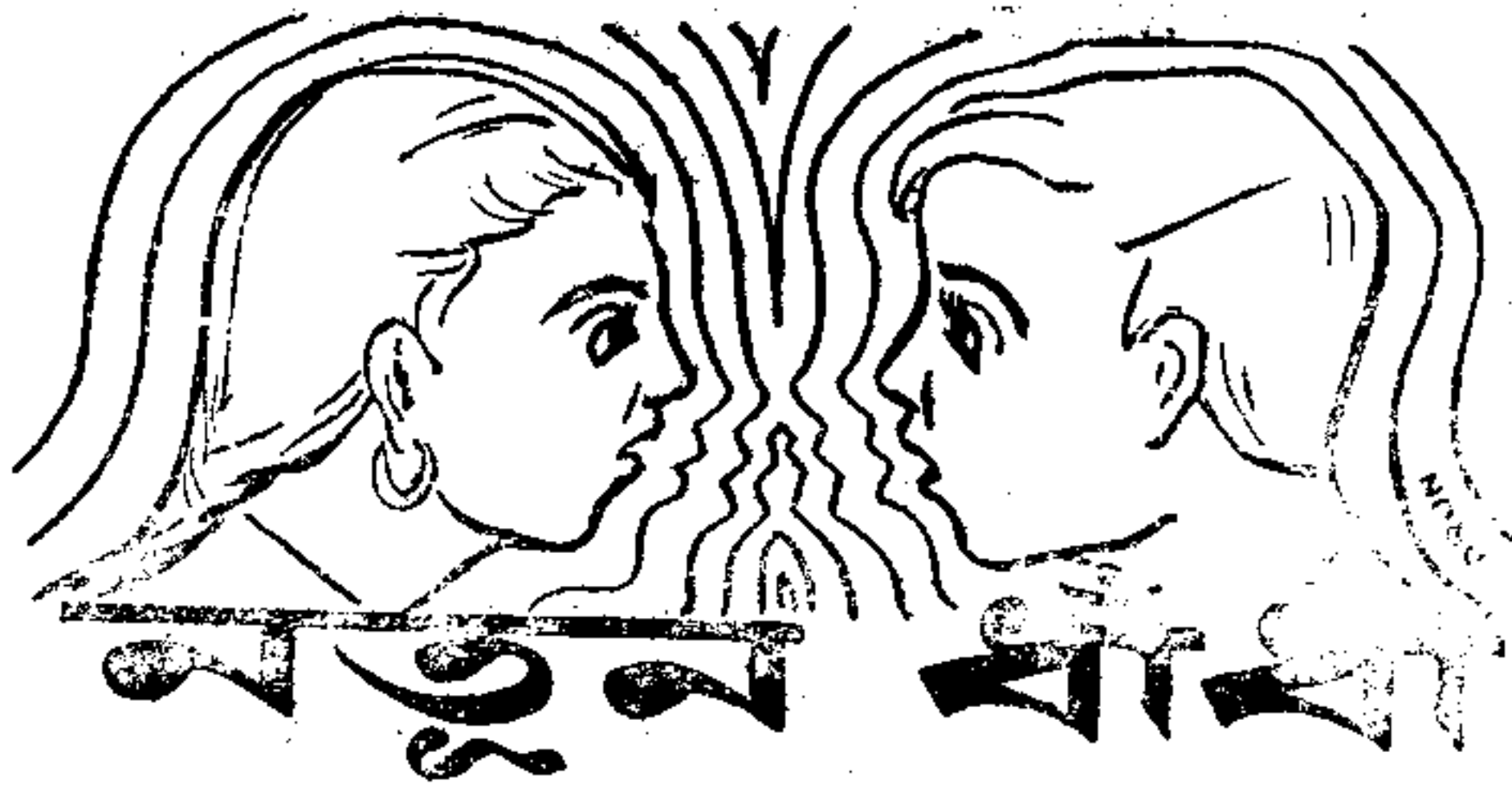
১। টুকুকে সকলেই এড়িয়ে চলে কারণ টুকু প্রতিটি কথাই ঘুরিয়ে বলে। সেদিন দূর্গা জিজ্ঞাসা করল টুকু কটা বাজে ভাই! টুকু বলল দুপুর হতে এখন যত সময় এখন হতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সময়ের তিনের পঞ্চমাংশ।

২। ফুলপরী বাণীর কপালে টিক্ দিয়ে বলল তুমি কেঁদোনা, তোমার পুতুল-রাণীর সরোবরে নিশ্চয় পদ্ম ফুটবে। কিন্তু একটা ফুলেই ফুটবে আর আজ যা ফুটবে কাল তার দ্বিগুণ হয়ে ফুটবে। পুতুল-রাণীর সরোবরে পনের দিনে একটা পদ্ম অর্দ্ধ বিকশিত হয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। বাণী পারছেনা, তোমরা বল, কবে পদ্মটি সম্পূর্ণ ফুটবে।

৩। নীতু আর রীতু খুব বন্ধু আর বড় সন্ধি প্রিয়। তাই রোমান অক্ষরের সাত আর একের চেহারায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও এক আর সাত অভিন্ন হৃদয়। অর্থাৎ ওদের মতে, সাত তার পোষাকের একটু পরিবর্ত্তন করলেই দুজনের মান সমান হয়ে যাবে। বল, কি করতে হবে।

৪। পিবুর ছোট কথা বলতে লজ্জা করে তাই ছোট বেণীটা দুলিয়ে স্বপ্নাকে জিজ্ঞাস করল পুঁতির দর কত রে; আধ ছটাক কিনতাম, ব্যাগ বুনব। স্বপ্নাও কম যায়না, ঘাড় দুলিয়ে বলল টাকায় যত পণ পুঁতি ৩৩ আনায় ছয় পণ পাঁচটা পাবি।

চৈত্র মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। যুগল কৃষ্ণ হালদার

২। "দিলীপ নারায়ণ"

৩। "গোপাল চন্দ্র"

৪। "বনফুল"

উত্তর দাতাদের নাম।

সুনীল সাধু, বিমান রায়, অনিল গান্ধি, সুসময় নায়েক নারায়ণ চক্রবর্ত্তি, বুলু, মণ্টু, খুকু উত্তম, মৃদুলা সোম, মনীষা সাধু, মমতা, স্বাধীনা তন্দ্রা, ইন্দ্রা,

(আলাদিহি বর্দ্ধমান)

স্বপ্না সাধু, অরুপ কুমার, আদিনাথ, সোমনাথ, ও ছোট কাকু। ইরং রোড আসান সোল।

লক্ষী চরণ সাধু, কিপু মণ্ডল

মহিশিলা বর্দ্ধমান।

অনিল ও অর্চনা রায় সিতারামপুর বর্দ্ধমান।

৪। শ্রীমতী অভয়া হালদার
শ্রীস্বপন হালদার কুমারী অরুণা দত্ত
শ্রীঅঞ্জন রায়
কুমারী বাণী হালদার।

কলিকাতা।

১। বাণী হালদার। ২। কুন্তলা শ্রীহাহদার

৩। স্বপন হালদার ৪। রাধারানী হালদার।

৭৭/বি বলরাম দে ষ্ট্রীট কলিকাতা

গন্ধবণিক পত্রিকা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শ্রীহারাধন দত্ত,

সম্পাদক, গন্ধবণিক সমীপেষু

'গন্ধবণিক' রবীন্দ্র শতাব্দ সংখ্যা পেলাম। পড়লাম। খুশি হলাম। তোমার সম্পাদকীয় মুন্সিয়ানার সাধুবাদ করি। বিশেষ করে বিগত কালের মনীষিগনের যে সব রচনার্ঘ্য এই উপলক্ষ্যে তুমি সংকলিত করেছ তাদের বক্ষে ধারণ করে আমাদের পত্রিকা গৌরবান্বিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের পাঠকগণ এই স্বল্প-পরিসর শতাব্দ সংখ্যা খানিতে সেকাল এবং একালের মনের উপর রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিফলনের পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পাবে। এটা কম লাভের কথা নয়। স্বজাতীয় তরুন লেখক-লেখিকাদের রচনাবলী পাঠ করে প্রীত হলাম। কিন্তু স্বজাতীর সুধীজনের রচনায় সংখ্যা-ল্পতায় ব্যথিত বোধ করলাম। তাঁদের সঙ্গে যথাযথভাবে যোগাযোগ করা কি সম্ভব হয় নি?

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি সমন্বিত প্রচ্ছদটিও সুন্দর হ'য়েছে। পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকল জনকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ইতি ৪ মধুপাল লেন, কলকাতা ৫

স্নেহাসক্ত—

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

বাঙলা ভাষায় এমন কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা আছে, যাদের অস্তিত্ব অনেকে অবগত না হ'লেও এই সকল পত্রিকা বহু সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্মের মুখপত্রিকা হিসেবে কোন কোন সমাজের চাহিদা যথারীতি মিটিয়ে চলেছে। 'গন্ধবণিক' নামক বিখ্যাত কাগজখানির চল্লিশ বর্ষে পদার্পণ বাঙলা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধিত করেছে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বক্তব্য বেশ সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ। অন্যান্য রচনাসমূহ বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। গন্ধবণিকের ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির বহুল প্রচার হোক, আমাদের এই প্রার্থনা। সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু ও শ্রীহারাধন দত্ত। ৬৭।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা চার আনা।

বসুমতী—২৬শে চৈত্র ১৩৬৭

রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'গন্ধবণিকের এই বিশেষ সংখ্যাটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

আকারে ছোট হলেও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকবৃন্দের সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ বর্ত্তমান সংখ্যাটি।

মুখ্যতঃ এক বিশেষ সমাজের মুখপত্র হলেও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতিশীল ভাব-ধারার পরিচয়বাহী আলোচ্য পত্রিকা খানি; রবীন্দ্র শতাব্দ উপলক্ষে তাঁরা এতে যে আয়োজন করেছেন তা অনাড়ম্বর হলেও মূল্যবান। নতুন ও পুরাতন লেখকগণের বিবিধ রচনা সতর্কতার সহিত একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি রীতিমত চিত্তাকর্ষক।

আমরা 'গন্ধবণিকের এই রবীন্দ্র সংখ্যা খানি পেয়ে যে আনন্দিত হয়েছি, একথা অনস্বীকার্য।

বসুমতী—২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

●

নূতন ধাঁধা

নূতন ধাঁধা' এই বিভাগ এতদিন হ'তে আমাদের কৌতুহলী পাঠকদের মনোরঞ্জনের বিশেষ কারণে পরিণত হয়েছিল। এই বিভাগটি পরিচালনা করছিলেন ডাঃ বিদ্যুৎ কুমার মল্লিক এম, বি, বি, এস, মহাশয়। আরও উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় বিভাগটি পরিচালনায় অসুবিধা হচ্ছিল—সেজন্য শ্রীযুক্ত মল্লিকের সুদক্ষ সহযোগিতা হ'তে আমরা ক্ষণকালের জন্য বঞ্চিত হ'লাম। এখন হতে এই বিভাগটি পরিচালনা করবেন শ্রীবসুমতী দাঁ বি, এ। ধাঁধা সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি এখন হ'তে নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

শ্রীবসুমতী দাঁ, বি, এ,
C/o নাগ আর্ট প্রেস
৬৭।১।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ

মন্দ্রমুখরের হালখাতা

পত্রিকার এই বিভাগটি বিগত কয়েক বৎসর হ'তে নানা কারণে পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিল। 'মন্দ্রমুখরের হালখাতা' এই শিরোনামায় প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন, সমাজচিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা ও রাজনৈতিক চিন্তার যে সমস্ত সম্ভার উপহার দেওয়া হ'ত তা নানা কারণে বিগত কয়েক বৎসরের পত্রিকার একটি বিশিষ্ট ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। গত কয়েক মাস হ'তে আমাদের এই বিভাগটি নানা কারণে অন্তর্ধান করেছিল। বর্তমান সংখ্যা হতে বিভাগটি আবার যথারীতি প্রচারিত হ'তে থাকবে।

—সম্পাদক, গন্ধবণিক

গন্ধবণিক পাত্র চাই।

পূর্ব্ব বাসস্থান খুলনা, এবার বি. এ. দিয়াছে, সুশ্রী পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, অফিসার বা অনুরূপ পাত্র চাই। পত্রালাপ করুন।

শ্রীহরিপদ দত্ত।
C/11, আনন্দপুরী।
পোঃ বারাকপুর।
জেলা ২৪ পরগণা।

পরীক্ষার ফল—১৯৬৮ আই, এ,

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীনিশীথ কুমার দাস	৺ধীরেন্দ্র নাথ দাস।	জোড় পাকড়ী (জলপাইগুড়ী)	তৃতীয়
কুমারী সিপ্রা দাস	ডাঃ বিশ্বেশ্বর দাস।	শিলিগুড়ী (দার্জ্জিলিং)	তৃতীয়
শ্রীমদন মোহন দত্ত	শ্রীমুরারী মোহন দত্ত	কাটাপুকুর (রাজসাহী)	তৃতীয়
শ্রীসুব্রত দত্ত	শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত	শোভাবাজার, কলিকাতা	তৃতীয়
শ্রীশান্তিকুমার সাধু		গন্ধবণিক ছাত্রবাস	তৃতীয়
শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত	শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত	স্বাধীনপুর, বীরভূম	তৃতীয়
শ্রীসলিল চন্দ্র নাগ	শ্রীভজেন্দ্র নাথ নাগ	কলিকাতা	দ্বিতীয়
	আই, এস-সি,		
শ্রীসমীর কুমার দত্ত	শ্রীঅসিত বরণ দত্ত	চোরবাগান, কলিকাতা	প্রথম
শ্রীদ্বিজেন্দ্র বল		গন্ধবণিক ছাত্রবাস	প্রথম
শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার পাল	শ্রীনৃত্য গোপাল পাল	পটলডাঙ্গা, কলিকাতা	দ্বিতীয়
	হায়ার সেকেণ্ডারী (বিজ্ঞান)		
শ্রীত্রিষাম্পতি দত্ত	অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত	কলিকাতা	প্রথম
	এম, বি, বি, এস, নীলরতন মেডিকেল কলেজ		
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বণিক	৺অক্ষয় কুমার বণিক	কলিকাতা	
	সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, বি, ই, (ফলিত গণিতসহ)		
শ্রীসোমনাথ দত্ত	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত	ট্যামার লেন, কলিকাতা	প্রথম

গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি

স্থাপিত—ইং ১৯৪৪ সাল

মহাশয়,

গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে, অতীতে বা বর্তমানে, যে সকল ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য বিদ্যা বুদ্ধি জনসেবা প্রভৃতি দ্বারা নিম্নোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন অথবা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই কার্যে সহায়তা করিবার জন্য আপনার সানুগ্রহ সহযোগিতা কামনা করিতেছি। অতএব আপনার জ্ঞাত ঐ প্রকার কৃতী গন্ধবণিকগণের নাম ধাম পিতার নাম ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক পক্ষ কালের মধ্যে অথবা যত শীঘ্র সম্ভব আমার নিকটে নিম্নলিখিত যে কোনও ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাইবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিতেছি। আমার ভরসা আছে এই সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইব না। ইতি—

উত্তর পাঠাইবার ঠিকানা :—
১৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১৩, বালক দত্ত লেন, কলিকাতা-৭

নিবেদক,
শ্রীপ্রভাত চন্দ্র দত্ত,
সহঃ-সভাপতি
গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি

বিভিন্ন ক্ষেত্র।

১। ব্যবসা বাণিজ্য
২। চিকিৎসা ব্যবসা
৩। স্থাপত্য (ইঞ্জিনিয়ারিং)
৪। আইন ব্যবসা
৫। বিচার বিভাগীয় চাকুরী
৬। প্রশাসনিক চাকুরী
৭। শিক্ষা বিভাগীয় চাকুরী
৮। সেনা-নৌ-বিমানে চাকুরী
৯। ডক্টরেট উপাধিধারী
১০। মহিলা স্নাতক
১১। বিদেশ পর্যটক
১২। জন প্রতিষ্ঠান—জনসেবা
১৩। লেখক – লেখিকা
১৪। শিল্পী

গন্ধবণিক মাসিকপত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ | ৭ম সংখ্যা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রসঙ্গ কথা

শ্রাবণ চলে যায়। আমাদের চিরকালীন বর্ষাঋতু তার ছকে বাঁধা ঘর খানিকে প্রায় অতিক্রম করে। তবু এই পোড়া পশ্চিমবাংলার উর্দ্ধাকাশে একখণ্ড কালো মেঘ ও দেখা গেলনা। বাংলা দেশের বর্ষা ঋতুর আকাশ আজ দুধে ধোয়া। এই বিপর্যয় আমরা বিলীয়মান দিন গুলিতেও লক্ষ্য করে এসেছিলাম। ক্রমে যেন এটাই সত্যে পরিণত হচ্ছে—যে আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল নয়। শ্যামলা বাংলার কথা আমরা ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে বারে বারে শুনেছি। কিন্তু এই বাংলা দেশ কি শ্যামলা? খণ্ডছিন্ন বাংলার যে অংশটুকুতে আমাদের বাস্তুভিটা—আজ তা শুষ্ক ও ম্রিয়মান। বাংলার গাছ গাছালি অরণ্য-পর্বত, নদ নদীর মত বাংলাদেশের মানুষ গুলোও সেই প্রকৃতির অঙ্গীভূত। চিরযৌবনা শ্যামলা প্রকৃতির মধ্যে সুস্থ সবল ও স্বাধীন মানুষের যে দীপ্ত প্রকাশ তাহাই নয়নাভিরাম, সেই প্রকাশই বাংলার কাব্য ইতিহাসে। সেই সবুজ সতেজ ও প্রাণবন্ত জীবন—প্রকৃতি ও মানুষের সেই অপরূপ প্রকাশ তাহাই এদেশের কবি ঋষিদের নয়নে মূর্তিমান হয়েছিল। সত্যই বাংলা দেশের সেদিন ছিল।

এই অরণ্য শ্যামল বাংলার প্রান্তর আজ শুষ্ক, বাংলার যে অসংখ্য নদ নদী এতদিন কলস্বনা—কুলপ্লাবী ও গীত কণ্ঠ ছিল—আজ তাদের প্রাণের প্রকাশ রুদ্ধপ্রায়, সেই নদীনালা গুলির ম্রিয়মান জীবন ধারা আজ কতকগুলি খাত ও বদ্ধতোয়া পল্বলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানও এযুগের যন্ত্রদানব সেই স্বাধীন দুর্বার গতি-ধারাকে শৃঙ্খলে বন্দী করেছে। কিন্তু জলপ্লাবনের সেই অশান্ত সংগ্রাম বাংলাকে নির্যাতিত করেও বাংলার গৃহলক্ষ্মীকে ফলে ফুলে ফসলে কল্যাণশ্রী দান করত! আজ কংগ্রেসী-তন্ত্রের সর্বগ্রাস তার কণামাত্রও দান করতে পারেনি। বিজ্ঞান ও মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়াসে দেশান্তরে যুগান্তর আনলেও আমাদের এই দেশের নিষ্করুণ প্রকৃতির কাছে একটা বিরাট অট্টহাসির মত প্রতিভাত হয়েছে। শ্রাবণের মেঘমণ্ডলের নীচে এতদিন যে বাংলা দেশকে চাক্ষুষ করে এসেছিলাম -এই শ্রাবণের বাংলাদেশ আমাদের হতাশও পীড়িত করেছে। অবশেষে এদেশের বহু ঘোষিত সরকারী দম্ভ যখন নিষ্ফল অসারতায় পর্য্যবসিত হ'ল বিজ্ঞান যখন পরাজয় মানল। সেদিনই হঠাৎ শ্রাবণের

মেঘে আকাশ ভরে গেল অতি ভীম ভৈরবহরষে বর্ষা নামল। এই আষাঢ়। প্রকৃতির অশান্ত আক্রোশে শুষ্ক পশ্চিম বাংলা হঠাৎ করে জলমগ্ন হ'ল। সেদিনই হয়ত পিপাসার্ত অরণ্যকুল উদ্বাহু হয়ে মেঘমালার বন্দনা করেছিল, অসহায় কৃষককুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—মেঘ পূজার আয়োজন করেছিল। অজস্রধারায় বর্ষণ হ'ল। পৃথিবী কাঁদল, আমরা হেসেছিলাম কিন্তু কাঁদতেও হয়েছিল। সে কথাই বলেছিলম।

কবি প্রয়াণ। রবীন্দ্রনাথ : মোহিতলাল

এই সময় বাংলা দেশের প্রকৃতিই কেবল ক্রন্দসী থাকে না। শ্রাবনধারার মত আমাদের চোখে জল ঝরে আসছে সে অনেকদিন আগে থেকে। শতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ এই শ্রাবণেই পরলোকগমণ করেছিলেন। তারিখ ২২শে শ্রাবণ। এ বৎসরে তাঁর বিশতম মৃত্যু বার্ষিকী। সেই রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যুগন্ধর মহামানব। আজিকার স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি ঐ রবীন্দ্র-চিন্তা, রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র সাহিত্যে। কিন্তু সেই চিন্তা সংগীত ও সাহিত্যের ভাবমূর্তি—ভারতবর্ষ কেন সমগ্র বিশ্বের হ'লে ও তিনি সেই মূর্তিকে বাংলা ভাষা, বাংলার মানুষ ও বাংলার জলবায়ু-মাটি রসের আধারের মধ্যেই চাক্ষুষ করেছিলেন। সেজন্য বিশ্বকবি বা সর্বভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জীবনে আরও কত বড় এটা সহজেই অনুমেয়। সেই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ আমাদের বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনের এক মহান অপচয়ের দিক —স্মরণীয় শোক দিবস একথা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনা। সেই সার্বভৌম কবি সম্রাটের প্রতি আমরা বৈশাখ সংখ্যার পত্রিকা মারফত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম। সাম্প্রতিক কালে এই রবীন্দ্রনাথ বহু আলোচিত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং ২২শে শ্রাবণের স্মৃতিকে আর একবার স্মরণ করছি এবং অতি শ্রদ্ধাসহকারে।

কিন্তু এই শ্রাবণেই আর এক কবি আমাদের অশ্রু ঝরিয়েছিলেন—তিনি কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। ১০ই শ্রাবণ তিনি পরলোক গমণ করেন—সে আজ থেকে প্রায় ৯ বছর আগের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এমন পুরুষ মূর্তি বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কদাচিৎ লক্ষ্য করা গেছে। তিনি ছিলেন বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতির শেষ অগ্নিহোত্রী। প্রতীচ্য বিদ্যার শমী স্পর্শে যে উজ্জীবন গত ঊনবিংশ শতকের বাংলা প্রত্যক্ষ করেছিল—মোহিতলাল ছিলেন তাঁর সর্বশেষ প্রতিনিধি, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই vivacious creative age এর পরিসমাপ্তি ঘটে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা কবিতার নূতন গতিপথ উন্মুক্ত করেন। তিনি রবীন্দ্র শিষ্য হয়েও ছিলেন রবীন্দ্রদ্রোহী। গত ৫০ বৎসর ধরে বাংলা দেশে, যে রবি দ্রোহিতা চলেছিল কবি মোহিতলাল তার পুরধা ছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের মূলে যে পৌরুষ ও প্রাণবন্ত জীবনের প্রকাশ ছিল। যে সত্য ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি শক্তিমান সত্যনিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই তা অর্জন করতে পারেন। মোহিতলালের ঐ শক্তির প্রকাশ সেকালের বাংলা সাহিত্যের অনুকরণ ধর্মিতা ও গতানুগতিকার অর্গলবদ্ধ দ্বারে আঘাত হানে। সাহিত্যের জাড্য মোচন করেন মোহিতলাল। কাব্য সাধনায়, সমালোচনায়, চিন্তাশীল প্রবন্ধে সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনায়-অপূর্ব ঋজুধর্মী ও সতেজ গদ্যশৈলীর নির্মাতা হিসাবে—চিন্তা স্বাধীনতার স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতায় তিনি সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। ১০ই শ্রাবণের কবিকে এই অবসরে আজ আর একবার স্মরণ করছি—প্রণাম জানাচ্ছি শ্রাবণের ঐ মহাপ্রয়াণের কবিকে।

শতবর্ষে বিজ্ঞানাচার্য

প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটন ও তার ব্যবহারিক নিয়োগ সৃষ্টির আদিকাল হ'তে মানুষকে কৌতুহলী করেছে। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে সেখানেই। এ বিষয়ে অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘটেছিল—এবংবিধ ইতিহাস এদেশে দুর্লভ নয়। তবু বিজ্ঞানচর্চা আমাদের দেশে অব্যাহিত ছিল [না। ইউরোপীয়

বিষ্ঠার সংঘর্ষে ও মিলনে হঠাৎ আমাদের বিজ্ঞান চর্চা নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে বিজ্ঞান চর্চার এক নূতন ইতিহাস রচিত হ'ল। সেকালে এই আধুনিক জগতের প্রাণবার্তা যাঁরা সর্বাগ্রে ঘোষণা করেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য। জগদীশ চন্দ্র পদার্থ বিজ্ঞান উদ্ভিদ ও জীব বিজ্ঞানে এবং প্রফুল্লচন্দ্র রসায়নে বুধমণ্ডলীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জগদীশ চন্দ্রের শতপূর্তি উপলক্ষ্যে আমাদের দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া দেখা গিয়েছিল। গত ২রা আগষ্ট, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের জীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। সেই বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু পরিবেশনের ইচ্ছা।

১৯৬১ সাল বাংলাদেশে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরে ভারতবর্ষের দুজন যুগ প্রতিনিধির শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল। কবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ঘাটন দুজনেরই লক্ষ্য—কিন্তু পৃথক পন্থায়। একজন সাহিত্যে—অপরজন বিজ্ঞানে। প্রফুল্লচন্দ্র এদেশের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার ঋত্বিক—একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ১৮৬১র ২রা আগষ্ট তিনি খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওখানে মধ্য বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনকরে ১৮৭০ সালে তিনি কালকাতা হেয়ারস্কুলে যোগদান করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন—তারপর এফ, এ, পাশ করে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস্ সি ক্লাসে যোগদান করেন। ১৮৮৫ সালে বি, এস্-সি পাশ। ১৮৮৮ সালে ডি, এস্-সি, এবং "হোপ প্রাইজ" অর্জন। এই সময়ে তিনি "সিপাহী বিদ্রোহের পরে ও পূর্বে" শীর্ষক একটি ইংরাজী নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৯ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৮৯৫ সালে Mercurous Nitrate আবিষ্কার করে সমগ্র পৃথিবীতে বিজ্ঞান জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে "কানিংহাম" অধ্যাপকের পদে বৃত হন। ১৯১২তে Bengal Chemical-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে "পালিত প্রফেসর" হিসাবে যোগদান করেন। ১৯১০ সালে 'History of Hindu Chemistry' প্রনয়ণ তাঁর জীবনে র এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কলেজ ই তাঁর দেহাবসান ঘটে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই। উপরিলিখিত ঘটনাগুলি তাঁর জীবনের একটা স্কেচ মাত্র। তাঁর সুমহান জীবনের সকল ইতিবৃত্ত এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এজন্য কৌতুহলী পাঠক তাঁর ইংরাজীতে লিখিত 'An autobiography of a Bengalee Chemist' গ্রন্থখানি অবশ্যই পড়বেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের চারিটি অধ্যায়। ছাত্র-জীবন—অধ্যাপক-জীবন—ব্যবসায়ী জীবন ও স্বদেশ সেবার জীবন। উনবিংশ শতকের নব জাগরণের অন্যতম প্রতিনিধি পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের সংগে তাঁর অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জীবনের দিক থেকে এঁরা দুজনেই সরল ও খাঁটি বাঙালী। তাঁরা নবোদ্ভূত চিন্তা-গুলিকে কেবলমাত্র গ্রন্থবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি—মনুষ্য কল্যাণে সেগুলির ব্যাপক প্রয়োগের জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। জগদীশচন্দ্রের মত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার, তথ্য তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সাফল্যগুলিকে কেবলমাত্র লেবোরেটরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি—তিনি এদেশের দারিদ্র্যজীর্ণ মানুষের মধ্যে সেই বিজ্ঞান সত্যগুলিকে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে দেশের অতীত ঐতিহ্যমোহ যেমন জাগরিত ছিল—তেমনি তিনি অতি মাত্রায় বিজ্ঞানী ও যুক্তিনিষ্ঠ ছিলেন। মাতৃ-ভাষার প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা ছিল। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি এর প্রমাণ। তাঁর Shakespare চর্চা ও সাহিত্য প্রীতির নিদর্শন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁর ভাষণ বহু মূল্যবান। শিক্ষিত বাঙালীর চাকুরি মোহকে তিনি বারে বারে ধিকৃত করিছিলেন—এবং এর প্রতিকার স্বরূপ বাঙালী যুবকরা যাতে করে ব্যবসা বাণিজ্যে

অধিকতর মনোনিবেশ করে—তার নির্দেশ দেন। জাতীয় আন্দোলন ও স্বদেশিকতার তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। সেকালের সমাজ কল্যাণে—বন্যা বিধ্বস্ত আর্তত্রাণে—তাঁর আত্যন্তিক প্রয়াসের কথা একালে প্রায় দুর্লভ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে—বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলন বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি যে মত ও পথকে গ্রাহ্য করেছিল—তা যেমন প্রয়োজনানুগ জ্ঞানগর্ভ তেমনি দূরদৃষ্টির সম্পন্ন। Bengal Chemical-এর দ্বারা তিনি স্বাধীন বিজ্ঞানচর্চা ও ব্যবসায় নবদিগন্ত বাঙালী তরুণদের কাছে তুলে ধরেছিলেন—সেই সংগে দেশের অগণিত মানুষকে জীবিকা অর্জনের একটা সুন্দর পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি বিজ্ঞান চর্চা করেছেন—আবার সাম্প্রতিক দেশ ও জাতির সর্বপ্রকার সমস্যার মধ্যে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি। তাঁর জন্মভূমির নিকটেই তাঁর স্মৃতিবহণ করে চলেছে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। "বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের" নাম পশ্চিম বাংলায় আজ অবিদিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঐ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন—কামাখ্যাচরণ নাগ। তিনি সেকালের একজন বিশ্রুতকীর্তি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। কিছুদিন আগে, বাসুমতী সাহিত্য সভায় "শ্রুতি-স্মৃতি : কামাখ্যাচরণ নাগ" একটি রচনা প্রকাশ করেছিলাম। সেখানে কামাখ্যাচরণের উপর প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যাপক প্রভাবের কথাও বলেছিলাম। প্রফুল্ল চন্দ্র কি কারণে গত যুগের বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের এক যুগন্ধর মহাপুরুষ—সম্ভবত সেই পরিচয়ের জন্য এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন হবে না। ২রা আগষ্ট। তাঁর জীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হোল।

এযুগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথা আমাদের অবিদিত নয়। তবু দিকে দিকে যে মারণাস্ত্রের পরিকল্পনা চলেছে—যাতে ভয় হয় হয়ত বা এ সভ্যতার বিপর্য্যয় ঘটবে। সেই উপলক্ষ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শততম জন্ম জয়ন্তী আমাদের সম্মুখে একটা গভীর সত্য ও আদর্শের দ্যোতনা করবে। প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান মনুষ্য কল্যাণ ও লোকহিতের জন্য। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করবার পরও এই বিজ্ঞানচর্চা তেমন অগ্রগামী হতে পারেনি। স্কুল—কলেজ—বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যন্ত্রপাতি ও গবেষণাগার প্রয়োজন—তা সম্যক গড়ে ওঠেনি। আজ আমরা আশা করবো অচিরে এ বাধা দূরীভূত হবে। ভারতের গ্রাম জীবন হতে শহর জীবন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। আমাদের কৃষি—শিল্প—বাণিজ্য আধুনিকতায় মণ্ডিত হবে। দারিদ্র্যদুষ্ট ভারতবাসীর জীবন নব সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবে। সেদিনই হবে প্রফুল্লচন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনার সার্থক রূপায়ণ। সেদিন কবে আসবে জানি না। তবে তাঁর শততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যেও দেশে তেমন সাড়া পড়েনি দেখে হতাশ হয়েছি। ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী রসায়ণ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই শততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

উইলিয়ম্ কেরী

উইলিয়ম কেরী, আমাদের বর্তমান "প্রসঙ্গ কথা" মারফত আলোচিত হবে—এমন আশা করেছিলাম। কিন্তু স্থানাভাববশত কেরী সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য উপস্থিত করা গেল না। বাংলা গদ্য ও মুদ্রণ যন্ত্রের প্রথম প্রবর্তনকারী হিসাবেই নয়—নানাপ্রকার সমাজ, ধর্মান্দোলন ও দেশহিতকর কার্য্যাবলীর দ্বারা আমাদের নব সভ্যতার তোরণদ্বারে তিনিই আগমনী গান করেছিলেন। এই বৎসরে আমাদের দেশের কোন কোন স্থলে তাঁর Bi-centenary উৎসব হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণচ্ছলে—আগামী সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথায়' ভারতবন্ধু কেরী সম্বন্ধে আমাদের যৎসামান্য আলোচনা পরিবেশিত হবে।

শ্রীহারাধন দত্ত

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্র

শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র, এম, এ,

"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সান্বীক্ষা," বাৎস্যায়ন ভাষ্য। প্রমাণসমূহের দ্বারা পদার্থের পরীক্ষার নাম ন্যায়। প্রত্যক্ষের এবং আগম অর্থাৎ শাস্ত্রের আশ্রিত যে অনুমান তাহাই ন্যায়. তাহার অন্য নাম অন্বীক্ষা। সেইজন্য ন্যায়শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী কহে। যাহা হউক ন্যায় শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষের ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ন্যায়-শাস্ত্রের অর্থ অনুমান শাস্ত্র।

এই শাস্ত্র পাঠে বিশুদ্ধ অনুমান করিবার শক্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে। জগতে অনুমানের দ্বারা বহু বিষয় জানিতে হয়; কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বিষয় আমরা জানিতে পারি না। পর্ব্বতে ধূম আমার নয়নগোচর হইতেছে; বহ্নি ত আমার প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। তবুও আমি বুঝিতে পারিলাম, পর্ব্বতে বহ্নি আছে। কেন? আমার অনুমানের দ্বারাই এই জ্ঞানলাভ করিলাম। আকাশে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আমি দর্শন করিতেছি; নিকট মেঘগর্জ্জন আমার শ্রুতিগোচর হইতেছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে বৃষ্টি হইবে, তাহা ত আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই। তবুও আমি অনুমানের দ্বারা জানিতে পারিলাম, ক্ষণকাল পরেই বৃষ্টি হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন। যাহা সত্যবস্তু ন্যায়-শাস্ত্র পাঠে তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। প্রতীচ্য ন্যায়-শাস্ত্রেও ঐ একই কথা। The aim of Logic is the attainment of truth—কিন্তু ন্যায় সূত্রকার গৌতম ঋষি তত্ত্বজ্ঞানকেই ন্যায়শাস্ত্রালোচনার চরম উদ্দেশ্য বলিতেছেন না। অপবর্গলাভই ন্যায়শাস্ত্রালোচনার চরম উদ্দেশ্য। ন্যায়শাস্ত্রে বর্ণিত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই কি সঙ্গে সঙ্গে অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে? না, তাহা নহে। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে রাগ দ্বেষ মোহের বিনিবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি বিরত হইলে জন্মেরও বিরাম হইয়া থাকে। জন্মের বিরামের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সংঘটিত হয়। তাহাই অপবর্গ।

যাহা হউক প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ পদার্থের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতমকৃত ন্যায়দর্শন পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এক একটী অধ্যায়ে দুইটী করিয়া আহ্নিক রহিয়াছে। কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত সূত্রে এই ন্যায় দর্শন পরিসমাপ্ত। এই সূত্র সমূহের দ্বারা উল্লিখিত ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম সূত্রের দ্বারা ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ্য বা নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তারপর প্রথমাধ্যায়েই পদার্থগুলির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তারপর অন্যান্য অধ্যায়ে পদার্থসমূহের পরীক্ষা পরিবর্ণিত হইয়াছে।

প্রমাণ চতুর্ব্বিধ ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ পদার্থে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেমন, পুস্তকখানিতে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং ইহার সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। অবশ্য ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নামই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই অনুমানের উৎপত্তি। ধূম দর্শনের দ্বারা বহ্নির অনুমান করিলাম। প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূম জ্ঞান হইল; তাহা হইতে বহ্নির অনুমিতি হয়। অনুমান ত্রিবিধ,—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। কারণ জ্ঞান হইতেই কার্য্যের জ্ঞান অনুমান করিতে পারি; যেমন, মেঘোন্নতি দর্শনে বৃষ্টির অনুমান। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান। কার্য্য দর্শনে কারণের অনুমান শেষবৎ অনুমান।

নদীর পূর্ণত্বাদি দর্শনে দেশান্তরে বৃষ্টি হইয়াছে এই অনুমান করিতে পারি। সামান্য বা সমানভাব দর্শনে যে অনুমান তাহার নাম সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। এই ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞাত বস্তুর সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা অন্য বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমান প্রমাণ যেমন,—আমরা গরু বিশেষরূপে চিনি; শুনিলাম গরুর তুল্য গবয়। পরে গবয় দর্শনে বুঝিলাম, ইহাই গবয়; এই হইল উপমান প্রমাণ। আপ্তবাক্য বা ঋষিবাক্য শব্দপ্রমাণ।

প্রমেয় কি? জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্রই প্রমেয়। তবে প্রমাণের মুখ্য বিষয় বলিয়া নিম্নোক্ত দ্বাদশটী বিষয়কে ন্যায়শাস্ত্রে প্রমেয় বলা হইয়াছে :—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ।

প্রমেয়সমূহের আলোচনা এবং সংশয়, প্রয়োজন ইত্যাদির বিষয় বিবৃত করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পঞ্চাবয়ব ন্যায় যে—প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ, এবং প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রে যে Syllogism সিলজিস্‌ম্ রহিয়াছে তাহা এই মহান্যায়েরই অনেকটা অনুরূপ, ইহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

অনুমান ব্যতীত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা হয় না; ঐহিক পারলৌকিক সকল বিষয়েই অনুমানের প্রয়োজন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, ইতর প্রাণীও অনুমান করিয়া থাকে। এই অনুমান প্রক্রিয়া যখন অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয়, তখন অনুমানের কিরূপ আকার থাকা বিধেয়? ন্যায়শাস্ত্রকার গৌতমের মতে সেই অনুমান বা ন্যায়ের পাঁচটা অঙ্গ বা অবয়ব থাকিবে; যথা—প্রতিজ্ঞা হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। এই হেতু ইহার নাম পঞ্চাবয়ব ন্যায় বা মহান্যায়।

প্রতিজ্ঞা—শব্দ অনিত্য। শব্দ যে অনিত্য, এখানে ইহাই প্রতিজ্ঞা করা হইল।

হেতু—উৎপত্তি ধর্ম্ম হইতে, হেতু প্রদর্শন করা হইল শব্দ উৎপত্তি ধর্ম্মক, অতএব ইহা অনিত্য।

উদাহরণ—স্থালী ও ভূক্তির মত। উৎপত্তি ধর্ম্মক স্থালী প্রভৃতি যেমন অনিত্য, উৎপত্তি ধর্ম্মক শব্দও তদ্রূপ অনিত্য; এই উদাহরণ দেওয়া হইল।

উপনয়—যাহা উৎপত্তি ধর্ম্মক, তাহাই অনিত্য।

নিগমন—এই হেতু উৎপত্তি ধর্ম্মক বলিয়া শব্দ অনিত্য।

প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রে যে সিলজিস্‌ম্ পঞ্চাবয়ব নহে; তাহা তিনটী অবয়ববিশিষ্ট। দুইটী প্রতিজ্ঞা হইতে একটী তৃতীয় প্রতিজ্ঞা অনুমান করা হয়; যথা—১। মনুষ্যসমূহ নশ্বর; ২। রাম মনুষ্য; ৩। অতএব রাম নশ্বর। এস্থলে রাম নশ্বর' এই প্রতিজ্ঞাটী প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতে অনুমান করা হইল। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার দুইটী ভাগ আছে,—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। এক একটী ভাগ এক একটী (term) টার্ম্। টার্ম্ এক শব্দাত্মকও হইতে পারে। একাধিক শব্দাত্মকও হইতে পারে। প্রতিজ্ঞা বহু প্রকারের হইতে পারে। সামান্য প্রতিজ্ঞা, বিশেষ প্রতিজ্ঞা, ভাববোধ প্রতিজ্ঞা, অভাববোধক প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। যে দুইটী প্রতিজ্ঞা, হইতে অনুমান করা হয়, তদ্দ্বয়ের একটী বিশেষবোধক হইলে অনুমানটী বিশেষ-বোধক হইবে। প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তে তাহা স্ফুটীকৃত। কারণ, 'মনুষ্যসমূহ নশ্বর' ইহা সামান্যবোধক। 'রাম নশ্বর' ইহা বিশেষবোধক; এবং নিগমনটীও বিশেষবোধক। প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের একটি অভাববোধক হইলে নিগমনও অভাব-বোধক হইবে। মনুষ্যসমূহ সর্ব্বজ্ঞ নহে; সে মনুষ্য; অতএব সে সর্ব্বজ্ঞ নহে। সিলজিস্‌ম্ সংক্রান্ত এতাদৃক্ বিধিসমূহ ডিডাকৃটিভ লজিকে বিস্তৃতভাবে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক প্রতীচ্য লজিকের সিলজিস্‌ম্ বা মহান্যায় পঞ্চাবয়ব নহে। এই প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ফলে নিগমন সমভাবেই করা হইতেছে। পরন্তু অস্মদ্দেশীয় মহান্যায়ের পঞ্চাবয়বত্ব সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। গৌতমের পূর্ব্বে দশাবয়ব গ্রহণের প্রথা ছিল, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। আবার বেদান্তিগণের মধ্যেও তিনটী অবয়ব মাত্র গ্রহণের বিধি ছিল। পাঁচটী অবয়ব গ্রহণ না করিয়া কেবল

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, অথবা উদাহরণ, উপনয় নিগমন এই তিন অবয়বের দ্বারা অনুমিতি ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতে পারে। মূল কথা প্রতীচ্য দেশীয় সিলজিসম্ ও অস্মদ্দেশীয় মহান্যায়ের মধ্যে যে বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট।

প্রতীচ্য লজিক দ্বিবিধ, ডিডাক্‌টিভ ও ইন্‌ডাক্‌টিভ্ অর্থাৎ যথাক্রমে অবরোহ ও আরোহ প্রথামূলক টার্ম্, প্রতিজ্ঞা, সিলজিসম্ প্রভৃতির আলোচনা ডিডাক্টিভ্ লজিকের বিষয়ীভূত। ইন্‌ডাক্টিভ্ লজিকে অর্থাৎ আরোহ প্রথামূলক ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ হইতে সামান্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কার্য্যকারণের সম্বন্ধাদির বিচার এই লজিকের অন্তর্গত। বহু নৈয়ায়িক এতৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেও কার্য্য কারণ বিষয়ে নানা বিচার রহিয়াছে। যাহা হউক এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধ লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'সত্যনির্ণয়' প্রতীচ্য ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং Theology বা ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপক শাস্ত্র, ও Cosmology বা জগত্তত্ত্ব নিরূপক-শাস্ত্রের ইহা অঙ্গীভূত নহে। সাধারণ দর্শনশাস্ত্রে লজিক হইতে প্রয়োজনমত অনেক বিধি পরিগৃহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে বলা হইতে পারে, কাণ্টের Twelve Categories বা দ্বাদশ পদার্থ গ্রীক লজিক হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। অন্বীক্ষা বা অনুমানের শাস্ত্র হইলেও ইহা দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। ন্যায়দর্শন ষড়্দর্শনের অন্যতম দর্শন। অপবর্গ লাভের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই দর্শনশাস্ত্র সীমাবদ্ধ হইয়াছে। আবার ইহা আর্য্যঋষি প্রণীত। একখানি প্রধান Cosmology বা জগত্তত্ত্ব নিরূপক শাস্ত্র। অতি প্রাচীন-কালে Atomic theory বা পরমাণুবাদ এই ন্যায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অত্যধিক আলোচনায় শাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবুদ্ধি সঞ্জাত হইতে পারে কেহ কেহ এমন মনে করিতে পারেন।

শাস্ত্রের কোন কোন উক্তিকেও যেন হেতুশাস্ত্রের বা তর্কশাস্ত্রের উপর কটাক্ষ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তর্কশাস্ত্রের কটাক্ষ নহে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে:- "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" 'যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া সেই দুই ধর্ম্মমূল শাস্ত্রকে (শ্রুতি ও স্মৃতি) অমান্য করে সেই বেদনিন্দক নাস্তিক সাধুগণ কর্ত্তৃক সমাজ বহিষ্কার্য্য। কিন্তু কুতর্ককে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলা হইয়াছে। বিবুধমণ্ডলীয় মধ্য শ্রুত হওয়া যায়, ন্যায়শাস্ত্র সম্যক্ শেষ না করিয়া অন্ততঃ কিছু বাদ রাখিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়; নতুবা শৃগাল-যোনি প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, ন্যায়বিদ্যার ঐ অপবাদ অলীক। মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্র প্রণয়নের পর বহুকাল যাবৎ বহু নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে শত সহস্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রন্থ আলোকনে ও তাঁহাদের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে যতটুকু কিছু জানা যায় তাহাতেও তেমন মনে হয় না। কেহ কেহ নাস্তিক্য-বাদের প্রতিবাদ ও ঈশ্বরবাদ স্থাপনকল্পেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদুদয়নাচার্য্য-কৃত কুসুমাঞ্জলি। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ চার্ব্বাক, মীমাংসক বৌদ্ধ, জৈন ও সাংখ্যকারগণের নিরীশ্বরবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কোন কোন নৈয়ায়িক পরম কৃষ্ণভক্ত। ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠ্য বহুতথ্যপূর্ণ ভাষাপরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকটী কি মধুর:—"নূতন জলধর রুচয়ে, গোপবধূটী দুকূল চৌরায়। তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায়, সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥" মোটের উপর দেখা যায়, অধুনাতন সময়ে কিছু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির আলোচনা করিলেই চিত্তের মধ্যে যেরূপ নাস্তিক্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়, পূর্ব্বকালে তদ্রূপ হইত না। তৎসময়ে সুধীগনের চিত্তকমল যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সৌন্দর্য্যে শোভমান থাকিত, তেমনি নিরতিশয় ভগবদ্ভক্তি-সৌরভে প্রপূরিত দেখা যাইত।

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিতবিদ্যা যেরূপ স্থান লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বকালে এদেশে আন্বীক্ষিকী

বিস্তারও যেন তদ্রূপ স্থান ছিল বলিয়া মনে হয়, এক্ষণে বিদ্যার্থিগণকে যেমন সাহিত্য অধ্যাপনা করান হয়, তেমনি গণিত শিক্ষাও প্রদান করা হইয়া থাকে। তাহারা অন্ততঃ কিয়ৎকাল ধরিয়া সাহিত্য ও গণিত যুগপৎ শিক্ষা করিতে থাকে। পূর্ব্বকালে ব্যাকরণ ও সাহিত্য কিছু অধীত হওয়ার পরই প্রায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যাইত। ব্যাকরণে অকৃতবিদ্য জনেও ন্যায়বিদ্যালাভের প্রচেষ্টা করিত। ফলতঃ বিদ্যার্থিমাত্রেরই ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানার্জ্জনের প্রযত্ন প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। চারি পাঁচশত বর্ষ ধরিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ, ক্ষুদ্রকারিকা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিরচিত হইয়াছে। পণ্ডিত কুলতিলক রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি বঙ্গদেশের নৈয়ায়িকের কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় থাকিবে। তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বহু শতাব্দী ধরিয়া বিহারে ন্যায়শাস্ত্রালোচনা হইতেছিল। নব্য ন্যায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ চিন্তামণির প্রণেতা গঙ্গেশ, বৈশেষিকের টীকাকার শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি মৈথিল নৈয়ায়িক চিরপূজ্য। নব্য-ন্যায় মিথিলায় প্রথম উদ্ভূত, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সম্মিলনে নব্যন্যায়ের উৎপত্তি।

●

॥ বৃথা ॥

॥ শরৎ দত্ত ॥

●

গহন বেদনা হৃদয়ে রয়েছে জমা
বুকের মাঝারে রয়েছে অনেক ক্ষত :
দুখের আঘাত সয়েছি কত
আজ নেই তুমি মনোরমা !
আকাশের নীলে স্বর্ণের ঢল নামে,
ধরণীর কূলে হলুদ রোদের মায়া,
পাখী খুঁজে ফেরে গাছের নিভৃত ছায়া
প্রৌঢ় এ বুকে সকল কামনা থামে !
শিমুল পলাশে লাগল আগুন বনে,
সবুজের ঢেউ শাখায় শাখায় জাগে
আকাশ ও মাটি জাগল কি অনুরাগে
জাগল না হায় এ হৃদয় কাননে !
প্রাণের জোয়ার ধরণীর কূলে কূলে
রঙের বাহার পুলকায় উল্লাসে,
নদী মাঠ বন গানের গরবে হাসে,
হৃদয় যমুনা বেদনায় ওঠে দুলে !

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

শ্রীচন্দ্রনাথ পাল

বিশ্ব সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র গত ২রা জুলাই কক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ে পাড়ি দিয়েছে ইহলোকেত্তর কোনও এক অজ্ঞাত জগতে। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে এমনই একজন সাহিত্যিক যাকে চেনে না বা তার লেখা পড়েনি এমন কোন সাহিত্যরসিক বোধহয় নাই। হেমিংওয়ে গত ২রা জুলাই নিজের বাড়ীতে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃত্যুটা মর্মান্তিক, তার থেকেও মর্মান্তিক যে এক বলিষ্ঠ লেখনী স্তব্ধ হোলো চিরতরে। কোন একটি আমেরিকান পাক্ষিক পত্রিকা লিখল—

"One of the great builders of American literature has passed away"। হেমিংওয়ের জন্ম হয় ২১শে জুলাই ১৮৯৯ সালে ইলিনয় রাজ্যের ওক পার্কে। চিকিৎসক পিতা Dr. Clarence Edmonds Hemingway-র ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্রও চিকিৎসক হবেন। কিন্তু হেমিংওয়ের নেশা লাগল মাছধরায় আর শিকারে। তাই যখন তাঁর বয়স ৮ বছর বাবা তাঁকে দিলেন একটা মাছ ধরার ছিপ। ১০ বছর বয়সে বাবা দিলেন একটি শিকারের বন্দুক। শিকারের বন্দুকই তাঁর জীবন নিল গত ২রা জুলাই।

হেমিংওয়ের রচনা সম্ভারের মধ্যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে কথোপকথনের মাধ্যমেও যে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব সেটা হেমিংওয়ের লেখা দেখে বোঝা যায়। তাঁর রচনার মধ্যে কথোপকথন বেশী স্থান পেয়েছে। অনেক সাহিত্য রসিকেরা তাঁর এই ভঙ্গীকে, Typical Hemingway type বলে থাকেন।

সাংবাদিকতা দিয়েই হেমিংওয়ের কর্ম জীবন সুরু। Kausas City Star পত্রিকাতেই তাঁর সাংবাদিকতা সুরু হয়। এই সময় তখন বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হেমিংওয়ে ঘর ছাড়তে চাইলেন। ইচ্ছা ছিল সেনা বিভাগে যাবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় বাধ সাধল তাঁর একটি ক্ষত চোখ। স্বেচ্ছায় তিনি রেডক্রসের এ্যাম্বুলেন্স-ড্রাইভার হোয়ে ইটালীয় সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। যুদ্ধে আহত হবার জন্য তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তিনি প্রতিফলিত করলেন "A Farewell to Arms" উপন্যাসে। হেমিংওয়ে যুদ্ধের বিভীষিকা তুলে ধরেছেন তাঁর আর একটি উপন্যাসে "For Whom The Bell Tolls"-এ।

'In Our time' লিখেই তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু হয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নেবার পর। "In Our time"-এ হেমিংওয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যুদ্ধের মাহাত্ম্য। বীতশ্রদ্ধ সৈনিক যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তার শত্রু সৈন্যকে কাছে পেয়েও তাকে হত্যায় বিমুখ হবার মত মনোভাব। একদিকে জীবনে অশ্রদ্ধা অন্যদিকে শত্রু সৈন্যের সংগে শত্রুতার কারণ খোঁজার জন্য মানুষের সহজ সংবেদনশীল মনোবৃত্তির উন্মেষ ফুটে উঠেছে।

'A Farewell to Arms' এ তিনি বলেছেন যুদ্ধ বিপর্যস্ত এক প্রণয়ী যুগলের মধ্যে জীবনের মূল্য। তারা খুঁজছে জীবনকে পরস্পরের কাছে যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতিকে ধিক্কার দিয়ে। A Farewell to Arms এ হেমিংওয়ে উপলব্ধি করেছেন প্রেম প্রীতির পারস্পরিক বন্ধনেই জীবনের সাফল্য।

যুদ্ধোত্তর প্যারীতে এসে হেমিংওয়ে সান্নিধ্যে আসতে পারলেন Ezra Pound, Andre Gide, Valery Larband, James Joyce, Miss Gertrude Steine. প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের। Miss Stein এর প্রেরণায় হেমিংওয়ে তাঁর সুন্দর সহজ লেখার ভঙ্গীতে লেখা সুরু করেন।

'In our time' দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন সুরু হলেও সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে ১৯২৬ সালে 'The Also Sun Rises' নামক উপন্যাস প্রকাশের পর। তারপর তিনি লেখেন "A Fare well to Arms' "Death In

the Afternoon' 'For Whom the Bell Tolls', 'To Have and Have not', "Green Hills of Africa" এ ছাড়াও হেমিংওয়ে বহু ছোট গল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই এক বৈশিষ্ট নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হেমিংওয়ের জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র এবং বিবিধ। যুদ্ধ, শিকার, মাছধরা, ষাঁড়ের লড়াই কি বক্সিং এ সব ঘটনা সুসামঞ্জস্য ভাবে ব্যবহার করেছেন। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকার বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ে তাঁর বিপুল ছোট গল্প রচনায় লাগিয়েছেন। হেমিংওয়ের লেখার মধ্যে বেশীর ভাগ পটভূমিকা ইটালী, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, এবং আফ্রিকা। কিউবার হাভানার উপকূল হেমিংওয়ের লেখার রসদ জুগিয়েছিল। হেমিংওয়ের রচনার মধ্যে স্প্যানিস ইটালিয়ান ফরাসী ভাষারও ব্যবহার দেখা যায়। এমন কি কয়েকটি গল্পের নামকরণও করেন ঐ সব ভাষায়। হেমিংওয়ের সাহিত্য জীবনে তার স্বদেশ আমেরিকার থেকে বেশী প্রভাব পড়েছিল ইয়োরোপের।

কয়েক বছর বিরতির পর ১৯৫২ হেমিংওয়ের 'The Oldman and The Sea' প্রকাশিত হয়। 'The Sun also Rises' 'A Farewell to Arms' 'For Whom the Bell Tolls" প্রভৃতির রচয়িতার সংগে 'The old man and the Sea' এর রচয়িতার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য। এই বইয়ে হেমিংওয়ে এক নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আগের সেই ষাঁড়ের লড়াই বক্সিং যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের লেখক হেমিংওয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়না। এখানে হেমিংওয়ে যেন এক বৃদ্ধ। যৌবনের উদ্দামতা, উচ্ছলতা, যেন নিস্প্রভ হোয়ে গেছে। বার্দ্ধক্যে উপনীত হোয়েছেন লেখক তাঁর সেই বুড়ো জেলের মতই। বৃদ্ধ জেলে অনেক দিন মাছ ধরতে না পেরে অন্যের অবজ্ঞা, শ্লেষ কুড়িয়ে ছিল। তার অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু শারিরীক ক্ষমতা ছিলনা। শেষে সে এক খুব বড় মাছ ধরল। কিন্তু দৈহিক অক্ষমতার কারণে সে সেই মাছ ধরে রাখতে পারলনা। সাফল্য আর ব্যর্থতা দুটোই পেল। The Old Man and the Sea বই খানিতে হেমিংওয়ে বয়সের কথা তুলে ধরেছেন। এই বই খানি প্রকাশ পায় ১৯৫২ সালে।

এই বই খানির প্রকাশের পর হেমিংওয়েকে অনেক সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। অথচ সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই বই খানিই সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার আনল হোমিংওয়ের কাছে ১৯৫৪ সালে। নোবেল পুরস্কার পেয়ে হেমিংওয়ে নিজেকে প্রমাণ করলেন যে তিনি একজন শিল্পী, সত্যিকারের সাহিত্যিক। নোবেল পুরস্কার পাবার আগে হেমিংওয়ে পান আমেরিকার সব থেকে বড় পুরস্কার পুলিৎসার পুরস্কার ১৯৫৩ সালে। হেমিংওয়ের সাফল্যে সমালোচকদের দৃষ্টি খুলে গেল।

হেমিংওয়ে ভালবেসেছিলেন স্পেনকে আফ্রিকাকে ফ্রান্সকে হাভানা উপকূলকে। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পাওয়া যায়। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াইএর পটভূমিকায় রচিত অনেক গল্প এবং একটি উপন্যাস আছে (The Sun also Rises) আফ্রিকার গহন অরণ্য জীবন তাঁর ভাল লেগেছে শিকারের রোমাঞ্চের জন্য। আফ্রিকার পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস Green Hills of Africa, The Snows of Kilimanjaro" (বড় গল্প)। যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls' এছাড়া রয়েছে অনেক ছোট গল্প। সমুদ্র এবং জেলেদের কাহিনী ঘিরে রয়েছে তাঁর সাহিত্য জীবনের সব থেকে বড় স্বীকৃতি নোবেল এবং পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী 'The Old Man and the Sea'.

হেমিংওয়ের রচনার মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিশেষ বা গণ্ডী বিশেষ পাওয়া যায়না তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে রোমাঞ্চ প্রেম প্রীতি জীবন কথা উদ্দামতা উচ্ছলতা, সব কিছু তাঁর রচনাবলীর মধ্যে দেখতে পাই ইয়োরোপের আল্পস্‌, আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের বিবরণ,

বিদুষী ভার্য্যা

শ্রীননীগোপাল প্রামাণিক

কেশবপুর গ্রামের পরিতোষ মণ্ডল—একজন মধ্যবিত্ত চাষী গৃহস্থ। কেশবপুর গ্রামের বসতি খুব বেশী না হইলেও যে কয়েকজন চাষী গৃহস্থ বাস করিত প্রায় সকলেই চাষের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সারা দিন চাষের কাজের পর দিনান্তে সকলে বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর একত্রে কোন এক স্থানে বসিয়া ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ কীর্ত্তন ইত্যাদি করিত। পরিতোষ মণ্ডল ইহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। দানধ্যান, অন্নদান ইত্যাদি সৎকার্য্য করা পরিতোষ মণ্ডলের একটা বিশেষরূপ অভ্যাসে পরিণত হইয়া। কিন্তু এমন সাধু ব্যক্তির প্রতি ভগবানের যেন অবিচার ছিলো—পরিতোষ মণ্ডলের বয়স আটত্রিশ বৎসর তখন তার তিনটী কন্যা—পুত্র সন্তান ছিলনা সেজন্য সংসারের প্রতি বিশেষ আস্থা ছিলো না। কিন্তু মণ্ডল মশায়ের স্ত্রীর সেরূপ কিছু হয় নাই—সে কিন্তু একটা উচ্চ আশা লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিত।

একদিন পরিতোষ মণ্ডলের স্ত্রী তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—"আমরা দুইজনে একদিন ৺বৈদ্যনাথ ধামে গিয়া বাবার চরণে মানত দিইগে দেখি—বাবা বৈদ্যনাথ আমাদের প্রতি সদয় হন কিনা—; এই যুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ডল মশায় সেই সঙ্গে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন—এবং তার একটি কন্যাকে তার শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহারা দুজনে ৺বৈদ্যনাথ ধাম অভিমুখে রওনা হলেন।

কেশবপুর হইতে ৺বৈদ্যনাথ ধাম পাকা বাষট্টি মাইল রাস্তা। তাহারা স্বামী স্ত্রী দুইজনে দুই কলসী গঙ্গা জল মাথায় লইয়া—পদব্রজে ৺বৈদ্যনাথ ধাম অভিমুখে—রওনা হইল। রাস্তায় খাওয়া দাওয়া বাহ্য প্রস্রাব কিছুই করিবেনা—কারণ এই পণ লইয়া বাহির হয়—যে এই মাথার গঙ্গাজল যতক্ষণ না বাবার চরণে—অর্পন করিব ততক্ষণ কিছুই করিবনা—অন্তরে বাবার নাম স্মরণ করিতে করিতে দুই রাত্রি একদিন চলার পর—বৈকালের দিকে দেওঘরে আসিয়া পড়িল—এত কষ্ট কিন্তু তাহারা এ কষ্টকে অকাতরে সহ্য করিয়া ৺বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিল। "জয় বাবা বৈদ্যনাথ কী জয়"—উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভুর মস্তকে সেই মস্তকের জল ঢালিল—তারপর প্রভুত চরণামৃত পান করিয়া জীবন সার্থক করিল—। সন্ধ্যার পর প্রভুর সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিয়া—প্রসাদ ভক্ষন করার পর তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাবার মন্দিরের উঠানে মানত দিল তাহাদের ভক্তি তাহাদের সংকল্প—বাবা খুব শীঘ্রই মঞ্জুর করিলেন—তারা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া—বাবার মহিমার গুণ কীর্ত্তণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

ফ্রান্সের কাফের এবং ফরাসী জীবনধারার বিবরণ স্পেনের বুলফাইটের বিবরণ, হাভানার উপকূলে মাছধরার বিবরণ, আবার অতি এক কিশোরের কথা থেকে সুরু করে এক অতি বৃদ্ধ মৎসজীবির কথা পর্য্যন্ত বলেছেন তাঁর রচনার মধ্যে।

হেমিংওয়ের জীবনের বিচিত্র ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। আমেরিকার ফ্লোরিডা, কিউবার হাভানা, ফ্রান্সের প্যারী, ইটালীর সীমান্ত, স্পেনের মাদ্রিদ, আফ্রিকার উগাণ্ডা এ সবজায়গাগুলোতেই হেমিংওয়ের জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। এই সব দেশে যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু ভাল লেগেছে, যা কিছু তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে সে সবই তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকতা দিয়ে কর্ম্মজীবন সুরু করে সাহিত্য দিয়ে শেষ করেন তাঁর জীবনের কটা দিন। মধ্যের বিচিত্র এবং বহুবিধ অভিজ্ঞতা ফল বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য এই সম্পদ। এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি বিরাজ করবেন সাহিত্য রসিকদের মনে, যে বৈশিষ্ট্য একমাত্র হেমিংওয়ের।

কিছু দিন পর পরিতোষ মণ্ডলের স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইল এবং নির্দিষ্ট মাসে তাহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। জন্মান্ধ দৃষ্টি শক্তি পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়—তাহার চাইতে বেশী আনন্দ ইহাদের। ছেলে বাবা বৈদ্যনাথের দয়ার দান—তাই ছেলের নাম—"বিশ্বনাথ রাখা হইল এবং 'বিশু' বলিয়া তাহাকে ডাকিত—বৈদ্যনাথ নামই তাহার রাখা হ'তো কিন্তু পরিতোষ মণ্ডলের খুড়ার নাম বৈদ্যনাথ মণ্ডল। তাই পুত্রের নাম বিশ্বনাথ রাখা হয়।

বিশ্বনাথের বয়স যখন পাঁচ বৎসর— মণ্ডল মশায় তাহাকে লেখপড়া শিক্ষার জন্য গ্রামের রামধন পণ্ডিত মহাশয়কে নিযুক্ত করিলেন,—কিন্তু অত্যাধিক আদর পাইয়া বিশ্ব-নাথের—লেখাপড়ায় বিশেষ মন ছিলোনা—পণ্ডিত মশায় বিশেষ শাসন ও করিতে পারিতেন না—কোন প্রকারে বাবা বাছা করিয়া তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের—লেখাপড়া হয়।

বিশ্বনাথের বয়স যখন তের বৎসর– তখন পরিতোষ মণ্ডল তা'র বিবাহ দেওয়ার জন্য—ব্যস্ত হইয়া উঠলো। জয়নারায়ণপুর গ্রামের গোকুল মণ্ডলের মেয়ে বাসন্তির সহিত বিশ্বনাথের বিবাহের স্থির হইয়া গেল। বাসন্তি সৎগুণ সম্পন্না ও সুশিক্ষিতা মেয়ে। গোকুল মণ্ডল যেমন তার ছেলেদের লখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন,—তেমনি তাহার মেয়েদেরকেও লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। জয়নারায়ণপুর গ্রামে একটী মাত্র মাইনর স্কুল বহুদিন ধরিয়া আছে—বাসন্তি ঐ স্কুলের পড়া শেষ করিয়াছিল—মাত্র নিকটে কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুল থাকিলে বোধহয় কিছুটা আরও পড়া হইত।—এই অসুবিধার জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় নাই।

সাড়ম্বরে বিশ্বনাথের সহিত বাসন্তির বিবাহ সু-সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর বাসন্তি আর তার বাপের বাড়ীতে থাকিতে চাহিত না—বাসন্তি সংসারের কাজকর্ম্মও ও শশুড় শাশুড়ির সেবাযত্নে অতি অল্প দিনেই বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল, সংসারের কাজ কর্ম্ম করার পর যেটুকু সময় পাইত—সেই সময়ে অনেক রকম হাতের কাজ করিত।

বিবাহের কিছুদিন পর বিশ্বনাথের শরীর অনেকটা খারাপ হইতে লাগিল—তার শরীর দিন দিন খারাপ হইতেছে দেখিয়া তার মা বাবার মনটা বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি করিয়া পুত্রের স্বাস্থের উন্নতি হয় তাহার চিন্তায় অস্থির হইয়া একজন বড় ডাক্তারকে দেখাইলেন। ডাক্তারের পরামর্শ মত বিশ্বনাথকে হাওয়া পরিবর্ত্তন জন্য—তাহার মাসীমার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল—।

পাঁড়া গ্রামের কতকগুলি অশিক্ষিতা মেয়ে প্রায়ই বিশ্বনাথের খোঁজ খবর জন্য মণ্ডল মশায় এর বাড়ী এসিয়া বৌ এর সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিত বৌ—এর লক্ষণ ভাল—এমন বৌ আনলে মণ্ডল গিন্নি তোমার ছেলের শরীর কেমন খারাপ হ'য়ে গেল এখন তোমাদের ছেলে বাঁচলে হয়। এই সকল কথাগুলি সবই বাসন্তির কানে যায় কিন্তু সে নীরবে সহ্য করে; আর অন্তরে তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য ভগবানকে জানায়-এ ছাড়া তার আর কি করণীয় থাকিতে পারে সবই নিয়তির খেলা এইটুকু জানিয়া সে তাহার মনকে সান্ত্বনা দেয়। এত অশান্তির মধ্যেও বাসন্তি সব সময়ই নিজের করনীয় কাজগুলি করিত এবং সে গুলিকে কাঁচ দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিত। একখানি কিন্তু কাঁচ অভাবে বাঁধাইতে পারে নাই।

দেড় মাশ কাল থাকার পর বিশ্বনাথের শরীর বেশ ভাল হইয়া গেল—তাই বিশ্বনাথ নিজের বাড়ী চলিয়া আসে—সঙ্গে তার মাসীমাও আসিল। বিশ্বনাথের জীবনে এই প্রথম দীর্ঘদিন বাড়ী ছাড়া হইয়া সে কোন দিন থাকে নাই। বিশ্বনাথের বিবাহের পর তার শরীর খারাপ হয়—দ্বিতীয়ত তাহাকে বাড়ী ছাড়া হইতে হইল, ইহাতেই বিশ্বনাথের মা বাবার পুত্রবধূর প্রতি কিছুটা অশ্রদ্ধা জন্মিল, সেজন্য বাসন্তিকে প্রথম তাহারা যেরূপ স্নেহের চোখে দেখিতো আর সেরূপ দেখিত না।

বিশ্বনাথ তার মাসীমার বাড়ী হইতে আসিয়া দেখিতে পইল যে তার স্ত্রী একটী কার্পেটের উপর সে হাতের

কাজ করে লিখেছে এবং সেটাকে কাঁচ দ্বারায় বাঁধিয়ে দেওয়ালের টানিয়ে রেখেছি :—

তাতে লেখা আছে এই :—

বিশ্ব যদি চ'লে যায়—
কাঁদিতে কাঁদিতে,—
একা আমি প'ড়ে রব
কর্ত্তব্য-সাধিতে।

বিশ্বনাথ অনেক ক্ষন ধ'রে লেখাগুলি পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে ডাকিয়া ব'লে;—তোমার বৌমা কি লিখেছে জানো—তখন তার মা আগ্রহ সহকারে বিশ্বকে জিজ্ঞেস করে কি লিখেছে বাবা বল্তো বিশ্বনাথ তখন সজল নয়নে উপরের লিখিত কবিতাটীর অর্থ প্রকাশ ক'রে বল্লো এর মানে কিমা জানো—তোমার বিশ্ব যদি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী হ'তে চ'লে যায় তা'তে তোমার বৌ এর কোন দুঃখ হবেনা—বরং সে নিশ্চিন্ত মনে এই বাড়ীতে বাস করিবে। এই কথা শ্রবণ মাত্র—তার মা বৌ-এর নিকট গিয়ে নানা রূপ কুৎসিত গালি দিয়ে তার গলায় হাত তাকে বাড়ী হ'তে বে'র ক'রে—কিছুতেই তাদের মনকে স্থির করাতে পারেনা—পাড়ার অনেক লোক জন এসে মধ্যস্থতা ক'রে ব'লে যাক্ আজ সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, বরং কালকে সকালে তোমরা সঙ্গে নিয়ে তার মা বাপের কাছে দিয়ে এ'সে আর এমন অলক্ষুনে মেয়ে এনো—না—

বাসন্তি বেশ বুঝতে পারলো—এ সবই আমার অদৃষ্টের দোষ নইলে কেন—ই বা আমার বিয়ে এমন একটা অশিক্ষিত পরিবারের বাড়ীতে হবে। আমি কিন্তু আমার অন্তরে কোন রূপ- অশ্রদ্ধা আনাই নি, বাবা-মা—যাকে ধরে আমার বিয়ে দিতেছেন সে যেমনই হউক না কেন সেই আমার স্বামী সেই আমার সারা জীবনে-সাথী এবং চিরদিনের অন্তরের দেবতা—কিন্তু হায় :—নিয়তির যে ম্যাপ আঁকা আছে তাহা হইবেই এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করার পর সে স্থির করিল আমাকে ত এ ঘর হতে যেতে হবেই—;এই চিন্তা করার পর একটী কার্পেটের লেখা যাহা কাঁচ অভাবে বাঁধানো হয় নাই সে খানিকে ঐ রূপ অবস্থায় দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিল—সে খানিতে লেখা এই :—

ওহে বিশ্বদেব তুমি বিশ্বপতি
(তব) পদে চিরদিন থাকে যেন মতি।

খুব ভোরে সূর্য্যোদয়ের—পূর্ব্বেই বাসন্তি একাকী তার শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—যাবার সময়কার দৃশ্য দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। কিন্তু হায় এ দৃশ্য দেখিবার মত তখন কেউই ছিলো না—মানুষ, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত ও তখন গভীর নিদ্রায় নিজ নিজ স্থানে রহিয়াছে বাসন্তি জানে আমার গুণ একদিন প্রকাশ পাইবেই।

পরিতোষ মণ্ডল ও তাহার স্ত্রী সকালে শয্যা ত্যাগ করার পর দেখে যে তাহার পুত্রবধূ ঘরে নাই তখনই তাহারা চিন্তা করিয়া লইল—একাকী সে তাহার বাপের বাড়ী গিয়াছে—; যাক্ আপদের শান্তি হয়েছে। বিশ্বনাথও সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া দেখে যে তার স্ত্রী নাই ;—হঠাৎ যেন বিশ্বনাথের মুখে বিষাদের চিহ্ন আসিল—অন্তরের বেদনায় সে কাঁদিতে লাগিল—বিশ্বনাথের মা গিয়ে তার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—"বাবা বিশ্ব তুমি কেঁদোনা ওমন লক্ষীছাড়ী বৌ গেছে—এতে তোমার ও আমাদের মঙ্গল—সাতদিন মধ্যে তোমার বিয়ের ঠিক ক'রে ফেল্‌ছি—তুমি বাবা ও বৌ এর নাম মুখে ও এনেনা—দেখবে সাত দিনের মধ্যে এমন বৌ আন্‌বো এনে আমরা চিরদিন সুখে সংসার করবো।

দৈবক্রমে পরিতোষ মণ্ডলের ইষ্টদেব অর্থাৎ যাকে ব'লে দীক্ষাগুরু সেদিন ঐ গ্রাম দিয়া অন্য কোন গ্রামে যাচ্ছিলেন,—শিষ্যের বাড়ীতে এইরূপ অশান্তির খবর লোক মুখে শুনিতে পাইয়া গুরুদেব পরিতোষ মণ্ডলের বাড়ীতে আসিলেন—গুরুদেব বাড়ীতে আসা মাত্র পরিতোষ মণ্ডল ও তাহার স্ত্রী সব কিছু ঘটনা গুরুদেবকে বলিল—গুরুদেব বলিলেন—আচ্ছা মা, বৌমা কি লিখেছে—একবার আমায় দেখাও দেখি;—বৌমার বাবার আমার শিষ্য আর তাহারা কিন্তু বৌমার খুব প্রশংসা করে—

এই কথা বলার সঙ্গে তারা গুরুদেব কে ডেকে নিয়ে গুরুদেব কে দেখালেন—; গুরুদেব চশমা খানি চোখে লাগাইয়া বৌমার লেখাটী পড়িয়াই একেবারে হতভম্ব হইলেন কি ভাষায় যে তাঁর শিষ্যকে উত্তর দিবেন তার ভাষা তিনি পাচ্ছিলেন না অনেক ক্ষণ নী ব থাকার পর বলিলেন সর্ব্বনাশ কি মুর্খ তোমার ঘরের লক্ষীকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিলে, তোমাদের মত এত এত মূর্খ্য যে আজকাল কার যুগে হ'তে পারে এ আমার ধারণার বাহিরে। তোমাদের কে শিষ্য ব'লে পরিচয় দিতে মন আমার লজ্জা হবে—তোমরা নিতান্ত পাপী তাই সোনার লক্ষী কুলবধুকে পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে! সে কার্পেটে লিখলো—এই বিশ্ব সংসার বা দুনিয়া যদি কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যায় আমি কিন্তু আমার নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য ঠিক ভাবে ব'সে থাক্‌ব তার সরল অর্থ এই বিশ্ব সংসারের যত কিছু ঘটনা বা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হউক না কেন আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য বিচলিত হবনা—সেটাকে তোমরা বুঝলে বিশ্ব যদি চ'লে কাঁদিতে কাঁদিতে যামে তোমর বিশ্বনাথ কাঁদতে কাঁদতেযাবে আর সে ঘরে ব'সে থাক্‌বে হায়রে মূর্খ হায়রে হতভাগা শিষ্য তোমরা! আর কি ওমন শিক্ষিতা বৌ তোমাদের কপালে আস্‌বে-এ রাখালের হাতে শালগ্রামের মরণ! মুর্খের ঘরে শিক্ষার কোন মান মর্য্যাদা থাকেনা যাক্‌ আর দেরী না ক'রে আমার আদেশ পালন করবার যদি ইচ্ছা হয়-এই মাত্র গিয়া বৌমাকে নিয়ে এস নতুবা তোমাদের ঘরে জল গ্রহণ আমি করবনা-গুরুদেবের কথামত পরিতোষ মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে বৌমাকে আনবার জন্য যাবে এমন সময় সংবাদ এলো—তাদের বৌ-এর নশ্বর দেহ গ্রামের বাহিরে একটা পুকুরে ভাস্‌ছে।

●

অন্য একদিন

হিমাংশুবিমল দত্ত, বি, এ,

●

ছাতিম গাছের নিচে ছায়া দিনের দুপুর
প্রজাপতি-ডানা মেলে কী আশ্চর্য্য এক রংয়ের নেশায়
কল্পনার ঘাড়া বসে আশায় পেয়ালা যেতো ভরে
সুরেলা খুশির কণ্ঠ ভেসে যেতো উদাসী হাওয়ায়।
স্বপ্নের সুরমা চোখে, বুকে নিয়ে বাঁচার বিভূতি
তোমাকে বলেছি ডেকে, সাথে নেব জীবনের পথে
উজ্জ্বল সূর্যের মতো যৌবনের বলিষ্ঠ বিবৃতি
তোমার গাণের সুরে বাঁধা হ'লে শপথে।
সে এক আশ্চর্য্য দিন ; আলো ঝরা সোনালী সকাল
কে আর জানতো বলো! মুছে যাবে সময়ের স্রোতে
বৈশ্য-এ সভ্যতার দ্বারে মাথা বুকে রক্তাক্ত বৈকাল
ক্লান্ত দেহে মুছে যাবে বিস্মৃতির অন্ধকার রাতে।
এখানে যৌবন আছে জটাজুট সন্ন্যাসীর মতো
কণ্ঠে নিয়ে দিনান্তের লবনাক্ত আহত পিপাসা
কী করুন! কান্না চেপে আমিও যে ঘুরি অবিরত
মনের আকাশ ছুড়ে ব্যর্থতার অসীম কুয়াশা।
কতই সইব বলো, ছলনার বিষাক্ত বিদ্রুপ
গানের ব্যাপ্তির মাঝে শোননি কি আকুল ক্রন্দন
সময়ের অপচয়ে শোননি কি আশারা নিশ্চুপ
দু-চোখে অসীম জ্বালা, বজ্র হ'ল দুরন্ত যৌবন।

●

ভোরের আলো

সারথি ভাইয়ের চিঠি

ছোট বন্ধুরা আমার।

অনেক দিন থেকে তোমাদের আসরে আমার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকবে। সেজন্য ভাল করে তোমাদের সাথে মিলতে পারিনি। গল্পবলা বা গল্প শোনা শুধু শিশুদের কেন সকলেরই সাধারণ ধর্ম। সৃষ্টির আদিম ঊষা থেকে সকল দেশের মানুষের মধ্যেই এই গল্প মোহের প্রবৃত্তি প্রবল। সেজন্যই তোমাদের আসরে ও মাঝে মাঝে গল্প বলি। সে গল্প কেবলমাত্র রূপকথা বা পরীর দেশের নয় বা-ভূত পেত্নিও আজগুবি নয়। আমরা মানুষের গল্পই বলি। এ গল্পও মধুর ও সুন্দর। রূপকথা বা আরব্য উপন্যাসের মত সেখানে ও মনোমুগ্ধ কর, রোমাঞ্চ কর, কত ঘটনা রয়েছে। এই অবসরে আজ বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগের আমাদের মতই কয়েকজন মানুষের কথা বলবো তাঁদের কেউ সংবাদ পত্রসেবী, কেউ কবি, কেউ বা বিজ্ঞানী! হরিশ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার বড়াল, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সেই নাম। রবীন্দ্রনাথের শত বর্ষ উৎসবের কথা আমরা শুনেছি শুধু আমরা কেন সারা বিশ্ববাসী শুনেছেন। কিন্তু যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাঁরা ও বাংলা দেশের নবযুগের অন্যতম নায়ক। এঁদের ও শত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে কিন্তু সে উৎসব কোথায়? হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নাম তোমরা কেউ বা শুনে থাকবে। ১৮৬১ তে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তার পর শতবর্ষ পূর্ণ হলো। ১৮৬১, বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বছরেই নীল আন্দোলনের সাফল্য ঘটে। বৃটিশ সিংহের সংগে যুদ্ধ করে সেদিন বাংলার নীল চাষীরা জয়লাভ করেছেন। সেই নীল আন্দোলনের যিনি নায়ক ছিলেন—তিনি "হিন্দু পেট্রিয়টের" সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়। অগ্নিবর্ষী লেখনী চালনা করে তিনি দিনের পর দিন' হিন্দু পেট্রিয়টের' কলেবর পূর্ণ করতে থাকেন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনার কথা সেদিন কেউ ভাবতেই পারেনি। সিপাহী যুদ্ধের পর "নীল বিদ্রোহই ছিল সাধারণ মানুষের প্রথম সংগ্রাম। সে ইতিহাসে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয়। আজ তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কথা বারে বারে মনে পড়ছে।

আবার মনে পড়ছে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্মৃতি স্বতন্ত্র প্রবণ কবি অক্ষয় বড়াল। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কবিবিহারীলালের শিষ্য। হয়ত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি কিছু বড় ছিলেন। রবীন্দ্রযুগ—যে যুগে কোন কবি শিল্পীই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন নি-সেকালে অক্ষয় বড়াল স্বতন্ত্র প্রবণ কবি। বাংলার কাব্য লক্ষ্মীকে তিনি এক অপূর্ব কল্যাণশ্রী দান করেন। বাংলার গার্হস্থ্য প্রেম-তাঁর কবিতা রাজিতে এক অপূর্ব বাণীভঙ্গিলাভ করে। প্রেম-প্রকৃতি-প্রীতি তাঁর হাতে এক অপূর্ব কলা শিল্পে মণ্ডিত হয়। ১৩৬৬র বঙ্গাব্দে সেই কবিজীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আমরাও তাঁর কথা একবার ও ভাবিনি—অথচ আমাদের উচিত ছিল অনেক আগেই তাঁর কথা চিন্তা করা। তবু তাঁর, প্রদীপ, শঙ্খ, ভুল, কনকাঞ্জলি, এরা চিরকালের জন্য বেঁচে রইল। বাংলা ভাষার মত সেগুলির ও মৃত্যু নেই।

বিজ্ঞান চর্চা আমাদের দেশে কম ছিলনা। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার কথা যাঁরা জানতে চেয়েছেন তাঁরাই সে কথা জানেন। তবু ইংরেজ আমলের ভারত-বর্ষে বাংলা দেশে নতুন করে বিজ্ঞান চর্চা হয়েছিল। বাঙালীর বিজ্ঞান প্রতিভা সাগর পাড়ের দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাধানাথ শিকদারের কথা আমরা জানি। জানি জগদীশচন্দ্রের কথা। তাঁর জীবনের শতবর্ষ উৎসব কিছুকাল আগে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রফুল্ল চন্দ্রের নাম আমরা হয়ত বা কেউ জানি। কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালকে আমরা ভাল করে চিনি। সে আমাদের নিত্য প্রয়োজন মেটায়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র তার প্রতিষ্ঠাতা। একালের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়ণ বিজ্ঞানী। তিনি এবং দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চার ইতিহাস প্রণয়ণ করেন। রসায়ণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক কিছু আবিষ্কার করেন প্রফুল্লচন্দ্র। আজকালের অধিকাংশ কৃতি বিজ্ঞানীই তাঁর ছাত্র। তিনি সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক। এ বছরের ২রা আগষ্ট তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী হচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই স্বতঃস্ফূর্ততা। এই তিন বাঙালী মহাজনের গল্প তোমাদের বল্লাম। আশাকরি তোমরা আরও বেশী করে জানবে।

—সারথি ভাই

নামটা মনে নেই

শ্রীমাধব দত্ত

উপস্থিত ভট্চায্যি মশায়ের মেজাজটা বেশ সুবিধের নেই। না থাকারই কারণ, যদিও কারণটা ঘটেছে তুচ্ছ কারণে এবং ততোধিক অকারণে। কারণ যত যৎসামান্যই হোক্; ইতিমধ্যে তার 'ব্রণ' আকারটা ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছে। আজ তো ভট্চায্যি মশায়ের ইচ্ছে হচ্ছে—সন্ন্যাসী হন। ঘর সংসার, মোহ-মায়া ত্যাগ করেন।

তুচ্ছ কারণ এবং ততোধিক অকারণের সারমর্ম হচ্ছে,—ভট্চায্যি মশায়ের ছেলে শ্রীরত্ন বইয়ের দোকান করেন। ফুটবলের সরঞ্জাম ছাড়া ছেলেদের আরও কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষও মজুত থাকে। মাঝে মাঝে ভট্চায্যি মশাই ছেলের অনুপস্থিতিতে দোকানে গিয়ে বসেন। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ তিনি খদ্দের-দের সঙ্গে সুমিষ্ট এবং ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন না। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে, এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কয়েকদিন আগে 'ভটচায্য-মশাই' প্রহসন পর্য্যায়ের একটি নাটিকা বার হয়েছে। স্থানীয় স্কুলের ছেলেরা সরস্বতী পূজাপলক্ষে উক্ত বই খানি মঞ্চস্থ করবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলো। স্কুলেরই ছেলে (অনুমানে জানা গেল)। কিন্তু ভটচায্যি মশাইয়ের নিকট অপরিচিত সুতরাং নিঃসন্দেহে আগন্তুক। ছেলেটিকে দোকানে উঠতে দেখে গলা খাঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,কি চায় হে ছোকরা

আচ্ছা, 'ভটচায্য মশাইয়ের' দাম কত ?

ভট্টাচায্যি মশাই তো রেগেই আগুন।—এ্যাঁ ছেলেটা বলে কি—তার দাম মানে তার মূল্য ? হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হলো—কি বললে হে ছোকরা—

শাঠি সৎ ব্যবহারের প্রচেষ্টা অক্ষম এবং ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মর্মাহত হলেন। কারণ, ছেলেটি তার উগ্রমূর্তি দেখে পূর্বেই অদৃশ্য হয়েছে।

কিন্তু ভট্চায্যি মশায়ের প্রত্যুত্তরে জবাব—খদ্দেরদের সঙ্গে সুমিষ্ট ব্যবহার করলে নিজেকে নীচ, হীন এবং দীন প্রতিপন্ন করা হয় এবং খদ্দেরদের সঙ্গে উচিত ব্যবহার করলে ব্যবসায়ের মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় অতএব তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।

ছেলের অনুপস্থিতিতে আজকেও ভট্চায্যি মশাই দোকানে বসে সদ্য আসা পঞ্চাশ খানা বই ফর্দের সঙ্গে মিল করছিলেন। অর্ধেকের ও বেশী মিল করে তিনি বিরাট এক হাই তুললেন। সামনের ঘড়িতে কটাক্ষপাত করতেই তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলেন একজন খদ্দের আবির্ভাব হচ্ছে। খদ্দের দোকানে উঠতেই কাজে মন সংযোগ করে মুখ না তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই ?—

আচ্ছা, ভট্চায মশাই'য়ের দাম কত ?--

ভটচাযি মশাই তো রেগেই আগুন।—এ্যাঁ—ছেলেটা বলে কি-তার দাম মানে তার মূল্য ? হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হলো—কি বলেলে হে ছোকরা—

ছোট্ট উত্তর—'বই'

মুখ তুললেন ভটচাযি মশাই, বললেন, বই বললেই তো হয়না, বইয়ের নামটাও বলতে হয় !

ভদ্রলোকটি বললেন, কিন্তু নামটা মনে নেই।

ভট্চাযি মশাই আবার কাজে পুরা মাত্রায় মন দিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট ক্রেতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে যে ?

বইটা দিন—ভদ্রলোক বললেন।

আপনি মশাই কেমনধারা ভদ্রলোক—এবার মুখ তুললেন ভট্টাচায্য মশাই।

কেন ?

আবার কেন ? আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম কি বই চাই ? আপনি বললেন, কিন্তু নামটা মনে নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার আজ্ঞে হ্যাঁ। বলি, দিস ইজ নট এ তামাসা প্লেন বাট এ রিয়্যালি বুকশপ—যান, বেরিয়ে যান।

দেখুন—

দেখবো আবার কি ?—আপনার মতো হাজার হাজার ভদ্রলোক দেখেছি।

অন্ধ হয়ে দেখেছেন, আচ্ছা নমস্কার আমি—ভদ্রলোক অগত্যা বিদায় নিলেন।

প্রতি নমস্কার করতে কিন্তু ভুললেন ভট্টচাযি্য মশাই। এ-সব ইয়ার্কি—সেরেফ ফাজলামি তৎসহ ভণ্ডামি এবং ধাসটামি। ফুলতে ফুলতে ভট্টচায্যি মশাই আবার কাজে মন দিলেন।—এঁ্যা—এ কী, ফর্দে পঁচিশ নম্বর বই এঁ্যা। দু'হাত দিয়ে চোখকে ভাল করে রগড়িয়ে পরিষ্কার করলেন ভট্টচাযি্য মশাই। চশমার কাঁচ দু'টো কাপড় দিয়ে বেশ করে ঘষলেন। নাঃ, দৃষ্টিভ্রম বা মনমত্র কোন টাই নয়। বইটা তুললেন চোখের কাছে, ধীরে সুস্থে নামটা আবার পড়লেন, কিন্তু নামটা মনে নেই।

ছেলেকে সামনে দেখেই তিনি আচমকা চমকে উঠলেন। রাঁচি যাবার ট্রেনটা শেষ হুইসেল দিল ছাড়বার জন্য।

●

রোদ্দুরের গান

মিহির দত্ত

●

শুধু রোদ্দুর,—
দিনের প্রথম গান ছড়াক রোদ্দুর
আকাশে জীবনে
হৃদয় মেলুক চোখ রোদ্দুরের পানে।
আরও রোদ্দুর
হলুদ ধানের ক্ষেতে খুশীতে নাচুক
অফুরন্ত প্রাণে,
রোদ্দুর তুলুক সুর ভরা ফসলের
পৃথিবীর কানে।
মুছে যাক যত শোক সবুজের গানে
বাসি মন তাজা হোক্
রোদ্দুর-স্নানে”

●

পরীক্ষার ফল—১৯৬১

[গত আই-এ, আই, এস-সি, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ফাইনাল, প্রি-ইউনিভারসিটি প্রভৃতি পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং বঙ্গীয় গন্ধবণিক সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে মোটেই পশ্চাৎপদ নয়। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যুৎবিভাসিত উজ্জীবন আজ আর অবিদিত নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বোর্ডের উপরিলিখিত পরীক্ষা গুলিতে বাংলাদেশের অসংখ্য গন্ধবণিক ছাত্র ছাত্রী সাফল্যলাভ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বজাতীয় পত্রিকায় আজ আর সকলেই সংবাদ প্রেরণ করেন না। ফলে আমাদের অগ্রগতির সম্যক পরিমাপ সম্ভব হয়না। যাঁরা সংবাদ পাঠিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন—তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—পর্য্যায় ক্রমে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র সাফল্য সংবাদ প্রকাশ করছি। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সাফল্য সংবাদ আজিকার গন্ধবণিক সমাজের প্রগতির পূর্ণ চিত্র নয়।]

শ্রীহারাধন দত্ত
সম্পাদক, গন্ধবণিক

স্কুল ফাইনাল

নাম	পিতার নাম	স্থান	বিভাগ
শ্রীঅলোক দত্ত	শ্রীঅমল দত্ত	বালক দত্ত লেন,	তৃতীয়
" অশোক সাধু	" অমিয় সাধু	মদন চ্যাটার্জি লেন, কলিঃ	ঐ
" অরুণ সাধু	ঐ	ঐ	ঐ
" সমীর পাল	" মানিক পাল	বেনেটোলা লেন, কলি	প্রথম
" সন্দীপ দাস	" রাধামোহন দাশ	বেলগেছিয়া, কলিঃ	তৃতীয়
কুমারী মিনতি দত্ত	শ্রীজিতেন দত্ত	বেনেটোলা লেন, কলিঃ	তৃতীয়
শ্রীরামচন্দ্র নাগ	শ্রীফটিক চন্দ্র নাগ	বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিঃ	দ্বিতীয়
শ্রীকণককান্তি সাহা	শ্রীললিত কুমার সাহা	চোরবাগান	তৃতীয়
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস	শ্রীবিপিন চন্দ্র দাস	ডাঙনা (পশ্চিম দিনাজপুর)	দ্বিতীয়
শ্রীঅরুণ কুমার নাগ	শ্রীকাশী নাথ নাগ	পটলডাঙ্গা, কলি	"
কুমারী যুথিকা নাগ	ঐ	ঐ	"
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র হালদার	শ্রীবিশ্বনাথ হালদার	নায়ান কৃষ্ণ সাহা লেন, কলিঃ	"
শ্রীসূর্য কান্ত দে	শ্রীরতন লাল দে	ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, শিবপুর	দ্বিতীয়
মীরা বণিক	ডাঃ গণেশ চন্দ্র বণিক	হাবড়া	দ্বিতীয়
শ্রীকরুণাময় দাস	শ্রীমন্মথ নাথ দাস	শিলিগুড়ী, দার্জ্জিলিং	তৃতীয়
কুমারী বীণা দাঁ	" হরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ	পটলডাঙ্গা, কলিকাতা	তৃতীয়

হায়ার সেকেণ্ডারী

নাম	পিতার নাম	স্থান	বিভাগ
দিপঙ্কর কুণ্ডু	শ্রীচণ্ডী চরণ কুণ্ডু	বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিঃ	দ্বিতীয়
কুমারী প্রতিমা লাহা	শ্রীবিশ্বনাথ লাহা	ভবানীপুর, কলিঃ	দ্বিতীয়
শ্রীমতী পুষ্প পাল		শোভাবাজার, কলিঃ	দ্বিতীয়

শ্রীপ্রদীপ দত্ত	শ্রীশিশির দত্ত	মার্কাস লেন, কলি :	দ্বিতীয়
কুমারী সুমিত্রা সাধু	৺মিহির সাধু	মদন চ্যাটার্জি লেন, কলি :	তৃতীয়
শ্রীশঙ্কর প্রসাদ দত্ত	শ্রীবিভূতি দত্ত	[illegible]টীয়া, বর্ধমান	দ্বিতীয়
শ্রীবিনয় কুমার বণিক	শ্রীবেণীমাধব বণিক	[illegible]গান, হুগলী	দ্বিতীয়
কুমারী উমা বণিক	শ্রীননীগোপাল বণিক		দ্বিতীয়
কুমারী রিনি দত্ত	„ অবনীমোহন দত্ত		দ্বিতীয়
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বণিক	শ্রীরমেন্দ্রনাথ বণিক		দ্বিতীয়
„ দীপককুমার দাশ	ডাঃ বিরেশ্বর দাশ	শিলিগুড়ি, দার্জিলিং	দ্বিতীয়
„ দেবেন্দ্রনাথ দাশ	৺তারিণীমোহন দাশ	মাসবাজার, জলপাইগুড়ি	তৃতীয়

প্রি ইউনিভারসিটি

কুমারী কণা দাস	৺ভগবান চন্দ্র দাস	জোড়পাকৈড়ী, জলপাইগুড়ী	দ্বিতীয়
শ্রীরঞ্জিৎ কুমার বণিক	লেঃ কর্ণেল হেরম্ব বণিক	কৃষ্ণনগর	তৃতীয়
শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত	শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত	চোরবাগান, কলিঃ	দ্বিতীয়

আই, এস্-সি

শ্রীতুষার সাধু	শ্রীসমর সাধু	কলিকাতা	দ্বিতীয়
„ প্রমথেশ দত্ত (বর্ধমান ইউনিভার্সিটী)		চন্দননগর	দ্বিতীয়
„ মদনমোহন দত্ত	„ গোবর্দ্ধন দত্ত	শিবপুর	তৃতীয়
শ্রীপ্রশান্ত কুমার চন্দ্র (বারাণসী হিন্দু ইউনির্ভাসিটি হইতে বাংলায় লেটারসহ নবম স্থান অধিকারী)			প্রথম

আই, কম্

শ্রীসঞ্জীব সাধু	শ্রীসুবোধ সাধু	চোরবাগান	দ্বিতীয়
প্রবীর কুমার বণিক	„ প্রবোধ চন্দ্র বণিক	কৃষ্ণনগর	প্রথম
গীতা বণিক	শ্রীগঙ্গাধর বণিক	দোমহানী, জলপাইগুড়ি	তৃতীয়

শারদীয় সংখ্যা, গন্ধবণিক

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও গন্ধবণিকের শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে। একোচত্বারিংশৎ বৎসরের প্রাচীন 'গন্ধবণিক' পত্রিকা বাংলার সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। আগামী মহালয়ার দিন 'গন্ধবণিকের' শোভন শারদীয় সংখ্যাখানি প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যা খানিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বজাতীয় প্রবীন ও তরুণ লেখক লেখিকাগণের সঙ্গে বাংলা দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিকের রচনা স্থান লাভ করবে। স্বজাতীয় লেখক লেখিকাগণের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁদের সর্বপ্রকার রচনা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছায়। স্বজাতীয় লেখক লেখিকাগণ প্রতিবৎসরের ন্যায় এবৎসরেও আমাদিগকে সাহায্য করবেন এ আমরা বিশ্বাস করি। এ সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপিত করা হবে।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা
সম্পাদক, গন্ধবণিক
C/o নাগ আর্ট প্রেস
৬৭।১।১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলি-৯

অন্যতর সম্পাদক
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু
১৫।৭.৬১

নতুন ধাঁধা
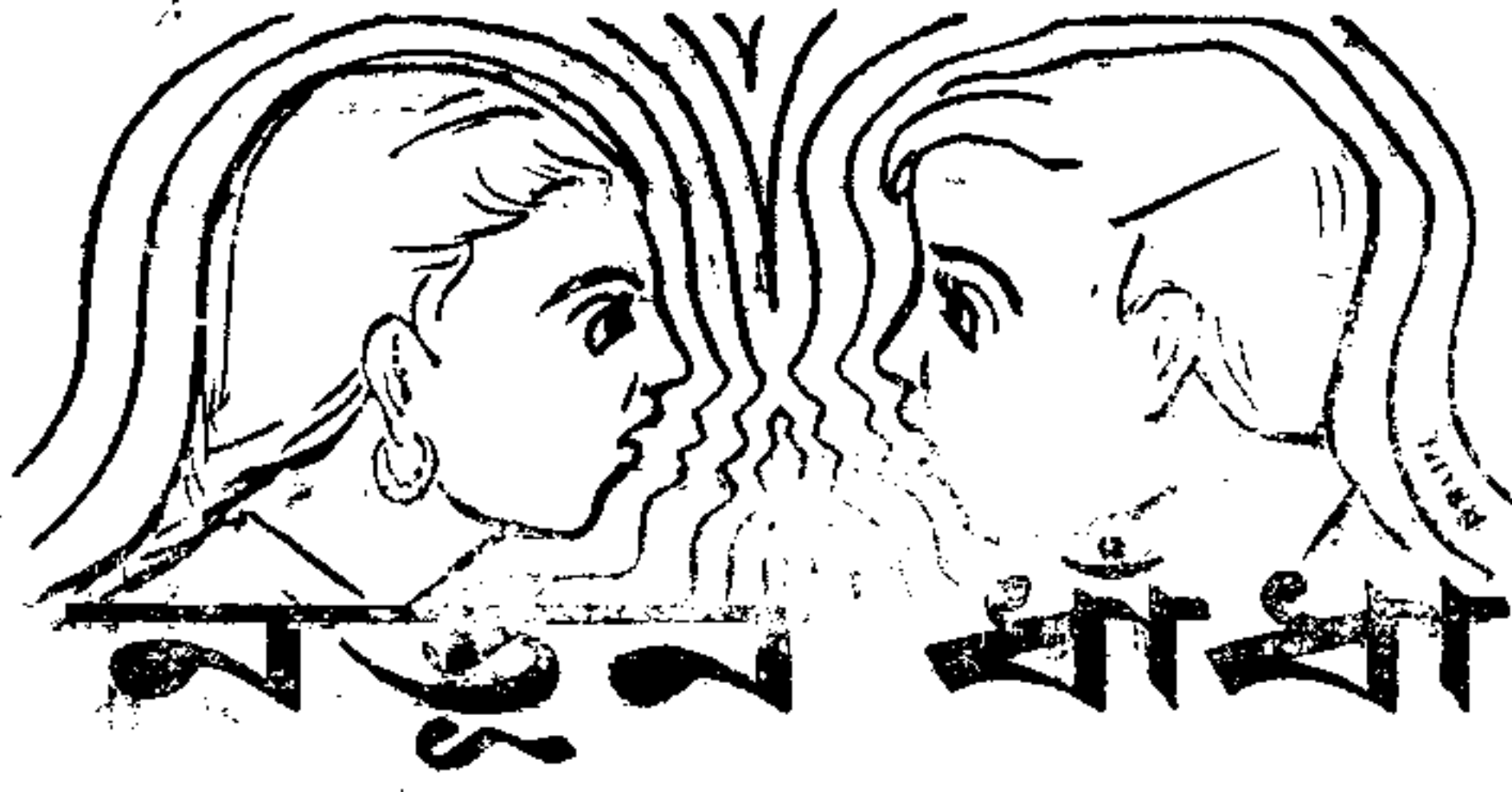
১। লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, নলিয়াপুর, বর্ধমান।

প্রসাধনে ব্যবহৃত নাম তিন বর্ণে,
মাখে নাত্তা' মাথা, মুখে পড়ে নাতা' কর্ণে
তরল পদার্থ তাহা রঙ ভালো বটে
হাতেতে লাগিলে দাদা সহজে না ওঠে।
প্রথম দু'টি বর্ণ মাঠে বাস করে,
ভা'য়ে ভা'য়ে ভাগ হ'লে তা'র সংখ্যা বাড়ে।
শেষ দু'বর্ণ ভাই ওঠে মাটি ফুড়ে
বড় বড় বিটপীর ঝুঁটি কসে ধরে।
প্রথম তৃতীয় বর্ণে সুমধুর ফল
বর্ষায় পাকে তাহা, বীজ একদল।
তৃতীয় দ্বিতীয় বর্ণে হেন ফল হয়
বৃক্ষ শিরে জন্ম তা'র মিষ্ট রসময়।
"ধুপ" করে শব্দ হয় পড়িলে ধরায়
কি বা ওই দ্রব্য তাহা বল গো আমায়।

২। বীথিদি, রীতা দি, প্রদীপ, জয়শ্রী দত্ত, কলিকাতা।

চারটি মেয়ে আর তা'দের চারজনের চারটি ভাইদের মধ্যে ৩২ টা আম ভাগাভাগি হলো। এইভাবে হলো যে লীলা-১টা নীলা—২টা, বীণা-২টা ও সীতা ৪টা আম। পেল। অমল ঘোষ পেলো তা'র বোনেয় সমান সংখ্যা আম। বিনয় ঘোষ পেলো ত'ার বোনের দ্বিগুণ। অনিল রায় পেলো তা'র বোনের তিন গুণ। অজিত সেন বোনের চতুর্গুণ। এই হিসাব থেকে বোলতে পার কি পেলো ত'ার ভাইয়েরা কে কটা আম পেলে আর বোলে দেবই বা কার কি পদবী?

—:•:—

৩। অসিমা দি, কলিকাতা—

ছয় অক্ষর বিশিষ্ট এমন একজন মহিলার নাম করো; যা'র প্রথম দু' অক্ষরে খাদ্য বস্তুর নাম, তৃতীয় অক্ষরে যে কোন অস্ত্রের নাম, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষরে পাঁচালী রচয়িতার নাম হয়। আচ্ছা এবার বলতো নামটা কি?

—:০:—

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর :—

১। ৪—৩০ মিনিট—
২। পরের দিন বা ১৮ দিনে।
৩। VI I লিখতে হবে।
৪। টাকার দশ পণ

—:•:—

গত মাসের ধাঁধার উত্তর দাতার নাম :—

১। লক্ষ্মীনারায়ণ সেন,। অসিমা দি

—:•:—

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

ভাই বোনেরা আমার,

পূজো তো এসে গেল। তোমরা প্রত্যহ সারাদিনের কাজের পর যেটুকু ফুরসৎ পাবে সেই সময়টুকু অযথা ব্যায় না করে বিচিত্র ধরণের মন রাঙান মন যাচান ধাঁধা তৈরীর কাজে উঠে পড়ে লেগে পড়ো। আমার বিশ্বাস তোমারা এই আবদার টুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না। ভালবাসা নিও।

C/o নাগ আর্ট প্রেস — কুমারী বসুমতী দি, (বি এ)
৬৭।১।১ হ্যারিসান রোড
কলিকাতা-৯

Gandhabanik Mahasava

FREE SEAT in the Chhatrabas for the session 1961-62.

FIRSTLIST

In the Seat Selection Sub-Committee meeting held on 5. 8. 61 the following applicants have been granted. Applicants with asterisks against their names are hereby instructed to see the undersigned for regularisation of their application forms.

		Name	District	Course
	1.	Sri Sauker Prosad Dutt (New)	Burdwan	B. Sc (3yr. Degree Course)
	2.	Sri Dhirendra Nath Ball (New)	Santal Parganas	Do
**	3.	Sri Ashoke Dutta (Old)	Midnapore	B.Com (2nd yr) 3 yr Deg Co
	4.	Sri Dwijendra Nath Ball (Old)	Santal Pargs.	B. Sc (3rd yr)
**	5.	Sri Naba Krishna Mullik (New)	Midnapore	Do Do
**	6.	Sri Gagan Behari Chand (New)	Bankura	B. Com(3rd yr)
**	7,	Sri Santi Narayan Sadhu (Old)	Burdwan	B, A (3rd yr)
**	8.	Sri Dilip Kumar Datta (Old)	Burdwan)	B. Sc (4th yr)
**	9.	Sri Amiya Ratan Bid (Old)	Bankura)	Do Do
**	10.	Sri Sasanka Sekhar Dutt (Old)	Hooghly	B. Com 4th yr)
**	11.	Sri Narayandas Dutta (New)	Burdwan	B. A (4th yr)
**	12,	Sri Sham Sundar Banik (Old)	Tripura	A. M. I. E. (2nd yr)
**	13.	Sri Tushar Kanti Sinha ,,	Midnapore	M.B.B.S. (2nd yr.)
**	14.	,, Bisnu Pado Halder ,,	Hooghly	Do (Final yr.)
**	15.	,, Gobinda Dutta ,,	Burdwan	C.A. (1st yr.)
	16.	,, Haridas Dey ,,	Hooghly	Do (2nd yr.)
	17.	,, Dilip Kumar Banik ,,	Cooch Behar	M.Com. (6th yr.) L.B.(3rd yr.)
**	18.	,, Nikhil Krishna De ,,	Bankuria	M.Sc. (6th yr.)

for Gandhabanik Mahasabha

Debnarayan Datt

Secretary

শুভ বিবাহ

শোভাবাজার বেনেটোলা নিবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় স্বর্গীয় অতুল কৃষ্ণ দাঁ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জগন্নাথ দাঁ-র সহিত কলিকাতা জোড়াসাঁকো হাল সাকিম বরাহনগর টবিন রোড নিবাসী উক্ত গোত্রীয় শ্রী কালিচরণ দাঁ-র দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অপর্ণার শুভ পরিণয় বিগত ২৪ শে আষাঢ় রবিবার শ্রীভূপতি মোহন পালের হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাটিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষ সমগোত্র হইলেও তাহাদের মধ্যে সপ্তপুরুষ ব্যবধান থাকায় পুরোহিতগণের সম্মতিক্রমে এবং স্বজাতি আত্মীয় গণের উপস্থিতিতে এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে।

এই বিবাহোপলক্ষে পাত্রপক্ষ গন্ধেশ্বরী সেবা ভাণ্ডারে দুই টাকা প্রণামী দিয়াছেন। আমরা নব-দম্পতির দীর্ঘায়ু ও সুখময় জীবন কামনা করিতেছি।

গন্ধবণিক পাত্র আবশ্যক

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, ষোড়শ বর্ষীয়া পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। পাত্রী সর্বপ্রকার গৃহকর্ম ও সূচিশিল্পে নিপুণা। শিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রই কাম্য। যোগাযোগের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্রালাপ করুন।

শ্রীগোবিন্দ লাল বণিক
টুল রুম সেক্সন্
অর্ডনান্স ফ্যাক্টরী অম্বরনাথ
পোঃ অম্বর নাথ। বোম্বে।

গন্ধবণিক সূচীপত্র

শ্রাবণ—১৩৬৮

গ্রাহকগণের প্রতি

গত আষাঢ় সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যে সকল গ্রাহক তাঁহাদের দেয় বার্ষিক চাঁদা এখনও পাঠান নাই আগামী ভাদ্র সংখ্যা তাঁহাদের ভিঃ, পিঃ, যোগে পাঠান হইবে। ভিঃ, পিঃ-তে ৩'৬২ নয়া পয়সা খরচ পড়িবে। আশা করি কেহ ভিঃ, পিঃ ফেরৎ দিয়া জাতীয় পত্রিকার ক্ষতি করিবেন না। পাকিস্তানের যেসকল গ্রাহক এখনও টাকা পাঠান নাই তাঁহাদের ভাদ্র মাস হইতে পত্রিকা আর পাঠান হইবে না।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা
C/o নাগ আর্ট প্রেস
৬৭।১।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

কার্য্যাধ্যক্ষ "গন্ধবণিক"

গন্ধবণিক মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা	ভাদ্র
৮ম সংখ্যা	নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	১৩৬৮

প্রসঙ্গ কথা

১৯৬১ সাল। বাংলা সাহিত্যও সংস্কৃতির একটা লাল তারিখ। বঙ্গ সাহিত্যের মহানায়ক রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে ভাস্বর আমাদের এই কাল। বাস্ত-বিকই বাংলা সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষাতে যে রত্নরাজি তিনি দান করেছেন তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্ব পূজিত কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব কেবল কাব্যঃঐশ্বর্যে নয়, বাংলা ভাষা আজ সকল প্রকার ভাব ও চিন্তা ধারন করতে সক্ষম। এটাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। বাংলা সাহিত্যের প্রবাহপথ ধরে অগ্রসর হলে আমরা দেখি এর জন্মলগ্ন কোন এক ধূসর অতীতে। তারপর কুল কুল ছন্দে সে প্রবাহিত হয়ে এসেছে লচাড়ী পয়ারের যুক্তপদ বন্ধে—সুরে প্লাবিত করেছে—বাংলার মাটিও মানুষকে। সেই উর্ম্মিমালা বাহিত পলিমাটি যে আমাদের মনোভূমিকে বারে বারে শ্যামল করেছিল মধ্যযুগের বংলার কাব্য সাহিত্য বিশেষ করে বাংলার বৈষ্ণব কাব্য তার প্রমাণ। কিন্তু এ ভাষাত কেবল মাত্র কবিতার ভাষা। সর্ব প্রকার ভাব প্রকাশের ভাষা এ নয়। এ ভাষার চরণে শৃঙ্খল—মুক্ত স্বাধীন এ নয়—। মানুষের সকলপ্রকার ভাব প্রকাশ এই ভাষায় সম্ভব নয়। মানুষের একটা ব্যবহারিক ও আটপৌরে ভাষার প্রয়োজন ছিল। সে ভাষা গদ্য ভাষা। সকল সাহিত্যের মত বাংলা ভাষাতেও এই গদ্যছন্দের ব্যবহার অতি আধুনিক কালের। যে গদ্য ভাষা ভিন্ন বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি কল্পনা-তীত ছিল, যার অভাবে বঙ্কিম রবীন্দ্র প্রতিভার আবির্ভাব বিলম্বিত হত। সেই গদ্য ভাষাকে যাঁরা অদ্ভুত পরিশ্রমে অধ্যবসায়ে একটা প্রাথমিক রূপ দান করেছিলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী। একথাও স্মরণীয় উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগারণ যাঁদের প্রচেষ্টায় প্রকাশ বেদনায় অভিভূত হয়েছিল—তাদের প্রায় সকলেই পাশ্চাত্ত দেশের মানুষ। মনে পড়ে উইলিয়ম জন্স, চার্লস উইলকিন্স, কোলব্রুক, আলেকজাণ্ডার সোমা, জেমস প্রিন্সেপ, জোশুয়া মার্শম্যান, ও মণিয়ার প্রভৃতি অবিস্মরণীয় নাম গুলিকে। এই একই সারিতে উইলিয়মকেরী, ও

ফেলিক্স কেরীর নাম জুটো বসাতে ইচ্ছা করে। এরা সকলেই ভারত সাধক ও ভারত বন্ধু। উনবিংশ শতকের সগ্য আবির্ভাবের তোরণ দ্বারে যখন বাংলা গদ্যের সূতিকা গৃহখানি অতি সতর্কতার সংগে রচিত হচ্ছিল সেই লগ্নেই ভারতবন্ধু উইলিয়মকেরী তার রক্ষণাবেক্ষন ও লালন পালনের অতি কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য বাংলা সাহিত্য ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের দরবারে কেরী এই অবিস্মরণীয় নাম যুগ যুগ ধরে বিরাজ করবে। এ নাম মুছে যাবার নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে বাংলা গদ্যের জড়তা দূর হয়নি একথা সত্য, আবার কেরী প্রমুখ মিশনারীদের চেষ্টায় যে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচিত হয় একথা ও সত্য নয়।—কারন ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই পোর্তুগীজ পাদ্রীগণ দু খানি ধর্ম পুস্তক বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এছাড়া 'দোম আন্তানিওর, 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথালিক সংবাদ" এবং পোর্তুগীজ পাদ্রী মনোয়েল দা-আস-সুম্প সাম এর কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, প্রাচীন গদ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের নানা প্রকার দলিল দস্তাবেজ চিঠিপত্র, শূণ্যপুরাণ, চৈতন রূপ প্রাপ্তি এবং বহু সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচনায় বাংলা গদ্যের ভ্রূনাবস্থা দেখা গিয়েছিল। তবু সেই কালেই 'কেরীর' মত মহামনস্বী ভারতবন্ধুর প্রয়োজন হয়েছিল। বাংলা ভাষার গদ্য নির্মানের ক্ষেত্রে তাঁর বহু মূল্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ইতিহাস যদি সেকালেই না পেতাম তাহলে এত সহজেই বাঙালী সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ হত কিনা সন্দেহ। এই ১৯৬১ তে হয়ত রবীন্দ্র শত বার্ষিকী নাও প্রতিপালিত হতে পারত। গত সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথায়' আমরা ভারতবন্ধু, উইলিয়ম কেরী, সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধানিবেদনের আশা প্রকাশ করেছিলাম। সেই উইলিয়ম কেরী কি কারণে আমাদের নমস্য আজ রবীন্দ্র মতিলাল প্রফুল্লচন্দ্র চিহ্নিত শতবর্ষ উদযাপনের কালেই—উইলিয়ম কেরীর Bi-centary বা দ্বিশততম জন্মদিনে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের কথা বিশেষ আলোচনার যোগ্য এবং সেটাই তাঁর মহত্ব নির্দেশক। বিদেশী ইংরেজ চলে গেছে যে বেশ কিছুদিন হোল আমরা তাদের অনেক কিছুকেই আজ প্রশ্রয় দিচ্ছিনা, তবু সেই বিদেশী উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্মোৎসব তাঁর নিজের দেশের মত আমাদের দেশেও কেন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ এটাই উপলব্ধির বিষয় এবং সেই আলোচনার জন্যই এই ভূমিকা।

ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)

উইলিয়ম কেরী বাংলা গদ্যের আদি প্রবর্তকনা হলেও তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে। কেরীর হাতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যশৃঙ্খলায় মণ্ডিত হ'তে থাকে। কেরীর পূর্বে বাংলা গদ্য নিয়ে যে শৃঙ্খলাহীন প্রচেষ্টা চলেছিল সেখানে সত্যকারের বাংলা গদ্যছন্দ আবিষ্কৃত হয়নি। গীতাঞ্জলির, গলায় জয়মাল্য পড়ার প্রায় একশোবছর আগে বাংলা গদ্যে লিখিত বইয়ের সংখ্যা যখন মাত্র কয়েকটি এবং মুদ্রিত বই যখন প্রায় একটি ও নেই তখন এই বিদেশী বন্ধুই সর্ব্বপ্রথম বিশ্ব-গোচরে এনেছিলেন এই প্রাচ্যভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। ইউরোপের নরদামটনশায়ারের 'পলাস পিউরি' গ্রামে ১৭৬১-১৭ই আগষ্ট তাঁর জন্ম, অতি অখ্যাত বংশে। ১৭৯৩, ১৩ই জুন. প্রিন্সেস মারিয়া জাহাজযোগে ভারতবর্ষযাত্রা এবং ১১ই নভেম্বর কোলকাতায় উপস্থিত। ভারতবর্ষে পৌঁছানোর পূর্বে তাকে নানা কার্যে নিযুক্ত হতে দেখা গেছে। বিয়ে করেছেন তিনি, ধর্ম্মকথা প্রচার করেছেন, পৌরোহিত্যে দীক্ষিত হয়েছেন আবার এর মাঝেই ইংরাজী, ল্যাটীন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা অবসর মত শিক্ষা করেছেন। বাংলাদেশে এসেই তিনি সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন চতুর্দ্দিকে আস্তানা গড়ার চেষ্টায় তাই তাকে সপরিবারে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। অবশেষে মালদহের মদনবাটির নীল কুঠীর তথাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি কিঞ্চিৎ স্থিতি লাভ করেন। ১৭৯৪-থেকে ১৭৯৯ প্রায় ছ বছর কেরী মদনবাটীতে ছিলেন। এই

সময়ে মালদহতে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখান বসেই 'নিউ টেষ্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদ শেষ করেছিলেন। ইতি পূর্বে ১৭৮৩ সালে জনটমাস বাংলা দেশে এসেছিলেন। যে মারিয়া জাহাজে কেরী এসেছিলেন সেই জাহাজে টমাস ও ছিলেন। টমাস্, উইলাকিনস্, পঞ্চানন কর্মকার, এবং রামরাম বসুকে জানতেন। এই মারিয়া জাহাজ হতে স্ত্রী ডরোথিএবং চারটি সন্তান নিয়ে কেরী বাংলার মাটিতে পদার্পণ করলেন। ঘাটেই পরিচয় হল রামরাম বসুর সংগে। সেদিনই মাসিক ২০ টাকা বেতনে রামরাম বসু তাঁর মুন্সী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেরী বাংলা শিক্ষা করলেন টমাস ও রামরাম বসুর কাছে। এরপর কেরী ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী সপরিবারে শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছোলেন। তাঁর জীবনের পরবর্ত্তী ৩৪টিবছর এখানেই কেটেছে। তাঁর মধ্যে তিরিশটি বছর কেটেছে সগৌরবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপকের কাজে। মিশনারীর পাদ্রী হিসাবে কেরী যেদিন শ্রীরামপুরে এসে পৌঁছিলেন—বাস্তবিক পক্ষে—শ্রীরামপুর সেদিন কেবল মাত্র বাংলাদেশের নবজাগৃতির অন্যতম কেন্দ্র না হয়ে—সমগ্র ভারত তথা এশিয়া খণ্ডের মহাপীঠস্থানে পরিণত হ'ল। এই সালেই শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে কেরী প্রভৃতির চেষ্টায় ম্যাথুলিখিত সমাচারের মুদ্রণ আরম্ভ হ'ল। ২৫শে মে রামরাম বসু মিশনে যোগ দিলেন। আগষ্ট মাসে ম্যাথু লিখিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত, প্রকাশিত হ'ল। ১৮০১ খ্রীঃ, ৫ই মার্চ, নিউ টেষ্টামেণ্টের'' মুদ্রিত আকারে প্রকাশ, কথোপকথন' প্রকাশ। ১৮০১এর ৮ই এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের আহ্বানে কলেজে বাংলা অধ্যাপক পদ গ্রহণে স্বীকৃতি ; ১লা মে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত। এই সালেই কেরীর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত। রামরাম বসু রচিত 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র' কেরীর দ্বারা সংস্কৃত হয়ে প্রকাশিত। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে : বাংলা, আরবী, ফার্সী, দেবনাগরী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, চীনা প্রভৃতি ভাষায় প্রায় ২ লক্ষ ১২ হাজার বই মুদ্রিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৮০৯এ তিনি লালবাজার চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সালেই অগ্নিসংযোগের ফলে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ধ্বংস হয়। ১৮১২ খ্রীঃ কেরী কর্তৃক 'ইতিহাস মালা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ১৮১৫ হতে ১৮২৫এর মধ্যে কেরী বাংলা অভিধান খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী প্রণীত "বাংলা ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কেরীর 'বাংলা ব্যাকরণই' বাংলা ভাষার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। যদিও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন শহর হতে হ্যালহেড সাহেব কৃত বাংলা ব্যাকরণ বহুপূর্বেই প্রকাশিত হয়ে বাংলা ব্যাকরণের দিকদর্শন স্থাপন করে। কেরী একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেন। এছাড়া, উইলিয়ম কেরী একটি "ইউনিভারসাল ডিক্সনারী বা পলিগ্লট ভোকাবুলারি" রচনার উদ্যোগ করেছিলেন। সেটি আজও একটি আড়াই শত পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি হিসাবেই শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে। কেরীর নিজের হাতে লিখিত সেই অভিধানটিতে একই শব্দের ভাষায় অর্থ লিখিত আছে তেরটি ভারতীয় ভাষায় : সেই ভাষাগুলি হচ্ছে—সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠী, মৈথিলী, কাশ্মিরী, তেলেগু, কর্ণাটিক, ইত্যাদি। এমনকি কোন কোন আদি ভাষাও স্থান পেয়েছিল তাতে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই শ্রীরামপুর থেকে, সেদিন বাইবেল প্রকাশিত হয়েছিল ৪৪টি ভাষায়। এমনকি সুদূর চীনদেশ হতেও সেদিন ছাপার কাজ আসতো শ্রীরামপুরে। এমনি করে সেদিন গোটা বাংলা-দেশ কেন—এশিয়ার আধুনিক সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত

হয়েছিল শ্রীরামপুর। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রত্যুষ লগ্নে কেরীর এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য আমাদের সাহিত্যের জয়যাত্রা অব্যাহত হতে পেরেছিল—একথা স্বীকার করতে কোন কুণ্ঠা নেই। তাঁর "কথোপকথন" ও 'ইতিহাস মালায়' বাংলার চলিত ভাষারও সংকেত ছিল। আঞ্চলিক উপভাষা, কোলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নিয়ে এই গ্রন্থ দুখানিতে তদানীন্তন বাংলাদেশের অনেক কিছু আলোচিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ, 'উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে কেরীর 'কথোপকথন' ও ইতিহাসমালার' অভিনবত্ব বিচার করে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এছাড়া, তাঁর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ—ব্যাকরণ, অভিধান ও অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে পথিকৃতের অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য মণীষার অপূর্ব নিদর্শন বিরাজিত আছে।

আধুনিক বাংলাগদ্যের বনিয়াদ সেদিন এমনি করেই এক বিদেশী ভারতবন্ধুর হাতে নব অভিব্যক্তির রূপ লাভ করেছিল। সে ইতিহাস অধুনা দুর্লভ নয়—কেরী সম্পর্কে এবং ফোর্ট উইলিয়ম ও শ্রীরামপুর মিশনের কর্মাবলার কথা—বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। আমরা সে ইতিবৃত্ত এখানে উপস্থিত করতে চাই না। কিন্তু কেবলমাত্র অভিধান, ব্যাকরণ, অনুবাদ এবং মৌলিক বাংলাগদ্য গ্রন্থ রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর প্রয়াস যেমন সর্বাংগীন তেমনি ব্যাপক। বহু বাধা বিপত্তি গেছে তাঁর জীবনের উপর দিয়ে—স্ত্রী ডরোথি উন্মাদ হয়েছেন। এই প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন—দ্বিতীয় স্ত্রী শার্লেটও। একমাত্র উপযুক্ত পুত্র ফেলিক্স কেরীও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কেরী ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ করতে পারেনি। বরং আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতাকে সর্বাংগীন করার জন্য তিনি প্রাণপাত করে তাহাও মুখ্যত কেরীর প্রচেষ্টাতেই প্রচার লাভ করে। অবশ্য এ বিষয়ে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাঁর সহায়ক ছিলেন প্রথম উদ্যোগী ছিলেন মার্শম্যান—কিন্তু প্রথম ছাড়পত্রটি দিয়েছিলেন ডঃ কেরী। তাঁর অনুমতিক্রমে ১৮১৮তে প্রথম "দিগদর্শন" ও পরে "সমাচার দর্পন" প্রকাশিত হতে থাকে। এইসময়েই 'Friend of India' পত্রিকাখানিও এই শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে "দিগদর্শন" ও "সমাচার দর্পনের" ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। সেজন্যই বাংলা সাংবাদিকতার জন্যও আমরা কেরীর কাছে ঋণী।

সমাজচিন্তা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রণী দেখা গিয়েছিল। বিধবাকে পুড়িয়ে মারা, মেয়ে সন্তান হত্যা করা, কুষ্ঠ রোগীকে কবর দেওয়া সেকালে আমাদের সমাজের অন্যতম কুসংস্কার ছিল। কেরী তীব্রভাবে এইগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৮১৮ সালে Friend of Indiaর প্রথম সংখ্যাতেই তিনি এই কুসংস্কারের বিরোধিতা করে একটা রচনা প্রকাশ করেন। রথযাত্রা, চড়ক প্রভৃতি হিন্দু ধর্মোৎসবে মনুষ্য নির্যাতনের যে বর্বর রীতি প্রচারিত ছিল। Ghat murder, যা চড়ক উৎসবে নিত্য অনুষ্ঠিত হ'ত—কেরীর চোখে এগুলি কুসংস্কার বলেই প্রতিভাত হত। এবং তিনি এই সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশের নারী প্রগতির কথাও তিনি সর্বাগ্রে চিন্তা করেছিলেন। জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সহযোগে তিনি ১৮১৬ সালে একটি Pamphlet প্রচারিত করেন। "Hints relative toNative School 1816" প্রচারপত্রেই তাঁর উদার শিক্ষাচিন্তার কথা ধরা পড়ে। তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মনিযুক্ত হয়েছিলেন—কেবল তার চিন্তা করেই বিরত থাকেননি। বাংলাদেশে তখন অনেক নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সেকালের এই নূতন স্কুলসমূহের একটা মস্ত বড় সমস্যা ছিল পাঠ্য পুস্তকের ব্যাপারে। তার সমাধান কল্পে ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যত Marchioness

জন্মাষ্টমী

শ্রীসাধনধন নাগ

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানায় ধর্ম্মস্য তদাত্মনম্ সৃজাম্যহম্,
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
(শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা)।

দুর্য্যোগ সমাচ্ছন্ন এক ভাদ্র রজনীর অষ্টমী তিথিতে মথুরার কংশ কারাগারে যে দেবশিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন —সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া রাজ শক্তির অত্যাচারে নির্য্যাতিত নিপীড়িত জনক বসুদেব ও জননী দেবকীকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন—„ভয় নাই, আমি আসিয়াছি”।

তিনি আসেন যুগে যুগে অধর্ম্মের নিরসন ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে। কখনও পূর্ণ, কখনও অংশ। এই অবতার বাদের উপরই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা প্রতিষ্ঠিত। যিনি অসীম, যিনি অনন্ত, তিনিই ভগবান। এই অসীম জগতে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, বিশ্বেকে তিনি পোষণ করিতেছেন এবং তাহার আপ্যায়নেই বিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রাণ শক্তিতে সঞ্জীবিত হইতেছে। বিশ্বের দিক হইতে বিশ্বের সঙ্গে ভগবৎ শক্তির সংযোগ সম্পর্কে এই অনুভূতিই অবতার তত্ত্বের গোড়ার কথা। প্রকৃতপক্ষে অতি সূক্ষ্মভাবের দিক হইতে ভগবানের এই অবতরণ নিত্য ও সনাতন, এই লীলার শেষ নাই।

সর্ব্বাবস্থায় সকল ভাবের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব; মহাভাবকে লইয়া তাহার খেলা। যে যেভাবে চিন্তা করে সে সেই ভাবেই শক্তি লাভ করে, জীবনকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে কীর্ত্তনে, স্মরণে এবং চিন্তায় তাঁহার দিব্য লীলার সম্পর্কে যে কোন ভাবে গেলেই মানুষের মন উদার হয়। চিত্ত সম্প্রসারনশীলতা লাভ করে, প্রভূত ক্ষুদ্র যে সেও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে মাথুরার কংস কারাগারে যে দেব শিশুর আবির্ভাব ঘটে, শ্রীবৃন্দাবনে তাহার বাল্যলীলা। সেখানে গোধন চারণ, গোপ বালকগণেক সঙ্গে বিহার গোপীদের সঙ্গে কালিন্দী পুলিনতটে কুঞ্জ কুটীরে রাস-বিলাস। নিত্যধাম তাহার বৃন্দাবনভূমি। অপ্রাকৃত এই ধামে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধার নিয়ত যুগল লীলা করিতেছে। সচ্চিদানন্দময় এই গোবিন্দের সেই আনন্দ লীলার আভাসে জীব জগৎ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার অনুধ্যানে আনন্দেরস এক ভাবমূর্তি প্রকাশ পায় এবং মানুষ আনন্দময় নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিংসা দ্বেষের অতীত এই অবস্থা—এই অবস্থায় প্রেম এই মাত্র সার—জীবনে বিকার তখন থাকে না। অধ্যাত্ম, সমাজ, রাজনীতি সব জুড়িয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা গীতি ধ্বনিত হইতেছে। ভারতের অন্তরসত্ত্বা জুড়িয়া তিনি অখণ্ড-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার দিব্য লীলার রস সম্পর্কে ভারতের যুগ হইতে যুগান্তরে বহুবিধ বিঘ্ন বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া মানব ধর্ম্মের পুর্ণাভিব্যক্তির সাধনায় উজ্জীবিত হইতেছে। ভারত সব ভুলিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা সে বিস্মৃত হইতে পারে না।

আগামী ১৫ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া কৃষ্ণগীতিরই ঝঙ্কার উঠিবে। জাগিবে মহাওঁঙ্কার ধ্বনি। আমরা যেন শ্রবণ করিয়া সেই অমৃত পান করিতে পারি। তাঁহার চরণে সমগ্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সমর্থ হই, তবেই আমাদের সব ভয় কটিয়া যাইবে, সকল দুঃখের নিরসন ঘটিবে।

আর কত দূর

শ্রীমিহির দত্ত

●

আর কত দূরে নিয়ে যাবে
হে রাত্রি
কুয়াসায় আচ্ছন্ন প্রান্তরে, আর কত
দিকহারা মরুমায়া
ভোলাবে আমাকে, আলেয়ার মদে
আকণ্ঠ ভরে দিয়ে, চোখে এঁকে
অচেনা পথের সুর্মা, হে রাত্রি
কত কাল টানবে আমাকে
আশ্চর্য্য রহস্যে ঘেরা শরীরের বাঁকে॥

আমি ক্লান্ত প্রাণ বেদনার বোঝা টেনে
একটানা ধূলো ঢাকা পথে,
শালের অরণ্যে কোন
হারানো নদীর মত
বার বার ব্যর্থ হয়ে সাগর সন্ধানে
অনন্ত তৃষা শুধু তীব্রতর হয়
হৃদয় গহনে॥
বেদুইন মন তবু ছুটে যেতে চায়
শালের অরণ্য হতে তুষার চূড়ায়
আকাশ অসীম হতে
সমুদ্র সীমায়॥

হে রাত্রি আর কত কাল, আর কত
অন্ধকার নামহীন দেশ পার হয়ে,
তোমার রহস্যের দ্বার পাব খোলা—
অকস্মাৎ আলোর ধারায়,
সিক্ত হব কবে—
শেষ হবে এই পথ চলা॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত

শ্রীধীরাজ দত্ত

মাষ্টার মহাশয় একটু উপকার করবেন ? উপকারের নামে একেবারে আঁতকিয়ে উঠে কৃত্তিবাস পণ্ডিত। উপকার রূপ এই দুষ্ট গ্রহকে জীবনে কোন দিনই তিনি প্রশ্রয় দেননি। উপকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মতে মানুষের একটা মুদ্রাদোষ, একটা মনোবিকার, বিকৃত রুচির পরিচায়ক। পুরাণে নাকি তিনি পড়েছেন, উপকার যে নেয় সে যত অপরাধী, উপকার যে করে সে তার চেয়ে সহস্রগুণে বেশী অপরাধী। উপকার করে ভগবানের দরবারে তিনি অপরাধী হতে পারেন না, নরকের ভয়ত আছে। তাছাড়া উপকার কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মতে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার উপর এক চরম আঘাত। উপকার সমাজ জীবনকে নাকি পঙ্গু করে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, মানুষকে ভিক্ষা দেওয়া একটা উপকার করা। আমরা ভিক্ষা দিই বলেই তো ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্যা এত বেশী। সেই জন্য ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে প্রকাশ্য দিবালোকে ভিক্ষা দেওয়া নাকি নিষিদ্ধ। তিনি যদি রাষ্ট্র প্রধান হতেন তবে উপকার রূপ এই দুষ্ট গ্রহকে শুধু ভারতের সমাজ জীবন হতে নয় অভিধান হতে মুছে দিতেন।

এ হেন কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাছে একেবারে নিস্বার্থ উপকার আশা করে আসিনি, তাই করযোড়ে বললেন, 'পণ্ডিত মশায় একেবারে নির্জ্জলা উপকার নয়, তাতে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে।

"কি বললেন অর্থ প্রাপ্তি যোগ ? কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে পণ্ডিত মশায়এর, তবে তবে কেন ওকে উপকার এর মত নোংরা শব্দ দিয়ে কলুষিত করছেন নিংসকোচে আপনার বক্তব্য পেশ করুন এই দাসের সমীপে—"

"আমার খোকনটাকে যদি দুবেলা একটু পড়াটা দেখিয়ে দেন তবে আমারও একটু উপকার হয় আপনারও কিছু অর্থ আসে।

* * *

ছোট্ট সহর সোহাপুর। স্কুলটা আরও ছোট্ট। এই স্কুলেই হেড পণ্ডিত হয়ে এসেছেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত। নদীয়ার কোন এক অখ্যাত গ্রামে ওঁর বাড়ী। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাছে ওর যে বংশলতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে কিছু বাদসাদ দিলে সংক্ষিপ্ত সার দাঁরায় এই, হায়দ্রাবাদের নিজাম ষ্টেটের প্রধান উজির ছিলেন তার প্রপিতামহ দেওয়ান রাম নারায়ণ তর্কালঙ্কার। প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। তার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন রায় বাহাদুর দেব নারায়ণ তর্কালঙ্কার। দিল্লীতে যখন ৫মজর্জ্জ দরবার করেন তখন নাকি দেব নারায়ণ বাবুও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নিয়ে এসেছিলেন "রায় বাহাদুর খেতাবটা।

রায় বাহাদুর দেবনারায়ণ তর্কালঙ্কার ছিলেন তেজিও জাঁদরেল প্রকৃতির মানুষ তৎকালিন ইংরেজ সমাজ তাঁর ভয়ে তটস্থ ছিলেন, কোন এক নীলকুঠির বড়সাহেবকে নাকি তিনি বেমালুম হজম করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভয়ে বাঘ ও বকরি একই ঘাটে জলপান করত। এই দেবনারায়ণ বাবুর ছেলে মহারাজ প্রতাপ নারায়ণ তর্কালঙ্কার। প্রকৃত দেশ প্রেমিকের সংজ্ঞায় যতগুলো গুণ থাকা দরকার সমস্ত গুনেরই অধিকারী ছিলেন তিনি। বৃটিশ সিংহের রক্তচক্ষু তাঁকে কর্ত্তব্য পথ হতে কোন দিনই বিচ্যুত করতে পারেনি। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ এর প্রতিবাদে দেশের অপমানের বিষ নীলকণ্ঠের মত আপন কণ্ঠে ধারন করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ইংরেজ দেওয়া সম্মানের মুকুট মহারাজ উপাধি। দেশের লোক আদর করে তার নাম দিয়েছিল নীলকণ্ঠ ঠাকুর। নীলকণ্ঠ ঠাকুরই হচ্ছেন কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পিতা। পণ্ডিতের বয়স যখন ২ কিংবা তিন তখন তাঁর পিতা, রাজনীতি হতে বাসর গ্রহণ করে বিষ্ণুর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর বিপুল সম্পত্তি একটা ট্রাষ্টিবোর্ডকে দান করে এক বস্ত্রে চলে এসেছিলেন

নদীয়া। সেই হতে তাঁরা নদীয়ার অধিবাসী। পণ্ডিতের কাকা কৈলাস নারায়ণ তর্কালংকার, মাণিকতলা বোমা মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এক মাসতুত দাদা সূর্য্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিল, ইতিহাসের পাতার অন্তরালে তার স্বযত্নে রক্ষিত গোপন কাহিনী একটার পর একটা বলে যায় কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

কিন্তু ইতিহাস একথা লেখেনি—আমি বলেছিলাম্। ইতিহাস অবিচার করেছে বলেত তিনি অবলুপ্ত হতে দিতে পারেন না তাঁর বংশের এই গৌরব গাথাকে। পক্ষপাতে দুষ্ট ইতিহাসের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করবেন একদিন এই মহাসভা লোক সমক্ষে উদ্ঘাটিত হবেই। লোক মুখে প্রচারিত হয়েইত হোমারের কলমে সৃষ্টি হয়েছিল, অডিসি, আর ইলিয়াড। কাব্যে উপেক্ষিতা ছিল বলেইত আজ সতীনারী উর্ম্মিলার এত গৌরব। ইতিহাস কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মতে আষাঢ়ের পুঞ্জিভূত মেঘ। তার অন্তরালে আছে অনন্ত নীলাকাশ। সে নীলাকাশ অবলুপ্ত হবার নয়। একদিন সে প্রকাশ হবেই।

তার বংশের ইতিহাসও আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘের অন্তরালে অনন্ত নীলাকাশ—তাছাড়া যে ইতিহাস পড়েন তার সবটাই সত্য নয়, অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে বলবে কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

এটা সত্যি যে সত্য মিথ্য যাচাই করবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। ঠিক যেন পাহাড়ের নীল মিশে আছে দিগন্তের নীলে, দূর হতে কি কেউ ওদের পার্থক্য বুঝতে পারে, পারেনা যতই কাছে যাবেন ততই বুঝতে পারবেন কত লক্ষ কোটী যোজনের ব্যবধান এই দুই নীলে। ইতিহাস যতই ঘাটছি মশায় অনেক মিথ্যেই চক্ষে পড়ছে ঠিক যেন শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রেখেছে ঐতিহাসিকরা। আমার মাসতুত দাদার কাছে শুনেছি ইংরেজের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে পটাসিয়াম সাইয়ানাইড খাইনি প্রীতিলতা, আসলে এ ব্যাপারটা কি জানেন? মিশ কালো ঠোঁটের ফাঁকহতে বত্রিশটি দাঁত বের করে একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে। আমার সামনে হতে সুর সুর করে চোদ্দ অক্ষরের পয়ার কে যেন ঢেলে দিল এক দোয়াত কালী, পৃথিবীর বুক হতে মিশিয়ে গেল সে অক্ষর। কি ব্যাপার? ধরা গলায় অস্ফুষ্ট একটা বিচিত্র স্বর বেরিয়ে আসে।

আসলে প্রেমের জন্য বিষ খেয়েছিল প্রীতিলতা—সেও জানি, দেশ প্রেমের জন্যই তাঁকে তার জীবন বলি দিতে হয়েছিল মুহূর্ত্তের জন্য সত্যের ক্ষীণ আলো দেখতে পায়।

"দেশ প্রেম টেম ও সব ভুয়া মশায়, ভুয়া। আসলে আমার মাসতুত দাদার প্রেম। মাসতুত দাদা যখন বিয়ে করতে অস্বীকার করল্ ওখেল বিষ। আর ইতিহাস লিখল্ এক দেশ প্রেমিকা ইংরেজের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মঘাতনী হলেন। আপনার ছেলেটার তারিফ করতে হয় মশায়, আচ্ছা ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে, ওর মাথার তারিফ না করে পারা যায় না, জীবনে অনেক ছেলে, নিয়েই ঘাটলাম, এরকম ছেলে হাজারে একটা মেলে 'ছেলেটার ভবিষ্যৎ আরও উজ্বল হয়ে উঠে, আপনি যদি একটা কাজ করেন।'

কি কাজ? আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম। আপনার ছেলেটার যদি একটা এডুকেশন ইনসিওর করে রাখেন্ ভবিষ্যৎটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ইনসিওর এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এর কার্য্যকারণ সম্পর্কটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না তাই জিজ্ঞেস করলেম।

"উঃ আপনাদের কি করে যে বোঝাব ভেবে পাচ্ছিনে কপালে একটা করাঘাত করে কৃত্তিবাস পণ্ডিত লুই পাস্তরকে হয়ত তার টিকা আবিষ্কার এর গুনাগুণ বোঝাতে এত কষ্ট পেতে হয়নি।

"যান যান ইউরোপ আমেরিকাটা একেবারে ঘুরে আসুন-তারপর জিজ্ঞেস করবেন। এই কুপমণ্ডুকতার জন্যইত আছে আজ আমাদের এই দশা-ঠিকই বলেছে সেই কবি "নগরে নগরে জ্বলিছে দীপ মালা ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে" ভাবটা এই যেন সমগ্র ইউরোপ আমেরিকাটা সাত আটবার চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন "আপনি গিয়েছিলেন নাকি ঐ মুলুকে ?"

"কেন শোনেন নি লাইফ ইনসিওর ন্যাসানালাইজড হবার আগে আমাকেইত পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকার ঐ সম্পর্কে উচ্চ গবেষণা করতে। কৃত্তিবাস কমিশনের রিপোর্টের জোরেইত ন্যাশানালাইজড হল ই লাইফ ইনসিওরেন্স। থাকগে বেশী ককিয়ে লাভ নেই শুধু এইটুকুই জেনে রাখুন ঐ এডুকেশন ইনসিওরেই ভবিষ্যতে আমার কথায় সত্যতা প্রমান করিয়ে দেবে।"

"কিন্তু কার কাছে ইনসিওর করব ?"

"কেন আমিই ত এ অঞ্চলের স্থানীয় এজেন্ট। ওঃ আসল কথাটাই আপনাকে বলতে ভুলে যাচ্ছি, দেখি আপনার হাতটা।

কেন জিজ্ঞেস করলেন, দেখিইনা জোর করে টেনে নেন আমার হাতটা, নাকি উইনার, কিস্তিমাত, আমাকে কিন্তু ৫ পারসেণ্ট দিতে হবে তা আগে হাতেই বলে রাখছি।

কিসের পারসেণ্টেজ নেবেন আপনি ? আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করি, রেঞ্জাসের টিকিটের ফার্ষ্ট প্রাইজের, মশায় ফার্ষ্ট প্রাইজের। দেখছেন না আপনার বৃহস্পতির স্থান কত উঁচু। ভাগ্য রেখা বৃহস্পতি প্রায় স্পর্শ করতে যাচ্ছে, কিন্তু কোন অজ্ঞাত দুষ্ট গ্রহ ওকে বার বার বাধা দিচ্ছে।

চিরকালটাত কলম পিষেই কাটালাম, হটাৎ বড় লোক হবার লোভটা সামলাতে পারলাম না "তাহলে উপায়—" আমি যেন হতাশায় অভিভূত হয়ে যায়। উপায় আছে বইকি, আমার কাছে রেঞ্জার্সের টিকিট আছে কাটতে থাকুন আর দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য একটা শান্তি করুণ"

রেঞ্জার্সের টিকিট না হয় আপনার কাছে পেলাম্ কিন্তু শান্তি কাকে দিয়ে করাই।

শান্তি করানোর জন্য আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। পোটা পঞ্চাশেক টাকা যোগাড় করুন, খুব সংক্ষেপে আমিই একটু কষ্ট করে করে দেব।

তাহলে আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রও অধ্যায়ন করেছেন ? আমার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে।

কি বললেন জ্যোতিষ শাস্ত্র একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে কৃত্তিবাস পণ্ডিত। ফস করে একটা বিড়ি ধরায় সে। একেবারে খাস ববি উইলসন সাহেবের ছাত্র ছিলাম আমি, খাস জার্মান। এটা নিশ্চয়ই জানেন, জার্মানীরা পৃথিবীতে এ্যাসট্রোলজিতে শীর্ষস্থানীয়।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত একটা কাজে ঠাসা গো ডাউন। তিনি লাইফ ইন্সওরেন্স কেকাম্পানীর এজেণ্ট রেঞ্জার্সের কে, সি চ্যারিটী ফাণ্ডের টিকিট বিক্রি করেন। তিনি একজন গর্ভর্ণমেণ্ট সিভিউল্ড কণ্ট্রাক্টর। একজন বড় জ্যোতিষী, খোদ ববি উইলসন সাহেবের ছাত্র, ইলেকসনের সময় কংগ্রেসের হয়ে নির্ব্বাচনী বক্তৃতা দেন, মিউনিসিপ্যাল ইলেকস্যানে ই উ সি, সির পক্ষ হয়ে লড়েন। সর্ব্বপরি তিনি লোহাপুর প্রাইমারীর হেড টিচার। যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার এই কর্মময় জীবনে কতটুকু অবসর পান প্রাইমারী টিচার রূপে ? ফস করে একটা বিড়ি ধরাবে, পণ্ডিত একটু আড়চক্ষে ঠিক ৪৫ এ্যাঙ্গল করে তাকাবে আপনার দিকে মিসকালো ঠোঁটের ফাঁক হতে ছুড়ে দেবে একটু করে মিচকি হাসি, তারপর বলবে "কেন নামের পেছনেই ত এর অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। হয়ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবেন, হয়ত ফস করে জিজ্ঞেস করে বসবেন, কি রকম ?" কিন্তু সাবধান—ঠোঁটটাকে সজোরে দাঁতে চেপে বলবে, "আপনাদের ব্রেনে দেখছি কিছুই নেই শুধুই গোবর ঠাসা, এই সামান্য অর্থটুকু বোঝবার ক্ষমতাও আপনাদের নেই। প্রাইমারী অর্থাৎ আমরা ছুটি প্রায়ই মারি। যদি প্রায়ই ছুটি না মারব তবে এই ৬২৷৷০ টাকা বেতনে নিরম্ব উপবাস দেব।

"কিন্তু ন্যায়ত ধর্ম্মত এটাকি যুক্তি যুক্ত ?" কেন যুক্তি যুক্ত নয়, কার্লাইলস্ পড়ুন, পড়ুন ভিক্টর হুগোকে 'তারপর বলবেন আমি অন্যায় করছি বা ন্যায় করছি—সাকসেস হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য, আর এই

পিছন দুয়ারের আত্মকথা

শ্রীইন্দু পাল

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে ভাদ্রের আকাশ হ'তে,
একটি সংসারের উঠোনে।
মানুষ নেই বাইরে কোথাও,
সবাই আশ্রয় নিয়েছে ঘরের অন্ধকারে।
এমনকি খাঁচার সবুজ টিয়া—
সেও উঠেছে বারান্দার অলিন্দে।
লালচে কুকুরটা বসেছে আরাম করে
বারান্দার 'পরে
লম্বা লেজের কুণ্ডলী পাকিয়ে!
মোটা গৃহিনী মেদের লালিত্যে
ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ায়
আরামে চোখ বুজেছে।
চোখ বন্ধ করেছে খাঁচার টিয়া
শীত শীত অনুভব করে।
তার সবুজ পেলবতায় কাঁপন জেগেছে;
মসৃণ পাখা দু'টোর রূপ যেন
পেয়েছে শীতের জড়তা।
কুকুরটার চঞ্চল চোখের উপর
ভিজে পাতা
বিরক্তি নিয়ে শুয়ে আছে।
ভন্‌ভনে মাছি যতো—
উড়ছে, বসছে,
এখানে ওখানে—
সারা বারান্দাময়।

এমন সময়,
য খ ন,
বাইরে বৃষ্টি ঝঝছে ভাদ্রের আকাশ হ'তে
মানুষ যখন শুকনো অন্ধকারে আছে বসে,
যখন পাখী ঝিমোচ্ছে শুকনো ডানা মুড়ে।
আর যখন পশুও আছে নির্ভর আশ্রয়ে

তখন সেই একটি আর্দ্র মুহূর্তে
আমি আছি বাইরে দাঁড়িয়ে,
সহায় সম্বলহীন হয়ে।

বুকে ভার নিয়ে
আমি ভিজছি
আবহমান কাল ধরে,
সেই একটি আর্দ্র মুহূর্তে
যখন বাইরে বৃষ্টি ঝরছে ভাদ্রের আকাশ হ'তে।
কেরোসিনের ফাটা কাঠে,
যে কাঠ কেটেছিল গ্রীষ্মের দুপুরে,
সেই ফাটা কাঠের ফাঁকে ফাঁকে
জল জমেছে—
জল নয়,

কৃত্তিবাস পণ্ডিত

সাকসেস আসে অর্থের মধ্যে দিয়ে। যেমন ধরুন, রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন যিনি সেই ম্যাদাম কুড়ির কথায় ধরুন না, অর্থাভাবে তাঁকে এই সংকল্প প্রথম অবস্থায় একরকম ত্যাগ করতেই হয়েছিল, কলম্বাসের বেলায় ও ঐ একই প্রশ্ন যদিনা স্পেনে ওকে সাহায্য করতো, তবে পৃথিবীর লক্ষ কোটী মানুষের মিছিলে হয়ত ওকেও হারিয়ে যেতে হত, তাই ভিক্টর ও হুগো বলতেন সাকসেস ব্যাকরণ মানেনা, ইসকাইলস্ বলতেন মানুষের চোখে সাকসেসই ভগবান। আমি সেই সাকসেসই চাই। আমার পিতা নীলকণ্ঠ ঠাকুর ওরফে মহারাজ প্রতাপ নারায়ণ সেটা দান করেছেন আমি চাই তারই সমপরিমান অর্জন করতে। আমি চাই সংবিধান সংশোধন করে আবার ব্যক্তিগত উপাধি বিতরণ, পিতার পরিত্যক্ত মহারাজ উপাধি।

ভাদ্রের ধূসর আকাশ হ'তে
যে জল ঝরছে আমার বুকে—
আমার অশ্রুর সঙ্গে
সেই জল এক হয়ে গেছে।
আমার ব্যাথার অশ্রুর মূল্য নেই তাই,
তাই যে শুকোয় তখন—
যখন, ভাদ্রের আকাশ হ'তে
বৃষ্টি ঝরা আসে,
নীল নামে
আকাশের কোলে,
প্রান্ত হ'তে প্রান্তরে।
নির্জ্জন দুপুরে রোদ ওঠে ;
ভেজা উঠোন রোদ পেয়ে
হেসে ওঠে ঝলমলিয়ে।
গৃহিনী বাইরে আসে
থপ থপ করে,
ফোলা চোখে আলো দেখে সে।

বন্দী টিয়া বাইরের কাঁঠাল গাছে
খাঁচার মাঝে দোলে ;
বৃষ্টি ঝরে
টুপ টুপ করে,
মোটা মোটা মসৃন পাতা হ'তে
পাখীর লাল ঠোঁটের ওপরে।
টিয়া ঘাড় নাড়ে
গলার লাল দাগে ভাঁজ ফেলে।
কুকুরের লম্বা লেজের কুণ্ডলী ভাঙ্গে;—
লেজে দোলা নিয়ে,
গা মোড়া দিয়ে
উঠে আসে বাইরে ;
উঠোনের ভিজে নরম মাটীতে
নরম পায়ের আলপনা দিয়ে
আমার কাছে আসে সে।
তারপর, একটি মুহূর্ত্তে,
কেরোসিনের ফাটা কাঠ ডিঙ্গে

বাইরের জলে খেলা করে
ছপ ছপ শব্দ তুলে।
গৃহিনীর ডাকে
টিয়া 'নাম' করে।
কুকুরটা হঠাৎ তখন চেঁচায়
ঘেউ ঘেউ করে,
একটা প্রায় ন্যাংটো ভিখিরীর মেয়েকে দেখে।
বালি রঙের জটে তার
জলকণা জমে থাকে ;
মুক্তো বলে মনে হয় দূর থেকে।
কালো থ্যাবড়া মুখে
কান্না জাগে,—
হলদে দাঁতে চেঁচায় সে,
কেরোসিনের ফাটা কাঠের উপর
খোঁড়া পা তুলে।
এধার প্রবেশের নেই অধিকার,—

ওধার থেকে দয়া মাগে।
ভিক্ষা চায় ভিখারিনী।
ক্ষুধার্ত্ত মানবী আজ
হাহাকার করে আমার বুকের ওপর ;
অন্ন চেয়ে চেয়ে
শীর্ণ গলায় বীভৎস মরা শিরা জাগে ;
মায়া হয় মোর।
কিন্তু আমার যে কিছুই নেই—
নিঃস্ব আমি,
কি দেবো তারে ?
কি দিয়ে তারে
জানাবো আমার নীরব মনের আকুলতা,
আমার সহানুভূতি
বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ
ভিখারিনী তুলে ধরে,
আমার বুকের পরে ;
কণামাত্র করুনার পাত্রী সে,
এ পারের দয়া মাগে এতটুকু।

মেয়েটার তীক্ষ্ণ স্বরলো চীৎকারে,
গৃহিনী সাবধানে,
ছাপ ফ্যালে থপথপে
উঠোনের মাঠে।
গোল গোল সুন্দর নধর ছেলে তার
এই মাত্র বসেছে খেতে,—
হাড্ডিসার ভিখারিনীকে
এখন ভিক্ষে দিতে নেই,
ছেলের তাতে অমঙ্গল হবে।
ক্ষুধার্ত মানবী কাঁদে
দু'টী অন্ন তরে,
খায়নি সে তিনদিন ধরে।
গাল পাতে গৃহিনী—
তাতে কি? একজন পাঁজর বের করা মেয়ে
খেয়েছে কি না খেয়েছে,
প্রয়োজন নেই যা'র কোনো।
পেটের জ্বালায়,
ভজে ভিজে এসেছে ভিখারিণী
একমুটো পাবার আশায়।
যদিও,
কয়েক ঘণ্টা আগে
পেট ভরে খোকা খেয়েছে,
তবু তার এই মুহূর্ত্তে
ক্ষিদে পেতে পারে।

কিন্তু,
তিনদিন ধরে মোটে
পেটে কিছু পড়েনি যে মেয়ের তার,
এই মুহূর্ত্তে ক্ষিদে পাওয়া মহাপাপ।
ক্ষুধার্ত ভিখারিনীর লোভ
পূর্ণোদর নধর সুন্দর ছেলের
বুঝি অমঙ্গল ডাকে!
গৃহিনী অভিশাপ দেয়
ভিখারিনীর গলিত মৃত্যু কামনা করে।

সমাজের বিষাক্ত দুষ্ট যারা,
যারা নিঃস্বরিক্ত সর্ব্বহারা,
তারা—
সুস্থ সবল মানুষের কল্যান কামনায়
তরল মৃত্যুপান করুক।

দুর্ব্বলা ভিখারিনীকে একমুঠো ভিক্ষে দিলে
সমাজের সুস্থ সবল ছেলেটির অমঙ্গল হ'বে।
গৃহিনী শিউরে উঠে
অনাগত সর্ব্বনাশ অনুমান করে।
সংসারিনী তাই,
ভিখারিনী মুখের উপর
খিল দিলো তুলে।
ক্ষুধার্ত মানবী ফিরে গেলো
ক্ষুব্ধ আশা লয়ে;
তার দীর্ঘশ্বাস
আমার বুকের হাড় কেঁপে উঠে।
দুঃস্থা ভিখারিনীর কান্না আমি শুনেছি,
আমি দেখেছি সুস্থ সমাজের অনুমানুষিক
ব্যাধি।
আমার মুক্ত বুকের মাঝে,
হেরি খেলেছে জগতের 'আলোর সমাজ
পতিত মানুষের রক্ত নিয়ে।

যুগ যুগ ধরে,
তাদের রক্তের স্বাক্ষর নিয়ে
আজো আমি জেগে আছি
অহর্নিশ প্রহরী হয়ে।
আমার অন্দর মহলের আত্মীয় যারা
তাদের কোন জ্বালা নেই—
জ্বালা নেই সদর দোরের।
আমি পিছন দুয়ার—
গরীব দুঃস্থা ভিখারিনীর যত আবেদন,
সম ব্যর্থ হয় আমারই বুকে;
সমাজ সংসার বাসীর শত অভিশাপ,

সেও আমারই বুকে
নিষ্ঠুর আছাড় খায়।
আমি নির্ব্বাক নিষ্পন্দ হয়ে।
শুধু প্রহর গণি।
পিছন দুয়ার আমি—
যুগে যুগে নিয়ে যাবো বয়ে
ভিখারিনীর শত ব্যথা ;
আর—
বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষুব্ধ প্রবল বিদগ্ধ আক্ষেপ
বলে যাবো সকলের মনে মনে—
পশু আর পাখীকে
যে মানুষ অন্নদান করেছে ;
সে মানুষ ভরপেট মানুষকে দিয়েছে খেতে,
সেই মানুষের কাছে
ক্ষুধার্ত্তের মানুষ বঞ্চনা পেয়েছে।
পিছন দুয়ারে আমি—
আমার মনের অনুশোচনা জাগে ;
ইচ্ছা করে,

হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ি
সমাজ সংসার পরে ;
আর সেই ধ্বংস স্তূপে
দীনহীন ভিখারীর দল
উৎসব কলরবে মুখরিত হোক্।

আমার অনিচ্ছায়
গৃহিনী আর ভিখারীর মাঝে
ব্যবধান হয়ে আছি আমি।
আমার মৃত্যুর মাঝে
ওদের মিলন যদি হয়,
তবে আমার মৃত্যু হোক ;
আমার সে মৃত্যু আনন্দ ও সুখের।

আজ হ'তে আমি
জেগে রবো সেদিনের অপেক্ষায়
সে'দিন আমার মৃত্যু হ'বে
আর আমার মৃত্যুর আলয়
মহৎ উজ্জ্বল হ'বে
গৃহিনী ও ভিখারিনীর মাঝের অহঙ্কার

●

প্রসঙ্গ কথা (১৬৪ পৃষ্ঠার পর)

of Hastings, Mr. Bayly এবং কেরীর প্রচেষ্টাতেই "এই স্কুল বুক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এই সোসাইটিতে পরবর্ত্তী কালে অবশ্য অনেক বিদ্যোৎসাহী বঙ্গ মণীষী যোগদান করেন। ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'The Calcutta Society'-রও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ভারতের নারী প্রগতির যে জয়যাত্রা ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে—তাও এই ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে বিশেষ করে শ্রীরামপুর হতেই প্রসার লাভ করেছিল। শ্রীরামপুরেই মুখ্যত Mrs. Hannath Marshmanএর প্রচেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১১ সালে এই মিশনারীদের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ৪০টি বালিকা নিয়ে একটি বিদ্যালয় সুরু হয়। কিন্তু ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত Female Juvenile Society কর্ত্তৃক অতঃপর কলিকাতাতে ব্যাপকভাবে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর মূলেও যাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছিলেন—তাঁরাও Calcutta Baptist Female School Societyর সদস্য ছাড়া আর কেউ নয়। এই শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই অতঃপর ঢাকায় ৭টি এবং চট্টগ্রামে ৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল এবং মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৮৪ জন। এর পরে আমাদের দেশে নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তনে বেথুন, বিদ্যাসাগর, মদন মোহন বিদ্যালঙ্কারের অপূর্ব প্রয়াসের কথা আজ ইতিহাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। এইগুলি ছাড়া ডাঃ কেরী কুষ্ঠ

রোগীদের জন্য কলকাতায় কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন। ঋণভারে জর্জরিত প্রজাদের জন্য শ্রীরামপুরে তিনি একটি Savings Bank (1820) স্থাপন করেন। ভারতের কৃষি ও কৃষক সমাজ নিয়েও কেরীকে চিন্তা করতে হয়েছিল। এবিষয়ে কেরী প্রতিষ্ঠিত, "এগ্রি হর্টি কালচার" প্রতিষ্ঠানটি আজও তার নামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়েও প্রভুত গবেষণা করেছিলেন তার নিজস্ব একটা বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ছিল শ্রীরামপুরে। আজ তা আর নেই। কিন্তু এখনও আছে উদ্ভিদ বিদ্যায় "Careay Soulea" নামে একটি বিশেষ জাতের শালগাছের নাম। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিখ্যাত ডঃ রক্সবেরা কেরীর পাণ্ডিত্বকে সেদিন সম্মান জানিয়েছিলেন—শাল গাছকে তাঁর নামে নামকরন করে। ইহাই উইলিয়ম কেরীর বহু বৈচিত্র্যময় মহান-জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মাত্র। ১৮৩৪ সালে তিনি শ্রীরামপুরেই পরলোক গমন করেন।

উনবিংশ শতকের ঐ প্রত্যুষ লগ্নে একজন বিদেশী কত উপায়ে ভারতবর্ষের মঙ্গল চিন্তা করেছিলেন—তা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে আভিভূত হতে হয়। তার এই বহুমুখী কীর্ত্তি কলাপের জন্য তিনি একান্ত ভাবেই ভারত বন্ধু। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের Rebirth এর জনক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আর্থিক দুরবস্থার কালে বাংলা চর্চা বন্ধ করার জন্য যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করেন—তখন বাংলা ভাষার ত্রানকর্ত্তা উইলিয়ম কেরী কলেজ কাউনসিলকে যে পত্র লেখেন—সেখানে তিনি বলেছিলেন—

"Conivnced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken. in India, and, in point of real utility, yeilds to none. I can never persuade myself to advice a step which would place it in a degraded point of view in the College." ইহা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গৌরবলাভের যোগ্য। এ যেমন তাঁর উপলব্ধি ও অন্তদৃষ্টির পরিচয় তেমনি তাঁর অক্লান্ত সাধনার কথা চিন্তা করতে গেলে শ্রদ্ধায় অভিভূত হতে হয়। তার বাংলা ভাষা চর্চ্চার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে এম. এ. ডি, লিট মহাশয় লিখেছেন—To Carey belongs the credit of having raised the language from the debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and Permanent form of speech, capable as in the past, of becoming the refined and Comprehensive Vehicle of a great literature in the future. (History of Bengali Literature in the 19th century. C. U)

সেই ভারতসাধক, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ত্রানকর্ত্তা উইলিয়ম কেরীর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী চলেছে ইংলণ্ডের নরদামটনশায়ারে—জন্মবার্ষিকী চলছে—বাংলা দেশে। বিদেশীকে পুজা করে আজ আমরা ও গৌরবান্বিত। সেজন্যই আমাদের সংবাদ পত্রে, সভা সমিতিতে, কেরী কীর্ত্তির কথা প্রায়শ আলোচিত হচ্ছে। আমরা যে পিছয়ে নেই আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাই তার প্রমাণ। গন্ধবণিক, বাংলাদেশের একখানি লব্ধকীর্ত্তি সামাজিক পত্রিকা—আজ সেই সামাজিক পত্রিকার মুখে ও "কেরী কীর্ত্তির কথা"। দ্বিশততম জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমারা ভারতবন্ধু, ভারত সাধক, উইলিয়াম কেরীর উদ্দেশ্যে আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রীহারাধন দত্ত

ভোরের আলো

সমাজবন্ধু স্মরণে

বাদল রাত্রির অবসান হয়েছিল সেদিন। শরতের প্রসন্ন আকাশ শুভ্রতায় দিকদশ আচ্ছন্ন করেছিল। কুমুদ-কহলার প্রস্ফুটিত হয়েছিল বর্ষার সঞ্চিত জল খণ্ড গুলিতে। শারদাঞ্জলির শাহানা সুরে তখনই বংগভূমি বিলাসকলা কুতূহলে উন্মত্ত হয়েছিল। তবুও কান্না থামেনি মানুষের। গৌড় বংগের অরণ্য আদিম যুগের সেই শ্রেষ্ঠী সওদাগর ও বৈশ্য বাঙ্গালী সন্তানদের চোখে জল ঝরেছিল। বাংলার শারদ প্রসন্নতা সেদিন কেন বিরহ বিধুর হয়েছিল। ভাদ্রের প্রায় মেঘ মুক্ত আকাশের নীচে সওদাগর বৈশ্য বণিকদের ঘরে ঘরে কেন কান্নার রোল উঠেছিল! হয়ত এ কোন নক্ষত্র চ্যুতি--হয়ত বা প্রলয় আলোড়ন। কিন্তু সত্যই প্রকৃতিতে সেদিন কোন অরাজকতা ছিল না। একজন বৈশ্য গন্ধ-মহত্তম বঙ্গীয় প্রতিভার অবসান হয়েছিল। বণিক জাতির কাছে তিনি সমাজবন্ধু বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন সমাজের কাছে তিনি Great Indologist Dr. Abinash Ch. Das নামে পরিচিত। সেজন্য প্রতিভাদ্রে আমরা তাঁর কথা স্মরণ করি—স্মরণ না করে পারিনা। তিনি নব্য গন্ধবণিক সমাজের ত্রানকর্ত্তা—আবার ঋকবৈদিক ভারতের অন্যতম প্রবক্তা—এবং যশস্বী বাণী সেবক।

তখন শরতের মেঘ নির্মুক্ত আকাশ। দিনটা ছিল ২০শে ভাদ্র, (১৩৪৩) ইংরাজী ১৯৩৬ (৫ই সেপ্টেম্বর)। বঙ্গীয় গন্ধবণিক সমাজের সব্যসাচী অবিনাশচন্দ্র দাস ইহলোক ত্যাগ করলেন। নবভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বহু পূর্বেই বলেছিলেন বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতির ভবিষ্যৎ ... ইংরেজী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী ও এই একই সুরে বাংলা জাতির কর্ণকুহরে নিনাদ করেছিলেন। সমাজ বন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাস এই বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের সূর্য্যালোকিত কালেই অবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা দেশে তখন নব জাগরণের শঙ্খ বেজে উঠেছে, কাল রাত্রির অবসান ঘটছে, ধর্ম, সমাজ সাহিত্য বিজ্ঞান চিন্তায় যুগান্তর এসেছে। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহের' প্রবর্ত্তন করলেন। ধর্ম-চিন্তায় নূতনত্ব দেখালেন রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ বিজয় কৃষ্ণ, কেশব চন্দ্র, দয়ানন্দ। সাহিত্যের মরাগাঙে জোয়ার এল। অবিনাশচন্দ্র এই যুগালোকেই মুক্তিস্নান করলেন। সমাজচিন্তায় আত্মমগ্ন হলেন। সুপ্তিমগ্ন নিজ জাতির প্রতিচ্ছবি এই আলোকে দেখে তিনি নিজেই শিহরিত হ'লেন। সমগ্র বাংলা দেশে গন্ধবণিক সন্তানেরা তখন অতি কদর্য জীবন যাপন করছিল। যেন অধঃপতিত জাতি। শিক্ষা ছিলনা, বিত্ত ছিলনা, শৌর্য ছিলনা। প্রাচীন হিন্দু ভারতে, মধ্য যুগের ভারতে, যাদের অর্ণবপোত দূর দেশে, দারুচিনি লবঙ্গ লতার দেশে পাড়ি দিত। ভারতের হিন্দুগৌরব, বৌদ্ধগৌরবকে যাঁরা দিকে দিকে প্রচারিত করেছিল—যাঁরা কেবলমাত্র গন্ধদ্রব্য নয়, শিক্ষা ধর্ম ও সভ্যতার বাণিজ্য করত। তাদের এই দশা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। সেদিন সেজন্যই তাঁকে আমাদের ত্রানকর্ত্তা হিসাবে পেয়েছিলাম। নিজ জাতির বন্ধন মুক্তি ঘোচাতে তিনি বদ্ধ পরিকর হলেন। সেদিন জাতি ভুলে গিয়াছিল তাদের নিজ জাতীয় ইতিহাসকে। অবিনাশচন্দ্র বাংলা দেশের ঐ নবযুগে সেই ইতিহাস তাদের শোনালেন। ইতিহাস লিখলেন নূতন করে 'The Vaisya Caste' এই গ্রন্থের নাম আজ আর অনেকেই জানেন না। মহাসভা প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি পরে এই অগ্নু প্রেরণাতেই, শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল—দাতব্য সভার প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হয়েছিল। শিক্ষা সমিতি দুটি অবশ্য অনেক পরের সৃষ্টি। তবু এর প্রেরণা মূলে অবিনাশচন্দ্র ছিলেন। যে পত্রিকায় এই ভোরের আলো প্রচারিত হচ্ছে তাও অবিনাশচন্দ্রের সৃষ্টি। বক্তৃতা দিয়ে, লেখনী দিয়ে, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে, অর্থ সামর্থ সংগ্রহ করে, তিনি সেদিন এই মরনোন্মুখ জাতিকে প্রাণ সঞ্জীবিত করেছিলেন। আজকের গন্ধবণিক সমাজের দিকে দিকে জয়যাত্রা হয়েছে এ আমারা জানি। কিন্তু এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সেদিন তাঁকে কত প্রাণপাত প্রয়াস করতে হয়েছিল—কত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল—আজিও সেকালের যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরাই অবিনাশ চন্দ্রের সেই কঠোর তপশ্চর্য্যা ও প্রাণান্ত প্রয়াসের কথা সবিস্তারে বলতে পারবেন। তাই বলতে ইচ্ছা হয়—তিনি সমাজ সংস্কারে সেদিন বিদ্যাসাগরের ভাবশিষ্য হিসাবেই আবির্ভূত হয়ে ছিলেন যদিও তাঁর গণ্ডি ছিল ক্ষুদ্র।

অবিনাশচন্দ্রের অন্য পরিচয় তিনি বাংলা দেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বাণী সেবক। উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে তাঁর অনেকগুলি সৃষ্টি কুসুম বঙ্গীয় সাহিত্যের দরবারে নিবেদিত হয়েছিল। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি, 'স্বদেশ' ও 'সনাতনী' পত্রিকার সৃষ্টি তার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। বিশিষ্ট সংবাদিক ও স্বদেশ প্রেমিক সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গলী) নরেন্দ্রনাথ সেন (ইণ্ডিয়ানমিরর) এর কাছে তিনি শিক্ষানবিশী করেছে। বাল্যকাল হতেই তিনি বিভিন্ন ইংরাজী বাংলা সংবাদ পত্রের নিয়মিত লেখক। স্বদেশ, ও সনাতনী ছাড়া,বঙ্গীয় পঞ্চয়েৎ পত্রিকা, ও গন্ধবণিকের সম্পাদনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত, ভারতীর' তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বন্ধু রমানন্দের, সখা, প্রদীপ, প্রবাসী, Modern Review প্রভৃতি পত্রিকার জন্মলগ্ন হতেই লেখক শ্রেণীভুক্ত হয়ে-ছিলেন। Calcutta Review historical quaterly, Indian Missor প্রভৃতি পত্রিকায় তার রচনাদি শোভিত হ'ত। কত পত্রিকায় যে তিনি লিখতেন—তার সকল পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর বাংলা গ্রন্থ, সীতা, সীতা (ছোট) পলাশবন, কুমারী, অরণ্যবাস, প্রভাবতী, দুর্গারাণী,

গাথা, সুকথা, প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজিও স্মরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D উপাধি লাভ করেছিলেন, The "Rigvedic India" নামক মহামূল্য গ্রন্থ প্রনয়ন করে। এর ফলেই স্যার আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন তিনি। ফলস্বরূপ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের —"প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এখান হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন প্রায় ১৫ বৎসর পরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা কালেই The "Rigvedic Culture" নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থখানি রচনা করেন। তাঁর কীর্ত্তির কথা লিখে শেষকরা যায় না। আমাদের গন্ধবণিক সমাজ তাঁকে 'সমাজ বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের একজন বিশ্রুতকীর্ত্তি ব্যক্তি ছিলেন। আজ ভাদ্রে তাঁর তিরোধন দিবসে অতি সংক্ষেপে তার জীবন কথা এখানে পরিবেশন করা গেল। ভোরের আলোর পাঠক পাঠিকারা ইচ্ছা করলেই পুরানো গন্ধবণিকের পাতায় পাতায় সমাজ বন্ধুর কীর্তির কথা অবগত হতে পারবেন। গত মাঘের 'প্রসঙ্গ কথায়' আমাদের সম্পাদক মহাশয় অবিনাশ স্মরণে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। অবিনাশচন্দ্রকে আমরা আজিকার নব্য গন্ধবণিক সমাজের প্রবক্তা হিসাবে জানি। তাঁকে বাদ দিয়ে এই জীবন-দীপ্ত জাতির কথা ভাবা যায়না। আমাদের জাতির একজন ঋষিকল্প মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁকে স্মরণ করলে আমাদের জাতিরই কল্যান। সেই আশাতেই এই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটুকু "ভোরের আলো" বিভাগে উপস্থিত করলাম।

সারথি ভাই

দিদির ভাই

শ্রীরাঘব দত্ত,

পিওন দা, পিওন দা, নেই কি আমার চিঠি?
একদিনও যে দেয় নি চিঠি দুষ্টু ছোট দিদি।

তাইতো তোমায় শুধাই এসে নিত্যি সকাল বেলা
বন্ধ করে আমার পড়া, আমার মজার খেলা।

মাকে বলি, তিনি শুধু চুপটি করে থাকেন,
কোলে নিয়ে দিদির খাঁচার টিয়াপাখী ডাকেন।

বাবা বলেন, গেছে রিণি, অনেক অনেক দূরে
আসবে যখন ছাড়বি নাকো রইবি বুকে জুড়ে।

দাদা আমার দুষ্টু বড়—কান্না দেখে বলে
দেখ্ না চিঠি, রিণিতো প্রায় এসেছে আর চলে।

ইংরেজীতে দিদির চিঠি পড়তে আমি নারি
এবার এলে দিদির সাথে নেবো নেবোই আড়ি।

দিদির শখের পোষা কুকুর বাগান ঘরে থাকে
মনে পড়ে বড্ড বেশী কুকুর যখন ডাকে।

আমায় আর ভাল লাগেনা, ভাল লাগেনা কিছু
খুশি হতাম, যদি পেতাম, যেতে দিদির পিছু।

মারু বেহাগ

শ্রীদিলীপ কুমার দত্ত

ঢং ঢং।

হলঘরের বড় ঘড়িতে রাত দুটো ঘোষণা করত। সুব্রত আপন মনে ছড়িটা টেনে চলেছে বেহালার তার গুলার উপর, মারু বেহাগের করুণ সুর নৈশ রাত্রের আকাশে বাতাসে সৃষ্টি করেছে এক বেদনা বিধুর সুর মূর্ছনা। অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা সঞ্চিত ব্যথা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে বেহালার সুরতরঙ্গ লহরীর মধ্যে।

কিন্তু সুব্রত কি বেহালার ভিতর দিয়ে চলে গেছে আঠার বছর আগের, তার সেই অতীত জীবন স্মৃতির মধ্যে? সেই বিয়োগে ব্যথায় ভরপুর, সবেদন অনুভূতিই কি ফুটে উঠেছে তার সুরের মধ্যে তাই বুঝি বেহালার সুর এত করুণ এত মর্মন্তুদ।

আঠারো বছর আগেকার কথা। দুর্গপূজার বিজয়ার দিন। বাড়ীর প্রায় সকলেই চলে গেছে প্রতিমা নিরঞ্জনের সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যে অশ্রুবিসর্জনের জন্যে। ঘরে বসে বসে পান সাজছিল সবিতা। হঠাৎ সুব্রত কিছুটা সিঁদুর নিয়ে এসে লেপে দেয় সবিতার গালে। "ঘটের সিঁদুর দিলে মংগল হয়" বলল সুব্রত। লজ্জায় লাল হয়ে গেল সবিতার গাল দুটো। সিঁদুরের রক্তিমার সংগে মিশে সে আভা আরও ঘোর হয়ে উঠল। "ছিঃ ছিঃ কি করলে বলত" লজ্জারক্ত সবিতা বলে।

"কি আবার করলাম" সুব্রত কৈফিয়ৎ দেয়, এর মানে কি জান" বলেই সুব্রতর উত্তরের অপেক্ষা না করেই হনহন করে চলে যায় সবিতা। স্কুলপাঠ্য বালক বালিকার ছেলে মানুষী এখানেই শেষ হয়।

সুব্রতর বাবা জমিদার, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ছেলেবেলা থেকে গান বাজনার উপর সুব্রতর ঝোঁক দেখে তিনি ঐ গ্রামের ভুতনাথ বাবুর কাছে সুব্রতকে বেহালা শিখতে পাঠান। আর সুব্রত ভুতনাথ বাবুর মেয়ে সবিতাকে পায় তার বাল্যসংগীরূপে। স্বজাতীয়তার জন্যে তাদের মেলামেশাটা হয়ে উঠে আরো নিবিড়।

যখন সবিতা ও সুব্রত প্রথম বুঝতে পারল তাদের এই মেলামেশার মধ্যে আরও কিসের একটা অদৃশ্য আকর্ষন আছে, ঠিক সেই সময়ই সুব্রতকে পাঠানো হয় কলকাতায়, কোন একটা নাম করা কলেজে পড়বার জন্যে।

ফাষ্ট ইয়ারের শেষের দিকে। কলেজে কি একটা Functionএ সুব্রত বেহালা বাজাবার দায়িত্ব নিলে, ছাত্র ছাত্রীদের সমর্থক সূচক হাততালি আর কলকাকলীর মধ্যে সে বাজনা শেষ করে। পরের দিন কলেজে।

এই বেহালা বাজানোকে কেন্দ্র করেই সুব্রতর আলাপ হয়ে গেল স্বাতীর সংগে।

স্বাতী। কলিকাতার হাইকোর্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর এ্যাডভোকেটের একমাত্র দুলালী। কথায়, ভাবে ভংগীতে, চাল চলনে স্বাতী সব সময়েই তার আভিজাত্যের কথাটা প্রত্যেককে মনে করিয়ে দেয়।

কোন ইয়ারে পড়েন আপনি? স্বাতী প্রশ্ন করে সুব্রতকে "ফাষ্ট ইয়ারে।" সুব্রত উত্তর দেয়। বাঃ তাহলে আমরা ত এক ক্লাশে পড়ি। কি চমৎকার হাত আপনার বেহালায়।

নানা এমন আর কি? আপনাকে কিন্তু একদিন আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।

আচ্ছা।

এর পর থেকেই স্বাতী সুব্রত কলেজের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠতে সব জায়গাতেই ওদের একসঙ্গে পাওয়া যেতে লাগল, হতাশ প্রেমিকের দল সুব্রতর দিকে চেয়ে থাকত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। আর সবিতা?

স্বাতীর চটুলতা চাহনি, বিলোল কটাক্ষ আর মদির আবেষ্টনীর মধ্যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল সবিতার স্নিগ্ধ মুখখানা। সবিতাও সেই অদৃশ্য আকর্ষনটার কাছেই আত্ম সমার্পন করেছিল। তাই এক বৎসর কেটে যাওয়ার পরও সুব্রতর না আসার জন্য লিখল একখানা

চিঠিটা অবশ্য সুব্রতরও ওয়েষ্ট পেপার বক্সের পরিমান বৃদ্ধি করল।

সুব্রত ভুলতে লাগল সবিতাকে, ভুলে গেল তার শস্য-শ্যামলা পাড়া গাঁয়ের কথা।

সেকেণ্ড ইয়ারের প্রথমের দিকে ওদের কলেজে এল অনিমেষ। পুরাপুরি আধুনিক কেতাদুরস্ত সাজ্জা ও আচার আচরণ সুগঠিত স্বাস্থ্য; পেশীবহুলা দেহ, অনিমেষ সত্যিই সুপুরুষ। আর অদ্ভুত নিঃসংকোচ ভাবে সবার সংঙ্গে আলাপ করতে পারে। কলেজের মেয়ে মহলে উঠতো মৃদু গুঞ্জন আর দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিভিন্ন কৌশল।

ঠিক এই সময় Chemical Laboritory তে Practical Class করতে গিয়ে হঠাৎ একটা Test tube নষ্ট করে সুব্রতর মুখ মণ্ডলকে লিপ্ত করে এক মরাত্মক এ্যাসিডে।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে যতনা কষ্ট পেত তার বহুগুণ দুঃখ পেত অনিমেষ স্বাতীর মেলামেসার খবর পেয়ে। প্রথমে একদিন স্বাতী এসেছিল। জানিয়ে গেছল সহানুভূতির একটু পোষাকি স্পর্শ।

তিন মাস পরে সুব্রত বেরিয়ে এল প্রথমে সে গেল স্বাতীর কাছে। দেখল স্বাতী আর অনিমেষ দুজনে গল্প করছে। ওকে দেখে দুজনেই ভুত দেখার মত আঁতকে উঠল।

"স্বাতী একটা কথা শুনবে।" সুব্রত অনুরোধ জানায়। না—না, তুমি এক্ষুনি চলে যাও চলে যাও তোমার কোন কথা শোনার মত ধৈর্য আমার নেই। যাও চলে যাও। "স্বাতী, দুব্রত আবার ডাকে। যাবে না ব্যবস্থা করতে হবে। অনিমেষ এগিয়ে আসে। সুব্রত বেরিয়ে আসে। হোষ্টেলে এসে সে ভাবে স্বাতীর ভালবাসা। স্বাতী ত তাকে ভালবাসেনি, তার বেহালা বাজানোর তারিফ করেছে মাত্র। আর সে এগিয়ে গেছে কত দূর। আজ হঠাৎ তার মনে পড়ল সবিতাকে।

সেই দিন রাত্ত প্রায় আটটার সময় সুব্রত তাদের গ্রামে ফিরে এল। পথেই শুনল সবিতার বিয়ের কথা। সেই দিনই সবিতার বিয়ে।

বেচারী সবিতা।

দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি সুব্রতর আশায় থেকে সে এত দিন পর্য্যন্ত পিতা মাতা সমাজ সকলের সংগেই যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধক্লান্ত নিরাস সবিতা এবার তাই আর অমত করেনি। ভুতনাথ বাবু ও সুব্রতর আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে সুব্রত এগিয়ে আসে বিবাহ মণ্ডপের দিকে। আলোর আর বাদ্যের কোলাহল কিছুই তার কানে যাচ্ছেনা।

সবিতা খবর পায় সুব্রতর আগমনের। সবিতা—" সুব্রত ডাক দেয় শান্ত কণ্ঠে। কোন জবাব না দিয়ে সবিতা দ্রুত চলে যায় অন্দরের দিকে। বিস্ময় বিমূঢ় সুব্রত দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। কিছুক্ষণ পর, একটা আর্ত চীৎকারে সুব্রতর মগ্নতা কেটে যায়। সবিতা বিষ খেয়েছে।

সবিতা—সুব্রত শয্যা পার্শ্বে গিয়ে একবার ডাকল। বহুক্ষণ পর সবিতার চোখের পাতা দুটো একটু ফাঁক হল। দুটো চোখ সুব্রতর মুখের উপর পড়ল। আর তার সমস্ত শরীর যেন রুদ্ধ অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

সবিতা, সবিতা—আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলব। আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

হঠাৎ সংশেষ হয়ে গেল। অভিমানিনী চিরদিনের জন্যে চোখ বন্ধ করল।

* * *

রাত প্রায় সাড়ে তিনটা। সুব্রত এবার বুঝি থামবে। ছড়িটার গতি শ্লথ হয়ে আসে। পরাহত, ব্যর্থ, সংগীতহারা সুব্রত বেহালাটাকেই তার সমব্যথী করে নিয়েছে। মারু বেহাগের মধ্যেই বেহালা জানায় তাকে সমবেদনা সহানুভূতি।

নতুন ধাঁধা
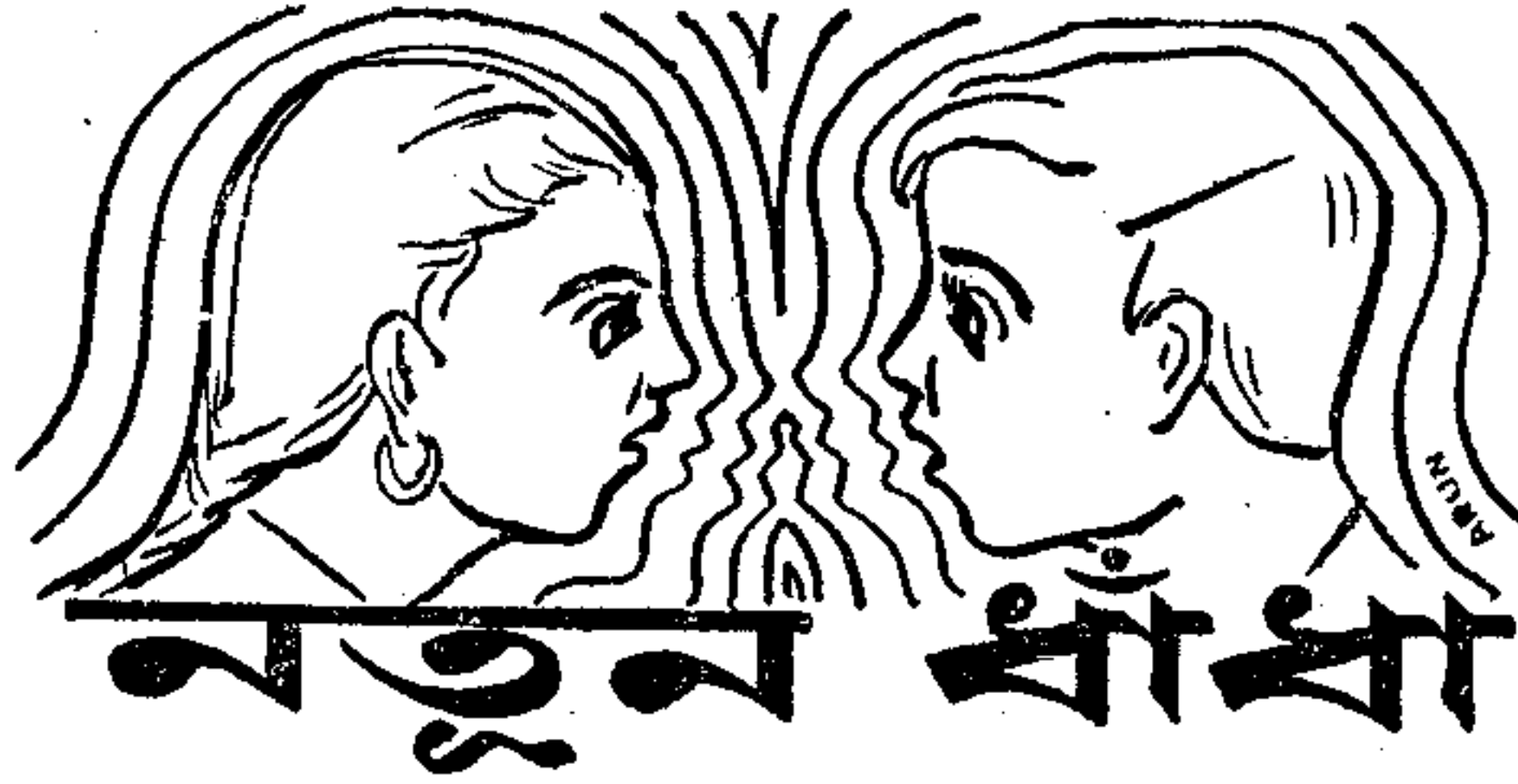
১। অসীমা দাঁ—পটলডাঙ্গা, কলিকাতা

রা	নি	ব	মি	তা	রা
কু	র	ছ	কা	ম	র
উ	স্থ	রো	মী	য়া	ট
শে	য়	ক	জ	তো	নী
য়	ং	ল	থ	আ	ন

উপরিউক্ত ছক্‌টির মধ্যে একজন বিখ্যাত মহিলা কবি, একজন লেখক, একটি নদী, একটি জন্তু, একটি প্রসিদ্ধ হ্রদ, একজন পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও একটি সুমিষ্ট ফলের নাম লুক্কায়িত রহিয়াছে, বাহির কর।

২। লক্ষ্মী নারায়ণ সেন, বর্দ্ধমান

পঞ্চবনে নাম মোর ছোট ছোট পাতা
পরদেহে থাকি আমি অতি দীন লতা
প্রথম অক্ষরে দেখি দুই অর্থ কয়
এক অর্থে বসুন্ধর, অন্যে যাহা হয়
প্রথম তিন অক্ষরে তাহারই আশ্রয়
কিবা আমি, কিবা নাম বলুন মহাশয়।

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর :—

১। আলতা

২। অমল— ৩টা, বিনয়—৮টা, অনিল—৩টা, অজিত ৮টা লীলা রায়, শীলা সেন, বীণা বোস, সীতা ঘোষ।

৩। অন্নদা সুন্দরী

গত মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম :—

প্রবীর নাগ, রত্না দে, পূর্ণিমা দাঁ, লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। সুকুমার দাস

ঘোষণা—

'নতুন ধাঁধা বিভাগের' যাবতীয় চিঠিপত্র, রচনাদি প্রভৃতি অতঃপর কুমারী বসুমতী দাঁ, বি-এ, C/o দি নাগ আর্ট প্রেস, ৬৭।১।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় অবশ্য প্রেরিতব্য।

—সম্পাদক, গন্ধবণিক

"স্মৃতি পূজায়"

শ্রীরসিকলাল দত্ত

অমর নহে ত কেউ এ বিশ্ব ভুবনে
জন্মিয়া এড়ান নাহি যায় ত মরণে।
সৌভাগ্য সম্পদ সুখ সম্মান সুখ্যাতি
চিরস্থায়ী নয় আছে এ সবের ইতি।
কর্ম করিবারে নর এসে থাকে ভবে
রাখে কীর্ত্তি জয়ী হ'য়ে জীবন আহবে।
দেহের বিনাশ হয় কীর্ত্তি সে অমর
স্মৃতি তার চিরকাল থাকয়ে ভাস্বর।
হে সমাজ বন্ধো! দেহ তব পঞ্চভূতে,
মিশে গেছে কবে তবু রয়েছ স্মৃতিতে
চির জাগরূক, কীর্ত্তি তব অবিনশ্বর
তাহারি প্রভাবে তুমি সমাজে অমর।
যাবৎ থাকিবে ভবে এ বণিক জাতি
তাবৎ উজ্জ্বল রবে তব পুণ্য স্মৃতি।
স্ব ধর্ম পালনে ধর্ম পুরুষের হয়
আদের্শে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা সদাতার রয়।

সাথে লয়ে যেতে হবে যে থাকে পিছনে,
পতিত জনারে করি প্রতিষ্ঠা জীবনে।
ঘুমন্ত সমাজ পেয়ে ও মহান বাণী
জেগে ছিল ঝেড়ে ফেলে শতাব্দীর গ্লানি।
তুমি নাই জাতি পুনঃ সুপ্তিতে মগন
তব উপদেশ কেহ করে না পালন।
স্বধর্ম পালনে ধর্ম্ম নয় কারো ব্রত
আদর্শ কর্ত্তব্য নিষ্ঠা হয়েছে বিগত।
অকূলে ভাসিছে তরী নাহি কর্ণধার
কেহ নাই অন্ধকারে পথ দেখাবার।
এমন দুর্দিন কভু আসে নাহি আগে
রক্ষঃ—তুমি জাতি আজ এ আশীষ মাগে।
তোমার আদর্শ বাণী পুনশ্চ সমাজে
সাহস সু বুদ্ধি দিক শক্তি দিক কাজে।
হে সত্রিস! স্মৃতি পূজার পুণ্য লগণে
লও সবে পুর্ণদীক্ষা—স্বধর্মাচারনে।

শুভ বিবাহ

বিগত ১১ই আষাঢ় (ইং ২৬শে, জুন, ১৯৬১) বারানসী নিবাসী স্বর্গীয় সত্য গোপাল দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তুহিনকুমার দত্তের সহিত পুরুলিয়া, মুন্সেফডাঙ্গার লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বসন্তকুমার চন্দ্র M. B, B. S, L. O. মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী অর্চ্চনার শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রীমান তুহিন কুমার Benaras Hindu University হ'তে M. Sc. পাশ করে বর্ত্তমানে Department of Atomic energy, Govt. ofIndia অধীনে কর্মরত আছেন। কল্যাণীয়া অর্চ্চনাও বি এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন। আমরা এই নবদম্পতির মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ কামনা করি। বিবাহ উপলক্ষে ডাঃ বসন্ত বিহারি চন্দ্র মহাশয় গন্ধবণিক সেবা ভাণ্ডারে ৫্

সুচীপত্র

পরীক্ষার ফল ১৯৬১

স্কুল ফাইনাল

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীদিলীপ কুমার দত্ত	৺অশ্বিনী কুমার দত্ত	কলিকাতা	তৃতীয়
প্রদ্যোৎ কুমার হালদার	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র হালদার	বেলডাঙ্গা, মুশিদাবাদ	তৃতীয়

প্রি-ইউনিভারসিটি

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীসুকুমার দে	শ্রীঅবনী কুমার দে	কলিকাতা	দ্বিতীয়
কুমারী রমা দত্ত	৺ডাঃ পঞ্চানন দত্ত	কলিকাতা	দ্বিতীয়
অরবিন্দ দাস	শ্রীকালী প্রসন্ন দাস	কলিকাতা-৯	প্রথম

আই-এ-সি

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীসমরেন্দ্র নাথ নাগ	৺গোবিন্দ সরন নাগ	কলিকাতা	প্রথম
সুকুমার দাঁ	শ্রীনিধিরাম দাঁ	কলিকাতা	ঐ

আই-এ

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীসুব্রত দত্ত	শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত	কলিকাতা	তৃতীয়
মদনমোহন দে	শ্রীদুলাল চাঁদ দে	কলিকাতা	ঐ

বি-এস-সি

নাম	পিতার নাম	সাকিম	বিভাগ
শ্রীনিখিল কুণ্ডু	৺মনীন্দ্র কুণ্ডু	বাঁটরা, হাওড়া	পাশ কোর্স

শ্রীশ্রী৺দুর্গা

আনন্দময়ীর আগমনে—

দেবীস্তুতিঃ

বিধেহী দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্রিয়ম্

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।

গন্ধবণিক

শারদীয় সংখ্যা

১৩৬৮

আবাহন

বর্ষারদাক্ষিণ্যে ছিল পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি। ভাদ্র সেই আশা বুকে নিয়ে নতনেত্রে বিদায় নিয়েছে ক্রন্দনঘন মেঘে। আশ্বিনে সে স্বপ্ন সার্থক রূপ নিয়েছে—

দেখেছিনু অশ্রুস্নাত বরষায়—ফিরে ফিরে চায়,
ধরণীর বক্ষপূর্ণ করেছে সে মিষ্ট রসধারে।
তাই ধরা অশ্রু মুছি মৃদু ভাষে দিতেছে বিদায়।

স্বপ্নের কুঁড়িগুলি ফুল হ'য়ে ফুটেছে একে একে। যা সুর ছিল তা গান হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এক টুকরো কান্নার পর এক ঝলক হাঁসি। রাত এসেছে সেতারের গুঞ্জন নিয়ে। দিনের আলো দেখা দিয়েছে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। আশ্বিনের প্রাণ প্রাচুর্য্য ফুটে উঠেছে সুরে ছন্দে গানে। এক অনাস্বাদিত সুর, ঝঙ্কার তোলে হৃদয়বীণার তারে। বাণীময় হয়ে ওঠে বাংলার মা-টি।

শ্রদ্ধানত নেত্রে মিষ্ট হাঁসি দিয়ে করি আবাহন
হে আশ্বিন ধরণীতে হোক তব শুভ আগমন।

প্রাচীন যুগে, আর্য্য ঋষি পূজিত ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে অশান্তির গ্লানি সমাজ জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করত। এমন কি অশান্তির দাবদাহে তপোবনেরও শান্ত শ্যামশ্রী বিঘ্নিত হ'ত। দানবের অত্যাচারে মানব বিপন্ন বোধ করত। প্রতিবিধান কল্পে সকলে এক জোট হ'য়ে নিদ্রিত ভগবানের ঘুম ভাঙ্গাত স্তবে, গানে, যাগে, বন্দনায়। ঐশী করুণার রুদ্ধ দ্বারে আকুল হ'য়ে মিনতি জানাত। ভেঙ্গে যেত যোগনিদ্রা। শঙ্খ চক্র-গদা। পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণু নেমে আসতেন ধরার ধূলায় অসুর নিধন কল্পে। ঐশী শক্তির কাছে আসুরিক শক্তির ঘট্‌তো পরাজয়। দিকে দিকে বেজে উঠত
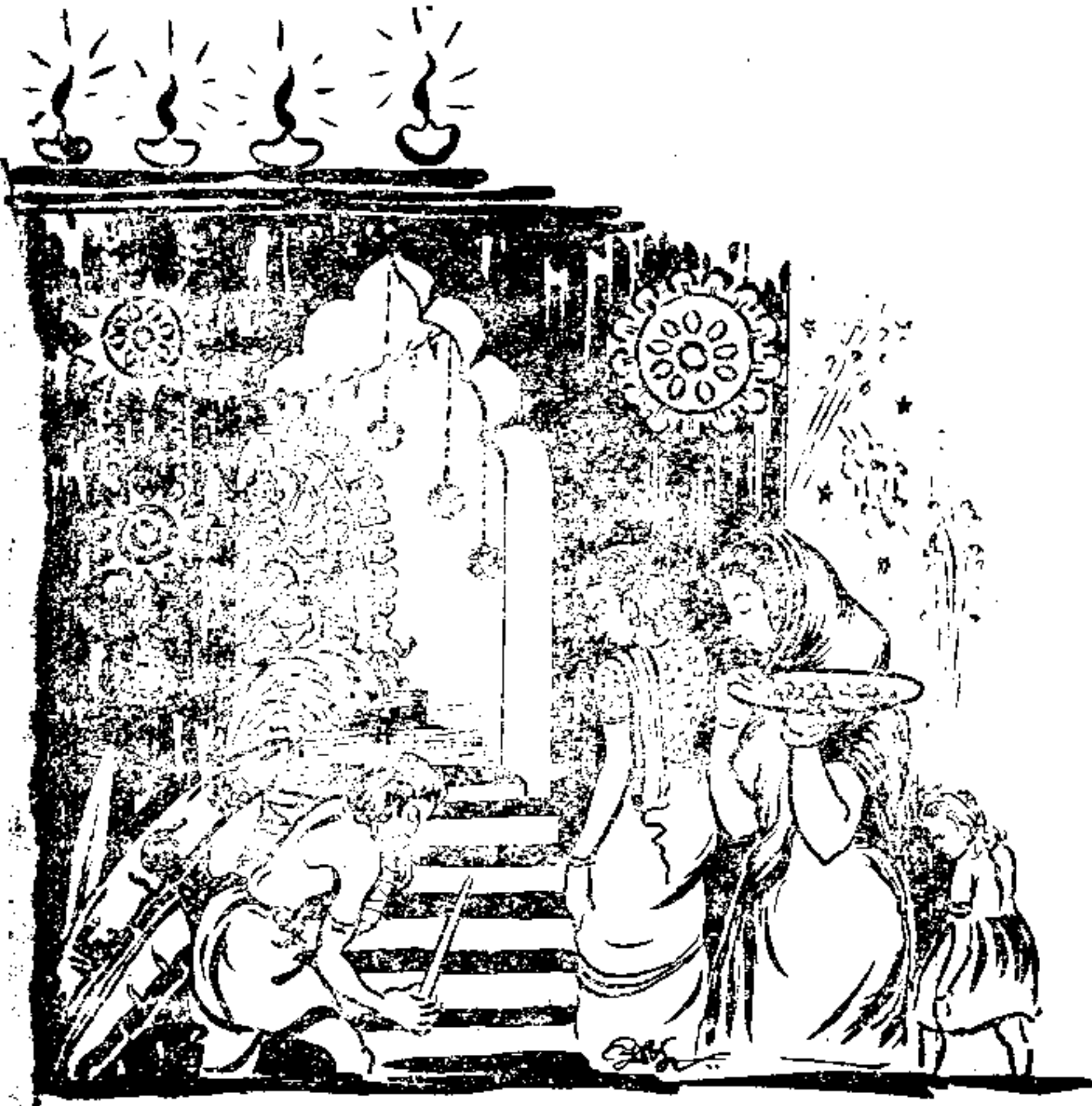
মঙ্গল শঙ্খ, মন্দিরে মন্দিরে জ্বলে উঠত আরতি দীপ, মনের অন্ধকারে ভেসে আসত আলোর জোয়ার, স্নায়ুতে স্নায়ুতে বেজে উঠত অশ্রুত রাগিনীর আলাপন, চিত্ত সব কিছু ছাড়িয়ে চলে যেত গ্লানির উর্দ্ধে, একটি পবিত্র মাধুর্য্য এসে মনকে ভরিয়ে দিত। বিপ্লবের সমাধির উপর ফুটে উঠত শান্তির অম্লান পদ্ম।

এ গেল সেকালের কথা। সেকালে একালে প্রভেদ অনেক। সেকালের মানুষ বিশ্বাস করত ঐশী শক্তিতে আর একালে সে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। তাই মানুষ হয়ে পড়েছে দুর্ব্বল, অসহায়। আজকের বাঙলার প্রতিটি মানুষের জীবন বিড়ম্বিত, দৈন্যে পৃষ্ট, রোগে শোকে মর্ম্মাহত। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, মূর্ত্তিমান হাহাকার বিরাজ করছে বাঙালীর সমাজ জীবনে। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসন্তোষের বিষবহ্নি। আশা ও প্রতীক্ষায় চলে যায় মালায় গাঁথা চলমান দিনের সারি। জপমালা আঙ্গুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে আর দিনমালা গোটা জীবনটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে; রেখে যায় স্মৃতি আনন্দ বেদনার। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর জীবনে আনন্দ বিলাস মাত্র।

অতএব এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাঁচতে হলে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। নিজেদের সকল মালিন্যের উর্দ্ধে তুলতে হবে। একযোগে ডাকতে হবে সেই শক্তিশ্বরী মহামায়াকে—বলতে হবে মাগো! যুগে যুগে তুমি রক্ষা করছ তোমার সৃষ্টিকে সকল বিপ্লব হতে। আজ এসো এসো মাগো ধর হাত, বড় অন্ধকার, লয়ে চল আলোক নির্ঝর তীরে শক্তি দাও...শান্তি দাও সন্তানে তোমার।

আশ্বিনের শুভলগ্নে বেজে উঠেছে মঙ্গল শঙ্খ। দূরাগত বানীসম ভেসে আসে আগমণী গান, দূর হতে ক্রমশ নিকটে। পূজার লগ্ন আগত। মণ্ডপে মণ্ডপে চলেছে প্রতিমা গড়ার আয়োজন। কুমার গড়ে সেই প্রতিমা অর্থের বিনিময়ে পরের মনোরঞ্জনের জন্য। মনের মাধুরী দিয়ে আত্মরঞ্জনের জন্য প্রতিমা গড়া হয় কোথায়? অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে ত্রুটি হীন প্রতিমা নির্ম্মাণ অসম্ভব। তাই প্রতিমা থেকে যায় নিষ্প্রাণ। বিন্দু বিন্দু প্রেম ও ভক্তি দিয়ে প্রতিমার মাটি সিক্ত হলে তবে তাতে প্রাণ সঞ্চার হবে—প্রতিমা কথা শুনবে। সাজ সজ্জা ও পারিপাট্য দিয়ে জাঁক জমকই প্রকাশ পায়, তাই মাটি—মাটিই থেকে যায়। সে মাটি সন্তানের অশ্রুজল সিক্ত না হলে কথা বলেনা, অভীষ্ট দেয়না, ঈষ্ট লাভ হয়ে যায় সুদূর পরাহত। একালের তপস্যা যে ভক্তিরই তপস্যা। তাই নিরাকারকে মনের মাধুরী দিয়ে, প্রেম, ভক্তদিয়ে সাকারকে রূপান্তরিত করে, আত্মীয়ের সিংহাসনে বসিয়ে, মাতৃরূপে আবাহন করি সেই চণ্ডিকাকে, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়াকে আশ্বিনের এই শুভ শারদ লগ্নে। মাগো দুর্গতি নাশিনী আমাদের সকল দুর্গতি দমন কর। ঘুচে যাক সর্ব্ব বাধা, দূর হোক রাগ, হিংসা, দ্বেষ, শান্তি বিরাজ করুক তোমার এই সুন্দর পৃথিবীতে।

"কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ
হউক নির্ম্মল, হউক, নিঃশেষ
চিত্তে হউক যত বিঘ্ন অপগত
নিত্য কল্যাণ কাজে।"

দীর্ঘ অপেক্ষার পর আবার এসেছে শরৎ তার সমস্ত মাধুর্য্য নিয়ে। শরতে পৃথিবীতে নব জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। "দিকে দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে" আগমনী সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই সুরে সুর মিলিয়ে এস আমরা বলি মাগো! অন্নপূর্ণা রূপে ভিখারী শিবকে তুমি ভিক্ষা দিয়েছ তোমার ঐশী শক্তি—ঘুচে গেছে বিশ্বের ক্ষুধা। আর দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী রূপে আমাদের মনমন্দিরে বিরাজ করে আমাদের অভয় দাও, শক্তি দাও শান্তির শ্বেত পদ্মদল মেলুক তোমার সৃজিত এই সুন্দর ভুবনে।

বন্দে মাতরম্

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু

রবীন্দ্রনাথ ও কবি জগদিন্দ্রনাথ

হারাধন দত্ত

●

রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কাল একেবারে সংক্ষিপ্ত ছিলনা। অন্যান্য বাঙালী জীবনের তুলনায় তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনে কেবল ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশ নয়, দেশ বিদেশের অগণিত মানুষের সংগ লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনের সংগে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত খ্যাত অখ্যাত মানুষের কথা আমরা নানা ভাবে লাভ করেছি, তাঁদের স্মৃতিকথা কবি নিজেই অনেক স্থানে লিখে গেছেন। তারপর পরবর্তীকালের সাহিত্যানুরাগী রবীন্দ্রানুরাগীদের সাধনার ফলে রবীন্দ্রজীবনের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবু মনে হয় রবীন্দ্র সান্নিধ্যের সকলের কথা আজও অনেক ক্ষেত্রে অলিখিত আছে। নাটোরের মহারাজা কবি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কথা স্বভাবতই এখানে মনে আসে।

নাটোরের মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র রাণী ভবানীর বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীই ছিলেন না বা নিজেকে রাজকার্য্যের খণ্ডিত গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখেননি, এটি ছিল মহারাজের জীবনের বাইরের দিক। জগদিন্দ্রনাথের আর একটি জীবন ছিল—এই জীবন তাঁর সাহিত্যিক জীবন। সাহিত্যিক জীবনে তিনি বহু পূর্ব হতেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন, তাঁকে রবীন্দ্র পূজারী ও বলা চলে। জগদিন্দ্রনাথ রাজ পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। অতিগরীব ব্রাহ্মণ তনয়ের পুত্র তিনি। তাঁর বাল্যনাম ব্রজনাথ। সেজন্যই বিপুল বিভব, অতুল মান সম্মানের মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হ'য়েও রাজা জগদিন্দ্রনাথ সেই ব্রজনাথকে কখনও ভুলতে পারেননি। নাটোর মহারাজের বহিরাবরণের অন্তরালে যে এক দীন বুভুক্ষু ব্রাহ্মণতনয় প্রতিদিন আর্ত্তনাদ করে ফিরত সে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সকলের কানে পৌঁছাত না। চরম রাজসিকতার মধ্যে লালিত হয়ে ও দীনতার প্রতি এই মমত্বের জন্যই তিনি সুধাকণ্ঠ সাহিত্যিক হয়েছিলেন। জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথ বয়সের দিক থেকে কিছু বড় ছিলেন। ১৮৬১ তে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। জগদিন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৮র অক্টোবরে। ১৮৮৬ তে জগদিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৮৮৭-৮৯ পর্যান্ত তিনি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৯তে তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটে। এর পরেই জগদিন্দ্র নাথ রাজ কার্য্যের সংগে নানা ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে সাহিত্য ও সংগীতকে তিনি যে ভাবে লালিত করেছিলেন—বৈষয়িক কার্যে জড়িত হওয়া সত্বেও সেই অনুরাগ দূরিভূত হয়নি। ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথের, "কবি কাহিনী" প্রকাশিত হয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন সুরু হয়। বঙ্গাব্দের ১২৮৩ সালের দিকে ঠাকুরবাড়ীর ছেলে মেয়েদের নায়কত্বে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জগদিন্দ্রনাথ গোড়া হতেই ভারতী'র অনুরাগী ছিলেন। প্রগতিবাদী রবীন্দ্রনাথের দলের লোকেরা ভারতী, সঞ্জীবনী, সাধনা, বালক প্রভৃতি পত্রিকা মারফত লিখতেন। অপর দিকে প্রচার, ধর্মপ্রচারক, বঙ্গবাসী, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকা অনেক সময় রবীন্দ্র বিরোধিতায় নিযুক্ত থাকতো। জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রগোষ্ঠীরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরাপুরি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি 'শ্রীঃ' বা নামের আদ্যাক্ষর যুক্ত ছদ্মনামে ভারতীতে লিখতেন। ভারতীর পুরাতন সংখ্যা গুলিতে এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীর সম্পাদক নিযুক্ত হওয়া কালীন তিনি 'ভারতী' সম্পর্কে একটি রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। জগদিন্দ্র নাথ সম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণীর' বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায়

প্রকাশিত 'ভারতী' রচনায়' ভারতীর প্রতি ঋণ স্বীকারের কথা আছে। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বংগদর্শন' প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত এই 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর অনেকগুলি কবিতা ও রচনা প্রকাশিত হয়। সেকালের সাহিত্য জগতে, প্রমথ চৌধুরী একটি অবিস্মরনীয় নাম প্রমথ চৌধুরী ঠাকুর বাড়ীর জামাতা এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাহিত্য সুহৃদ ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা "মানসী ও মর্মবানী"তে বীরবলের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিখানি জগদিন্দ্রনাথকেই লেখা। 'বীরবলের' চিঠিতে জগদিন্দ্রনাথের প্রভূত প্রশংসা আছে। এইরূপে নানাপ্রকার পরোক্ষ দিক থেকেও ঠাকুর বাড়ী ও রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রমথ চৌধুরী জগদিন্দ্রনাথ সম্পর্কে ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ, জগদিন্দ্র স্মৃতিপূজা সংখ্যায় (মানসী ও মর্মবাণী) লিখেছিলেন—"আমি যদি কৈশরে রবীন্দ্রনাথের ও যৌবনে জগদিন্দ্রনাথের আন্তরিক আনুকুল্য লাভ না করতুম তা'হলে আমি খুব সম্ভব একজন বাঙলা লেখক হয়ে উঠতুম না।" জগদিন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা মূলতঃ স্বদেশ প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই স্বদেশপ্রীতি কেবলমাত্র ভাষা ও সাহিত্য সেবার মধ্যে নিয়োজিত থাকে নি, তিনি প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯০১ সাল হতেই তিনি বাংলার যাবতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯০৪ সালে বাংলা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই সময় কলিকাতার টাউন হলে একই কালে দুটি বিরাট জনসভার সমবেশ হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উপরতলার সভাপতি ছিলেন—সেই বিরাট সভায় সর্বপ্রথম প্রতিবাদকারী বক্তা ছিলেন—কবি জগদিন্দ্রনাথ। ১৯০৪ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের Forward পত্র সেই উপলক্ষ্যে জগদিন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিল। "The one trait in his character, which appealed most to the People was his patriotism. At a time when majority of the member of the landed aris tocracy dared not come within the Precints of the Indian national Congress. the maharaja of the Natore had the courage of his convictions and joined it openly. For years he was a familiar figure on the Congress dais and took an active Part in his deliberations. As a member of the Bengal Legislative Council in the Pre-reform, he uniformly voted with the elected representatives of People. ১৯০১-১৪ সালে জগদিন্দ্রনাথ কংগ্রেসের অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। বিডন স্কোয়ারে এই সময়ে ডি, ওয়াচা সাহেবের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস হয়—জগদিন্দ্রনাথ সেখানেও অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯০৩ সালে বহরমপুরে কংফারেন্স জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। Bengal Legislative Council এ তিনি উত্তরবংগ হ'তে পর পর নির্বাচিত হন। মোট কথা দেশের রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করেন। এই স্বদেশ প্রীতির জন্যও রবীন্দ্রনাথের মত মহত্তম কবি রাজনীতির সংগে জড়িত হয়েছিলেন, লেখনীও সক্রিয় সহযোগিতার বলে তিনি সেকালের জাতীয় আন্দোলনকে অনেক খানি অগ্রগামী করে দেন। এই কাহিনী রবীন্দ্রজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন রাজনৈতিক ও স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হয়েছিলেন—সেই সময়ে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ তাঁর অতি সান্নিধ্যে ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা একযোগে কাজ করেছিলেন। ১৩২১ সালে উত্তরবংগ রাজসাহীতে যে সাহিত্য সম্মিলন হয় সে সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। এই সম্মিলনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"রাজসাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সংগে চক্রান্ত করে সভায় বাংলা ভাষা

প্রবর্তন করবার প্রথম প্রচেষ্টা যখন করি তখন উমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।" আর সেজন্যই জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী ১৭. ১. ২৬ তারিখে সবরমতী আশ্রম থেকে এই শোক লিপিটি লিখে পাঠান। I was only recently that I was privileged to come in contact with the Maharaja Bahadur of Nattore, I was much struck by his culture, reserve and simplicity. His death is a distinct loss to the nation. May the grief of the family be lightened by the consciousness of the thought it is shared by many of the Maharaja's friends and admirers.

জগদিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকা সম্পাদনা। ১৩১৫ সালের দিকে 'মানসী' পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র প্রথম দিককার 'মানসী'র সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সুবোধ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ফটিক চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিও মানসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯১৯ বা ১৯২০র দিকে 'মানসী' পত্রিকার সংগে তাঁর সংস্রব ঘটে। রাখালদাসের অনুরোধেই তিনি মানসীতে 'নূরজাহান' রচনাটি প্রকাশ করতে থাকেন। ১৩২১ সালের বৈশাখে তিনি মানসীর' পূর্ণ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে ১৩২২ সালে অমূল্যচরণ বিত্তাভূষণের সহযোগিতায় তিনি 'মর্মবাণী' নাম্নী একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—কয়েক মাস প্রকাশ করার পর 'মর্মবাণী'কে 'মানসী'র সংগে যুক্ত করে, 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে মাসিক পত্রের প্রচার করেন। অতঃপর এই 'মানসী ও মর্মবাণী'র সেবাতেই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ১৩৩২ সালের ২১শে পৌষ তারিখে জগদিন্দ্রনাথ স্বর্গা-রোহণ করেন—তাঁর মৃত্যুর পরও ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রচারিত হয়। অতঃপর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনাকালে তাঁর অন্যতম সহযোগী সম্পাদক ছিলেন—কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এই 'মানসী ও মর্মবাণী'তেই জগদিন্দ্রনাথ সেকালে এক বঙ্গীয় সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে লালন করেন। এই গোষ্ঠীর শিরোমণি ছিলেন—রবীন্দ্র নাথ। জগদিন্দ্রনাথ যেমন 'ভারতী' ও 'বংগদর্শনের' লেখক হয়েছিলেন, 'মানসী ও মর্মবাণীতে' নিয়মিত লিখে রবীন্দ্রনাথও তেমন মহারাজকে সম্মানিত করেছিলেন—এখানে তাঁরও প্রীতিরও পরিচয় আছে।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বাংলাদেশের একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথ উভয়েই এই প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। এই পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁরা জীবনপাত করেন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' তাঁদের অবদানের কথা পৃথক আলোচিতব্য। জগদিন্দ্রনাথ কেবল 'মানসী ও মর্মবাণীর' সম্পাদক ছিলেন না। তিনি বংগ ভাষা ও সাহিত্যের বরেণ্য সেবক। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—জগদিন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৩৩২ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে, ঐ বৎসরের নবম অধিবেশনে, পরিষদ কর্তৃক শোক নিবেদন করা হয়। ঐ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। ১৩৩৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার কার্যবিবরণীতে জগদিন্দ্রতর্পনের অনেক কথা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া জগদিন্দ্রনাথ সাহিত্য আন্দোলনের বহুবিধ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন। রবীন্দ্র-নাথের মহত্তম কবি প্রতিভাকে সম্মান দানের ক্ষেত্রে সাহিত্য পরিষৎ' অগ্রণী। ১৯১০ সালে বাংলা গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত হয়, পর বৎসরই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই কাল সীমার মধ্যে রবীন্দ্র-

নাথের শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বংগ ভারতীর কুঞ্জবন সুধাকণ্ঠে পরিপ্লুত করে চলেছেন—এই সময়ে ১৩১৮ ইং :৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৫০ বর্ষ পূর্তি হয়, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। তবু তাঁর মহত্তম কবি প্রতিভাকে সাহিত্য পরিষৎ ও শান্তিনিকেতন থেকে অভিনন্দিত করার ব্যবস্থা হয়। জগদিন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে সাহিত্য পরিষদের পক্ষে নায়কত্ব করেন। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথকে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে যথাযোগ্য সম্মান দানের প্রচেষ্টা করেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এই সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সারদাচরণ মিত্র মহাশয়। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিনন্দন পাঠ করেন। কলিকাতার টাউনহলে কবি সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন সাহিত্য পরিষৎ। এই সম্বর্দ্ধনা সভায় নাটোরের মহারাজা কবি জগদিন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা নবপর্যায় বংগদর্শনের মাঘ ১৩১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে উক্তি তিনি করেছিলেন —তা আজও মূল্যবান, তাঁর সেই অতি সুলিখিত অভিভাষণ হ'তে এখানে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল— "বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই যে কিশোর রবির কিরণ সম্পাতে বঙ্গ ভারতীর কবিতাকুঞ্জে যে কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। কালক্রমে সেই রবির উজ্জ্বলতেজে আজ সমগ্র ভারতভূমি উজ্জ্বলিত, সেই সাহিত্য রাজরাজেশ্বর তাঁহার মনোরত্ন শালার নিভৃত মণি প্রকোষ্ঠ হইতে নানাবিধ মাহার্ঘ্য ও অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া শিশু সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করতঃ বিশ্বসাহিত্য সমাজের নিকটে আজ তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর প্রভৃতি বিভাভরণ ভূষিত তরুণ বঙ্গসাহিত্যের রূপচ্ছটায় দশদিক যে আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা কবিবর একক তোমারই কৃতিত্বে। তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠিত মুক্তদানের ফলে। আজ তোমার বীণার অমৃত নিষ্যন্দি ঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্য কুঞ্জের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত; তোমার অনুগামিগণ তোমার সুরে গান গাহিয়া, তোমার ছন্দে কবিতা পড়িয়া, তোমারই অনুকরণে গদ্য রচনা করিয়া নিজনিজ শ্রমের সাফল্যলাভ করিতেছেন। সাহিত্য নিকুঞ্জের প্রত্যেক পত্র পুষ্পে, বল্লরী কিশলয়ে আজ তোমার সুধাময় সুর অনুরণিত রহিয়াছে।" এই অভিভাষণেই জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শতায়ু কামনা করেন। ইহা রবীন্দ্র ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে এই ভাষণে আতিশয্য দোষ অপেক্ষা সত্যেরই জয় জয়কার। জগদিন্দ্রনাথ দূর হ'তে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা সদৃশ প্রতিভাকে কেবল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি, তিনি বারে বারে এই ব্যক্তি পুরুষের অতিনিকটে এসেছেন এবং নিকট হতেই আরতি করেছেন। এর পরই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে— দেশ বিদেশে তাঁর যশো গরিমা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ পরিভ্রমণে বার হন। ইউরোপ প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন হ'ল অনেক স্থলে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনরায় রবীন্দ্র সংবর্ধনার আয়োজন করল। এই সংবর্ধনা সভাতে ও জগদিন্দ্রনাথকে অগ্রণী দেখা গেল। বঙ্গাব্দের ১৩২৮ সালে পরিষৎ আয়োজিত রবীন্দ্র সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করলেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই অনুষ্ঠানে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপস্থিত হ'তে না পারায় জগদিন্দ্রনাথের উপরই পৌরোহিত্য করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। আশ্বিন, ১৩২৮ সালের 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় 'সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্র সংবর্ধনা' শীর্ষক জগদিন্দ্রনাথের অভিভাষণটি মুদ্রিত হ'তে দেখা যায়। ইহা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অভিভাষণে জগদিন্দ্রনাথের রবীন্দ্রভক্তির গভীরতা সহজেই ধরা পড়ে। অভিভাষণের প্রথমাংশ এইরূপ। "বঙ্গদেশের যে প্রতিষ্ঠান হইতে যাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আজ এই আনন্দ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে—আমার মনে হয়— ইহার নেতৃত্বভার যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলেই উপযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে শোভিত হইত। পরিষৎ

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত থাকিতে পারিলে কোন কথাই ছিল না। শৃঙ্খলার সহিত যজ্ঞ সমাপন ভার তাঁহারই উপর থাকিত এবং এই অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা দান করিবার জন্য যাহা কিছু বক্তব্য ও কর্ত্তব্য, তাহা তিনি ও তাঁহার নির্দেশ মত অপরাপর কর্মীগণ সুসম্পন্ন করিতেন। অনিবার্য্য কারণে শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় আজ উপস্থিত থাকিতে না পারাতেই নানা বিচার বিবেচনার পরে এই অকিঞ্চনের উপরই নেতৃত্ব করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। বলাবহুল্য যে এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযোগিতা আমার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি যে আমি এই আনন্দ মহোৎসবের অনুষ্ঠাতৃগণের সম্মুখ সারিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমার কাহার অপেক্ষা ন্যূন নহে। যোগ্যতায় আমি সর্বকনিষ্ঠ হইলেও রবীন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আমাকে হার মানাইতে পারেএমনত আজিও আমার চক্ষুগোচর হয় নাই।"

জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভক্ত এবং বাংলাদেশের রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে তিনিও যে প্রধানতম এই ভাষণেই তার প্রমাণ আছে। জগদিন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে সহযোগ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, ১৩৩৩এর শ্রাবণ 'মানসী ও মর্মবাণী' সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "সম্প্রতি তিনি বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের, বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গত 'বর্ষামঙ্গলের' অভিনয়ে কবি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ যখন তাহার প্রিয় পাখোয়াজ লইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে এক চমৎকার দৃশ্য। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে সংখ্যাতীত সদনুষ্ঠানের সহিত আজীবন সংশ্লিষ্ট ছিলেন।" এইরূপে বিভিন্ন দিক থেকে জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। জগদিন্দ্রনাথ ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুশিক্ষিত ছিলেন। এছাড়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সকল অংগে তাঁর সহজ যাতায়াত ছিল। পাখোয়াজে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। রবীন্দ্রনাথের সংগে এই গভীর যোগাযোগ জগদিন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের একজন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক একথা অধুনা প্রায় বিস্মৃত। জগদিন্দ্রনাথের সন্ধ্যাতারা (১৩২৩) সেকালের কাব্য সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এছাড়াও তাঁর অনেকগুলি কবিতা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। আজও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। সাহিত্য জগতে জগদিন্দ্রনাথের অন্যতম কৃতিত্ব এই তিনি রবীন্দ্রযুগের একজন বিখ্যাত গদ্যশিল্পী ছিলেন— তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজীর ঋজুধর্মিতা গাম্ভীর্য ও ওজঃগুণ বাংলা গদ্যে সঞ্চারিত করেন। তাঁহার গদ্যকাব্য 'নূরজাহান' (১৩২৪) তার প্রমান। এছাড়া "দারার দূরদৃষ্ট" ও শ্রুতি-স্মৃতি" যা মানসী ও মর্মবাণীতে" ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল যা আজও গ্রন্থ বদ্ধ হয়নি। এগুলির মধ্যে জগদিন্দ্রনাথের প্রতিভার জলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান। সাময়িকীতে প্রকাশিত জগদিন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার সংখ্যা কম নয়। এগুলি সংগৃহীত হ'লে জগদিন্দ্রপ্রতিভার আর একটি দিক উদ্ঘাটিত হতে পারে। জগদিন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখানে সম্ভব নয়। আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর আজীবন যোগাযোগের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সুহৃদ জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর শোকসন্তপ্ত হয়েছিলেন। ১৩৩২ এর মাঘ, মানসী ও মর্মবাণীর" জগদিন্দ্রস্মৃতিপূজাসংখ্যায়, "জগদিন্দ্র বিয়োগে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা প্রকাশিত হ'তে দেখা যায়। এই রচনায় উত্তম বন্ধুবিয়োগ জনিত শোকের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের ঐ রচনার শেষাংশ এইরূপ—"যে সৌজন্য, যে বৈদগ্ধ্য, যে আত্মমর্যাদা বোধ, যে সামাজিক আত্মমর্যাদা বোধ, যে সামাজিক আত্মোৎসর্গ আমাদের দেশের প্রাচীন অভিজাত বংশীয়দের উপযুক্ত, জগদিন্দ্রনাথের তাহা অজস্রছিল,

তাহার সংগে ছিল আধুনিক যুগের শিক্ষা। জগদিন্দ্রনাথের চিত্ত বিকাশে দুইটি বিদ্যার ধারার যেখানে মিলন দেখিয়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁহার যেমন গভীর আনন্দ ছিল, ইংরাজী সাহিত্যে ছিল তার তেমনি অধিকার। এই অধিকার বাইরের শিক্ষার নয়। অন্তরের ধারণা শক্তিতে। তাঁহার চিত্তরাজ্য যাহা আমাদের মনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা পাণ্ডিত্যের উপাদানে নহে, তাহা সহজ সহৃদয়তার প্রদীপ্ত আলোকে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্ত্তি আজ আমাদের দুয়ারে উপস্থিত। জগদিন্দ্রনাথের শত পূর্ণ হ'তে এখনও বেশ কিছু বিলম্ব আছে। শুধু সেই কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের চতুস্পার্শে যারা একদিন আনন্দ গুঞ্জনে ভরিয়ে রাখত—এই শত বৎসরে তাঁদের স্মৃতি অনেকেই ভুলে গেছেন। কবি জগদিন্দ্রনাথ এমনই একজন হারিয়ে যাওয়া রবীন্দ্র সুহৃদ। আজ রবীন্দ্রজীবনের শতবর্ষে কবিকে স্মরণ করতে গিয়ে—হারিয়ে যাওয়া জগদিন্দ্রনাথকে পেলাম, সেজন্যই আজ এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁকেও আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

●●

আমার বাস্তব ঃ প্রেয়সীর ঘর

শ্রীরঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

●

রৌদ্রতপ্ত আলাধরা অন্তরঙ্গ বুক খানি আজ
বিচিত্র ভুলের সুরে গান গুলো কান্না হ'য়ে ঝরে,
গাঁথা প্রাণে অমিলের বাতাটাসে হানা দেয় দ্বারে
দাবী নাই! সে তো নাই॥ বলে প্রতি পৃথ্বীধূলি কণা

সংসারের বিচিত্র সে শান্তি মাখা লীলা নিকেতনে,—
নতুন সুরের সাথে সপ্তরঙা পক্ষীর মতন :
উড়ে গেল স্বর্ণ ডানা মেলে দিয়ে বাতাসের আগে
দীর্ঘশ্বাসে মরে কেউ, তার কিবা আসে আর যায়?

ছায়া ছায়া মায়া মুখী নিষ্ঠুরা সে ভূমিকায় হাসে
নতুন সুরের স্পর্শে ভাল লাগা হিমেলী হাওয়ায়
রান্না করা, গৃহস্থালী নবভাবে ঘর গোছানোর,—
কত কথা, কত কাজ, কলকণ্ঠি সময়ের ভীড়ে।

স্নান সেরে ভিজে চুল রৌদ্রে পিঠ এলোভাবে বসা
বেণী বাঁধা নত মুখী আয়নায় প্রতিচ্ছবি দেখা!
চিন্তা ফাঁকা অতীতের : বর্তমান সবটাই মিঠে
বিচিত্র হাওয়ার গতি মধু স্পর্শে শীত শীত লাগা।

আরেক দেহের উষ্ণে শীতটাকে কত ভালবাসো:
সময় চলচে ভাল তোমার ও আঙিনায় আজ;
হেথায় সুদীর্ঘ শ্বাস, অহরহ বিড়ম্বনা সুর,—
মৃত্যুর ইচ্ছেটা শুধু প্রতিক্ষণে আনাগোনা করে!

●●

সেকাল ও একাল

শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

প্রাকৃতিক বিধানে জগৎ নিত্যই গতিশীল। জগৎ মানেই যাহার গতি আছে, জগতের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনও গতি ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়; ইহাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন এত দ্রুত গতিতে এসেছে যে তা মানব ইতিহাসে পূর্ব্বে বোধ করি কখনো ঘটেনি। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার গুলিই এজন্য দায়ী। এই পরিবর্ত্তনের ভালো-মন্দ দুইদিকই আমরা দেখতে পাই। জড়বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে জড়প্রকৃতির উপরে আধিপত্য আমাদের অনেক বেড়ে গেছে। নানা দেশ ও জাতির মধ্যে দূরত্বও ব্যবধান অনেক পরিমানে কমেছে। এগুলো হলো বর্ত্তমান সভ্যতার ভালো দিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অবাঞ্ছিত দিকও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যান্ত্রিক উন্নতি যথেষ্ট হ'লেও এর অন্তরের দিকে আমরা ক্রমশ উদাসীন হ'তে বসেছি। একথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্ববিভাগেই প্রযোজ্য। সংগীত বিভাগেও এ কথাটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

সেকালের সংগীতের কি রূপ ছিল, আর একালে তা কি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে? রবীন্দ্রনাথকে আমরা জাতীয় প্রগতির প্রধান অগ্রদূত বলে সবাই স্বীকার করি। কিন্তু তিনিও সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের বর্ত্তমান সংগীতের ক্রমিক অন্তঃসার শূণ্যতা সম্বন্ধে লিখতে কুণ্ঠাবোধ করেননি অবশ্য আমরা লোক সংগীত সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিছু আলোচনা করতে চাইনা। উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বহুবার তাঁর কথা প্রসঙ্গে সাংগীতিক প্রবন্ধে ও নিজ জীবন কথা আলোচনায় জানিয়েছেন যে তাঁর প্রথম জীবনে উচ্চাঙ্গ যে সংগীত শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে গভীর রস প্রকাশে পরিপূর্ণ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তিনি তার পরিচয় পাননি। কালের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের গতিও হ'য়েছে দ্রুততর। জীবনের কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্যে শান্তি ও গভীর আনন্দের স্থান নাই। সংগীতের মধ্যেও এই ব্যস্ততা ও অস্থিরতার প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু মার্গ সংগীত বা কলাবন্তী সংগীতে চিত্ত চাঞ্চল্য বা অধৈর্য্য, সংগীতের রসভঙ্গ ক'রতে বাধ্য। জড় বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে মাইক, রেডিও, রেকর্ড ও সবাক চিত্রে সংগীতের পরিবেশন ও সুদূর দূরান্তের সংগীত শ্রবণ অনায়াসে সাধ্য। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের এই সুযোগের আমরা অপব্যবহার করছি। আমরা গভীর রসসংগীতের পরিবেশনের পরিবর্ত্তে তরল সংগীতের বিতরণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। জীবনে কর্ম্মের যথেষ্ট স্থান আছে, জড়বিজ্ঞানে কর্ম্মের সুযোগ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করতে পারে। কিন্তু অশান্তি, বিক্ষোভ ও প্রতিযোগীতার উত্তেজনায় কর্ম্মেরও কোন উন্নতি ঘটেনা এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও অশান্তিকর উত্তেজনারই সৃষ্টি ক'রে থাকে। সংগীতের ক্ষেত্রে সুরের মাধুর্য্য বর্জ্জিত অনেক ঘোড়দৌড় ও ছন্দ সুষমা বর্জ্জিত তালের লড়াই সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই উচ্চাঙ্গ কলাবন্তী সংগীতের পূজা চিরদিনই ক'রেছেন, কিন্তু তথাকথিত ওস্তাদী সংগীতের বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় ও কুণ্ঠিত হননি। আজ তাই দুঃখের সহিত স্বীকার করতে হয় যে যান্ত্রিক অশেষ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা সর্ব্ব সাধারনের নিকট সুরুচি সঙ্গত সরস উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোন সন্ধান দিতে অসমর্থ হচ্ছি। ফলে একদিকে ওস্তাদি সংগীতের রুচি বিকার বেড়ে যাচ্ছে, অপরদিকে যথার্থ রসিক সমাজে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি বিতৃষ্ণা উদ্ভব হচ্ছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত যে কাকে বলে, সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণারও অভাব ক্রমশই প্রকাশ পাচ্ছে। সৌন্দর্য্য ও রস বিশ্বজনীন বস্তু। শুধু কোন বিশেষ শিক্ষা দীক্ষার উপরে রসানুভূতি নির্ভর করে না। রসিক লোকেরা

অপরিচিত অথচ কোন সুন্দর শিল্প সৃষ্টি থেকেও রসগ্রহণ করে থাকেন। আমরা ইওরোপীয় সংগীত না শিখলেও পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের আবেদনে মুগ্ধ হই। তেমনই পাশ্চাত্য সংগীত রসিকগণ যে আমাদের রাগ-রাগিনীর সরস আবেদনে যে মুগ্ধ হন, তার প্রমাণের অভাব নাই। তাই যখন কোন পাশ্চাত্য সংগীত সমালোচক আমাদের কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ওস্তাদের খেয়াল গায়কী শুনে হলক্ তানের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সেই তান শুনে তাঁর মনে হচ্ছিল যে দুটি বুনো বিড়াল ঝগড়া করছে, তখন তাঁর এই সমালোচনা আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনা। কর্কশ সংগীতের কস্‌রৎ ক্লেশ কর ও কষ্টসাধ্য ; কিন্তু এই সংগীত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। সংগীত সম্মেলনে সর্ব্বসাধারণ যদি এই সংগীতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তবে আমাদের বলতে হবে যে ক্রমাগত এই কর্কশ সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে তবলার দুর্দান্ত প্রতিযোগীতায় সাধারনের সংগীতের রুচি ক্রমশ নিম্নমুখী করে ফেলেছে। এই কারনেই শিক্ষিত সমাজে হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা দেখা যায়। যারা সুরের সৌন্দর্য্যের পূজারী, তারা অসুন্দর কণ্ঠস্বরের কঠিন কস্‌রতে তৃপ্তি পেতে পারেন না। আমি আমার সংগীত দীক্ষার প্রধান গুরু তানসেন বংশীয় মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাল, "শ্রেষ্ঠ সংগীত কাকে বলে"। —খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন "আমাদের সেনী বংশের প্রধান শিক্ষাই হ'লো সুরই সংগীত অর্থাৎ সুর বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট না হ'লে সংগীতের সৃষ্টি হ'তে পারেনা। বেসুরো বা কর্কশ গান বাজনা সংগীত পদ বাচ্য নয়। যাঁরা গায়ক হ'তে চান, তাঁদের গোড়াতেই খাঁটি সপ্তক মনোরঞ্জক-রূপে কণ্ঠে প্রকাশ ক'রতে হবে এবং যাঁরা বাদক হ'তে চান, তাঁদেরও খাঁটিভাবে সুর মেলানো ও সুমিষ্টভাবে অঙ্গুলীদ্বারা যন্ত্রে স্বর উৎপাদন অভ্যাস করতে হবে। কি কণ্ঠ সংগীতে কি যন্ত্র সংগীতে সুরের প্রথম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদিগের মনে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আবেশ উৎপাদন করা চাই।"

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মোগলদরবার এবং অন্যান্য রাজদরবারে সংগীতে সুরের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। শুধু বিগত এক শতাব্দী ধরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যথার্থ আদর্শ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আবার প্রাচীন আদর্শের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। সেকাল বলতে আমি একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে করে থাকি। আর একাল হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত, এই একশো বৎসরের কথা। সেকালে লোকের মনে শান্তি ছিল ও সংগীতের পূজারীরা সুরের ধ্যানে তন্ময় থাকতো। একালে মানুষের মনে নানা সমস্যার উদয় হয়েছে, জীবনযাত্রাও ঝঞ্ঝাট্ পূর্ণ। শিল্পীদের জীবনও নানা অভাবের তাড়নায় জর্জরিত। সুরের ধ্যানের অবসর কোথায়? পূর্ব্বে শান্ত, শৃঙ্গার, করুণ ও বীর এই চার প্রধান রসের বিকাশ না হ'লে কাব্য ও সংগীতের কোন মূল্যই দেওয়া হতো না। বর্ত্তমানে চমক প্রদ অদ্ভুত রস, হাস্য রস ও ভয়ানক রসের প্রাদুর্ভাব। আপাতঃ দৃষ্টিতে আধুনিক সংগীতের বৈচিত্র যথেষ্ট, কিন্তু এখন যে সব অলংকার প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি খুবই লঘু ও অসার। এগুলি রাগের মর্য্যাদা ক্ষুন্নই ক'রে থাকে। সেকালের সংগীতেও রাগের মিশ্রণ যথেষ্ট করা হ'তো তখন শুদ্ধ রাগ যেমন ছিল, তেমন সংকীর্ণ বা মিশ্ররাগের প্রয়োগও কম ছিলনা। মার্গ সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে দেশী সংগীত, লোক সংগীত, লঘু সংগীত প্রভৃতি সব সংগীতেরই তখন স্থান ছিল।

কিন্তু একালের মতো রাগের বেখাপ্পা মিশ্রণ তখন প্রচলিত ছিলনা। বর্ত্তমাণে রাগের মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ অর্থাৎ হাল্কা সুর ও গভীর সুরের একত্র সমাবেশ যথার্থ রসিকের কর্ণপীড়াদির কারণ হ'য়ে থাকে। অবশ্য একথা আমরা বলছিনা যে সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু প্রাচীন ঢংয়েরই পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে। আধুনিক সৃষ্টিতে প্রাচীনের যা যথার্থ সম্পদ তা রক্ষা ক'রেও আমরা নতুন কিছুর সৃষ্টি ক'রতে পারি। যেমন হারমণি জিনিষটা নতুন এবং বিদেশ থেকে আমদানি। রাগের রস ও

রূপ অক্ষুন্ন রেখেও বহু সুর ও বহু যন্ত্রের যৌথসংগীত যে সম্ভব তার দৃষ্টান্ত আছে। ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো সহ কণ্ঠ সংগীতে এবিষয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার বিখ্যাত শিষ্যা শ্রীমতী প্রিয় চ্যাটার্জি তাঁর পাশ্চাত্য সংগীত গুরু ও কলিকাতা পাশ্চাত্য সংগীত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুহৃদবর ফ্রান্সিস্‌কো ক্যাসানোভা আমার নিকটে ভেরো রাগের একটি প্রাচীন ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে ঐ ধ্রুপদের উপরে একটি যৌথ যন্ত্র সংগীতে অর্কেষ্ট্রার সৃষ্টি করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এই সংগীত ফারপো হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা শুনে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত হন। কেননা পাশ্চাত্য প্রণালীতে ষড়জ পরিবর্ত্তন ও নানা সপ্তকের নানা সুরের একত্র সমাবেশ সত্বেও তাঁর অর্কেষ্ট্রায় আমার ধ্রুপদের প্রধান স্বরবিন্যাস ও ভৈরো রাগের গম্ভীরতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন ছিল, এমন কি একক সংগীত অপেক্ষা যৌথ সংগীতের পরিবেশনে রাগ সংগীতের ঐশ্বর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আধুনিকতার বিরুদ্ধে আমি ওকালতি ক'রতে চাইনা। তবে সেকালের সত্য ও সৌন্দর্য্যের ভিত্তির উপরেই একালের শিল্প সৃষ্টি ক'রে তুলতে হ'বে।

আগমনী

শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী

আজি এ শরতে এসো মা মরতে ত্রিদিব নিবাস হতে—
শুভ্র মেঘের পথ বেয়ে ঐ কনক কিরন রথে।
কুন্তল কালো উড়ায়ে আকাশে—
লোল অঞ্চল দুলায়ে বাতাসে,
শঙ্কা হরণ শঙ্খ বাজায়ে বাঙ্‌লার পথে পথে—
এসো মা শারদা, অভয়া বরদা ত্রিদিব নিবাস হ'তে।

বর্ষা ধারায় স্নান করি' ধরা—ধরেছে মধুর বেশঃ
মধুর ছন্দে, পরমানন্দে জেগে উঠে সারা দেশ।
চম্পা, শিউলি, শেফালিকা যত,
মৃদু হিল্লোলে দোলে অবিরত,
আগমনী সুর বেজে উঠে আজি তটিনীর জল স্রোতেঃ
এস মা জননী চির কল্যাণী ত্রিদিব নিবাস হ'তে।

সন্তান তোর ফেলি' আঁখিলোর কেঁদে মরে বেদনায়—
অশ্রু মুছাতে, দুঃখ ঘুচাতে আয় মাগো আজি আয়!
অন্নদাত্রী তুঁই মাগো যদি
ক্ষুধিতেরা কেন কাঁদে নিরবধি?
নর কঙ্কাল কেন লুটে তবু চারিদিকে পথে পথে?
মিটাইতে ক্ষুধা নিয়ে এসো সুধা আজিকে অমরা হ'তে।

অসুরেরা আজও জাগিয়া রয়েছে—কাঁদে তাই জনগনঃ
অসুর নাশিনী এসো দশহাতে ধরি' দশ প্রহরণ।
মুছিতে আজিকে নয়নের লোর,
পুনঃ আগমন হোক মাগো তোর,
ছেদিয়া বাঁধন, বসো মা আসন পাতিয়া হৃদয় পরতে;
এসো মা জননী, ভুবন মোহিনী, ভুবন ভোলান শরতে।

বলাকা'র কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত

●

রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে একটী মৌলিক তথ্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। তাঁহার সমগ্রজীবন দুই ভাগে বিভক্ত হ'তে পারে।

১। "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে "গীতাঞ্জলি" পর্য্যন্ত ইহার প্রথমপর্ব্ব এবং

২। "বলাকা হইতে "শেষখেলা" ইহার দ্বিতীয়পর্ব্ব। অবশ্য এই দুই বিভাগ বিচ্ছিন্ন নহে, কবিমানসের বৈশিষ্ট্য ও গতি প্রকৃতির মাধ্যমে এই দুই পর্ব্বই এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।

মহাকবির জীবননাট্যের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা অবশ্য নুতন কিছু নয়; কিন্তু রবীন্দ্র কবি মানসের পক্ষে ইহার একটী বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন দুই মহাকবির জীবনেতিহাসের সমষ্টি। গীতাঞ্জলী যুগের কাব্য সাধনার ইতিহাস যেন কবিমানসের একটী পর্ব্বের সুনিয়ন্ত্রিত ফল। এই যুগের আধ্যাত্মিকতা ও অরূপ পিপাসা মানবজীবন ও প্রকৃতি হইতে তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল। জগৎ ও জীবনের প্রাণ কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক শান্ত সুন্দর ধ্যান সুষমাময় নিত্য-বৃন্দাবনে মাধুর্য্যময় বল্লভকাণ্ডের সহিত কবির লীলা চলিয়াছে। "খেয়া"কাব্য হইতে "গীতিমাল্য" পর্য্যন্ত কবি জীবনের এই অধ্যায় সুপরিণত অধ্যাত্মজীবনের জাগরণ উন্মেষ ও পূর্ণতার কাহিনী। "গীতাঞ্জলি" পর্ব্বের এই আধ্যাত্মিক লীলাভিসার কিরূপে যে বলাকার ঝঞ্ঝা মদমত্ত গতি চঞ্চল জীবনোল্লাসের সৃষ্টি করিল তাহা বিস্ময়কর। গীতাঞ্জলি যুগের পরে বলাকার যুগ সত্যই স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিয়াছে। গীতাঞ্জলি কাব্যের অলঙ্কার বিরল সঙ্কেত বাঁধনগুলি গীতি কাব্যের আবেগ ও অখণ্ডতায় নিবিড় ও সংহত। বলাকার দীর্ঘ বিসর্পিত যুক্তাক্ষর সমন্বিত অসমপদী ছন্দের প্রবহমানতা ও ধ্বনি গৌরব আঙ্গিকের দিক হইতে স্পষ্টতই নবযুগের সূচনা করিয়াছে। বলাকায় রবীন্দ্রকাব্যের এই উজ্জীবন বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

এ যেন গ্রীক্ পুরাণ বর্ণিত ফীনিক্স্ পক্ষীর পরিণত দেহ হইতে তরুন পক্ষীর জন্মলাভ। কাব্য জীবনের অভিনব দ্বিজত্ব দীর্ঘজীবি কবিদের কাব্যেও একান্ত বিরল। "ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের পরিণত বয়সের কাব্য প্রথম যুগের অপরূপত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার অধ্যাত্মজীবন একটী বর্ণ বিরল পাণ্ডুরতায় অবসিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি কাব্যের পরে বলাকার জীবনের পূর্ব্বরাগ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অতিন্দ্রীয় অনুভূতির জগৎ হইতে আবার যেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ রূপে রসে ও বর্ণে কবির নিকট সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রমানসের এই পট পরিবর্ত্তন নানা কারণে অনুকরণ যোগ্য। সাধারনত কবি যে নাম করণে পরিবর্ত্তন লীলাকে অভিহিত করিয়াছেন গীতাঞ্জলি পর্ব্ব হইতে বলাকাকাব্যের পরিবর্ত্তন নাকি সেই শ্রেণীর নয়—তখনকার পরিবর্ত্তন একটু গভীরার্থ দ্যোতক। সোনার তরী "চিত্রায়" রূপরসোল্লাসময় জগতে কবির মানস বলাকা—যে নীড় রচনা করিয়াছিল কল্পনা কাব্যে তাহারই পাখা নবজগতের আকর্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিল। গীতাঞ্জলি পর্ব্বের কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন।

"এপার হইতে নবজীবনের পারে
চলেছি—আমার যাত্রা
করিতে সারা।"

বলাকা সেই মানস বিহঙ্গের প্রত্যাবর্ত্তনের ইতিহাস। এই শ্রেণীর অসাধারণ প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী বিশ্বসাহিত্যে বিরল। মহাকবি গ্যেটের কাব্যজীবনের সন্দেহ ইহার কিঞ্চিৎ তুলনা চলিতে পারে।

মধ্যবয়সে একসময়ে গ্যেটের কাব্য জীবন প্রায় স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। "শিলারের" সহিত বন্ধুত্ব হইবার পর কাব্য[illegible] এক মহান জাগরণ হইল তাহারই

প্রাণ-সত্তার চিরন্তন স্বাক্ষর বহন করিল তাহার অমর কাব্য "ফাউষ্ট" (FAUST)। গেটের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও উত্তরজীবন মহিমান্বিত, অনন্ত সম্ভাবনায় ও অমিত ঐশ্বর্য্যে প্রাণবান। কাব্যজীবনে এই শ্রেণীর বিবর্তন না ঘটিলে গেটে বা "রবীন্দ্রনাথ" সম্ভবতঃ দুইজনের কাহারও উত্তর জীবন এইরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত না।

পঞ্চাশোর্দ্ধে রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য শুধু কাব্যেই নয়—উপন্যাস ও নাটকেও সঞ্চারিত হইয়াছে। 'চতুরঙ্গ' 'ঘরে বাইরে' "ফাল্গুনী" প্রভৃতির নবতম আঙ্গিক চাতুর্য্য দুর্ব্বার প্রাণাবেগ, জীবনরসের গহনে অবতরণের সহজে দৃষ্টি, জগৎ ও জীবনের মর্ম্মকোষে এক বিস্ময়কর আনন্দ মাধুর্য্যের আবিষ্কার প্রৌঢ় কবির মানসলোকে নূতন জোয়ার সৃষ্টি করিল। গীতাঞ্জলি পর্ব্বের যে রসকেন্দ্র তাহা জীবনেরও 'পরে, জীবনকে অতিক্রম করিয়া লৌকিককে পশ্চাতে রাখিয়া এই যে রসোল্লাস তাহা নিত্য বৃন্দাবনের যেখানে শ্রাবন-ঘন-গহন মোহে তাঁহার পদধ্বনি শোনা যায়—পত্রমর্ম্মরে দীর্ঘ নিশ্বাস ধ্বনিত হইয়া উঠে, যেখানে সন্ধ্যার আকাশ মিলনের অরুন রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে, প্রতীক্ষায়, আশ্বাসে মিলনে বিরহেও ভীরু আত্মনিবেদন যেখানে অপার্থিব বিহ্বলতায় শিহরিয়া উঠে—বলাকার প্রত্যাবর্ত্তন সেই অলৌকিক ও তন্ময়তা হইতে জীবন রসিকতার তটপ্রান্তে ফিরিয়া আসা।

তাই বলাকা এক গতিশীল জীবনের কাব্য। গীতাঞ্জলির [illegible] মহান কাণ্ডারীর [illegible] অধিদেবতা রসরাজ তিনি নহেন। বলাকাকালের কবির রুদ্রদেবতা তাঁহার জীবনকে [illegible] বৈশাখের ঝটিকা বিক্ষুব্ধ মহাকাল। শান্ত মধুর পরিবেশ বলাকার কবির কাম্য নয়।

পথে পথে পাকে দিছে কাল বৈশাখীর
আশীর্বাদ"
শ্রাবণ রাত্রির আর্ত্তনাদ
ইহাই তো যৌবন ইহার অভাবেই
"উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জে পুঞ্জে
বস্তুর পর্ব্বতে"

এরূপ দৃপ্ত প্রাণবন্দনা রবীন্দ্র সাহিত্যে আর নাই। বলাকাকাব্যে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ এমন একটী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন যাহা তাঁহার শেষজীবনের কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বলাকার কতকগুলি কবিতায় বিশ্বপ্রসারী কবি কল্পনা ও জড় বস্তু ভেদকারী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। "চঞ্চলা" (৮নং) বলাকা (৩৬ নং) কবিতায় এই বৈশিষ্ট্যের সর্ব্বাধিক পরিচয় মিলিবে।

কবির চির তৃষিত সন্ধানী দৃষ্টি চলিয়াছে "দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে ;—অজানা হইতে অজানায় নব-তৃণাঙ্কুর উদ্বহন—আঁধার মৃত্তিকা হইতে "নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন" কবি কল্পনা একটা বস্তু রেখায় গ্রথিত হইয়া মহাকাব্যোচিত উদাত্ততা ও কালব্যাপ্তি দিয়াছে। মহাকালের পটভূমিকায়, জগৎ ও জীবনের উপলব্ধি পরবর্ত্তি কাব্যগুলিতে সীমাহীন বিস্তৃতি লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্টির মর্ম্মান্তকারী সৃজনোন্মুখী গতিরহস্যের অভিমুখীন গতিরহস্যের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া কবি সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের অভিমুখীন হইয়াছেন। দর্শন ও কাব্যের মাল্য বন্ধনে কবির এই বিশ্ব-বীক্ষণ একটী ধ্রুপদী উদাত্ততা ও মহাকাব্যোচিত বিশালতা লাভ করিয়াছে।

বলাকা কাব্যে প্রৌঢ়ের পরিণতি ও তারুণ্যের প্রাণ প্রাচুর্য্য একত্র সমন্বিত হইয়াছে। প্রথম যুদ্ধের মানবীয় মৃত্যু স্পর্শ কাতর কবি হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সমসাময়িক যুগ জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়াছে? কয়েকটী কবিতায় (১৫, ১৬, ৩৭, ৪০) শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত কয়েকটী পত্রে কবির এই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] কবির মানস-বিহঙ্গকে নূতন পথের নির্দ্দেশ দিয়াছে। পরমবিশ্বাসী কবিকণ্ঠে তাই বিশ্বার অমৃত বাণী :—

এর যত মূল্য সে কি ধরার
ধূলায় হবে হারা
স্বর্গ কি হবে না কেনা?

জীবনের এই মহামূল্য রস, এই মাঙ্গলিক চেতনা বলাকা কাব্যের সর্ব্বাঙ্গে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে কাব্য শাসনের প্রচলিত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া নূতন পথ রচনায় আঙ্গিক রূপায়নের দ্বিধাহীন সাহসিকতা কবির এই যুগের কাব্য ও গদ্যগ্রন্থগুলির বিস্ময় কর বৈশিষ্ট্য। বলাকার আঙ্গিক রচনায় সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে ছন্দ। গীতাঞ্জলি পর্ব্বের অতিনিরূপিত ছন্দবোধ বলাকায় দুর্নিবার আবেগে বাঁধ ভাঙিয়াছে। প্রচলিত ছন্দযুক্তির এই প্রয়াস পরবর্ত্তী কালের ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এমন কি গদ্য কবিতায় পূর্ব্বাভাস বলা যাইতে পারে।

একটি সিগারেটের আয়ু

শ্রীমিহির দত্ত

●

টিন খুলে সিগারেটটা আলতো ভাবে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলো সুদীপ্ত। পকেট থেকে লাইটার বার করে ধরিয়ে নিল। সিগারেট বার করা এবং ধরানো দুটো কাজই করলো এক হাতে, তারপর আরাম করে ধোঁয়া ছাড়লো পা দুটো টান করে ছড়িয়ে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিল। দামী সিগারেটের সুগন্ধ আর নীলচে ধোঁয়া একটু একটু করে ছড়িয়ে সুদীপ্ত হাসলো।

'তা হলে আবার আমাদের দেখা হল, কি বলো?'

'হু, তা প্রায় তিন বছর পরে। তবে তোমায় আর চেনা যায়না, একেবারে বদলে গেছ। উন্নতি করেছো বুঝতে পারছি!'

উত্তর দিলনা সুদীপ্ত, দামী টাইয়ের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে একটু হাসলো। বুদ্ধের মত প্রশান্ত হাসি। এ হাসিটাও আমার অপরিচিত, এটা নতুন আয়ত্ত করেছে সুদীপ্ত। শুধু হাসি নয়, গোটা মানুষটাকেই নতুন লাগছিলো আমার। তিন বছর আগেকার তাপ্পি মারা সার্ট পায়জামা পরা একমুখ দাড়িওলা, উদভ্রান্ত সুদীপ্ত এ নয়। পরিচ্ছন্ন কেতাদুরস্ত পোষাক পরা, নামের সঙ্গে মানানসই চেহারা নিয়ে এ এক নতুন সুদীপ্ত। ইশারা করে ওর টেবিল থেকে না ডাকলে চিনতেই পারতাম না। আশ্চর্য্য হয়ে ওকে দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম এর রহস্যটা কি। একইসঙ্গে দুজন বি. কম. পাশ করেছিলাম। ভাল চাকরীর জন্যে ঘুরে ঘুরে শেষপর্য্যন্ত ও বেহালার ওদিকে একটা স্কুলে কাজ জুটিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে কোন একটা কোম্পানীর সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেশ ধরেছিল। তাতে ও খুব সুবিধে করতে পারে নি। তারপর আর ওর কোন খবর রাখিনি, রাখা সম্ভবও ছিল না। তিন বছর পরে ওর দেখা মিললো এই রেষ্টুরেণ্টে। সুদীপ্ত আমায় ডাক্‌লো, তারপর সিগারেটটা ধরাল। আরাম করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বোধ হয় আমি কি ভাবছি আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলো। বেশ একটু কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কোন শাঁসালো চাকরী জুটিয়েছো বুঝি! নাকি পয়সাওলা শ্বশুর—"

'ওসব নয় হে বন্ধু। কাজ করছি, সত্যিকারের কাজ" মুখটা সরু করে সুদীপ্ত একটা ধূসর বৃত্ত তৈরী করলো, বৃত্তটা ক্রমশঃ বড় হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করে রইলো। তারপর মুখ খুললে—'এতদিন গরীব ছিলাম কেন জান, বোকা ছিলাম বলে। কিন্তু যেই বুদ্ধিমান হলাম, অমনি অভাব গেল পালিয়ে। হাতে এল টাকা। বুদ্ধি চাই বুঝলে, বুদ্ধি! সুদীপ্ত রহস্যময় ভাবে চোখ নাচালো। মুখে তেমনি হাসি, একটু বা অনুকম্পা মেশানো। বিজনেশ সিক্রেট কি তোমায় বলা ঠিক হবে? তবে শুধু বুদ্ধি নয় হিম্মত থাকা চাই। তোমার মত ঘাড় কুঁজো কেরাণীর কাজ নয়। এ কাজে উত্তেজনা আছে, বিপদ আছে যেমন, তেমনি পয়সাও যে আছে আমায় দেখেই বুঝতে পারছো।'—যেন দেখবার জন্যই দু' আঙুলে টুস্‌কী মেরে দামী প্যাণ্ট থেকে ছাই ঝাড়লো সুদীপ্ত। সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে পা নাচাতে লাগলো। দামী সিগারেট, আস্তে আস্তে পুড়ছে। নীল ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। বলতে কি ও যত ভনিতা করছিলো, আমার কৌতুহলও তত বাড়ছিলো। একটু ব্যস্ত হয়েই বল্লাম: 'রহস্যটা একটু খুলে বলবে? অবশ্য তোমার বিজনেশের যদি কোন ক্ষতি না হয়—' 'ক্ষতি?' সুদীপ্ত আবার তেমনি ভাবে হাসলো। 'তুমি আবার কি ক্ষতি করবে হে! পুলিশ তো একবছর ধরে চেষ্টা করছে, আমার টিকিও ছুঁতে পারে নি! পুলিশের নাম শুনে চম্‌কে উঠলে তো? সবটা শুনবে নাকি?'—

সত্যি চম্‌কে উঠেছিলাম আর কৌতুহলের পারা একলাফে গোড়া থেকে আগায় উঠে গিয়েছিল। বল্লাম চটপট শুরু করো!'—

অত ব্যস্ত হয়ো না, তোমায় বলবো বলেই ডেকেছি—সুদীপ্ত আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসলো। সিগারেটে আরও দুটো টান দিয়ে বলতে শুরু করলো—তুমি তো জানতে আমার অবস্থা। অভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন ট্রামে একটা ঘুমন্ত লোকের পকেট থেকে দশটাকার নোট তুলে নিলাম, কিছু টের পেল না। লোভ বাড়লো, সাহসও বাড়লো। আবার একদিন সুযোগ পেলাম। বড়বাজার থেকে একটা মালদার লোককে ফলো করেছিলাম, তাক্ মতো নোটের বাণ্ডিলটাও তুলেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লাম! লোকটা তার লোহার মত শক্তি হাতে আমার কব্জি চেপে ধরলে। কোন হৈ চৈ না করে একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। নিয়ে এল নোংরা একটা হোটেলের পেছনের খুপরীতে। জিজ্ঞেস করলে—কোন দলে ঢুকেছিস!' ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কোন রকমে বল্লাম—আমার টাকার বড় দরকার তাই।....

'ঠিক আছে, টাকা পাবি। আমার দলে নাম লেখা। যদি বেয়াদপি করিস তবে ভূতের দলে নাম লেখাতে হবে। বাগবাজারের খালে তোর লাশ পচে ঢোল হবে, বুঝলি!—

বুঝতে হল! ওর দলে ছিলামও বছর খানেক। চুরি চামারী নয়, ওর ছিল নেশার খদ্দের। চোলাই গাঁজা আফিমের তিনটে ঘাঁটী, কোথায় নাইবা শুনলে! দিনের বেলায় নিরীহ দপ্তরী খানা, রাত দশটার পর হ্যারিকেনের অল্প আলোয় সেইটাই ভাঁটিখানা, বে-আইনী বেচাকেনার আড্ডা। সেই লোকটার নাম বলেছি কি? থাক দলের কেউ ওকে ছুরি মেরে খুন করেছিলো। তারপর আমিও দল ছেড়ে দিলাম।"—সুদীপ্ত একটু থামলো। সিগারেটের কয়েকটা টান দিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার হাসলো। "দল ছাড়লাম। কিন্তু কাজ ছাড়ি কি করে। সব জিনিষেরই একটা নেশা আছে। নতুন ওস্তাদের সাকরেদী শুরু করলাম। কাজটা রিস্কি, কিন্তু লাভ ছিল। ফিফটি পারসেণ্ট পাওয়া যেত। আনলোডিংয়ের ব্যাপার। ষ্টেশনের একটু আগে দাঁড়িয়ে থাকো, স্পীড্ কমলেই লাফিয়ে উঠে পড়ো, ওয়াগানের সিল ভেঙ্গে বস্তা নিয়ে আবার লাফিয়ে পড়ো। কখনও চাল, কখনও সিমেণ্ট যখন যেমন হয়। শুধু খবরটা ঠিকমত পাওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে মাল লরীতে তুলে ডেলিভারী দিতে হয় তো!—

বয় এসে দাঁড়ালো পকেট থেকে টাকা বার করে সুদীপ্ত বিল মিটিয়ে দিল। লক্ষ্য করলাম এটাও সে করল একহাতে, বাঁ হাতটা একভাবে কোটের পকেটে ঢোকালো। আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝে সুদীপ্ত বললো—"ওটা নেই। সামান্য একটা ভুলে রেলের চাকায়....তা ধরো, ধরো ওটা ইনকামট্যাক্স দিয়েছি!—মুখের হাসিটা তেমনি ধরে রেখেছে সুদীপ্ত। হাতটার জন্যে ও কাজটাও ছাড়লুম ধরলুম হলের লাইন। নিজে কিছু করি না, হুকুম দিয়ে করাই: তা ফরাসী মদ আর জাহাজী সোনার করবার মন্দ চলছে না। ভালই আছি!—"
হ্যাঁ, তা ভালই আছে। ওকে দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো ওদের পরিবারের কথা। জিজ্ঞেস করলাম—আর তোমার বাবা, মা, বোন এরা?—"

"মরে গেছে। বোনটা গলায় দড়ি দিয়েছিল। বড্ড ছেলে মানুষ আর বোকা ছিল কিনা—সুদীপ্তর গলা একটুও কাঁপল না। ও হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা এবার যেন তেমন ফুটলো না, খাপছাড়া ভাবে ঠোঁটে লেগে রইল। দুজনে উঠে পড়লাম!

—'বিয়ে করেছো?'—

না। কোন বোকামী করতে আমি রাজী নই!—সুদীপ্ত দাঁড়াল 'আচ্ছা চলি' সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে ঘষে দিল সুদীপ্ত। তারপর সোজা হেঁটে বেরিয়ে গেল। ছোট্ট টুকরোটা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে রইল। ওটা দামী কি কমদামী ভাল কি মন্দ কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখন। শুধু ওর গন্ধটা হাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে।

নির্বাণ

শ্রীঅবনী কুমার দত্ত

তোমাতে আমার বিলীন কর হে
মিলনের মহামিলে
আকাশ যেমন মিশে গেছে
নিঃশেষে নভঃ নীলে।

সুরভি যেমন পুষ্প হারায়
সব কিছু মোর আপন হারায়
নদ নদী যথা হারায় ধারা
মহা সাগর সলিলে।

শুনি উজ্জ্বল পরম জ্যোতি তুমি
অন্ধ তমসা নাশো
নিঃস্ব হোয়ে যারা ভালবাসে
তুমি তাদেরই ভালবাসো;

তোমারই আগুনে পতঙ্গ সম
দহে যেন সব কিছু মম,
ফিরে দাও প্রভু মোর পুনঃ
আমার যা কিছু দিয়েছিল

কেন

শ্রীনিশীথ দাস

এ জীবন যেন তরঙ্গিত সমুদ্র সফেন।
প্রতিহত বারবার উদ্বেলিত মাটির দেয়ালে।
ক্ষয়িষ্ণু মানুষের চলিষ্ণু মন তবুও—
কোন ফাঁকে হৃদয়ের গোপন আড়ালে
জ্বালে ক্ষীণ দীপ। কাদার আধারে।
অতঃপর করে কোন গুপ্ত মন্ত্র,উচ্চারণ।
তারপর ফিরে আসে শূন্য হাতে রিক্ত মনে পুনঃ
পরাজিত জীবনের মধ্যাহ্ন আবাসে।
নির্জীব অস্থিগুলো বোঝা গন্ধে তিক্ত হয়ে আসে।
তবুও পরাজিত মানুষের দুর্ব্বল মন—
কেন ফিরে যেতে চায় তার পুরানো গুহায়
ফিরে পেতে তার সেই প্রথম মনন?

আমি

শ্রীশচী নন্দন নন্দন।

আমি পরিণাম দুঃখ—তাপ দুঃখ—সংস্কার-দুঃখ আমি বৃত্তি-বিরোধ
আমি বিশেষ—অবিশেষ—লিঙ্গ—অলিঙ্গ—আমি গুণ পর্ব্ব ব্রহ্ম বোধ
আমি দৃশিমাত্র দ্রষ্টা—সংশয়ের অতীত আমি—আমি প্রত্যয়ানুপশ্য
আমি [illegible]—আমি নিরস্ত—সমস্ত দ্বৈত—প্রপঞ্চ—আমি চির-অদৃষ্ট।
আমি মদালসা—তপোহীনা আমি সে চূড়ালা—
আমি "ঈশ্বরে তদাধ্যাস।"
আমি মহামুনি শুক—চির—দুর্দ্দান্ত মোর তপঃ-তেজোভাস।
আমি মনোজবিত্ব—বিকরণভাব। প্রধান-জয়ের অপার মহিমা
আমি অণিমা—লঘিমা আমি প্রাপ্তি আমি কামপূর্ণ প্রাকাম্য-গরিমা।
(চির-দুর্দ্দান্ত)

এবারের পূজোয় বাংলা দেশ

শ্রীচন্দ্রনাথ পাল

●

পূজো এসে গেল। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। শারদ কবিতার রসদ শিউলী ফুল এখনো ফোটেনি গাছে। বাঙালীর মনেও আসেনি পূজোর আমেজ। কিন্তু পূজো এসে গেল। পাড়ার বারোয়ারীর পাণ্ডাদের একজন দিয়ে গেল একটা হ্যাণ্ডবিল। সেটা দেখেই মনে হোলো সত্যিই ত পূজো এসে গেল। কর্ম্মের মাঝে থাকতে হয় বলেই বাংলা মাসের খোঁজ বিশেষ রাখিনা আর সেপ্টেম্বরের পরেই অক্টোবর একথাও সব সময় মনে থাকেনা। তাই পূজো যে সত্যিই এসে গেলো একথা ভাববার অবকাশ পাইনি। কারণ ত' একটা না, বহুবিধ। রোজের ভাবনা ভাবতে বসলে কি আর পূজোর ভাবনা মাথায় আসে। অনেকের আসে কিন্তু তাদের রোজের ভাবনা রুজির জন্যে নয়। বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় উৎসব এই দুর্গা পূজা। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কদিনের জন্যে জীবন হোয়ে ওঠে উচ্ছল, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে। কিন্তু স্তিমিতও যে হয় কারণ প্রাণপ্রাচুর্য্যের সংগে সংগে আর একটা বস্তুর প্রাচুর্য্যও যে চাই। প্রাচুর্য্য না পেলেও তার অস্তিত্ব ভালোভাবেই থাকা চাই। সে কথায় পরে আসব।

গতবছর পূজোর পর জনৈক আমেরিকান বন্ধুর কাছ থেকে দুর্গা পূজায় কলকাতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ পাই ডাকে। সেই বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে ঘাঁটতে হোয়েছিল কতকগুলো পুরানো বই যার মধ্যে ভারতের বিভিন্ন উৎসবের সংগে বাংলার দুর্গাপূজার বিবরণও দেওয়া ছিল। বাস্তবের দেখা আমার অভিজ্ঞতা জানাতে পারতাম সেই বন্ধুটিকে কিন্তু জানাব কেমন করে? আমার দেশকে বিদেশীর চোখে হেয় করবার জন্যেই কি জানাব আমাদের বর্ত্তমানের পূজা উৎসব। স্বভাবতই সত্য ঢাকবার জন্যেই পুরানো নথি ঘেঁটে উত্তর দিয়ে ছিলাম। তা না দিলে আমাকে বলতে হোতো বাংলাদেশের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ঘটে স্ফূর্ত্তির জন্যে। বহু জনের পকেট থেকে বের হয় পাঁচ জনের স্ফূর্ত্তির রসদ। এই কলকাতাতেই কয়েক হাজার পূজা হয়। বাজারে লাগে Competition পূজা প্যাণ্ডালেও তার হাওয়া লাগে। প্রতিমার সাজসজ্জার সেই আগেকার দিনের জৌলুষ ফোটাতে অক্ষম হোয়ে তারা বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কুলরমণীদের অনাড়ম্বর চটকদার সাজ সজ্জার নৈপুণ্য প্রদর্শনে Compete করে। সর্বজনীন পূজার পাণ্ডারা প্রতিমার শিল্পীর নাম অপ্রকাশ রেখে প্রকাশ করেন সিনেমা থিয়েটারের মতো মণ্ডপ সজ্জাকরের নাম, আলোক সম্পাতকারীর নাম। ফলে পটুয়ার নৈপুণ্য চাপা পড়ে নিওন, মার্কারী আর ঝলমলানো Decoration এর গুণে। পূজোর নামে মেতে ওঠে সুপ্ত ইন্দ্রিয়ের এক ইন্দ্রিয় যার নাম দেওয়া যেতে পারে গুণ্ডামী। যাক সে কথা, পাণ্ডাদের রোষাগ্নিতে আমার প্রাণটা খোয়াতে আমি চাইনা কি তাই বাধ্য হোয়েই এই প্রসঙ্গে আর আলোচনা করলাম না।

বাংলা দেশ আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। Darwin এর 'Struggle for existence' এর সার্থকতা আজ বাঙালী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। 'দুধে ভাতে' থাকাত দূরের কথা 'মাছে ভাতে থাকাটা এখন সম্ভব হোচ্ছেনা। বাঙালীকেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো নিরামিশাষী হোতে হবে দেখছি। কিন্তু তাতেও যে সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। কারণ মাছ বাদ দিয়ে শাকশব্জীর ব্যবহারও যে খুব আয়জনক হবে বলে মনে হয় না। কারণ অনুপাতে তাদের দামও বেড়েছে।

পূজোবাজার লাগবার অনেক আগে থেকেই কাপড়ের বাজারে দাম বাড়তে সুরু করেছে। পূজোয় বাঙালীদের নতুন পোষাক প্রায় অপরিহার্য্য। সামর্থানুযায়ী প্রায়

প্রতিটি বাঙালীই এ সময়ে নব সাজে সজ্জিত হোতে প্রয়াসী হয়। সে প্রয়াসে বাধা হোয়ে দাঁড়ায় demand and resourses এর অসামঞ্জস্যতা। ফলে cut your coat according to your cloth এই প্রবাদটিরই স্মরণ নিতে হয়। কিন্তু বস্ত্র যেখানে সুবৃহৎ না হোলেও বৃহৎ সেখানে কতই বা কাটা যায়। ইংরাজীতে যাকে বলে Bare necessities তাই ভুলোতেই বাঙালী জীবনে প্রাণান্তকর ব্যাপার।

চলিত কথায় আছে মা দুর্গা শরৎকালে একবার বাপের বাড়ী অর্থাৎ এই বাংলা দেশে আসেন চারদিনের জন্যে। প্রতি বছরেই তিনি এসেছেন এবারেও আসবেন। অন্ততঃ তিনি তাঁর বাপের বাড়ীর লোকেদের কাছে এই রকমই এত্তালা পাঠিয়েছেন। কিন্তু এবার তিনি এসে কি দেখবেন? দেখবেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর জরাজীর্ণ রূপ। দেখবেন ভাত কাপড়ের অভাবে তাঁর পিতৃকুলের এক মুমূর্ষু অবস্থা।

মহাপ্রকৃতির আগমনীর সুর বেজে উঠেছে। পরমা প্রকৃতি মাতা আবার আসছেন ধরিত্রীর বুকে। শরতের নীল আকাশের মাঝে ছোট ছোট মেঘ এসে জানাচ্ছে জননীর আবির্ভাবের কথা। বাংলাদেশ আবার মেতে উঠবে মা-কে বরণ করতে। সমস্যা সঙ্কুলমনেও অধ্যাত্ম সম্পদ মুছে যায়নি আজও বাঙালীর মন থেকে। আকুলভাবে বিশ্বপ্রকৃতিকে ডাকবার সময় এসেছে আমাদের মনে। 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরায়' আবার সেই আগেকার রূপ ফিরে পেতে প্রয়াসী হবার জন্যে সচেষ্ট হোলে ভাল হয়। মার অকৃপণ আশীর্বাদে আবার জাতির পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে কালের আবর্তণের ফলে আবার আমরা সুদিন ফিরে পাব।

প্রার্থনা করি অন্ধকার কেটে যাক। আলো আসুক। মা আমাদের শক্তি দিন সামর্থ দিন।

●

কৃষ্ণচূড়া

ইন্দু পাল

●

কৃষ্ণচূড়া আমার জীবনে এক পরম বিস্ময়—
মেঘের শ্লেটে সূর্যরেখা, বিষন্ন বলয়।
সব পৃথিবী হারায় যখন সবুজিমার সুর,
কৃষ্ণচূড়ার দেহ তখন সবুজে ভরপুর।
মৃত্যু বুকে কৃষ্ণচূড়া রক্তপ্রাণময়।
রুদ্র নাচে, পিনাক বাজে, ক্ষুধিত শ্মশান;
কৃষ্ণ অঙ্গে রাধা প্রেম, জয়ের নিশান।
আসুক ঝঞ্ঝা, পড়ুক বজ্র, মৃত্যু কালো,
জীবন আছে কৃষ্ণচূড়ার, শুধুই আলো।

●

ভোরের আলো

শারদ প্রভাতে

দেখতে দেখতে এ কবছর কেটে গেল। আবার পূজো এসে গেল। তোমাদের মুখ খুশীতে ঝলমল করছে বেশ বুঝতে পারছি। তোমরা কেউবা তোমাদের পূজোয় নতুন পোষাক কিনেছ, কেউবা কি কি কিনবে মনে মনে ঠিক করে বাবা মার কাছে আবদার জানাচ্ছ। ভোরের পাখী তোমরা। তোমাদের কূজনে আজ আমরাও আনন্দ বোধ করছি।

কালের অমোঘ নিয়মে এক বছর কেটে গিয়ে আবার দেখা দিয়েছে শরৎকাল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এই বৃষ্টি এলো আবার রোদ উঠছে। বাংলা দেশের শ্যামল প্রান্তর আবার হেসে উঠছে। মাঠে মাঠে ধান গাছ বেশ বড় হোয়ে উঠেছে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সবুজ কার্পেট-পাতা রয়েছে প্রান্তর জুড়ে। এর মাঝেই শিশির ভেজা ঘাসগুলোর ওপর ঝরে পড়ছে শিউলী গাছ থেকে। ফুলগুলো সাদা ফুলের পাপড়ী আর গেরুয়া রংয়ের বোঁটা দেখেই তোমরা চিনতে পারছো ওটা শিউলী ফুল। অর্থাৎ শরৎকাল। গ্রামে যারা আছ তারা ইতোমধ্যেই বাউলের গলায় আগমনীগান শুনতে পেয়েছো 'উমা মা যে আসছে'।

বিচিত্র দেশ এই বাংলা দেশ। বছরে ৬টা ঋতুই এখানে স্পষ্ট দেখা যায়। অনুভব করা যায়। পূজো এসে গেল। মা দুর্গার আবির্ভাবে আবার চারদিন বাংলা-দেশ মেতে উঠবে আরাধনার উৎসবে, মেতে উঠবে আবাল বৃদ্ধ বণিতা। সকলেই উপভোগ করবে এই উৎসব। তাই বাঙালীদের জীবনে এটাই জাতীয় উৎসব বলে, মহারাষ্ট্রের গণেশ পূজা, কেরালার ওনাম উৎসব, মাদ্রাজ, মহীশূরের দশেরা উৎসবের মতোই বাংলা দেশের জাতীয় উৎসব এই দুর্গাপূজা। বাংলা দেশে বারমাসে তের পার্বণ আছে বলা হয়। সত্যিই তাই। কিন্তু সবার

ওপরে স্থান এই দুর্গাপূজার। কারণ মহাশক্তির আবির্ভাব হয় এই সময় বাংলা দেশে দুটো ধর্মের প্রাধান্য বেশী লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব ধর্ম এবং শাক্ত ধর্ম। দুটো ধর্মই কিন্তু একই হিন্দু ধর্ম থেকে উদ্ভূত। দুই ধর্মাবলম্বীগণই হিন্দু। তফাৎ শুধু তাদের বিশ্বাসে। কেউ ভজনা করেন। কৃষ্ণ, বিষ্ণু কেউবা কালী দুর্গা। সাধনার পথ ভিন্ন হোলেও লক্ষ্য কিন্তু এক বিধাতার ভজনা। মহাপ্রকৃতির আরাধনার জন্যেই প্রতিটি বাঙালী প্রতিবৎসর শরৎকালের দিকেই তাকিয়ে থাক। উৎসবে মেতে উঠবে বাংলা দেশ।

তোমাদের স্কুলের পূজোর ছুটিও এসে গেল। স্কুল বন্ধ হোলে অনেকেই হয়ত কোথাও বেড়াতে যাবে। কেউবা দেশের বাড়ীতে পূজো দেখবে। আবার কেউ বা কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগ না পেয়ে এই কলকাতারই বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা দেখবে বাবা মা আর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সংগে। যেখানেই তোমরা যাও বা থাকনা না কেন তোমাদের ওপর আমার শুভেচ্ছা সব সময়ই আছে আর থাকবে।

—সারথি ভাই

●

পথ দেখে চল

বসুমতী দাঁ

●

পথ দেখে চল্, পথ দেখে চল্
মিলবে অনেক বাধা।
মনো বীণার তারে রে তোর—
দেখবি অনেক ধাঁধা॥

হয়তো রে তোর সরল ডাকে
মিলবে দুঃখের সাড়া।
তাই বলে কি সেই দুখেতে
হবি আত্মহারা ?

জীবনের এই দুঃখ সুখের মাঝে
চোখ মেলে তুই দেখনা ওরে,
ওই, আনন্দ গান রাজে।
দিনের আলো বিদায় নিলে
আঁধার জানি আসে
সেই আঁধারি বিদায় নিলে
ভোরের পাখী হাসে।
তাই বলি আজ পরাণ খুলে
আনন্দে গান গা।
সবার মাঝে প্রেমের বাণী
যা শুনিয়ে যা।

শেষ আবদার

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু

দুর্গাপূজা কবে শেষ হ'য়ে গেছে। তারপর কত পুজো এলো, কত পুজো, গেল, কিন্তু এই পুজোর মত এমন বড় পূজো আর ত একটাও এলনা। তাইত মনটা চেয়ে থাকে ভবিষ্যতের দিকে করে আবার দুর্গাপুজো আসবে। চলি-চলি-পা পা করে হেমন্ত গেল, শীত গেল। বসন্ত এল আর গেল, সঙ্গে সঙ্গে বছর ও ঘুরে গেল। মনের ওপর সময়ের পলিমাটি জমে ওঠে। আমরা পুজোর স্মৃতি ভুলতে বসি, কিন্তু নতুন বছর যখন চড়কের ঢাক বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের আগমন ঘোষণা করে, তখন থেকে আবার মনের কোনে হারাণ স্মৃতি লুকোচুরি খেলতে বসে গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা যায়—যাবার সময় চুপি চুপি বলে যায় ঐ এলো, ঐ—এলো। তারপর দুষ্টু মেয়ের মত আশ্বিন এসে মাটিতে পা ফেলে মেঘের রাশি সরিয়ে দেয়, আকাশে তখন দেখা দেয় ঘন নীলে চাঁদের রোশনাই, দিনের ঝর ঝর আলো ঝরে পড়ে স্যাঁৎসেতে মাটিতে। তারপর এক দুই তিন করে দিনের পর দিন চলে যায় আর যত দিন চলে যায়, মন যেন ততই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। তারপর এক সময় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ, জ্বলে ওঠে আরতী, প্রদীপ, বিল্বতলে মায়ের বোধন উদযাপিত হয়। তারপর চলতে থাকে মহাপূজার মহালগ্ন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করে। অন্ততঃ একটা দিন সকলে সাধ্য মত আনন্দে যোগদান করে।

কিন্তু এই আনন্দ স্রোতের অতলে কত দুঃখের ফল্গু নীরবে বয়ে যায় তার খবর ত আমরা জানিনা। তাই এই আনন্দের দিনে মনে পড়ে সেই সব কচি মুখ—যারা হয়ত একটা রঙিন জামা চেয়ে পায়নি, একটা খেলনার জন্য বায়না করে পায়নি, বৃথাই কেঁদে ফিরেছে সারাদিন। তারপর কোন ফাঁকে ভুলে গিয়ে পুজো বাড়ীর আনন্দে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। মায়ের চড়, বাপের ধমকানি, নিজেদের কান্না সব ভুলে গিয়েছে। তারা যে শিশু ভোলানাথ।

কিন্তু যারা বকল, যারা দিতে পারল না, বঞ্চনা করল তারা ভুলতে পারল কি?...........

আমার জীবনের পাতায় এই রকম কয়েকটা ঘটনার ছাপ পড়েছে তারই একটা তোমাদের উপহার দিচ্ছি। আশা করি এর থেকে তোমরা কিছু শিখতে পারবে।

সেদিনটা ছিল মহাষ্টমী। কাছেই শ্মশান—কালীমন্দির থেকে শ্মশানে গিয়ে বসলুম। এলোমেলো চিন্তা মনে এসে ভীড় করতে লাগলো। কিছুপরে দেখি একটা আধ পাগলা লোক, পরনে ময়লা জামা কাপড়। একগাল দাড়ি, একটা টকটকে লাল রঙের জামা নিয়ে এসে সামনে যে চিতাটা জ্বলছিল তাতে ফেলে দিল। জামাটা পুড়ে গেল, সে চুপ করে দেখল। তারপর ওপরে আকাশের দিকে চেয়ে বললে "টুনু মা তোকে পুজোর জামা পাঠালুম—পরিস—আর অভিমান করিস নি—আচ্ছা আসি।" ঐ চিতাটাই ছিল টুনুর শেষ শয্যা।

আমি ত অবাক। গঙ্গার ধারে সে গিয়ে বসল, আমিও তার পাশে গিয়ে বসলাম। প্রথমটা ভেবেছিলুম পাগল—তারপর তার কাছ থেকে যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনেছিলুম সেইটেই সংক্ষেপে তোমাদের জানালুম।

দুভাই নবীন আর বিপিন। নবীন বড়, বিপিন ছোট। ছেলেবেলায় বাপ মা মারা যায়। নবীন তখন চোদ্দ আর বিপিন পাঁচ। গ্রামের জমিদার দয়া করে সেরেস্তায় নবীনকে একটা কাজ দিলেন। তাতে কোনরকমে দুভায়ের দিন চলতো নবীন পরিশ্রমী ও মেধাবী ছিল। নিজের চেষ্টায় কিছু লেখা পড়াও শিখেছিল। যাইহোক বিপিনের বয়স যখন সাত তখন নবীনের বড় ইচ্ছে হল ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? দিনরাত ঐ একই চিন্তা। কাউকে কিছু বলতে পারেনা পাছে ঠাট্টা করে।

ধানজমি ছিল তাই বেচে দিয়ে ভাইকে লেখা পড়া শেখার জন্য তিন ক্রোশ দূরে জেলা স্কুলে ভর্তি করে দিল। রবিবার কোন কাজ থাকে না তাই প্রতি রবিবার ভাইকে দেখতে যায়। ভাইকে না দেখতে পেলে মন হু-হু করে ওঠে। প্রথম পরীক্ষার ফল ভালই হল। নবীন আনন্দে আটখানা হয়ে পড়লো। ক্রমশঃ যত উপর ক্লাসে উঠতে লাগলো ততই ফল ভাল হতে লাগল। শেষকালে টেষ্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলো। নবীন খবর জানতে পেরে আনন্দে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল। আনন্দ বেদনায় সে প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ল।

বিপিন অবশ্য প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে ওদের জেলা থেকে বৃত্তি পেল। এইবার কলেজের পালা। এখন প্রচুর টাকার দরকার কি করে যোগাড় করা যায়। ইতিমধ্যে নবীনের বিয়ে হ'য়ে গেছে; একটি গরীবের কন্যাদায় উদ্ধার করেছে। এখন তার বাসখানেকের একটি মেয়ে। সকলেই বলে মেয়ে খুব পয়া ও আসতেই ত বিপিন জলপানি পেল। ও মেয়ে দেখিস কখনও কষ্ট পাবে না। বিপিন খুব ভালবাসত ভাইঝিকে আদর করে নাম রেখেছিল টুনু।

নবীনের এখন একমাত্র চিন্তা কলেজের ফি কেমন ক'রে যোগাড় করা যায়। বউয়ের হাতে নোয়া শাঁখা বাদে দুগাছা করে চার গাছা পাতের উপর চুড়ী, আর গলায় ভরি দুয়েকের হার। বিয়ের সময় নবীনের শ্বশুর ঐ হার মেয়েকে দিয়েছিল। গরীব নবীন আজ পর্য্যন্ত এক আনা সোনাও দিতে পারে নি। যা রোজগার করে তার প্রায় সবটাই ভায়ের পড়ার খরচ যোগাতেই চলে যায়। উপস্থিত সে ঠিক করল ঐ হার ছড়া বেচে সে বিপিনকে কলেজে পড়াবে। বিপিন একথা শুনে প্রথমটা রাজি হয়নি। বউদির হার বেচে পড়া ছিঃ। শুধু নবীনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাকে রাজী হ'তে হয়েছিল। বউদিও হাসি মুখে হার খুলে দিয়েছিল। একটি ভবিষ্যতের রঙীন ছবি বুঝি তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল। টাকার যোগার এইভাবে করে নবীন বিপিনকে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। হ্যাঁ ইতিমধ্যে ভদ্রাসন টুকু বাঁধা পড়েছে, নবীন একবেলা খেয়ে ভায়ের খরচা যুগিয়েছে, বউ আস্ত একখানা কাপড়ের অভাবে বাড়ীর মধ্যেই থাকে, লজ্জায় বেরোতে পারেনা।

এই কবছরের মধ্যে বিপিন মাঝে মাঝে বাড়ী আসত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই তার আসা যাওয়া কমতে লাগল। সে ভাল ছেলে, দুবেলা দুটো টিউশানি করে, তারওপর জলপানি পায়। কাজেই তার মেসের ও কলেজের খরচা চলে যায়। কিন্তু দাদা বউদি যে সব খুইয়ে তার মুখ চেয়ে বসে আছে সে ভাববার তার অবকাশ নেই। ক্রমে ক্রমে বিপিন এফ, এ, বি, এ ও 'ল' পাশ করে ওকালতি করতে লাগল।

এক সিনিয়র উকিলের মেয়েকে সে পড়াত। 'ল' পাশ করার পর তাকেই বিয়ে করলে। দাদাকে খবর পর্য্যন্ত দিলেনা। তারপর শ্বশুরের সাহায্যে দুই এক বছরের মধ্যে বেশ পশার ও হতে লাগল। ক্রমে নিজেদের বাড়ীর একটু তফাতে পাকা বাড়ী করে বৌ নিয়ে বাস করতে লাগল। দাদা বউদির বড় আশায় ছাই পড়ল।

মনের দুঃখে নবীন ক্রমশঃ মনমরা হয়ে পড়তে লাগল। তার ছোট মেয়ে টুনুই একমাত্র তার অবলম্বন। কোন দিন দুবেলা জোটে কোনদিন জোটে না। পুরানো জমিদার ছেলের হাতে জমিদারীর ভার দিয়েছে। সে নবীনকে মুখ্যু বলে মাইনে বাড়াতে নারাজ। কাজেই নবীনের যে দুঃখু সেই দুঃখু।

এক পাড়াতেই বাড়ী। লোকে বলে ওনাকি টুনুর কাকার বাড়ী। ওদেখেছে কাকারও একটা ছোট মেয়ে আছে। ওর বড্ড ভাল লাগে তাকে।

গেলে কাকা কিছু বলেনা তবে কাকী দূর দূর করে। তবুও রাস্তায় যখন দুজনার দেখা হয়, তখন তাদের কত কথা হয় তার মানে আমরা বুঝিনা। তাতে মনের

যে সরলতার ছাপ ফুটে ওঠে তা সত্যই স্বর্গীয়। তাই কাকা কাকীর আড়ালে সে রুণুকে ভালবেসেছিল। ছেলেমানুষ বলেই রুণুর সাজ পোষাক দেখে মা বাপের কাছে আবদার করত। কিন্তু নবীন পাবে কোথা। আবদার মাঠে মারা যেত ছোট কচি বুক অভিমানে ফুলে ফুলে উঠে এক সময় নীরব হ'ত; কিন্তু হ'তনা তাদের অক্ষমতাই যাদের ললাট লিপি।

এই রকমই এক পুজোর সময় পাড়াটা সরগরম। টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে বললে রুণুর কেমন সুন্দর লাল জামা হয়েছে। তারও সেই রকম চাই। অক্ষম মা বাপের দোহাই দিয়ে তখনকার মত তাকে সামলালে। কিন্তু বাপ আসতেই টুনুর বায়না প্রবলভাবে বেড়ে গেল। জামা না পেলে সে ভাত খাবেনা। কিছুতেই যখন ভুলতে চাইল না তখন নবীন দিল এক চড়। পড়ে গিয়ে ঠোঁট একটু কেটে গেল তবু জামার বায়না ছাড়াল না। কেঁদে কেঁদে বিকেলের দিকে তার জ্বর এলো। জ্বর বিকারে পরিণত হল। ভুলবকতে লাগল "দেখ রুণু আমার বাবা আমায় ক....ত ভালবাসে, তোর চেয়ে আমার জামা কত ভাল, না বাবা?" হাসপাতালের ডাক্তার এল, ওষুধ দিল কিন্তু কিছু ফল হলনা। যখন জ্ঞান থাকে আবার তখন জামার বায়না ছাড়া কোন কথা ছিলনা। আর বিকারের ঘোরে পাওয়ার মিথ্যে প্রবঞ্চনা। অবস্থা যখন খুব খারাপের দিকে তখন জামার বায়না ছাড়া কোন কথা ছিল না। তখন নবীন একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য উঠে পড়ল। গত দুদিন তাদের পেটে ভাত পড়েনি। শরীর দুর্ব্বল। তবু কোন রকমে মাথা নিচু করে ভায়ের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

সদর দরজা খোলা ছিল। নবীন দেখল ভিতরে চুড়ীওয়ালা বসে আছে। রুণুর হাত ভরা চুড়ি। সেই রকম নবীন একটু ইতঃস্ততঃ করে পা বাড়াতে যাবে তখন কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল।

"ও কেন এসেছে?"

"কে জানে, বোধ হয় টাকা চাইতে।"

"খবরদার একটা পয়সাও দিওনা। তাহলে আর তো ফেরৎ পাবেনা।"

"আরে আমি কি তা না জানি।"

আস্তে হলেও নবীন সবই শুনতে পেল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মাটি ভিজল—কিন্তু ভায়ের মন ভিজলনা।

বিপিনই জিজ্ঞাসা করল—"কি জন্যে এসেছো"?

নবীন স্তব্ধ হ'য়ে একবার ভায়ের মুখের দিকে তাকাল, তার পর খুব ধীরে ধীরে বলল, মেয়েটা একটা লাল জামার বায়না করে জ্বরে পড়েছে। বোধ হয় বাঁচবেনা। তাই একটা পুরনো জামার জন্যে এসেছিলুম। যদি দিস অন্ততঃ যাবার সময় সে হাসিমুখে যেতে পারে।" আমি আর কখন তোর দরজা মাড়াব না। একটা ছেঁড়া জামা আমায় ভিক্ষে দে"।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল—"না-না ওতে আমার রুণুর অকল্যাণ হবে। ওকে যেতে বলে দে রুণু"

নীচে পৃথিবী মাথার ওপরে আকাশ। দুজনেই মৌন হয়ে নবীনকে লক্ষ্য করছে। আর নবীন—সে পাথর হ'য়ে গেছে। আঁখির পিছনে উদ্যত অশ্রুর ধাক্কা, বুকের ভেতর অভিমানের হিমাচল। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ীর বিষাক্ত হাওয়ায় তার দমবন্ধ হ'য়ে আসছিল। বইরে এসে খুব ভারী রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস কার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে কোথায় মুখ লুকাল কে জানে।

রাস্তায় চলেছে যে আচ্ছন্নের মত। যেন নেশা করেছে। হঠাৎ চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দেখল পথের উপর একটা সুন্দর লাল জামা পড়ে রয়েছে। কাদের বারান্দা থেকে উড়ে এসে পড়েছে। নবীন ছোঁ মেরে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। দরজায় পা দিয়েই কান্নার আওয়াজে সে বসে পড়ল। তাহলে সব শেষ। হঠাৎ আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল "টুনু মা আমার, ছেলের ওপর অভিমান করে চলে গেলে।" সেদিনটা ছিল মহাষ্টমী।

মহাত্মা স্মরণে

লক্ষ্মী নারায়ণ সেন

●

উদ্ধারিতে শৃঙ্খলিতা সতী দেবকীরে
জন্মিলেন নারায়ণ কংশ-কারাগারে,
পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী যমুনার তীরে,
মেঘাচ্ছন্ন ধরণীর নিশার আঁধারে।
জুড়াতে বন্ধন-জ্বালা, দানিতে মুকতি
কারারুদ্ধা পরাধীনা স্নেহময়ী মা'য়
নাশিলেন নারায়ণ স্ববলে যেমতি
মথুরাধিপতি কংশে পরম হেলায়।
সেইরূপে পরাধীনা ভারত মাতার
ভেঙ্গে দিতে হে মহান্, কণ্টক আসন
দানিলে মুকতি তুমি স্ববলে তাহারে
বিতাড়িয়া দেশ হতে বিদেশী শাসন
হে মহাত্মা, হে মহান্ তোমার চরণে
জানায় প্রণতি আজি দেশবাসীজনে।

●

ভোরের পাখী

শ্রীঃ নীল কুমার সাধু

●

বেড়ায় উড়ে ভোরের পাখী গাছের ডালে ডালে।
চাঁদ ডুবে যায় সূর্য ওঠে এই প্রকৃতির ভালে॥
সূর্য উঠলে হয় যে আলো।
পাখীর কূজন শুনতে ভালো॥
সাঁঝের আভাস পেয়ে তারা কিচির মিচির ডাকে।
এদিক ওদিকে উড়ে বেড়ায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে॥
রাতের তারা ঘুমায় ধীরে।
আপন আপন বাসায় ফিরে॥
ভোরের আলো পেয়ে তারা বেরোয় ঝাঁকে ঝাঁকে
সারি বেঁধে উড়ে চলে কৃষ্ণা নদীর বাঁকে॥

●

প্রসঙ্গ কথা

শ্রীহারাধন দত্ত

পৌষের পদক্ষেপে আমরা শীত জর্জরিত হয়ে পড়েছি। এ ভারতের প্রাকৃতিক জীবনের কথা। উত্তরন্থাং দিশির —শীতপ্রবাহ আর্য্য ভারতের সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের অভিভূত ও জরাজীর্ণ করে তুলেছে। প্রাকৃতিক নিয়মের এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সোজা নয়। আমরাও পাই নি। মৃত্যু ও প্রাকৃতিক নিয়ম। বাংলা-দেশের বুকে হঠাৎ মৃত্যুর যেন তাণ্ডব লীলা হয়ে গেল। প্রচণ্ড মৃত্যুবাত্যায় বড় বড় শালপ্রাংশু মহীরুহের পতন হল! আমরা দেখলাম। দেখলাম অতুলচন্দ্র, সুবোধ মিত্র, সুরেশচন্দ্র, ডক্টর অতীন বসু, অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী, অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, অধ্যাপক ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, অধ্যাপক নির্ম্মল সিদ্ধান্ত, অধ্যক্ষা রাণী ঘোষ, চিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ হাবুল সরকার—একে একে শোভা-যাত্রা করে মহাপ্রয়ানে চললেন। বঙ্গ মনীষার মন্দিরের দেউটি একে একে নির্বাপিত হোল। আমরা শোকাভি-ভূত ও মুহ্যমান হয়ে গেলাম। কিন্তু এত প্রাকৃতিক নিয়ম। মৃত্যু আসেই। সহ্য করতে হয় শোক ও বেদনাকে। আদিকাল থেকে মানুষ তাই করেছে। এরই মধ্যে আমরা ভারতের শেষ সাম্রাজ্যবাদী শোষক পর্ত্তুগীজদের অবসান দেখলাম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক নবদিগন্ত উদ্ঘাটিত হোল। সেই নবীন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে গৃহাভিমুখী হয়েছি। কিন্তু তাকিয়ে দেখি আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। বিগত চল্লিশ বৎসরে আমরা ...অধিকারী হয়েছিলাম, দেখা গেল সেখানে ছেদ পড়ে গেছে। আমরা আর চলতে পারিনি। আমাদের সমাজ বিস্তার কথা বলছিলাম। যে গন্ধবণিক আমাদের সমাজ সন্দেশকে পরিবহন করতো—তার হঠাৎ মৃত্যু ঘটেছে। কেন এই মৃত্যু, কেন এই ছন্দ পতন। জয়যাত্রার পথে আবার এই দুর্জ্জয় বাধা কেন? গন্ধবণিক, পত্রিকাকে এতদিন যিনি বাসুকীর মত মস্তকে ধারণ করে রেখেছিলেন—সেই অদ্বিতীয় অতুল্য সমাজ সেবী পুণ্যশ্লোক সাধনধন নাগ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। এই মর্তলোক হতে তিনি আজ বহু দূরে—। সে জন্যই ভাদ্রের পর প্রকৃতপক্ষে আর কোন পত্রিকা প্রকাশ হতে পারেনি। শারদীয় সংখ্যার জন্য যেটুকু তিনি প্রস্তুত করেছিলেন—সেই কতিপয় পৃষ্ঠাই আশ্বিন সংখ্যা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতক্ষণে যা বলেছি—তাতেই গন্ধবণিকের পাঠক সাধারণ পত্রিকা অপ্রাপ্তি এবং প্রকাশের বিলম্বজনিত কারণ সম্বন্ধে অসন্দিহান হতে পারবেন। স্বর্গীয় সাধনধন নাগই বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় বস্তু।

পরলোকে সাধনধন নাগ

বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর (বাংলা ৯ই আশ্বিন, ৬৮) সাধনধন নাগ মহাশয় কর্ম্মরত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৮ বৎসর ছিল। তাঁর স্ত্রী বহু পূর্বেই পরলোক গমন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা জামাতা এবং নাতি নাতনীদের রেখে গেছেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। আজ থেকে

৬৮ বৎসর আগে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় প্রসিদ্ধ নাগ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় হরিধন নাগ মহাশয়ের নামও বহু জনপরিচিত। তাঁর জীবন কথার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বারান্তরে সাধনধন নাগ মহাশয়ের ঘটনাবহুল জীবনের চিত্র উপস্থিত করার ইচ্ছা রইল।

সাধনধন নাগের আকস্মিক মৃত্যু; সমগ্র গন্ধবণিক সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গন্ধবণিক, পত্রিকার পক্ষে এ মর্মান্তিক। গন্ধবণিক, পত্রিকার তিনি কত বড় স্তম্ভ ছিলেন— আজ তাঁর অভাবে আমরা এ সত্য সকলেই উপলব্ধি করেছি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত প্রায় ৩ মাস পরেও পরবর্ত্তী কোন সংখ্যা প্রকাশ করতে পারিনি। সাধনধন নাগের মৃত্যুতে আমাদের পত্রপাবলিশিং সোসাইটি যে অনেকাংশে অসহায় হয়েছেন এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। তিনি গন্ধবণিক পত্রিকার মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন। কিন্তু সাধনধনের পরিচয় এই সংক্ষিপ্ত আভিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার পরিচয় এত সংক্ষিপ্ত নয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ স্বজাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় জাতীয় জাগরণের শঙ্খ ঘোষিত হয়। সাধনধন নাগ মহাশয় সেই জীবন জাহ্নবীর উৎসমুখে অবগাহন করেছিলেন। সমাজ সেবার সেই উষালগ্নে—তিনি সেবার মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন। প্রেসের ব্যবসা তাঁর পেশা ছিল। কিন্তু নিজ ব্যবসায় কিয়দংশ তিনি সমাজ সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। ইদানিং এরূপ চরিত্র বিরল দৃষ্টান্ত। গন্ধবণিক পত্রিকার প্রথম প্রকাশক, বোধকরি নীলমনি দাঁ মহাশয়। নীলমণি দাঁ'র পরেই সাধনবাবু পত্রিকাখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহন করেন। তারপর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪০ বৎসর একাগ্রভাবে এই পত্রিকার পিছনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইদানীং পত্রিকা তাঁর কাছে জীবনের অংগের মতই প্রতিভাত হত। প্রকাশক মুদ্রকের পরি:য়ে সাধনবাবুকে পরিচিত করলে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। নাম মাত্র মূল্যে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কেবল তাই নয়—পত্র পাবলিশিং সোসাইটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। গন্ধবণিক পত্রিকার প্রকাশক, মুদ্রকই হিসাবে নয়—তিনি একাধারে এই পত্রিকার সম্পাদক, নির্বাহক, প্রকাশক, মুদ্রক, সর্বময়কর্ত্তা ছিলেন। পত্রিকা সম্বন্ধীয় সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে ছিল। সাধনধন নাগকে বাদ দিয়ে, গন্ধবণিক পত্রিকার কথা চিন্তা করা যায় না। বাংলা দেশে সাময়িক পত্র সম্পাদনার ইতিহাসে, গন্ধবণিক পত্রিকাখানির যদি কোন মূল্য থেকে যায় তাহলে সেখানে সাধনধনের কৃতিত্বই সর্বাধিক। চল্লিশ বৎসরের গন্ধবণিক পত্রিকার পত্রে তাঁর নিপুন হস্তের বর্ণলিপি ও আন্তরিকতার গূঢ় গাঢ় রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। অনাগত কালের গন্ধবণিক সমাজ নিশ্চয়ই এ ইতিহাস মনে রাখবেন।

আমাদের সমাজের পত্রিকা পরিচালনায়, তিনি যে ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন—তার দৃষ্টান্ত যে কোন সময়ে যে কোন সমাজে বিরল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি হীন একজন সাধারণ মানুষের ঐ ত্যাগ, ব্যবহারিক বুদ্ধি, বিদ্যোৎসাহিতা এমন কি লিপি কুশলতা আমাদের সম্মুখে আলোকবর্তিকার মত বিরাজ করবে। কেবল পত্রিকা পরিচালনার মধ্যেই নয়—আমাদের সমাজ সেবার সর্ব অংগে—যেমন গন্ধবণিক মহাসভা, গন্ধবণিক দাতব্য সভা, গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতি প্রভৃতিতে তাঁর অসাধারণ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি এই সংস্থাগুলির সংগেও গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নানাবিধ ছোটখাট ত্যাগের দ্বারা তাঁর অস্তিত্বকে মহীয়ান করে তুলেছিলেন। নাগ মহাশয় এক কালে নিজ লেখনীতেও গন্ধবণিককে পরিপুষ্ট করেন। প্রাচীন গন্ধবণিক পত্রের ফাইলগুলো অনুসন্ধান করলে সাধন নাগ লিখিত অনেক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বজাতীয় সমাজ সেবা ছাড়াও তাঁর জনপ্রিয়তার অন্য দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এককালে স্বরগীতি বালিকা বিদ্যালয় ও অন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় (অধুনালুপ্ত)

প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উৎসাহী ছিলেন। সম্পাদক ও ছিলেন। College Square Swimming Clubএর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক-জন। বেনিয়াটোলা কর্পোরেশন নির্বাচনেও তিনি একদা কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেন। পটলডাঙ্গা কালী কীর্ত্তন সমিতির সম্পাদক ছিলেন এই সাধনধন নাগ। এরূপ বহু কিছু প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর সক্রীয় যোগাযোগ ছিল। সাধনবাবুর সেই বহু বৈচিত্রময় জীবনের কথা বলে শেষ করা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা ও কাহিনী যুক্ত হয়ে পড়বে—সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। সাধনবাবুর জীবনের এই গোধূলি লগ্নে আমি দৈনন্দিন সহচর ছিলাম। তাঁর জীবনের এই শেষ আট নয় বৎসর বর্তমান লেখকের সংগে গভীর ভাবে যুক্ত ছিল। সম্পাদনা ব্যাপারে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁর প্রেসে আমাকে আসতে হোত। রবিবার ছাড়া কোন দিনই প্রায় বাদ যেত না। এই সন্ধ্যাবেলাটা প্রায়ই সাহিত্যের আসর বসত। মাঝে মাঝে বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ বাবু আসতেন। সাহিত্যিক মণীন্দ্রবাবু, কবি কৃষ্ণধন দে, নীলিমা ভট্টাচার্য্য বেহু গঙ্গোপাধ্যায়, কবি কালিদাস রায়, কবি রামেন্দু দত্ত, প্রভাত চন্দ্র দত্ত, ডক্টর অনিল দে, সাধনবাবুর দৌহিত্র চন্দ্রনাথ পাল, প্রভৃতি অনেকেই এসে এ মুহূর্ত্ত-টিকে মনোরম করে তুলতেন। সাধনবাবু এ সভায় নায়কত্ব করতেন। তিনি বলতেন আমি মূর্খ হতে পারি —কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়। আমি আট বছর অবিনাশ চন্দ্র দাস, তারক নাথ সাধু, নিত্যগোপাল রুদ্র বেদান্তরত্ন, কবি কৃষ্ণধন দে, শ্রীমণীন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বিদ্বান ব্যাক্তিদের সংগে কাজ করেছি—আমার একটা প্রত্যয় বৃদ্ধি জন্মেছে। এই দম্ভোক্তি সাধনবাবুর মুখে প্রায়ই শুনেছি—সত্যি বলতে কি তিনি এ বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন। ইদানিং তাঁর রুচি পরিবর্ত্তন দেখে-ছিলাম। তিনি বলতেন—যুগ পালটেছে। আমাদেরও মত পালটানো প্রয়োজন। শুধু জাতি কথায় পত্রিকা চলে না। এই পত্রিকায়—অন্য সমাজের লেখকদেরও গ্রহণ করা উচিত। গন্ধবণিক, এই নামও অচল। এর নাম বরং সওদাগর করা উচিত। তাহলে বোধ হয় অন্য সমাজেও বিক্রয় করা যায়। পত্রিকার আঙ্গিক সৌষ্ঠব একান্ত প্রয়োজন। এই সব যুগোচিত রুচির কথা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। যাঁরা এসব বিষয়ের ব্যাপারী —তাঁরা এই কথাগুলোর মূল্য অবশ্যই অবগত হবেন। বাস্তবিকই—তাঁর এই ইচ্ছা অনেকাংশে গন্ধবণিকে প্রবর্তিত হচ্ছিল। তিনি জীবিত থাকলে—এর একটা নূতনতর রূপ দেখে যেতে পারতেন। সাধনবাবু অতিরিক্ত পরিমানে স্বচ্ছবাদী ছিলেন এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সমাজ নেতৃবৃন্দের মতান্তর ঘটে থাকতো। কিন্তু তিনি হৃদয় হীন ছিলেন না। তাঁর উদারতা ও মহত্বের কথা ও আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। সাধনধন নাগের চরিত্রের এই সমস্ত দিক স্বল্পকথায় ব্যক্ত করা যায় না।

বিগত ৯।১০ বৎসর বর্তমান লেখক তাঁর সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন এই সংস্পর্শ অভিজ্ঞতা হতে সাধনধন নাগের জীবনের বিচিত্রকথা লিপিবদ্ধ করা যায়। ইদানীং তিনি আমাকে সম্পাদক হিসাবে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে-ছিলেন কোন গন্যমান্য ব্যক্তি প্রেসে আগমণ করলেই— আমার নানাপরিচয় দিয়ে পরিচিত করতেন। এতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হতাম! তিনি আমাকে অধিকাংশ সময়ে ডক্টর অবিনাশ দাস, নৃত্যগোপাল রুদ্র, কৃষ্ণধন দে, মণীন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কৃতি সাহিত্যরসীদের সঙ্গে তুলনা করতেন। বাস্তবিকই তাঁর কাজে বর্ত্তমান সম্পাদক নানাভাবে ঋণী। তিনি আমাকে দুর পল্লী বাংলা থেকে আনয়ন করে সাহিত্য ও সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি দু-একবার আমার নিবাস নদীয়া জেলাতেও গিয়ে-ছিলেন। আমি যখন সুদুর পল্লী বাংলায় বঙ্গ সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে কর্মরত—আমার তখনকার কতিপয় লেখা বিবেচনা করে তিনিই আমাকে পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করে পত্র প্রেরণ করেন। এ ১০ বৎসর আগেকার

ঘটনা। এ বিষয়ে মণীন্দ্রবাবুর বিচার বুদ্ধিও যুক্ত হয়েছিল। তারপর কাজ নিয়ে কোলকাতায় এসে তার সংগে মিলিত হয়েছি। জীবনের গোধুলি বেলায়—তার জীবনের বিচিত্র কথা শ্রবন করেছি। তিনি যে আমার কাছে কত গল্প করতেন—তার সমগ্র পরিচয় এখানে সম্ভব নয়। তারপর সুখ্যাতির প্রচেষ্টাতেই আমি পত্রিকার সম্পাদক হই। বিগত কয়েক বৎসরে সম্পাদক হিসাবে এই পত্রিকার কতটুকু করেছি—আমদের পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। অবিনাশ দাস হতে সুরু করে—বহু সম্পাদকের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেন। তার জীবদ্দশায় আমিই সে ধারার শেষ সম্পাদক। তাঁর মতে আমিই নাকি সর্বকনিষ্ঠ সম্পাদক। ইদানিং তিনি জীবনের উপর অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন—নানা সূত্রে আমি তা অবগত হয়েছিলাম। আমাদের সাহিত্য আসরে অতি গোপনে তাঁর জীবনের প্রতি এই ভীতির কথা বলতেন। কিন্তু তিনি যে এতশীঘ্র চলে যাবেন তা ভাবতে পারিনি। প্রতিদিন যেমন এসে থাকি ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে অফিস ফেরার পথে এসেছিলাম। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি হতবাক হয়েছিলাম।—এমন কি কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ় হয়েছিলাম। ঐ তারিখেই যে মৃত্যু হবে তার আগের দিন এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইনি। আগের দিনও পূর্ববৎ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তিনি প্রেসে ছিলেন আমিও ৮টা পর্য্যন্ত ছিলাম। তারপরেই এই ঘটনা।

তাঁর মৃত্যুতে আমাদের পত্রিকা আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। এই দুর্দম বাধা অতিক্রম করতে হয়ত আরও কিছু সময় লাগবে। হয়ত পত্রিকাও আমাদের যথারীতি প্রকাশিত হবে। কিন্তু সাধনবাবুর শূন্যতা পদে পদেই আমরা উপলব্ধি করবো। বিগত ৩ মাস থেকে আমরা তা উপলব্ধি করছি। তিনি প্রার্থিত ধামে চলে গেছেন—কিন্তু পিছনে রেখে গেছেন তাঁর অর্দ্ধ শতাব্দীর সাধনা। অনুকরণীয় চরিত্র—তেজস্বীতায়, স্পষ্টভাষণে ভাস্বর, দয়ায় সহানুভূতিতে করুণাদ্র ত্যাগে মহীয়ান সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন চরিত্র—কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারই প্রেরণায় একদা এই 'প্রসঙ্গ কথার' সুরু। এই প্রসঙ্গ কথাতে, তিনি সমকালীন স্মরণীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে শোভিত করতেন এই লেখককে করতেন অনুপ্রাণিত। আজ সেই প্রসঙ্গ কথাতে, তাঁরই মৃত্যু সংবাদ তাঁরই সোদর প্রতিম, তাঁরই হাতে গড়া সম্পাদক দ্বারা লিখিত হচ্ছে—এই বর্ত্তমান লেখকের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ট্রাজিডি। তাঁর জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও রচনা করার ইচ্ছা রইল। আমরা এই অবসরে একান্ত সুহৃদ বিদ্যোৎসাহী, গন্ধবণিক পত্রিকার, একনিষ্ঠ সেবক স্বর্গীয় সাধনধন নাগের পরলোকগত আত্মার কল্যান কামনা করছি। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের কল্যান কামনা করছি। বারান্তরে সাধনবাবুর প্রসঙ্গ আমরা আবার আলোচনা করবো—কনিষ্ঠ সম্পাদকের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই আজিকার প্রসঙ্গ কথার যবনিকা হোল। অন্ধকারের পর সূর্য্যোদয়। এই শোক পারাবার পেরিয়ে আমরা জ্যোতির্ম্ময়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করি। নূতন করে যাত্রা সুরু হোক গন্ধবণিকের। দূর হতে আমরা সাধনধন নাগের শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছালাভ করবোই। অয়ং শুভারম্ভ।

বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ

রাণী বণিক

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামের পূর্বে বৈয়াকরণ বিশেষণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয় কারণ কবি ও ব্যাকরণকার সাধারণতঃ ভিন্নপথের পথিক। কবির দৃষ্টি সামগ্রিক দৃষ্টি আর বৈয়াকরণ যিনি তিনি সমস্ত শব্দকে, ভাষাকে, বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে প্রকাশ করিতেই ব্যস্ত। কাজেই কবি ও বৈয়াকরণ হিসাবে একই ব্যক্তিকে ভাবিতে গেলে একটু বিস্ময়বোধ হয় বৈকি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং সেই প্রতিভাও ছিল অলোক-সামান্য। তাই তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়কে বিচিত্র সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিভার এমন বৈচিত্রময় স্ফুরণ একমাত্র তাঁহার মধ্যেই সম্ভব হইয়াছিল।

মানুষ তাহার স্বভাব ধর্মকে কখনও অস্বীকার করিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথও পারেন নাই। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় কবি হিসাবে। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেখানেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার কবি পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন সে পরিচয় পাওয়া যায় 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকাতেই।—

"ভাষা তত্ত্বে প্রবীন সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল বিজ্ঞানী আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী।"—সুতরাং ব্যাকরণের নীরস শব্দতত্ত্বই তাঁহার আলোচ্য বিষয় নয়। তাই যথার্থ কবি ও বৈয়াকরণের মধ্যে যে পার্থক্যের সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। যে নিয়মের ঐক্য ধরিয়া ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় সেই নিয়মেরও নানা অদল বদল হয়। এই অদল বদল কেন হয় তাহার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ অনেক সময় পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার করিয়া অথবা দুরূহ শব্দতত্ত্বের নানা জটিলতার আলোচনা দ্বারা তিনি গ্রন্থখানিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। ভাষার ক্ষেত্রে পথ চলিতে চলিতে যাহা তাঁহাকে খুশি করিয়াছে, ভাবাইয়াছে, আশ্চর্য্য করিয়াছে তাহারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন তিনি।

ভাষা কাহাকে বলে, ভাষার ক্রমবিবর্তন, সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য এইসূত্রে বাংলা ক্রিয়াপদের স্বরূপ; স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিভিন্ন রকমের বিকৃতি, সর্বনামের ব্যবহার, বিশেষণের বিশেষত্ব; প্রত্যয় ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন দিকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে চিন্তাশীল আলোচনা করিয়াছেন। আর এই আলোচনাও যে কবি বৈয়াকরণের তাহার পরিচয় আলোচনার ভঙ্গিতেই সুস্পষ্ট। ব্যাকরণে ভাষার সংজ্ঞা আমরা শিশুকাল হতেই মুখস্থ করিয়া আসিতেছি কিন্তু সেই একই সংজ্ঞার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথও করিলেন কিন্তু তাহা কেমন বিচিত্র উপমার সংযোগে প্রকাশ করিলেন—

"কোঠা বাড়ির প্রধান মশলা ইট, তারপরে চুন-সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম

শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।”

বাংলা গদ্যের লেখ্য রূপটা এতকাল ছিল সাধু ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ। প্রমথ চৌধুরী তাহাতে একটা নাড়া দিলেন সত্য কিন্তু তবুও একমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহার ছাড়া অন্যত্র তিনি চলিত ভাষার সহজরূপটিকে ধরিতে পারেন নাই। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের একটা বিশেষ পার্থক্য হইতেছে চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ততা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বর্ণের ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছেন। তিন বা ততোধিক অক্ষরব্যাপী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগাইয়া শেষ অক্ষরে একটি স্বরবর্ণ জুড়িয়া যে বিশেষ উচ্চারণ প্রবণতা বাংলা ভাষায় দেখা যায় সেই বৈশিষ্ট্যটুকুও তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে—যেমন ছিট্‌কে পড়া, কাৎরে ওঠা ইত্যাদি। হসন্ত বর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যে যুক্তবর্ণের প্রাধান্য ঘটিয়াছে তাহার প্রতিও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রভাব যে 'অ'কার উচ্চারণের প্রতি আমাদের উপেক্ষা বশতঃ সে কারণও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। উচ্চারণ বিকৃতির ফলে আমরা 'অ'কে 'ও'কার উচ্চারণ করিতেছি কিন্তু তাহা নিতান্তই মুখের সীমায় আবদ্ধ হাত পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই তাই কলমের মুখে তাহার শুদ্ধরূপটাই প্রকাশমান। সেজন্য 'মোন' উচ্চারণ করিলেই শিখি আমরা 'মন'ই। 'অ'-কারের এই বিড়ম্বনা কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে নেই। 'অ'কার মধ্যবর্ণে 'য়'বর্ণের পূর্বে স্থান চ্যুত হয় নাই। যেমন, সময়, মলয়, ইত্যাদি। 'অ'-কারান্ত যুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে ও মধ্যস্থিত 'অ'কারের পদচ্যুতি ঘটিয়াছে।—যেমন বসন্ত, আলস্য। 'অ'-কার আরও তাড়া পাইয়াছে 'ই'-কার আর 'উ'-কারের কাছে। তাহাদের মিলিত শক্তির নিকট 'অ'-কারকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'অ'-কারকে পদে পদে অপদস্থ করিতে 'এ'-কার ও যথেষ্ট আগ্রহশীল। 'অ'-কার যুক্ত শব্দের বিকৃত উচ্চরণ 'এ'-কার প্রাধান্য পাইয়াছে, যেমন—*প্রহ্লাদ—পেল্লাদ।* বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট স্বরবর্ণ কয়টি ছাড়াও একটি 'এ্যা' (্যা) উচ্চারণ বাংলা স্বরবর্ণে স্থান পাইয়াছে।

এই তো গেল উচ্চারণ তত্ত্ব। এইবার আসা যাক বাংলা শব্দ যুগ্ম, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও প্রত্যয়ের আলোচনায়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে বসিলেও শব্দ তত্ত্বের কঙ্কাল লইয়া তিনি নাড়াচাড়া করেন নাই বরং বাংলা ভাষা যে বিশেষ ভঙ্গিযুক্ত ভাষা এবং স্বরবর্ণের সামান্য তারতম্য অথবা একই প্রত্যয়ের শব্দবিশেষ ব্যবহারের ফলে কেমন অর্থের ও পরিবর্তন ঘটে ভাষার সেই কৌতুহলজনক দিকটিতেই পাঠকের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। উদাহরণ সহযোগে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা চলে।—খাব-খাব; পড়ো-পড়ো; কাঁদো-কাঁদো ইত্যাদি শব্দযুগ্মে ভাবের যে ভঙ্গিটি প্রকাশ পায় তাহা একান্তভাবেই বাংলা ভাষার নিজস্ব ভঙ্গি। 'পড়ো' 'পড়ো'তে বা কাঁদো কাঁদো-তে যে বিশেষ ভাবটির আভাস পাওয়া যায় ইহাদেরই সংস্কৃতরূপ পতনোন্মুখ বা বাস্পাকুলে সেই বিশেষ ভাবটির একান্তই অভাব। ঝর ঝর; গা ছম্ ছম্ করা; খিটখিটে; ধপাস করে এই ধরণের ধ্বন্যাত্মক শব্দে ভাবপ্রকাশের যে সার্থকতা লাভ করা যায় ইহার পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ ব্যবহারে তাহা পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরণের শব্দ ভাষায় থাকিলেও এই বাংলা শব্দগুলির মত অন্য কোন শব্দ যোগ্য অর্থবহ নয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যোগে যে নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করা হয় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। স্ত্রীলিঙ্গে 'নী'—প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়—যেমন—সিংহ, সিংহিনী, বাঘ, বাঘিনী কিন্তু ঘোষের স্ত্রীলিঙ্গে কখনও ঘোষিনী বলা হয় না। আবার বামনী, কায়েতনী বলিলেও বদ্দিনী বলা হয় না বা দর্জিনী ও ব্যবহার করি না।

আবার বাঁদরামো বা পেজোমো ব্যবহার করিলেও মেঠোমো বলিতে পারি না। আবার 'আনা' প্রত্যয়ে বিবিআনা, বাবুআনা এই ভাবগুলি প্রশংসনীয় না হইলে ও গরিবিআনা শব্দে কপট অহংকারের ভাব আছে কিন্তু সাধুআনা শব্দটিতে যে ভাবটি প্রকাশ পায় তাহা সত্যকারের সাধুত্ব নহে। অনি বা আনি প্রত্যয়ের মধ্যেও অবজ্ঞার ভাবটি বিশেষ পরিস্ফুট।—যেমন—লোকহাসানি খিঁচুনি ইত্যাদি। এই ধরণের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায় এবং বাংলা ভাষার এইরূপ আরও বহু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ মননশীল আলোচনা করিয়াছেন। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবপর নয় কাজেই আলোচনাকে আর দীর্ঘতর করিয়া লাভ নাই। তবে এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে এই ভাষাতত্ত্বের ভাষা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতে চাই।

ব্যাকরণের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই। ভাষাতত্ত্বের মত নীরস আলোচনাকেও যে সরস করিয়া প্রকাশ করা চলিতে পারে বাংলা ভাষা পরিচয় তাহারই প্রমাণ। ইহার আলোচ্য বিষয় বৈয়াকরণের আর প্রকাশ কবির হাতের। গ্রন্থখানির প্রধান গৌরব এইখানেই।

কবিতা সুন্দরী

শ্রীরাঘব দত্ত (কীর্ণাহার)

তোর কবি নই আমি কবিতা সুন্দরী,
ওঠে নাকো কোন ভাব মোর মনে গুঞ্জরী
এতদিন গেল তবু একটাও ছত্র
পারিনি লিখিতে তাই লিখি এই পত্র।

প্রকৃতির লীলা আমি ভালবাসি সত্যি
কল্পনা ?—সে তো বাস্তবে ভর্ত্তি।
চারিদিকে বিষজ্বালা, চারিদিকে পাহারা
তাই আজি মোর কাছে দুনিয়াটা সাহারা।

প্রতিদিন খাতা খুলে একা শুধু বসে রই,
কি লিখিব, কি আকিব এই ভেবে সারা হই।
তবু তুমি কবিতা একবারও আস না,
মনে মনে বেশ জানি তুমি ভালবাসনা।

তাই বলি কৃপাময়ি, ওগো দেবী দয়া করি,
মোর মনে একবার ওঠো তুমি গুঞ্জরী।

পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণ

শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাঁ ও শ্রীমতী অমিতা পাল

[পশ্চিম জার্মানীতে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় রত শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দাঁ মহাশয়ের সহ-যাত্রিণী হয়েছেন তাঁর সহ-ধর্মিণী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাঁ ও শ্রীমতী অমিতা পাল। সুদূর জার্মাণ থেকে শ্রীমতী দাঁ ও শ্রীমতী পাল বাংলা দেশে বিশেষ করে কোলকাতার আত্মীয় স্বজনদের চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলিতে তাঁদের ঘরোয়া কথার ফাঁকে ফাঁকে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ ছিল। সেই চিঠিগুলিই "পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণ" এই শিরোনামায় 'গন্ধবণিকে' প্রকাশিত হতে থাকবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দাঁ এম-এস-সি মহাশয় গন্ধবণিক পত্র পাবলিশিং সোসাইটীর অন্যতম কার্য্যনির্ব্বাহক।]

সম্পাদক গন্ধবণিক

দমদম বিমান ঘাঁটী থেকে রাত ৯টার সময় প্লেন ছাড়ল। ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'এয়ার-কণ্ডিসানিং' যন্ত্র চালু হ'ল। 'এয়ার হোষ্টেজ' প্রথমে লজেন্স, চকলেট, লবঙ্গ, ছোট-এলাচ, কানে দেবার তুলা প্রভৃতি একটা ট্রেতে সাজিয়ে প্রত্যেকের কাছে নিয়ে এ'ল। সকলে পছন্দমত ঐসব কিছু কিছু তুলে নিল। তার দশ মিনিট পরে এক গ্লাস ক'রে আনারসের সরবৎ দিয়ে গেল। প্রত্যেকের 'সিটের' সামনের 'সিটের' পিছনে খাবার টেবিল লাগান থাকে। একটা সুইচ টিপতেই খাবার টেবিল সামনে এল। 'এয়ার হোষ্টেজ' একটি ট্রেতে সুন্দরভাবে সাজান 'ডিনার' দিয়ে গেল। খাবার পর সুইচটা টিপতেই খাবার টেবিল যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল। তারপর চেয়ারের হাতলে আর একটা বোতাম টিপতেই চেয়ারখানা ইজি-চেয়ারের মত হ'য়ে গেল। এইভাবে বেশ ঘুমান গেল। প্রত্যেক 'সিটের' উপরের দিকে তিনটি বোতাম আছে, একটায় 'এয়ার-হোষ্টেজ'কে ডাকা যায়, একটায় খাবার ও পড়বার মত আলো জ্বালা যায়, আর একটায় ঠাণ্ডা কম বেশী করা যায়। প্লেনের ভিতরটা সব পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া। বসবার সিটগুলি 'ডানলোপিলো' দেওয়া কোচ ধরণের। এয়ার হোষ্টেজরা সব সময় প্যাসেঞ্জারদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই দিকে নজর রাখে।

প্লেন কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছে তা ভিতর থেকে বোঝা যায় না, কেবল মাটি থেকে উঠবার সময় বোঝা যায় যে উঠছে। যখন উপরে উঠে গেলুম তখন শুধু কলকাতার আলোগুলো দেখা যাচ্ছিল—যেন ঠিক আকাশের তারার মত। আরও কিছু উপরে উঠলে নীচে মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। জেট্ প্লেন ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে চলে। আমরা যখন কলকাতার আকাশে তখন 'রেড রোড' ও চৌরঙ্গী বেশ বোঝা যাচ্ছিল—গঙ্গার জল ও ঝিক্‌মিক্ করছিল।

রাত এগারটার সময় আমরা বোম্বে পৌছলুম। সেখান থেকে রাত একটায় প্লেন ছেড়ে পরের দিন ভোর ৪টায় (আমার ঘড়ির কাঁটা তখনও সরাইনি, আমার ঘড়িতে তখন ৭॥টা বাজে) বিরুট পৌছল। সেখানকার 'এয়ার পোর্ট' থেকে 'সুইস-এয়ারের' বাসে ক'রে 'পামবিচ' হোটেলে উঠলুম। হোটেলটী সুন্দর সাজান। সেখানে ব্রেক-ফাষ্ট খেয়ে ট্যাক্সি ক'রে বিরুট সহর দেখতে গেলুম।

ফিরে এসে 'লঞ্চ' খাওয়া হ'ল—তারপর সন্ধ্যা আটটা পর্য্যন্ত ঘুম। আমরা হোটেলটীর ছ'তলায় ছিলুম। বাড়ীটীতে তিনটী 'লিফট্'—ঘরে ঘরে 'টেলিফোন', 'কণ্ট্রোল-হিটিং', 'এয়ার-কণ্ডিস্যানিং'। ঘরটী খুব সুন্দর ক'রে সাজান। রাত্রে 'ডিনার' খেয়ে ঘুম দিলুম।

পরের দিন ভোর চারটার সময় ঘুম থেকে উঠে সাড়ে চারটায় 'এয়ার-ওয়েজের' গাড়ীতে এয়ার-পোর্টে' যাত্রা করলুম। লেবানন সমুদ্রের ধারে অঞ্চলটা পাহাড়ী। রাস্তাগুলি তেমন চওড়া না হ'লেও—খুব পরিষ্কার। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি। রাস্তায় মানুষের চেয়ে গাড়ি চলে বেশী। ওখানে রাস্তায় যখন বেরিয়েছিলুম তখন লোকেরা যেন অবাক হ'য়ে আমাদের দেখছিল—বোধ হয় শাড়ী পরা মেয়ে ওরা দেখেই নি। বেলা সাতটায় প্লেন ছেড়ে বেলা দশটায় 'এথেন্স' তারপর 'জেনেভা' হ'য়ে 'জুরিখ' পৌঁছল। 'জুরিখে' আমরা বেলা একটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত ছিলুম। এই 'এয়ার-পোর্ট' অতি সুন্দর। এখানে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতে হয় যে এত লোক প্লেনে যাতায়াত করে—আমাদের দেশে লোক্যাল ট্রেনে যেমন হয়। কিন্তু এত লোকজনের যাওয়া আসার মধ্যে কোন গোলমাল হৈ চৈ নাই।

বিকাল পাঁচটায় 'সুইস-এয়ারের' মেট্রোপলিটন' প্লেনে উঠলুম। এতক্ষণ যত প্লেন চড়েছি সব 'জেট-প্লেন' ছিল—এটা আর 'জেট' নয়। ওঠবার একটু পরেই সন্ধ্যা ছয়টায় রাত্রের 'ডিনার' দিয়ে গেল। 'সুইস-এয়ারের' যত প্লেনে চড়েছি, আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছি এদের 'এয়ার হোষ্টেজদের' ব্যবহার, যত্ন ও আন্তরিকতা। এদিককার সব দেশে ছোটদের আদর খুব। আমাদের ছোট্ট রিতাকে যে দেখে সেই-ই আদর করে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা 'কোলোন' পৌঁছলুম। তখনও ঐ সহরে দিনের আলো রয়েছে। সেখান থেকে রাত্রি আটটায় বাসে ও ট্যাক্সিতে ১২।১৪ মাইল রাস্তা পার হ'য়ে 'বন্' পৌঁছলুম। 'বন্' পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। পূর্ব্বেকার বন্দোবস্ত মত এখানে 'ইডেন হোটেলে' রইলুম। এখানকার থাকবার হোটেলে 'ব্রেক-ফাষ্ট' ছাড়া অন্য খাবার পাওয়া যায় না। আমরা 'সিজার-প্লেস' নামে 'রেষ্টুরেণ্টে' গিয়ে খেয়ে এলুম। আমরা যে সুট-কেস্ এনেছি তা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে একলা নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ দেশের মেয়েরা অনায়াসে অক্লেশে আমাদের সুট-কেস নিয়ে সিড়ি দিয়ে উঠে গেল।

'বন্' থেকে ট্রেনে ক'রে আমরা 'নুরেনবার্গ' পৌঁছলুম। একটায় 'যুগোশ্লোভিয়ার' ট্রেন ছেড়ে সাতটায় পৌঁছল। ট্রেন থেকে দু'ধারের দৃশ্য এত সুন্দর যে বলা যায় না। 'রাইন' নদীর পাশ দিয়ে ট্রেনের লাইন আর অন্য দিকে উঁচু পাহাড়। 'নুরেনবার্গ' থেকে আবার ট্রেন ধরে আমরা রাত আটটা ত্রিশে 'এর্লান্জেন' সহরে উপস্থিত হলুম। এই ষ্টেশনে আমাদের রিসিভ করতে Siemens কোম্পানী থেকে সাহেব এসেছিলেন—তিনিই আমাদের সঙ্গে ক'রে আগে থেকে ব্যবস্থা করা বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

'এরলানজেন' সহরে আমাদের থাকবার জন্যে যে ফ্ল্যাটটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটী খুব চমৎকার। শোবার ঘরটী ডানলোপিলোর খাট, দেরাজ, টেবিল, টুল, 'বেবী-কট্', টেলিফোন, টেবিল-ল্যাম্প প্রভৃতি আধুনিক সরঞ্জামে সাজান। ঘরের মেজে সুন্দর কার্পেট দিয়ে মোড়া। বসবার ঘরটী বেশ বড়, এখানে 'সোফা-সেট' রাইটিং টেবিল, পিয়ানো, শো-কেস, বড় টেবিল, দুইটি বুক সেলফ্ প্রভৃতি আছে। ঘরের দেয়ালের বেশীর ভাগই কাঁচ, কাঁচের সামনে নেটের পর্দা ঝুলান আছে।

রান্নাঘরটীও দেখবার মত সুন্দর করে সাজান। ঘরে ঢুকেই বাঁদিকে ইলেকট্রিক 'হিটার' (উনুন), তার উপর

চারটী প্লেট বসান অর্থাৎ চারটী জিনিষ একসঙ্গে রান্না করা যায়। প্রত্যেকটীতে আবার আঁচ কম বেশী করা যায়। ভিতরে 'বেকিং-এর' ব্যবস্থা আছে। 'হিটারের' পাশে দুটো 'বেসিন'—বেসিনে কল একটী কিন্তু দুইটী হ্যাণ্ডেল—একটী ঘোরালে গরম জল, অন্যটি ঘোরালে ঠাণ্ডা জল পড়ে। এর পাশে একটী ছোট টেবিল। রান্নাঘরের ডানদিকে 'রেফ্রিজারেটর', একটি বাসনের আলমারি—বাসনগুলি চীনামাটীর, কাঁচের ও এনামেলের আলমারিতে থাকে থাকে সাজান। প্লেট ১২ খানা ক'রে ৩।৪ সাইজের আছে, ভাল কাপ-সসার ১২টী, কাঁচের গেলাস ৬টী ক'রে তিন রকমের; ভাত, ডাল রান্নাকরার মত এনামেলের বাসন ৬টী, এসব ছাড়া আরও কত যে বাসন আছে তা লিখে শেষ করা যায় না। একটা টানায় কাঁটা, চামচ, ছুরি, ভর্ত্তি; একটা টানায় রকমারি হাতা, চামচ, ডিম ফাটাবার যন্ত্র, নানা রকম আলু কাটার যন্ত্র, আরও অনেক রকম রান্না করার জন্য দরকার এমন সব যন্ত্রপাতি আছে যা আমরা ব্যবহার করতে জানি না।

'বাথ্ রুম' এত সুন্দর যে লিখে বোঝান যায় না। স্নান করার জন্য বড় 'সিঙ্ক্' (চৌবাচ্চা) আছে। তার মধ্যে গরম জলের ও ঠাণ্ডা জলের কল আছে। প্রয়োজন মত গরম ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে শু'য়ে বা ব'সে ইচ্ছামত স্নান করা যায়। বড় 'বেসিন' আছে, তাতেও গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল লাগান। বাথরুমের দেওয়ালে সবুজ টালি আর মেঝে সাদা কাল টালি বসান। অন্য ঘরগুলিতে কিন্তু নানারকম রং করা কাঠের মেঝে। সব ঘরে এমন কি বাথ্ রুমে ও 'সেণ্ট্রাল হিটিং'এর ব্যবস্থা আছে। বাড়ীর ভিতর সব জায়গায় 'এয়ার-কণ্ডিসনের' জন্য ঠাণ্ডা একদম টের পাওয়া যায় না। বাড়ীর বাহিরে কিন্তু অসম্ভব শীত; গরম জামা, ওভার কোট প'রে গেলেও বেশ ঠাণ্ডা লাগে। আমরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক ত! এখানকার বাসিন্দেরা বল্‌ছে এবার এসময়টায় নাকি এখানে বেশ গরম পড়েছে!

'এরলানজেন' একটী ছোট সহর কিন্তু যেমনি পরিষ্কার তেমনি সাজান। রাস্তা দিয়ে আধ ঘণ্টা অন্তর বাস যায়। রাস্তায় খুব কম লোকই চলাচল করে—বেশীর ভাগ লোকেরই গাড়ি আছে।

এখানে সাইন্স কলেজের এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোয়েছে—মিষ্টার সেন—তিনি ছয় বছর এখানে আছেন, জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছেন। আমরা এখানে আসার পরদিনই মিঃ সেন তাঁর স্ত্রীকে এ'নে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মিসেস্ সেন বেশ ভাল ইংরাজী বল্‌তে পারেন, যখন যা অসুবিধা ওনার কাছে জেনে নিতে বলেছেন। ওনারা শনিবার দিন আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। 'এমেল মায়ার' নামে Siemensএর আর এক ভদ্রোলোকের সঙ্গে আলাপ হোয়েছে।

তিনিও রবিবার দিন আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। এমেল মায়ার, তাঁর স্ত্রী মিসেস্ সেন ও আর যে সব জার্মানদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—প্রত্যেকেই খুব ভদ্র।

এখানে চাল, আটা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, রসুন পাওয়া যায়। দই পাওয়া যায়। এছাড়া এ দেশীয় শাক-সবজি আনাজ মিষ্টান্ন প্রভৃতি জিনিষ অনেক পাওয়া যায়। তবে সন্দেশ পাওয়া যায় না—সেইজন্যে কল্‌কাতায় মায়ের দেওয়া সন্দেশের বাক্সগুলি যত্নে 'রেফ্রিজারেটারে' রেখে দিয়েছি। কিছু কিছু বা'র করি—নিজেরা খাই আর অভ্যাগত এদেশের লোকেদের খাওয়াই—এই রকম আরও কিছুদিন ত চল্‌বে।

(ক্রমশঃ)

৺গঙ্গা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

'তাহলে একেবারে না খেয়ে ফিরলে বল ?' প্রভাতী চায়ের পাত্রটি গৃহিনীর নিকট গ্রহন করিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে কিছুটা ছাঁটিয়া ছোট করিয়া বলিলেন—'তা একেবারে না খেয়ে, বললে ভুল হবে। ষ্টেশনে কিছু চা-সিঙাড়া জুটেছিল। ঐ পার্য্যন্তই।

* * * * *

কাহিনীটা তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলা যাক্‌। পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাহাদের সংসারের বিস্তৃতি অন্দর মহলের অপেক্ষা বাহির মহলেই বেশী। লোক-লৌকিকতা, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বিবাহ-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বিবিধ সম্বন্ধও ক্রিয়াকাণ্ডই তাহাদের জীবনের একটি বৃহৎ অংশকে জুড়িয়া থাকে। বিশ্বেশ্বরবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ। নিজের সংসারের খুঁটিনাটি যেখানে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও অনায়াসে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়, লৌকিকতা সেখানে শুধু গোচরেই আসে না, পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হয়। লোক-লৌকিকতার সম্বন্ধ আছে এমন ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর বাবুর সামান্যতম অবহেলা অতি বড় নিন্দুকেও দিতে পারে নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহার কন্যা কৃষ্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন। জামাতাটি আধুনিক হইলেও বংশটি প্রাচীন। কাজেই বংশের শিকড় অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খেলারামবাবু বিশ্বেশ্বরবাবুর দূর সম্পর্কের বৈবাহিক। নিবাস বর্দ্ধমান। বিবাহ ব্যাপারে আসিয়া খেলারামবাবু বৈবাহিকের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার সময় করিয়া তাহার বর্ধমান বাড়ীতে পদার্পণ করিতেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু নানাবিধ ঝঞ্চাটের মধ্যে পড়িয়া বিশ্বেশ্বরবাবু আর সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই যাওয়ার ইচ্ছাটি পূর্ণ না হওয়ায় মনটি প্রসন্ন ছিল না।

অকস্মাৎ একদিন আবার বর্ধমান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। ৺গঙ্গা। বর্ধমানই যাইতে হইবে, খেলারাম বাবুর পারত্রিক কার্য্যোপলক্ষ্যে। বিশ্বেশ্বরবাবু বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইতি মধ্যে কন্যা-জামাতাও আসিল। বিশ্বেশ্বরবাবু জামাতাকে বলিলেন—'সবই তাঁর খেলা। সেই আমাকে যেতেই হবে; তবে বেয়াই মশাইকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুর্ভাগ্য আমার। যাক্‌ তোমরা কবে যাবে বর্ধমানে ?

'আমরা অবশ্য কাজের দুদিন আগেই যাচ্ছি। তবে ছুটি তো বেশী পাওনা নেই। কাজ চুকে গেলেই ফিরতে হবে, দু একদিন বেশী থাকা যাবে না।'

কৃষ্ণা বলিল—'বাবা, আপনি তো শ্রাদ্ধের দিন দুপুর নাগাদ যাচ্ছেনই। ব্রাহ্মণ-ভোজন চুকে গেলেই আমরাও আপনার সঙ্গে ফিরে আসব।'

'সেই ভাল। তোরা আমার সঙ্গেই ফিরিস্। দুর্ভাগ্য আমার! যাব, কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাব না।

বিশ্বেশ্বরবাবু দুঃখ করিয়া বলিলেও তাঁহার মুখ দিয়া যে কি প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল তাহা যদি তিনি বিন্দুমাত্রও জানিতেন!

নির্ধারিত দিনের সকালটি বৃষ্টি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিল। কলিকাতার রাস্তা আজকাল অল্প বৃষ্টিতেই প্রায় নাব্য হইয়া উঠে। আকাশের অবস্থা দেখিয়া বিশ্বেশ্বরবাবুর আবার দুর্ভাগ্যের কথাই মনে হইল। এই বৃষ্টির মধ্যেই তাঁহাকে যাইতে হইবে, সুতরাং মন অনুকূল থাকার কথা নয়। দশটায় ট্রেন। বাড়ী হইতে হাওড়া ষ্টেশন পৌনে এক ঘণ্টার রাস্তা। বৃষ্টির বেগ কিছু কমিলে যথাসম্ভব সত্বর জামাকাপড় পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

'পরেশ! একটা ট্যাক্সী পাওয়া যায় কিনা দেখ না বাবা! এতটা পথ বাসে এই বৃষ্টিতে যাবেন কি করে!'—বিশ্বেশ্বর গৃহিনী পুত্রের সাহায্য কামনা করেন।

'দুর্ভাগ্য! গিন্নি, দুর্ভাগ্য একেই বলে। ট্যাক্সি ডাকতে-ডাকতে ট্রেন আমাকে না নিয়েই চলে যাবে! দুর্গা দুর্গা,—বিশ্বেশ্বরবাবু আর অপেক্ষা করেন না। তাঁহাকে বাসেই যাইতে হইবে।

*　　*　　*　　*

বর্ধমান জংশন। ইলিশ-গুঁড়ির মত বৃষ্টি পড়িতেছে। ট্রেন হইতে নামিয়া বিশ্বেশ্বরবাবুর সিগারেট কিনিবার কথা মনে হইল। ভাবিলেন ধীরে সুস্থে গেলেই চলিবে। ষ্টলে চা ও সিঙাড়া খাইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে একটি সিগারেট ধরাইলেন। বৃষ্টির শেষ নাই, বিশ্বেশ্বরবাবুর সিগারেটের অগ্নি প্রান্তদেশে পৌঁছিল। এইবার তাহা হইলে উঠা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্য!

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া তিনি একটি রিক্সায় উঠিলেন।

'কোথায় যেতে হবে বাবু?'—রিক্সাওয়ালার প্রশ্ন।

'এই যে, এই যে ঠিকানাটা বলি'—বিশ্বেশ্বরবাবু পকেটে হাত দিলেন, নিমন্ত্রণ পত্র হইতে ঠিকানাটা বলিবেন।

'আরে! চিঠিটা আবার রাখলুম কোথায়!'—ব্যস্ত হইয়া জামার সমস্ত পকেট কয়টিই বারবার হাতড়াইতে থাকেন। কিন্তু পত্র পাওয়া গেল না। যাইবার কথাও নহে। তাড়াতাড়ির মাথায় চিঠিটি বাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছেন। এখন উপায়। কিন্তু দমিবার পাত্র তিনি নহেন; জীবনে বহুবার এই জাতীয় সমস্যায় তিনি পড়িয়াছেন কিন্তু বুদ্ধি বলে সমস্যার সমাধানও করিয়াছেন। অতএব এক্ষেত্রেও—

কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকিয়া রিক্সাওয়ালাকে বলিলেন—'এই সামনের রাস্তা ধরে সিদে চল। বেশী দূরের পথ নয়। গোটা দুই মোড় ফিরলেই পৌঁছে যাব। চল।'

রিক্সা চলিল। বিশ্বেশ্বরবাবুর মন এবং বুদ্ধিও সেই সঙ্গে চলিতে থাকিল। কাজ-কর্মের বাড়ীর দুইটি সাধারণ লক্ষণ—একটি ছাদের পাল টাঙানো, অপরটি বাড়ীর সম্মুখে পরিত্যক্ত কলাপাতা, গেলাস, খুরি। এই লক্ষণ মিলাইয়াই আজ ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

সৌভাগ্যবশতঃ দুইটি মোড় ছাড়াইয়া উক্ত লক্ষণ যুগলই বিশ্বেশ্বরবাবুর দৃষ্টিগোচর হইল। হৃষ্টচিত্তে রিক্সা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া লক্ষণাক্রান্ত বাড়ীর নিকটবর্তী হইয়া কড়া নাড়িলেন।

'কাকে চান?'—অপরিচিত এক যুবকের জিজ্ঞাসা।

'বিনয় কোথায়? ও তো দুদিন আগেই এসেছে শুনেছি। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না বাবা।'

'আজ্ঞে, আপনাকেও তো ঠিক চিনতে পারছি না। এবাড়ীতে বিনয় নামে তো কেউ নেই! আপনি কোথেকে আসছেন?'

'কোলকাতা থেকে আসছি। তবে কি এটা খেলারামবাবুর বাড়ী নয়। তাঁর বাড়ীতেও তো কাজ।'

'দেখুন, বোধ হয় আপনি ঠিকানা ভুল করেছেন। এবাড়ী খেলারামবাবুর নয়। তাঁর বাড়ী আরও মাইল খানেক এগিয়ে।'

'কিছু মনে করো না বাবা। তাহলে বোধ হয় ঠিকানাটাই ভুল হয়েছে। আমি এগিয়েই দেখি।'

যাক্, একটা হদিশ পাওয়া গেল। আবার রিক্সা ভাড়া করিয়া নির্দেশিত স্থানে আসিতে সত্যই এবার আর একটি পাল-চিহ্নিত বাড়ী দেখা গেল। এবার আর কোন ভুল নাই। খেলারমবাবুর বাড়ী পাওয়া গিয়েছে। দ্বারের কাছেই একটি কিশোরকে দেখা গেল। বিশ্বেশ্বর বাবু তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'এইটে কি খেলারাম বাবুর বাড়ী?

'আজ্ঞে হাঁ। আপনি কাকে চান?'

'বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বলো তো বাবা, কোলকাতা থেকে বিশ্বেশ্বরবাবু এসেছেন।'

কিশোরটি ভিতরে গেল। বিশ্বেশ্বরবাবু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখনই বিনয় অথবা কৃষ্ণা নিশ্চয় এখানে আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন।

'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

'এটা কি খেলারামবাবুর বাড়ী?'

'আজ্ঞে হাঁ। আমিই খেলারাম চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আপনাকে তো—'

সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বিশ্বেশ্বরবাবুর বিস্ময় বোধ করি ইহা হইতে অধিক হইত না। তিনিও খেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী যাইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে জীবিত দেখিবার আশা পোষণ করেন না। কিন্তু এই ব্যক্তির মধ্যে তো মৃতের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহার মস্তিষ্ক কোন আশুবুদ্ধি পরিস্থিতি অনুসারে দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল।

'আপনি খেলারামবাবু? তা আমি যে খেলারামবাবুকে খুঁজছি, তিনি আদৌ আপনার মত নন অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ—'

'অর্থাৎ তিনি জীবিত নন।'

'তার মানে?'

বিশ্বেশ্বরবাবু আর উত্তর না দিয়া সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করেন। ভদ্রলোক পাগল মনে করিলেন কিনা, তাহাও চিন্তা করেন না। বাড়ী তাঁহাকে লক্ষণ মিলাইয়া বাহির করিতে হইবে। আবার রিক্সায় চড়িলেন। কিন্তু এবার আর সরাসরি কোন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্বে আটঘাট আরও দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। ক্রিয়াকর্মোপলক্ষ্যে যে বস্তুটির প্রয়োজন হইবেই, সেই বস্তুটি হইতেছে মিষ্টান্ন। অতএব ময়রার দোকানে খোঁজ লইলেই গোল মিটিতে পারে। কিন্তু এখানেও সমস্যার সমাধান হইবার সত্বর সম্ভাবনা নাই। বর্ধমান শহর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ময়রার দোকানের সংখ্যাও সেই অনুপাতে কম নহে। তবুও তিনি হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। রিক্সা করিয়া যাইতে যাইতে পথে কয়েকটি বড় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হইতে কোন মৃত খেলারামবাবুর বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে মিষ্টান্ন গিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় কেহই ঈপ্সিত উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু উত্তরোত্তর রিক্সার ভাড়া বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের ধারে একটি গাছতলায় ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় পরিশ্রান্ত বিশ্বেশ্বরবাবু পরাজয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। আজ সত্যই তাঁহার পরাজয় ঘটিল। এমন পরাভব জীবনে কখনও পূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুদ্ধির মূলদেশে ধূমসংযোগ করিতে পুনরায় একটি সিগারেট ধরাইলেন।

একটা বয়স আছে যে সময়ে জিদের প্রবলতা জীবনের দুই কুল ছাপাইয়া উঠে। এই প্লাবন সাধারণতঃ যে বয়সের মধ্যে সীমিত, সেই বয়সকে বিশ্বেশ্বরবাবু বহুদিন পূর্বেই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ আজ এই পরিস্থিতিতে পড়িয়া তিনি সেই বিগত-জীবনের প্লাবনের প্রবলতাকে আবার যেন নূতন করিয়া অনুভব করিলেন। যৌবনে শ্রুত আবার একটি গল্প মনে পড়িতে যেন নিরন্ধ্র অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য আলোকের একটি নিশ্চিত অবিচল রেখা দেখিতে পাইলেন। এক সাহেব বিপদ গ্রস্ত হইয়া অপর এক স্বজাতীয় ব্যক্তির নিকট রাত্রিতে এক আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিল। আশ্রয় মিলিল। নিরুপদ্রবে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে ধন্যবাদ জানাইয়া অতিথি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে তাহার টুপিটি ফেলিয়া গিয়াছিল এবং সেই টুপিটিকে লইয়াই আশ্রয় দাতার অশান্তির সুরু হইল। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথির ঠিকানাও তাঁহার জানা নাই। অথচ, যেমন করিয়াই হউক, মালিককে তাহার দ্রব্যটি ফিরাইয়া দিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া আশ্রয়দাতা তখন টুপিটি লইয়া সমাধিস্থলের দিকে যাত্রা করিলেন। বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষনের ভার পরিচারকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি সমাধিস্থলেই আশ্রয় লইলেন। আশা রাখিলেন তাঁহার সেই অতিথিটি একদিন-না-একদিন ঐ স্থানে আসিবেই; তখন তিনি টুপিটি তাহাকে প্রত্যার্পণ করিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

বিশ্বেশ্বরবাবুর পরাজিত ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসি ফুটিল। খেলারামবাবুর ঠিকানা পরপারের ষ্টেশন হইতে পাওয়া যাইবে। তাঁহার এ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে না। জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া মানুষ যখন নামহীন পরিচয় হীন লোকে যাত্রা করে, পৃথিবীর ঠিকানাটি রাখিয়া যায় শ্মশানক্ষেত্রে। পৃথিবীর পরিচয়টুকুও তাহাকে খাতায় লিখাইয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে পরলোকে যাত্রা করিতে হয়। এইই নিয়ম। খেলারামবাবুও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন, তাঁহাকেও তাহার পরিচয় রাখিয়া যাইতে হইয়াছে ঐ শ্মশানঘাটের রেজিষ্টার বহিতে।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। কাল বিলম্ব না করিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু পুনরায় রিক্সার আশ্রয় লইলেন। দীর্ঘ পাঁচ-ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্মশানে পৌছিয়া সোজা রেজিষ্টারের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোনরূপে ভূমিকা না করিয়া স্বীয় বক্তব্য পেশ করিলেন।

'মশাই, দয়া করে আমায় একটা খবর দিতে পারেন?'

রেজিষ্টার মশাই খাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বলিলেন—'নাম বলুন।'

'খেলারাম চট্টোপাধ্যায়।'

'বাবার নাম?'

'আজ্ঞে ঠিক জানা নাই'।

'ঠিকানা?'

'আজ্ঞে, ঐটাই তো আপনার কাছে জানতে এসেছি।'

রেজিষ্টারের এতক্ষণে হুঁশ হইল, কোথায় যেন কি গণ্ডগোল হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এইরূপ একটি মৃতের ব্যাপারে তাঁহাকে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িতে হইয়াছে। কোর্ট-ঘর করার এখনও শেষ হইবার নাম নাই। আজও পূর্বাহ্নে সেই দুর্ভোগ গিয়াছে। আবার কোথা হইতে খেলারাম চট্টোপাধ্যায় আসিয়া জুটিল। কে জানে, এই ভদ্রলোক পুলিশের লোক কি না। আবার নূতন কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে কি না কে বলিতে পারে! রেজিষ্টারের চিত্তে ক্রমশই সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল।

'আপনি কি থানা থেকে আসছেন, স্যার?'

'আজ্ঞে না। কোলকাতা থেকে আসছি। দয়া করে যদি আপনি খেলারামবাবুর ঠিকানাটা বলে দেন।'

'বলেন কি মশাই! এমন কি ব্যাপার ঘটল, যে কোলকাতা পুলিশকে পর্য্যন্ত ছুটে আসতে হল!'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মশাই আপনি কি বলছেন? কোলকাতা পুলিশের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নি। কেবল মৃত খেলারামবাবুর ঠিকানা যদি—'

'আমাকে আর ছলনা করবেন না, স্যার।'

'ছলনা আপনাকে আমি করতে আসি নি, করবার প্রয়োজন আদৌ নাই। কেবল দয়া করে আপনি—'

'এখন দয়া করে বলছেন, পরে গলায় পা দিয়ে বলবেন—তা আমি জানি স্যার।'

'আরে ছি-ছি-ছি। আপনি আমায় অপরাধী করবেন না। দেখুন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার আবার কোলকাতায় ফিরতে হবে। অনুগ্রহ করে যদি ঠিকানাটা—'

দেখুন আমি কোন দোষ করিনি মিছামিছি আমাকে স্যার—'

'দোষ আপনার নয় মশাই, বরং দোষ আমারই। ঠিকানাটা বাড়ীতে ফেলে এসেই—'।

রেজিষ্টার এবারে বিস্মিত হইলেন। বাধ্য হইয়া এবং দায়ে পড়িয়া বিশ্বেশ্বরবাবুকে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি পুনরায় তাহার কর্ণগোচর করিতে হইল। সমস্যা শুনিয়া তিনি এবার প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন। বিশ্বেশ্বরবাবুর কিন্তু হাসিতে যোগ দেওয়া হইল না।

বলহরি হরিবোল! বলহরি হরিবোল!

আর একটি পরপারের যাত্রী আসিয়া পৌঁছিল। রেজিষ্টারকে এইবার নাম ঠিকানা লিখিতে হইবে। সবিনয়ে তিনি বিশ্বেশ্বরবাবুকে বলিলেন—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। এদের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েই আপনাকে আমি ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি।' তিনি এইবার নবাগতদিগের দিকে মনোযোগ দিলেন। একলা মানুষ। দাহ-ব্যাপারের যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা তাঁহাকে করিয়া দিতে হয়। রেজিষ্ট্রেশন-পর্ব চুকাইয়া তিনি কাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্ম বাহিরে গেলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। শ্মশান হইতে ষ্টেশন অনেক দূর। রেজিষ্ট্রার ভদ্রলোকের ও সত্বর ফিরিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বা তাঁহার নিকট হইতে একটি ঠিকানা পাওয়া যায়, সেই ঠিকানাই যে অভিলষিত, তাহার যাচাই বিশ্বেশ্বরবাবু করিবেন কি দিয়া? একদিনে দুই খেলারাম চট্টোপাধ্যায় কি ইহলীলা সম্বরণ করিতে পারে না? নিশ্চয়ই সে অধিকার তাহাদিগের আছে। ভাগ্যক্রমে যদিই বা ঠিকঠিকানাটি পাওয়া যায়, তবে সেখানে গিয়া যে সময়টিতে তিনি উপস্থিত হইবেন, তাহাও রীতিসম্মত নহে। কুটুম্ব-গৃহে রাত্রিবাসও তাঁহার মনঃপূত নহে। খেলারামবাবু জীবিত থাকিলে তাও-বা কথা ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে রাত্রিযাপন কোনমতে বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই আর এখানে অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। রিক্সাও খুঁজিতে হইবে, সময় লাগিবে বৈ কি। বিশ্বেশ্বরবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠিকানা সংগ্রহ করার জন্য তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই একটি রিক্সা পাওয়া গেল।

'এই রিক্সা, ভাড়া যাবে?'

'আজ্ঞে না, সোয়ারী আছে।'

সোয়ারী ইতিমধ্যে আসিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বর-বাবুকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—'বেশ তো আপনি যাবেন কোথায়?'

'ষ্টেশনে।'

'আমার সঙ্গেই আসুন। পটল, তুমি আমাকে দোকানে নামিয়ে দিয়ে বাবুকে ইষ্টিশনে পৌঁছে দাও। এখানে তো রিক্সা-টিক্সা আসে না বিশেষ। রাত হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি চল। সারাদিন যা খাটুন গেল—'।

রিক্সাতেই উভয়ের আলাপ হইল। ভদ্রলোক ময়রা। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, মৃত খেলারামবাবুর শ্রাদ্ধ-কার্য্যে তিনিই মিষ্টান্ন সরবরাহ করিয়াছেন। বৃহৎ ব্যাপার। সরবরাহ সাঙ্গ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গিয়া-

রছিল। নিত্য নদীস্নানের অভ্যাস। সন্ধ্যায় তাই স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। ঠিকানাটিও তিনি দিলেন।

'আপনি চাটুয্যে মশাইয়ের বাড়ী যেতে চান নাকি? বলেন তো, পটলকে বলে দিই, আপনাকে নিয়ে যাক্। তবে অনেকটা সময় লাগবে। পথও তো নেহাৎ কম নয়।'

'না না। আমি চাটুয্যে মশায়ের বাড়ী যেতে চাচ্ছি না। আমাকে ষ্টেশনেই যেতে হবে। কোলকাতায় নিজের ঠিকানাতেই ফিরতে চাই।'

মধ্যপথে ময়রা ভদ্রলোক তাঁহার দোকানে নামিয়া গেলেন। রিক্সা ষ্টেশনের দিকে চলিল। সারাদিন অভুক্ত, পরিশ্রান্ত বিশ্বেশ্বরবাবু ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলেন। সমস্ত দিনের দুর্ভাগ্যের কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। সারা দিনটি কি ধকলই না গেল। সেই ময়রার নিকট হইতে ঠিকানাটি পাওয়া গেল, উপরন্তু শ্মশান-ঘাট হইতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যাক্, তাহা হইলে তাঁহার পরাজয় ঘটে নাই। নাই-ই বা গেলেন, তবুও-তো যাইতে পারিতেন! বুদ্ধি তাঁহাকে বঞ্চনা করে নাই। অনেকক্ষণ পর বিশ্বেশ্বরবাবুর মুখে স্নিগ্ধ হাসির একটি রেখা দেখা গেল।

ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যাল অতিক্রম করিয়া গাড়ী আগাইয়া আসিতেছে। তাড়াতাড়ি টিকিট কাটিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিলেন। গাড়ী প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

'এ কি! বা-বা! আপনি কখন এলেন? আমরা সারাদিন আপনার জন্যে অপেক্ষা করলুম। কি ব্যাপার বলুন তো?' বিশ্বেশ্বরবাবুর কন্যা কৃষ্ণাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছিল। কন্যা জামাতার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—'তোরা ফিরছিস্ তো। চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।'

'সে কি? আপনি যান নি?'

'না। যাওয়া আর হল কই?'

'এত রাত করে এলেন কেন?'

'রাত তো এখানেই হল। এসেছি তো সেই কোন্ সকালে।'

'তবে? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? ওখানে গেলেন না কেন?'

'গাড়িতেই যেতে যেতে বলব। চল এখন। গাড়ী ছেড়ে দেবে।'

* * *

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিয়া বিশ্বেশ্বরবাবু যখন বাড়ি ফিরিলেন, তখন সংসারের নিত্যকর্ম সমাধা হইয়া গিয়াছে। গৃহিনী স্বামীর অপেক্ষায় জাগিয়া ছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়াতে বিশ্বেশ্বরবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন।

কিন্তু প্রয়োজন হইলেও ঘুম আসিতেছিল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধার তাড়না তাঁহাকে ঘুমাইবার অবসর দিতেছিল না। বারে-বারে উঠিয়া তিনি জল খাইতে লাগিলেন।

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। খিল খোলার শব্দে বিশ্বেশ্বর-গৃহিনীর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

'শরীর খারাপ নাকি?—গৃহিনী জিজ্ঞাসা করেন।

'তা একটু খারাপ হয়েছে বৈ কি!'

'কেন, কি হয়েছে? গতকাল খাওয়া-দাওয়া বেশি করে ফেলেছ নাকি? তোমার তো আবার বেশী কিছু সহ্য হয় না। তা বেশী খেতে গেলে কেন? জানোই তো নিজের শরীরের অবস্থা!'

'বেশী আর খেলুম কোথায়। যা খেয়েছিলুম—'

'তাতেই এই কাণ্ড! আজকাল তো আর খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ঐসব লুচি-টুচি খেয়েই—'

'না, না সে কথা নয়। লুচি-টুচির কথা বলছি না।'

'তবে কি বলছ?'

'সকাল কখন হবে তাই ভাবছি।'

'কেন পেট ব্যথা করছে নাকি ? এই সেরেছে। আমার মাথাটি খেয়েছ। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তা হলে একবার পরেশকে ডাকি, ডাক্তারবাবুর কাছেই পাঠাই।'

'না, না। কারুর কাছে পাঠাতে হবে না। ভোর হলেই তুমি কিন্তু চায়ের বন্দোবস্তটা একটু তাড়াতাড়ি কোরো। আর পারা যাচ্ছে না।'

'পেট-ব্যাথার উপর চা খাবে কি গো ?'

'পেটের যন্ত্রণাই হচ্ছে বটে, তবে কিছু না পড়লে আর যন্ত্রণার উপশম হবে না।'

'রঙ্গ রাখ। আসল কথাটা কি হয়েছে বল তো ?'

'আর বলবার ক্ষমতা নেই। খেলারামবাবু যে খেলাটা দেখিয়ে গেলেন।'

'তা আমাকে কি করতে হবে, সেইটাই না হয় বল।'

'ষ্টোভ জ্বালাতে হবে।'

'এখনই !' এই ভোর রাত্তিরেই ?'

'না, না তুমি ঘুমোও। সকাল হলে অন্যদিন তুমি আমাকে ডাক, আজ আমিই তোমাকে ডাকব।'

তোমায় ডেকেছিলেম

শ্রীমিহির দত্ত,
২১, টেমার লেন, কলিকাতা

সন্ধ্যার আবছা অরণ্যে
ডাকলাম তোমার নাম ধরে,
পেলাম না সাড়া
কি এক গভীরতায় হারিয়ে গেলে তুমি,
তোমার হাসি, তোমার কথা
হারিয়ে গেল মুখর মৌনতায়।

তোমার কাছে চেয়েছিলাম শুধু
একটুখানি হাসি
দিনান্তের এক টুকরো শান্তি
অবশ মনে আশার উত্তাপ।
তোমায় পেলাম না,
নীরব তুমি কালো চুলের নিবিড় অন্ধকারে,
সে নির্জ্জনে আমার দু' চোখ
ব্যর্থ হয়ে ফেরে।

* * * *

উষার অবাক আলোয়
হঠাৎ পেলাম তোমার দেখা
আমার ছোট্ট ঘরে,
অন্ধকারের নিথর জান্‌লা গ'লে—
তুমি,—তোমার কান্না-হাসি-কথা
আবার এলো ফিরে।

ভোরের আলো

রাত শেষের পাঠ

কুমারী মুকুরিকা কুণ্ডু
ভবানীপুর, কলিকাতা

রাত্রি তখন নিঝুম নিথর, শীতের আভাষ জোর।
মা যে মোরে পড়তে বলেন কাটিয়ে ঘুমের ঘোর॥
মুখ কাচু মাচু করে বলি "তুমি কি বোকা মেয়ে—
এখনো জাগেনী শুকতারা, দেখতো তুমি চেয়ে।
নিঝুম রাতে এহেন আদেশ কেন গো কর তুমি
ভোরের শিশির চুপে চুপে কয় এখনো ভেজেনি ভুমি"
মা হেঁসে কন "জানিস্ কি তুই ওর সাধনার ধারা
কত আঁধারের বাধা ঠেলে চুপে হেসে ওঠে ওই তারা॥"

নেপাল ভাঁড়

শ্রীননীগোপাল প্রামাণিক
লোহাপুর, বীরভুম

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যেমন গোপাল ভাঁড় নামে একজন বিখ্যাত রসিক লোক ছিলো, সেইরূপ বিজয়নগর নামে কোন এক রাজার নেপাল ভাঁড় নামে একজন ভাঁড় থাকিত। ভাঁড় পদবীর অর্থ এই যে—যাহারা বহু বহু হাস্যরস গল্পের দ্বারা সকলকে সর্ব্বদাই আনন্দিত রাখে এবং তাদের গল্প যেন অফুরন্ত ; তাই কথায় ব'লে গল্পের ভাঁড়। সেইজন্য ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে ভাঁড় বলা হইত। নেপাল ভাঁড় উহাদের মতই একজন।

একদিন রাজা বাহাদুর বৈকালে রাজপ্রাসাদের দ্বিতলে বসে কি এক চিন্তা করছেন—এমন সময় দেখতে পেলেন তাঁর রাজবাড়ীর দক্ষিণ দরজার সম্মুখে বহুলোক জমায়েত হয়ে কি যে দেখছে—রাজাবাহাদুর দ্বিতল হ'তে নেপাল ভাঁড়কে ডেকে বললেন দক্ষিণ দরজার গেটের নিকট এত লোকের গোলমাল কেন,—কি হয়েছে ;— খোঁজ নিয়ে আমাকে শীঘ্র সংবাদ দেন। নেপাল ভাঁড় রাজ আদেশে দক্ষিণ দরজার গেটের নিকট গিয়া কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার জেনে নিয়ে রাজ বাহাদুরের নিকট গিয়ে বললো—হুজুর আমি গিয়া সমস্ত ব্যাপার জানলাম্—ও ব্যাপার তেমন কিছু নয়—"ওরা পঁয়ষট্টি"—

রাজ বাহাদুর নেপাল ভাঁড়ের কথা শুনে ভীষণ রাগান্বিত হলেন ; কারণ তখনও লোকের জনতা ঠিক ঐ স্থানেই দেখা যাচ্ছে—এবং গোলমাল ও শোনা যাচ্ছে ; সেই কারণ রাজ বাহাদুর নেপাল ভাঁড়কে বলিলেন ; "ভাঁড় মশায় আপনার কি এই বয়সেই চক্ষু, কর্ণ দুই-ই নষ্ট হ'য়ে গেছে :—আমি এখান হ'তে দেখ্‌তে পাচ্ছি— আর আপনি তা'দের নিকটে গিয়েও তা'দেরকে দেখতে পেলেন না ; এসে উত্তর দিলেন "তারা পঁয়ষট্টি" অর্থাৎ তারা ওখান হতে চলে গেছে। যাক্ আপনার দ্বারা হবে না। গেটের দারোয়ান জয়গোবিন সিংকে ডেকে বললেন—জয়গোবিন সিং গেটের সামনে লোকের ভীড় কেন ?—কি হয়েছে—সমস্ত জেনে আমাকে সংবাদ দাও—জয়গোবিন সিং রাজ আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করে রাজাকে নমস্কার করে তথা হ'তে প্রস্থান করলো সমস্ত ব্যাপার জেনে শুনে রাজা বাহাদুর সকাশে গিয়ে বললো—

হুজুর ! হাম্ সব কুছ জান্ বুঝকে আয়া। আপকা বাগিচাকা যো মালী পইলে থা—উসকো লড়কা পাঁচকড়ি বলকে হ্যায় উস্‌কো প্যার টুট গিয়া—ছ'কড়ি বল্‌কে উস্‌কো বড়কা ভাই উস্‌কো পিঠ পর উঠাকে দাবাখানা মে লে জায়গা উস্‌লিয়ে দওরজা-কা সামনেহী মে ঠহরা হুজুর বাহাদুর কো কুছ মাংয়েঙ্গে দাবাকা খরচা বাস্‌তে। রাজা বাহাদুর দারোয়ানের মুখে এই কথা শোনা মাত্র পাঁচটী টাকা দিলেন এবং বল্‌লেন নেপাল ভাঁড়কে বোলাও।

নেপাল ভাঁড় বিষন্ন বদনে রাজার সাম্‌নে এসে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—হুজুর কি আমাকে ডেকেছেন ? রাজা বাহাদুর বলিলেন—হ্যাঁ আপনায় ডেকেছি কারণ যে আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা যে কার্য্যের সমাধান হয় না– নিরক্ষর এক দারোয়ানের দ্বারা হয় তার কারণ কি ? এতে প্রমান হচ্ছে যে দারোয়ান আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান। নেপাল ভাঁড় অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলিলেন হুজুর যদি অভয় দেন তবে বল্‌তে পারি। রাজা বাহাদুর বলিলেন—আচ্ছা ; ব'লেন। নেপাল ভাঁড় তখন

SECOND LIST

In the Seat Selection Sub-Committee meeting held on 12-8-61 the following applicants have been granted Free Seat in the Chhatrabas for the session 1961-62. Applicants are instructed to see the undersigned for regularisation of their application forms.

	Name	Dist.	Course
1.	Sri Nemai Chandra Chandra	(New) Birbhum	2nd yr. (B. Sc. 3yr. Deg. Cor.)
2.	Sri Dinabandh Das	(New) Burdwan	B. Sc. 3rd yr.
3.	Sri Tusarkanti Chandra	(New) Midnapur	B. Sc. 4th yr.
4.	Sri Biswarup Dey	(New) Do	B. Sc. 3rd yr.
5.	Sri Golock Behari Sadhu	(New) Hooghly	B. Sc. 3rd yr.

For Gandhabanik Mahasava
Debnarayan Dutt
Secy.

Date—16. 8. 1961.

THIRD LIST

In the SEAT SELECTION Sub-Committee meeting held on 9. 9. 61 the following applicants have been granted FREE SEATS and STIPENDS respectively for the session 1961-62. Applicants are hereby instructed to see the undersigned at an early date for regularisation of their forms.

FREE SEATS

	Name	District	Course taken
1.	Sri Pronab Kumar Dutt	(Old) Burdwan	M.B. B.S. 1st Year
2.	Sri Sukhendu Bikash Dutt	Do Murshidabad	M. A. 5th Year
3.	Sri Sunil Chandra Sadhu	Do Santal Parganas	M. Sc. 5th Year
4.	Sri Ratha Nath Hati	Do Murshidabad	B.Sc. Final Yr. 2nd Chance

	Name	Amount	Stipend per month	Name of the Stipend
1.	Sri Manabendra Das (Old)	15/-	Jalpaiguri Mech. Engg. 2nd Yr.	Akhoy K. Laha Chhatrabritti
2.	Sri Ashoke Dutt	,, 5/-	Midnapur B. Com. 3 Yr. D. Cou. 2nd Yr.	By Sri Durga C. Dutt
3.	Sri Shyam S. Banik	,, 5/-	Tippera A. M. 2nd Yr.	By Sri Durga Charan Dutt
4.	Sri Kalyan Dutt	,, 10/-	Calcutta B. Sc. 3 Yr. D. Cou. 2nd Yr.	Late Ashrumati Laha Smritibritti
5.	Sri Amitava Banik (New)	12/-	Birbhum L.E.E. Suri 1st Yr.	Late Kirti C. Daw Smritibritti
6.	Sri Sudhir K. De (Old)	12/-	Burdwan Jadavpur Engg. (Mech. Eng.)	Late Nirodmoni Laha Smritibritti
7.	Sri Sankar P. Dutt (New)	10/-	Burdwan B. Sc. 3 Yr. Deg. Cou. 1st Yr.	Late Satyarani Daw Smritibritti
8.	Sri Dwijendra N. Ball (Old)	12/-	Santal Pgs. B.Sc. 3rd Yr.	By Sri Sudhir Mohan Dutt

For Gandhabanik Mahasava
Debnarayan Dutt
Secretary.

Dated—12th Sept. 1961.

॥ পাশের খবর ॥

	ছাত্রছাত্রীর নাম	পিতার নাম	পরীক্ষা	বিভাগ
১।	শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দত্ত	ডাঃ প্রাণশঙ্কর দত্ত	প্রাইমারী ফাইনাল পরীক্ষা (২৪ পরগণা জেলার বৃত্তি পাইয়াছে)	প্রথম
২।	কুমারী উষালতা হালদার	ডাঃ গোবিন্দপ্রসাদ হালদার	বি, এ (পার্ট ওয়ান)	তৃতীয়

"শ্রীঅনাদি নাথ দাঁ"

বর্তমান বৎসরে গত ৩রা এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ দাঁ, এম, এস সি, মহাশয় উচ্চশিক্ষার্থে বিমান যোগে পশ্চিম জার্মানী অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তিনি সেখানে ৯ মাস কাল অবস্থান করবেন। শ্রীযুক্ত দাঁ মহাশয় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রেডিও ফিজিক্স বিভাগে নিযুক্ত আছেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের সংগে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। এখানে উল্লেখযোগ্য অনাদি নাথ দাঁ মহাশয় গন্ধবণিক সমাজের একজন কৃতী ছাত্র। বর্তমানে তিনি গন্ধবণিক পত্র পাবলিশিং সোসাইটীর অন্যতর কার্য্যনির্বাহক। পশ্চিম জার্মানীতে তাঁর সহ-গামিনী হয়েছেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাঁ ও শ্রীমতী অমিতা পাল। গত ২২শে মার্চ তারিখে অনাদিবাবুর বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে মহাসভা হলে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌরহিত্যে একটি সম্বর্দ্ধনা সভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভার একটি প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ দাঁ মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য ও নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের কামনা করা হয়। অনাদি নাথ দাঁ মহাশয় সম্পর্কিত এই সংবাদটি বিলম্বে পত্রস্থ করার জন্য আমরা দুঃখিত। বিলম্বে সংবাদ প্রাপ্তি ও পত্রিকার দুর্বিপাকই ইহার কারণ।

'শারদীয়' গন্ধবণিক সম্বন্ধে মতামত

এবারের 'শারদীয়' গন্ধবণিক সংখ্যাখানি পাইয়াছি। অন্যান্য বছরের তুলনায় পত্রিকার কলেবর ছোট হইলেও শক্তিশালী লেখক, লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধ, রচনা, গল্প, কবিতা সুনির্ব্বাচিত ও উচ্চমানের হইয়াছে। পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি।

২৪ পরগণা ডাঃ প্রাণশঙ্কর দত্ত

"গন্ধবণিক পাত্রী চাই"

"Pharmacist Diploma (C. U.) প্রাপ্ত দুইশত টাকা বেতনের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্ম্মরত গন্ধবণিক সম্প্রদায় মধুকল্য গোত্রের ২৭ বৎসর বয়স্ক একজন পাত্রের জন্য ৯ম্, ১০ম্ শ্রেণীর পাঠরত গন্ধবণিক সম্প্রদায় এক পাত্রী চাই। পাত্রের বীরভূম জেলায় পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিবাহের জন্য যোগাযোগ করুন। মেয়ে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও বুদ্ধিমতী হইলে কোন যৌতুক দাবী নাই।"

A. C. DATTA, C/o B. N. HOSPITAL
11th Assam Rifles, Rear Party : DINJAN
P. O. PANITOLA, ASSAM.

সাধনধন নাগের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ
গন্ধবণিক মহাসভা ভবনে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সাধনধন নাগ মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গন্ধ-বণিক মহাসভা হলে এক সভায় মৃত আত্মার প্রতি শোক নিবেদন করা হয়। পত্র পাবলিশিং সোসাইটীর কার্য্য-করী সমিতি আহ্বায়িত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশিশির কুমার দত্ত। সাধনধন নাগ মহাশয়ের বহুমূখী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীহারাধন দত্ত মহাশয়। পত্রিকার সাম্প্রতিক জয়যাত্রায় তাঁর আধুনিক রুচির কথা উল্লেখ করে এবং কলিকাতার সুবৃহত নাগরিক জীবনে সাধনধন নাগের প্রতিভার কথা উল্লেখ করে হারাধন দত্ত এক উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দেন। পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু—তাঁর তেজস্বিতা ও সদগুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। গন্ধবণিক শিক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীবিনয় কৃষ্ণ দাঁ মহাশয়ও সাধন বাবুর জীবনের খুঁটিনাটি উল্লেখ করে অভিভাষণ দেন। অতঃপর সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে একটী শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই শোক প্রস্তাবের লিপি অতঃপর সাধনধন নাগ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী পুষ্প পাল ও শ্রীমতী পদ্মা পালের নিকট প্রেরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। অতঃপর সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

গন্ধবণিক মাসিক পত্র

গন্ধবণিক মহাসভার একমাত্র মুখপত্র।

৪১শ ভাগ	যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা	পৌষ
দ্বাদশ সংখ্যা	নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।	১৩৬৮

প্রসঙ্গ কথা

নীচে শীতার্ত্ত পৃথিবী; উপরে কুয়াশাচ্ছন্ন ধুসর আকাশ। সূর্য্যকিরণ সেই কুয়াশান্তর ভেদ করে মাটির বুকে দিচ্ছে আল্‌তো পরশ। শীতের সকালে একটা জড়সড় ভাব বর্ত্তমান। কিছু পরে কুয়াশা কেটে গিয়ে স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ ঝলমল করে ওঠে; জড়সড় ভাব কেটে যায়; কর্ম্মপীড়িত মানব কর্ম্মে মেতে ওঠে; অন্নের সংস্থানে, বাঁচার প্রেরণায়।

পল্লীবাঙলার ঘরে ঘরে এই সময় পার্ব্বণ উৎসব সুরু হয়। আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সে উৎসবে মেতে ওঠে। শহরেও এই সময় নানা উৎসব লেগে থাকে। ক্রীড়া-মোদীদের জন্য খেলার মাঠে সুরু হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়দের ক্রীড়া কৌশল। এখানে ওখানে বসে গানের আসর। ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ শিল্পী গোষ্ঠী ও যন্ত্রশিল্পী সেখানে সমবেত হয়। এছাড়া সিনেমা, সার্কাস, প্যারেড, সভাসমিতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

এবার কলকাতা শহরে তিনটি সর্ব্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন; ভারতীয় হিন্দী পরিষদের অধিবেশন এবং গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলন। এই তিনটি সম্মেলনে বহু গুণী ও জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল। আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে প্রতিটি ভাষাই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুক এবং ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করে সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে একটি মধুর যোগসূত্র স্থাপিত হউক এই কামনাই করি।

স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে একটি; গত সতেরোই ডিসেম্বর। সেদিন ভারতীয় ফৌজ গোয়া, দমন এবং দিউতে প্রবেশ করেছে। প্রকৃত পক্ষে শক্তির লড়াই এখানে হয়নি। তাই ভারত সরকার একে 'পুলিশ এ্যাকশন' আখ্যা দিয়েছে। পর্ত্তুগ্যাল অবশ্য সিকিউরিটি কাউন্সিলে একটি আপত্তি দাখিল করেছে এবং সিকিউরিটি কাউন্সিল বিষয়টি আলোচনার যোগ্য বলে মেনে নিয়েছে। তবে যুদ্ধ বিরতির নির্দ্দেশ দেওয়ার আগেই ভারতীয় ফৌজ পর্ত্তগীজ শাসনের অবসান ঘটাবে বলে মনে হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে প্রায় এক যুগ আগে। এখনও দুষ্ট ক্ষতের মত বিদেশী শাসনের কলঙ্ক এর বুকে শোভা পায়না। তাই নিঃশেষে এই কলঙ্ক দূর হওয়ায় ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত।

ক্রিকেট খেলার রাজা। এ খেলায় ছোট বড়র ভেদাভেদ নাই। জাতি ও বর্ণ বৈষম্যেরও বালাই নাই। শীতের দিনে শিশির ধোয়া সবুজ গালচে বিছান মাঠে, রূপালী রোদে একটা মাদকতা আছে যা সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কানে কানে বলে এখানে কোন বৈষম্য নেই চলে এসো ছুটে এসো।

ইংরাজ ভারতবর্ষকে অনেক কিছুই দিয়েছে। ক্রিকেট খেলাটা ইংরাজের দান বলা যেতে পারে। ইংরাজের দেশ থেকেই এ খেলা এদেশে আসে। তার পর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এদেশের ক্রিকেট টীম। এক এক করে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ক্রিকেট খেলা প্রচলিত হয়। তারপর প্রাধান্যের জন্য ম্যাচ খেলাও সুরু হয়। তবে টেষ্ট ম্যাচ একটু ভিন্ন ধরণের। এক দেশের বাছাই খেলোয়াড়দের সহিত অন্য এক দেশের বাছাই খেলোয়াড়দের যে ম্যাচ তাকেই টেষ্ট ম্যাচ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেতে পারে বলছি এই কারণে যে টেষ্ট ম্যাচের যথার্থ সঙ্গা দিতে গেলে বলতে হয় "বিশ্ব ক্রিকেটের উচ্চ আদালতের ব্যবস্থাপনায় দেশের বাছা বাছা ক্রিকেট বীরদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম তারই নাম ক্রিকেট টেষ্ট"।

ভারতের পক্ষে ১৮৮৬ সাল স্মরণীয়। এই সালে ইংলণ্ড সফরকারী প্রথম ভারতীয় দল মোট ২৭টি ম্যাচ খেলে। একটিতে জয়ী হয়, ৮টি থাকে অমীমাংসিত এবং ১৮টি খেলায় পরাজিত হয়। ইংলণ্ড সফরকারী দ্বিতীয় ভারতীয় দল ১৮৮৮ সালে ৮টি খেলায় জয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। এ দেশের মাটিতে সর্ব্বপ্রথম বিদেশী টীমের আগমন হয় ১৮৮৯-৯০ সালে। মোট ১২টি খেলার মধ্যে ১০টি জয়ী হয়ে ২টি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়। বিদেশীয় দলের ভারতীয় মাটিতে সেটিই হল প্রথম পরাজয়।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। তাই বর্ত্তমানকে ঘুম পাড়িয়ে অতীতের ঘুম ভাঙ্গাতে হয়। পৌষের প্রসঙ্গ-কথা লিখতে হয় ফাল্গুনের শেষে। অতএব পুরান খবরের চাপে একে বিশেষ ভারী করা সঙ্গত হবে বলে মনে করিনা।

চলতে চলতে থেমে যাওয়ার ব্যাথা অনেক। তার কারণও থাকতে পারে অনেক। এক্ষেত্রে অনেক না হলেও একটিকে আমাদের প্রাধান্য দিতে হয়। সেটি মুদ্রণ ব্যাপার। যে নিরাপদ পক্ষপুটে গত চল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে পত্রিকার মুদ্রণ ব্যাপার সমাধা হয়েছে, সে পক্ষপুট আজ হারিয়ে গেছে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের প্রয়োজনে। এ বিষয়টি আশাকরি সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। অবশ্য এখন বলা যায় যে বাধা আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল তা অপসারিত হয়েছে।

সবশেষে একটা কথা নিবেদন করতে চাই। মাঘমাসে আমাদের পত্রিকার নূতন বৎসর সুরু হবে। নববর্ষের প্রথম সংখ্যাখানি যাতে তার পূর্ব্ব গৌরব অমলিন রাখতে পারে তার জন্য লেখক লেখিকাদিগকে উপযুক্ত রচনা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এবারের মত ইতি করছি।

—নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু

— ভুলোদা —

ধীরাজ কুমার দত্ত
লোহাপুর, বীরভূম

মিল বলতেন নামের কনোটেসন নেই। ডক্টর পি, কে, রায় বলতেন নামবাচক শব্দটি যতক্ষন অপরিচিত ততক্ষন সে ননকনোটেটিভ, কিন্তু যেই নামবাচক বস্তুটির সঙ্গে আপনি পরিচিত হলেন তখন তার বিশেষগুণ আপনার মনে উদিত হবে তখন নামবাচক শব্দ কনোটেটিভ হয়ে যাবে। মিল হয়ত কোন দেদার বক্‌সের বাড়ী গিয়ে দেদার ত ছুরের কথা। একটা বক্‌স দেখতে না পেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন কিনা জানিনে, কিন্তু ভুলোদার সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না, পি, কে রায় কে সমর্থন করতে বাধ্য হতেন এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। "যারা বুদ্ধিমান কল্পনা প্রবন তারাই হয় বেশী ভুলো" বলেছেন এক ইংরেজ লেখক, কিন্তু এমন ভুলের কথা কেউ শুনেছেন অথবা কল্পনা করেছেন একটা ছেলে কয়েকদিন ছুটির অবসানে বেমালুম ভুলে বসল সে কোন ক্লাসে পড়ে।

আপনি হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করতেই চাইবেন না বলবেন ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ, ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা, কোন ক্লাসে পড়ে তাই কি কেউ ভুলতে পারে, এ অসম্ভব ! গাঁজা !!

রংহীন রামধনু !!! গাঁজা কিংবা গুলি যাই বলুননা কেন আমি কিন্তু বলব পারে, এবং সেটা পারে একমাত্র আমাদের ভুলোদা ওরফে ভোলানাথ সেন। এবার পূজোর ছুটির অবসানে তিনি বেমালুম ভুলে বসেছিলেন কোন ক্লাসে পড়েন, চিন্তার পেয়ালায় চামচে দিয়ে তুফান বইয়ে দিয়ে শুধু এইটুকুই মনে করতে পেরেছিলেন পাশের বাড়ীর ভাড়াটের ছেলেটা কি নাম যেন.......... ও'র সঙ্গে একই সঙ্গে কলেজে যেতেন, প্রায়ই এক বেঞ্চিতেই বসতেন।

আপনি হয়ত আমার কথা স্বীকার করতেই চাইবেন না, বলবেন কেন বইগুলো দেখলেইত সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

কিন্তু বই থাকলে ত !

তবে হ্যাঁ, যথারিতি গার্জ্জেনের কাছে অবশ্য বই কেনার ভাউচার দেখিয়ে ফুল পেমেণ্ট নিয়ে নিয়েছেন, সাজিশ্চানের নামে নিয়েছেন ওভার পেমেণ্ট। কিন্তু সিগ্রেটের পয়সাটা, পার্টিতে চায়ের খরচের পয়সাটাত ডাইরেক্টলি গার্জেনের কাছে চাইতে পারেন না তাই ঐ পয়সাতে.......... । না আর বলবনা, জানতে পারলে ভুলোদা আবার গোটা কয়েক রদ্দা বসাতে মোটেই ভুল করবেন না। আপনি ঝানু লোক হলে হয়ত আরও একমাত্রা চাপিয়ে দিয়ে বলবেন তাহলে সাময়িক ভাবে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল ভদ্রলোকের। আমি বলব, না, মোটেই না, ছায়া, ছবি, রুচি, গীতী কার সঙ্গে কখন কোন সময় এনগেজমেণ্ট আছে বা ছিল এক নিশ্বাসে মুখস্তের মত বলে দেবে ভুলোদা। আজ ছু'মাস হল ছায়া চলে গেছে লোহাপুরে, তার বিদায় বেলার কথাগুলো অবিকল টেপ রেকর্ড করে রেখেছে ভুলোদা,

তার অন্তরের টেপরেকর্ড মেশিনে যাবার সময় ছায়া বলেছিল 'জান' ভুলোদা ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "আউট অব দি সাইট আউট অব দি মাইণ্ড" মহাকালের এই অমোঘ নিয়ম হতে তুমিও হয়ত রেহাই পাবেনা, তুমি আমাকে হয়ত ডুবিয়ে দেবে বিস্মৃতির প্রশান্ত মহাসাগরে" তার পটল চেরা চোখ দুটোয় সূক্ষ্ম জলের আভাষ, গোলাপের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দুটো অনাবশ্যক ভঙ্গিতে বার কয়েক কেঁপে গিয়েছিল, তাই একটা জোরসে দম কষে একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছিল ভুলোদা—রবিবাবুর ভাষায়—

ঝিনুকের দুটি খোলা মাঝখানটা ভরা থাক
একটা নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে
দুর্লভ মূল্যহীন

মাস খানেক আগে দেখা হয়েছিল রুবীর সঙ্গে, দীর্ঘ তিনটি বৎসর তারা এক সঙ্গে খাবি খেয়েছিল, লজিকের বেড়াজালে ইন্টারমিডিয়েট এগজামিনেশনের সাগরে। সেই থেকেই একান্ত নির্জনে ওদের মনে যে ভালবাসার অঙ্কুর দানা বেঁধেছিল সেইটেই বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় ১৯৫৪ সালের কলেজের সোস্যাল ফাংশানে। তারপর কে কোথায় ডুব মেরেছিল কেউ কারুর খোঁজ রাখেনি দীর্ঘ আরও কয়েকটা বৎসর বয়ে গিয়েছে তাদের উপর দিয়ে পাষাণের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নির্ঝর এর মত। রুবী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল "ভুলোদা তুমি কি আজও আমায় ভালবাস?

উত্তরে বলেছিল ভুলোদা—"রাতের সব তারায় রয়েছে দিনের আলোর গভীরে" একদিন অনুযোগ করেছিল গীতা "তুমি রুবীকেই বেশী ভালবাস, ওর সঙ্গে পটলের রেষ্টুরেণ্টে কত গল্প কয়, কত হাঁস, আমি বুঝি দেখতে পাইনা। উত্তরে বলেছিল ভুলোদা, শোন গীতা রবিবাবুর অমিত রায় এক যায়গায় বলেছে, "কেটীর সঙ্গে যে আমার প্রেম সেত ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব প্রতিদিন ব্যবহার করব। লাবণ্যর সঙ্গে যে আমার প্রেম, সে রইল দীঘি তা ঘরে আনবার নয় মন তাতে আমার সাঁতার দেবে।"

মহাসাগরের বুকে ভাসমান বরফপিণ্ড দেখেছ গীতা— ওর একভাগ ভাসে, আট ভাগ থাকে জলের তলে, ঐ ভাসমান টুকুই রুবীর জন্য—আর ঐ আট ভাগ তলানিতে তুমি ছাড়া কারুর ভাগ নেই। আজও সে কথাগুলো সুন্দর ভাবে মনে রাখতে পেরেছে ভুলোদা, একটা কথাও ভোলেনি।

সেদিন রবিবার, আজও মনে আছে ভুলোদার, গীতার আসার কোন চান্সই ছিলনা, তবুও এসেছিল গীতা—"তারপর ভুলোদা কেমন আছো তাই বল। ভুলোদা হালের লেখা নভেলগুলোর একটা লিষ্ট তৈরি করছিলেন, ঐ সঙ্গে কোন দোকানে ধারে মিলবে তারও একটা লিষ্ট। গীতার দিকে না তাকিয়েই বলেছিলেন— "এসো ছায়া"। "আমি ছায়া নই গীতা। "আজ রোববার না, জিজ্ঞেস করেছিলেন ভুলোদা—

কেন সোম আর শুক্রবারের রুটিন মাফিক আসা ছাড়া কি আর আমার এখানে আসা চলবে না। সেদিন ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ভুলোদা—সে কথাটা আজও মনে আছে ভুলোদার। এবার আপনিই বলুন কোন যুক্তিতে আপনি বলবেন, সাময়িক ভাবে স্মৃতিশক্তির লোপ পেয়েছিল ভদ্রলোকের। তবে কি ভুলোদা খুব বুদ্ধিমান বা কল্পনা প্রবন ছিলেন বলে এত ভুল করতেন। আমি বলব না, মোটেই না, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজ বারো বৎসর ধরে ভুলোদা— ম্যাট্রিক হতে বি, এ, অবধি লড়াই করছেন। কেউ বলে তিনি কলেজের পিলার, কেউ বলে পিরামিড। তাতে অবশ্য ভ্রুক্ষেপ করেননা তিনি। ভুলোদা ছিলেন পুরদস্তর বাস্তব বাদী।

শুনেছি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে হাইপথিসিসের চ্যাপ্টারটা প্রথমে তিনি পড়তে অস্বীকার করেছিলেন।

ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনার উপর স্থাপিত বলে তিনি ঘোর নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলতেন কল্পনার মত মেসেনী ব্যাপারে "ভূলোদা" নেই—তার ডাইরেক্ট এ্যাকসন্‌…………ডাইরেক্ট হিট……… ।

* * *

এবার রবিবাবুর শতবার্ষিকীতে আমরা যুবক সমিতির তরফ হতে এক বিরাট ফাংসানের আয়োজন করেছি, আমাদের ফাংসানে প্রধান অতিথি হয়ে আসছেন স্বকরি ব্রজেন সেন, সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন কেন্দ্রের সংস্কৃতি দপ্তরের সেক্রেটারী ডক্টর আর, কে বাজপেয়ী। এই বিরাট ফাংসান আমাদের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভবপর নয় ভেবে আমরা ভূলোদার শরনাপন্ন হলাম।

কে, কে, আসছেন তোদের ফাংসানে ? সিগারেটটায় কটা সুখটান মেরে এক মুখ ধুম উদ্গীবন করে বেশ একটু ভারিককি চালে জিজ্ঞেস করলেন ভূলোদা।

স্বকরি ব্রজেন সেন, কেন্দ্রের সংস্কৃতি দপ্তরের সেক্রেটারী আর, কে বাজপেয়ী বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বলি।

ইলা, ইভা, রত্না এদের কেউ আসছে ?

না জবাব দিই।

যতো সব ইডিয়ট, ফাংসান না ঘোড়ার ডিম্‌ রাগে গম গম করে উঠে ভূলোদা, আধপোড়া সিগারেটটা নতুন নাগরা চটিটার গোড়ালীতে চেপে দিয়ে আবার বলেন— "কি হবে তোদের ঐ যাচ্ছে তাই একটা ইয়ের মতন নীরস যুবক সমিতির ফাংসানে গিয়ে। তার চেয়ে বরং তাসের আড্ডাটায় বসলে অনেক জমবে। অস্থিরতায় মস মস করে ঘরময় পায়চারী করতে থাকেন ভূলোদা।

একি বলছ ভূলোদা ! স্বয়ং ব্রজেন সেন, আর কে বাজপেয়ী।

রেখে দে তোদের ঐ ব্রজেন সেন আর কে বাজপেয়ী, এই রোগেইত মরলি তোরা। কেন তোদের পাশের বাড়ীর অমিতা চৌধুরী কি কবিতা লেখেনা, ওকি কবি নয়। স্বয়ং রবীবাবুই বলেছেন—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দুরে
বহু ব্যায় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু—।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

তোরা কতবড় ন্থইসেন্স কতবড় ইডিয়ট একবার ভেবে ছাখ দিকি বলি পুরো তিনটি ঘণ্টা শ্রোতাদের বসিয়ে রাখবে কে, তোদের ঐ কি শ্যেন যেন বললি, আর ঐ বাজপাখী যতোসব………। ফাংসান যদি জমজমাট করতে চাস, দর্শকদের যদি পুরো তিনটে ঘণ্টা ম্যাস মেরিজম্‌ করে রাখতে চাস তবে আমি যা বলি তাই কর।

অন্তত কিছু না হক ইলা, ইভা, রত্না এদের দিয়ে ওপনিং আর ক্লোজিং সংটা গেয়ে দিতে বল—সভাপতির ভাষনের আগে যদি রত্না দত্তকে দিয়ে একটা ড্যান্স দেওয়াতে পারিস তাহলে—আনন্দের আতিশয্যে কথার খেই হারিয়ে ফেলে ভূলোদা।

তাহলে কি হবে ভূলোদা ? জিজ্ঞেস করল ক্লাব সেক্রেটারী নাফেমিয়া।

তাহলে তোমার মাথা আর মুণ্ডু। সোজা বাংলায় বলতে গেলে উসকা জবাব নেহি ?" বুঝলিরে বুদ্ধু। তোদের ঐ শ্যেন পাখী আর বাজপাখীও ফাংশনের তারিফ না করে পারবেনা। তা আগে হতে বলে রাখলুম।

ফাষ্টইয়ার হতে ফোরতইয়ার অবধি মাঝের এই বাৱোটী বৎসর প্রতিটি কলেজ ফাংসানের পুরোভাগে থেকে প্রতিটি ফাংসানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন আমাদের ভূলোদা। তাই ভূলোদার উপদেশ অগ্রাহ্য

করবার ক্ষমতা আমাদের ছিলনা। কিন্তু শত বার্ষিকীর বাজারে ওদের যা চাহিদা তাতে কি আসতে চাইবে, তাছাড়া প্রায় শিল্পীইত মাসখানেক ধরে বুক্‌ড্‌ হয়ে আছে বললে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শঙ্কর পাল।

"আসতে চাইবে মানে আলবৎ চাইবে—গিয়ে বল ভুলোদার অনুরোধ"।

সত্যই ভুলোদার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি, ইলা, ইভা, রত্না। বাণী নাট্য মন্দিরের এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করে দিয়ে আসতে হয়েছে ওদের, শুধু আসেননি ভুলোদা। অথচ শুনেছি এসব ব্যাপারে তিনি ওভার পাংচুয়াল ৪টেয় ফাংসান আরম্ভ হবার কথা থাকলে তিনি ১টার হাজির হন। তবেকি ভুলোদা তার নামের সঙ্গে তাল রেখে সব ভুলে বসে আছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম। দেখি ভুলোদা পরম নিশ্চিন্তে ইজি চেয়ারে তার ভোঁদামার্কা আড়াইমন ওজনের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে কি যেন পড়ছে। "একি ভুলোদা তুমি এখনও কি পড়ছ।"

"ভুলিনাই" নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল ভুলোদা। যাক তিনি আমাদের ফাংসানের কথাটা ভোলেননি এইটেই সৌভাগ্য। আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, "ভুলিনাই বুঝি মনোজবাবুর সব চেয়ে ভাল লেখা নারে? ওঃ মনোজবাবুর ভুলিনাই তাহলে অলরেডি তোমাকে আমাদের ফাংসানের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। অথচ এদিকে ইলা, ইভা, রত্না—কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে ভুলোদা—"ওরা এসে গেছে নাকি! অথচ এদিকে আমি ছ্যাখ দিকিন সব দিব্যি ভুলে বসে আছি, চল চল চল একরকম আমাকে জোর করে টেনে বেরকরে নিয়ে যায় ঘর হতে সোজা চলন্ত ট্রামে।

"এক প্যাক সিগ্রেটের দাম ছাড়, আর দুজনের ভাড়াটা দে দিকিন আমার হাতে"। একখানা গোটা পাঁচ টাকার নোটই দিলাম ভুলোদার হাতে। জানি বাকিটা ফেরৎ দিতে তিনি ভুলে যাবেন। টাকাটা নিসংকোচে পকেটে গলিয়ে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ভুলোদা চলমান ট্রামের হ্যাণ্ডেলটা ধরে অপস্য়মান ফুটপাতের দিকে। ঠিক যেন সমস্ত বিশ্ব সংসারটায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছে তার কাছে। অবাক হয়ে যায়—যে ভুলোদা এক মুহূর্ত্ত কথা না বলে থাকতে পারেনা তার একি নতুন রূপ। অপরিচিত পাঁচ সাত জন লোক থাকলেইত ভুলোদা জিজ্ঞেস করে বসবে তোর ইংরেজীর ক্লাসে কত পারসেন্টেজ আছেরে? অঃ আচ্ছা অপ্রস্তুত হয়েছিলেন আজ—ফিলোসপির প্রফেসর ডক্টর বাকচি ইত্যাদি অনেক অনাবশ্যক কথা, অথচ সেই বাচাল ভুলোদা আজ নীরব কেন। বিশেষ করে লেডিজ সিটে যখন তিল ধারণের যায়গা নেই। বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে আছি ভুলোদার দিকে ট্রাম কণ্ডাক্টর টোকা মারে উদাসীন ভুলোদাকে 'দাদা আপনার টিকিটটা?

মহা আতঙ্কে চমকে উঠে ভুলোদা। অ্যাঁ কলেজষ্ট্রীট পার? যেন কলেজষ্ট্রীটটা তার অজানায় পার হয়ে গেলে সমগ্র বিশ্বটাই লয় প্রাপ্ত হবে।

আমাকে শুদ্ধ টেনে নামিয়ে নেয় ট্রাম হতে, "এযে হ্যারিসন রোড কলেজষ্ট্রীট আসতে এখনও বাকি। "চোপরাও জোরসে" ভুলোদা গর্জ্জে উঠে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে টিকিট প্রত্যাশী চলমান ট্রামের কণ্ডাক্টর। জানি টিকিট না দিতে ভুলোদা মোটেই ভুল করেননি। আজ বারো বৎসর এই প্রসেসেই কলেজ আসছেন।

কি দরকার ছিল ভুলোদা এখানে নামবার? বললাম আমি।

'নে নে বড় বড় বুলি কপচাস নে, বলি কবজি ডোবাবার কোন ব্যবস্থা আছে, না পেটে গামছা বেঁধে যেতে হবে তোদের ফাংসানে। এদিকে যে হনুমানে

পেটে ডন দিতে আরম্ভ করেছে'। অগত্যায় ভুলোদাকে নিয়ে সামনের রেষ্টুরেন্টটায় ঢুকতে হয়।

সের তিনেক রসগোল্লা সহযোগে দিস্তাখানেক লুচি অবাধে গলাধঃকরণ করে একটা ঢেকুর তোলে ভুলোদা। জয় শিবশম্ভু। অবশ্য শিব শম্ভুর আর পেটের ভীতর হতে না বেরিয়ে এসে উপায় ছিলনা। একেত পেটে স্থানাভাব, তার উপর তিনসের রসগোল্লা ও দিস্তা খানেক লুচির চাপ, বাধ্য হয়েই তাকে উদ্বাস্তু হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। ভুলোদা শহরে এসে শহরের সমস্ত আদব কায়দায় রপ্ত করেছে শুধু রপ্ত করতে পারেননি শহরের খাওয়াটা। দুখানা লুচি আর একটু তরকারি খেয়ে ঢক ঢক করে একঘটি জল খেয়ে পোষায়না তার "তিনি বলেন" আমি পারিনে বাপু তোদের শহুরে ধরণের খেতে —তাতে আমাকে কেউ পেটুকই বলুক আর যাই বলুক।

*　　　*　　　*

ফাংসানের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভুলোদা—হাঁরে ক্যাংলা ফাংসানটা কিসের কৈ বললিনাথ তাজ্জব কি বাত, সাতকাণ্ড রামায়ন পড়ে সীতা রামের কে? গোটা পৃথিবী রবিবাবুর শত বার্ষিকী নিয়ে মেতে উঠেছে আর তুমি জিজ্ঞেস করছ কিসের ফাংসান, এতবড় ভুলও মানুষ করে। ভোলানাথ তোমার কে নাম রেখেছিল ভুলোদা?

ধাত্রীমাতা—সে এক মজার গল্প জানিস। আমি যখন সুতিকাগারে বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি ছেলে? ধাত্রীমাতা ভুল করে বলেছিল মেয়ে। আর সেই ভুলের মাশুলের বোঝা বইয়ে বেড়াতে হচ্ছে আমাকে ভোলানাথ নামে। যেন আমি ইচ্ছে করেই ধাত্রীমাতাকে ভুল বলিয়েছিলাম্ হ্যাঁ যা বলতে যাচ্ছিলাম। রবিবাবুকে অবহেলা করে আমিত তোদের এই ফাংসানে যেতে পারিনে।

কেন রবিবাবুকি তোমাকে তাঁর কোন ফাংসানে যেতে বারণ করেছেন?

রাগে আমার সর্বশরীরটা রীরী করে উঠে।

"ছাখ ক্যাংলা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিসনে, রবীবাবু শুধু আমাকেই নিষেধ করেননি, করেছেন তাঁর লক্ষকোটী অনুরাগীকে।

যারা রবিবাবুকে শত বার্ষিকী উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়ে সভা ডাকছে, ফাংশান করছে, গঠন করছে রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসব কমিটী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করছে, লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছে, তারা রবীবাবুকে কতটুকু বোঝেরে ইডিয়ট।

হ্যাঁ সমস্ত পৃথিবীর লোকই বোকা, শুধু বুদ্ধিমান তুমি"—

বুদ্ধিমান আমি না হতে পারি, কিন্তু যারা সভা সমিতি করছে তারা যে বোকা তার প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে। ছাখ শুধু দরাজ হস্তে টাকা খরচ করলেই কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূজা করা হয়ন', অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে কবিকে. বুঝতে হবে কবির অন্তর বাসনাকে, কবি নিজেই বলেছেন—

যখন রবনা আমি মর্ত্ত কায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয়মন
তবে তুমি এসো হেতা নিভৃত ছায়ায়
যেথা ঐ চিত্রের শালবন।

*　　*　　*

কখন স্মরিতে যদি হয় মন
ডেকোনা, ডেকে'না সভা. এসো এ ছায়ায়
যেথা এ চৈত্রের শালবন।

মুহূর্ত্তে থতিয়ে যায় আমার স্পিরিট, সারা পৃথিবীর লোক যখন বিস্মৃত হয়েছে রবিবাবুর অন্তিম বাসনা, তখন ভোলানাথ হয়েও ভুল করলেনা তুমি। তুমি শুধু ভুল করনা, অপরকে ভোলাও না, ভুল ভেঙ্গেও দাও। তুমি স্বার্থক ভোলানাথ।

সূর্য্যপুত্র

অনিতা চট্টোপাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়)
রাধানগর—বর্দ্ধমান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সময়ে গায়ে হলুদ এলো। বিরাট ব্যাপার। সমস্ত গয়না প্রমদা চৌধুরীই দেবেন। বরের সঙ্গে গয়না এলো। বিমু কনে চন্দন পরলো। তার সঙ্গে কনের মেকআপ নিলো গোঁফ কামিয়ে কল্লোলও। প্রমদা চৌধুরীর গয়না বিমুর অঙ্গে উঠলো। গিল্টির গয়না কল্লোলের। আর প্রমদা চৌধুরীর ডুপ্লিকেটে কলেজের একটি ছেলে স্বইচ্ছায় বর সাজলো।

ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টি হলো বিমুর তার সঙ্গে, যাকে কল্পনাই করেনি কোনদিন। পরের লগ্নে প্রমদাচৌধুরী পিঁড়িতে বসলেন। কনে এলো। শুভদৃষ্টি হলো। প্রমদা চৌধুরী নির্বিকার। জীবনের শেষলগ্নে বিবাহ শুধু তো একটি কামনার পরিপূর্ণতার জন্যে। কনের মুখ আর কি দেখবেন। ঘটকীর চোখ কিন্তু ছোট হলো সন্দেহে। ভেতর ভেতর খোঁজ নিয়ে আতঙ্কে বুক দুরুদুরু। একদিকে প্রমদাচৌধুরীর পাঁচশো টাকা গলাধঃকরন অন্যদিকে কলেজের ছেলেদের হাতে জীবননাশ। ভেবেচিন্তে ঘটকী নিরুদ্দেশ হল।

বাসরে বসেই সব টের পেলেন প্রমদাচৌধুরী। কনে একে একে বেনারসী, গয়নাগাটি খুলে গেঞ্জি আর আণ্ডারওয়ার পরে যখন হাওয়া খেতে লাগলো অসহ্য রাগে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন প্রমদাচৌধুরী। ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকেপড়া স্বাস্থ্যোজ্জল ছেলেগুলোর পানে চেয়ে চেঁচাতে ভরসা পেলেন না। কল্লোলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে উঠলো সকলে, প্রমদাচৌধুরীর কাছে এসে বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লো—এবার যে উঠতে হবে দাদু। পাশের ঘরে নবদম্পত্তি আছে আশীর্বাদ করে আসুন। মোটর ঠিক করেই রেখেছি, বাড়ী যান।

নবদম্পতিকে আশীবাদ করেননি প্রমদাচৌধুরী। মোটরে উঠতে উঠতে শাসিয়েছিলেন কল্লোলকে—তোমাদের নামে কেস করবো আমি···

হেসে উঠেছিল ছেলেরা—স্বচ্ছন্দে। তবে সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয়না। বেঁচে থাকবার ইচ্ছে থাকলে ওসব করতে যাবেন না। আর পঞ্চম সংস্করন হতে চললো। ছেলেমানুষটী করে আর লজ্জা বাড়াবেন না। বাংলাদেশে তো এতো ছেলে আছে। একটা পোষ্যপুত্তর নিয়ে নিন্‌না। ···নমস্কার দাদু···

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিলো। সেদিন অপমানের লজ্জায় ঘেন্নায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল প্রমদাচৌধুরীর। ধিক্কারে পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন তীর্থ পর্য্যটনে। মনের ক্ষুধা ঠিকই ছিল। যোগাযোগ ঘটলো আবার। কোন এক দুঃখী মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ী ফিরলেন। সূর্য্যযজ্ঞ করলেন···, আর এবারে ফললাভ করলেন প্রমদাচৌধুরী। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার ফল পেয়ে প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়াতে দিবাকর বখাটের দলে নাম লিখিয়ে ফেললো। ক্রমশঃ প্রমদাচৌধুরীর মনে

ধারণা জন্মালো বিন্থ অভিশাপ দিয়েছিল হয়তো ব্যথিত মনে, তারই প্রতিফল দিবাকর।

সরমা কথা শেষ করে আবার হাসলো। চায়ের কাপটা বিন্দুবাসিনীকে ধরে দিতে দিতে বলে—বাবা ভেঙ্গে পড়েছেন, কষ্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, আমি কিন্তু দেখে যাচ্ছি কপাল কতদূরে নিয়ে যায়। শুধু একটা ইচ্ছে ছিল 'বিন্থ'র যদি একবার দেখাপাই, তাঁকে বলতাম, যে দুঃখ বাবা ইচ্ছাকৃত দিতে চাননি। ভগবান তো তাঁকে সুখী করেছেন। তাঁর অভিশাপ তিনি ফিরিয়ে নিন, ফিরিয়ে দিন আমার স্বামীকে, শান্তি দিন আমার শ্বশুরকে।…

বিন্দুবাসিনী পিছু হটে পুরনো দিনগুলোতে বুঝি ফিরে গিয়েছিল মুহূর্তে। বুঝি ভাবছিলো মানুষের সুখ কিসে…

আনমনেই জিজ্ঞেস করেন—তোমার শ্বশুর কোন ঘরে থাকেন, চলো একবার দেখে আসি…। ছেলেটা বড্ড দুষ্টুমি করছে আমায় দাও…

—আপনার কাপড় নোংরা হয়ে যাবে। —কুণ্ঠিত মুখে বলে সরমা।

বিন্দুবাসিনী বলে—তা হোক।

মুখে না বললেও প্রাণে যে সব সময় একটি সুরই ধ্বনিত হয়, ফর্সা কাপড়ে ধুলোকাদা লাগাবার জন্তে মন উন্মুখ হয়েই থাকলো। বিন্থ অনেক পেয়েছিল, অযাচিত সৌভাগ্য দ্বারে এসে জয় করে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের বিন্থর মতো সুখী কে ছিল, কিন্তু আজকের বিন্থ কেন ভাবে পুলকেশ না এসে প্রমদাচৌধুরীই যদি আসতো, সুযোগ্য সন্তান না হোক, অযোগ্য সন্তানও তো একবার ডাকতো সেই ডাকে…

—মা দিবাকর চৌধুরী চাবির গোছা হাতে করে বিন্দুবাসিনীর সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়।

—মা…সমস্ত চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে বিন্দুবাসিনীর। একটি ডাক, হোলোই বা লম্পট সন্তানের তবুও তার মূল্য নির্দ্ধারন করা যায় না।

—চাবির গোছাটা নিন্ মা, গাড়ী এসে গেছে। আমরা যাচ্ছি। বিন্দুবাসিনীর আর লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই, পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে দিবাকরের মুখের পানে। উজ্জ্বল হাসিতে ভরে ওঠে মুখ। শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—মা বলে যখন ডেকছো, এ বাড়ী তখন তো তোমারই দিবাকর। বাইরের ঘরটাই আমার থাকবার পক্ষে যথেষ্ট। চাবী তোমার কাছেই থাক। আমি এখন চলি।…

দিবাকর আর সরমাকে অবাক করে দিয়ে বিন্দুবাসিনী উঠে দাঁড়ান। গাড়ীতে চাপার আগে এসে দাঁড়ান সরমার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—বিন্থ খুশী হয়েছে সরমা, তার আর কোনো রাগ নেই।…

গাড়ী বেরিয়ে যায় দৃষ্টির আড়াল হয়ে।

প্রিয়া ও পৃথিবী

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাস
দাসকলগ্রাম—বীরভূম

শ্রাবণের মেঘে ঢাকা—প্রাচীন আকাশ…
আমার মনের গতি বল্গাবিহীন
হরিণের মত ছোটে আঁধার পথে…
দূর অরণ্যের ছায়া ঢাকা পথটি বাঁকা।

কালো মেঘের ঘনঘটা আকাশ ছেয়ে,
পাশেতে ঘুমায় শিশু,—শিশুর মাতা
আমার মনের মায়া ওই কায়ায় ভরা ;
এ-পাশে রুগ্ন শিশু—পিতার মতন
স্থবির মহাশিশু অতি অসহায়।

* * *

সহসা চমক ভাঙে দমকা হাওয়ায় ;
জলো হাওয়া ঠিক যেন মায়ের পরশ !
তিমির গভীর রাতি আকাশ কালো
…জানিনা কখনো কারে বেসেছি ভালো !….

প্রদীপের শিখাসম হৃদয় মূলে
অবিরাম জলে বুঝি গোপন হোয়ে
সেই আমি' আর এই 'আমি' আজিকার
এই দুয়ের মাঝেরে কত যুগ ব্যবধান !

…ককিয়ে কাঁদিয়া ওঠে কোলের শিশু
টেনে নেয়নিজ বুকে মাতা তার—আমার প্রিয়া
আদিম মানবী যেন আঁধার গুহায়—
প্রিয়-পাশে মদালসা—নিদ্রালসা !

আকাশে মেঘের ভীড় ; জমাট আঁধার
আমার মনের মেঘ মেদুর হোয়ে
ভেসে চলে চলমান মেঘের মতন…
দূর-স্বপন-পসারী কোন্ কল্প-লোকে !

* * *

ফুলে ফুলে ভরা এই বসুন্ধরা,
কামনাকুসুম ফোটে দেহের বনে;
কণ্ঠেতে গান ছিল—প্রেম ছিল মনে
ভালবাসা ভরা ছিল হৃদয়-হ্রদে
হেথায় নিয়ত ফোটে অমৃত-কমল !

—যাক্ ঝরে—তবু তাহা মিথ্যা তো নয়,
ফুলে ছিল মধু আর ফলে ছিল সুধা
মানব-মানবী বুকে আদিম ক্ষুধা !
বড় ভালবাসি এই মায়াভরা মাটি !

…ওদিকে ঘুমায় খুকী—আমার মেয়ে,
আমার মায়ের ঠিক স্নেহময়ী ছায়া
তাহারই পাশেতে শুয়ে আমার জায়া,
ফলভরা দেহ যেন কল্পতরু !

এতরূপ কোথা ছিল অপরূপ হোয়ে
এত ফুল ফোটে বনে—ফল ধরে গাছে
নাচে মনের ময়ুর মধু বৃন্দাবনে
খোঁজে আদমে আজিও ইভা ইডেন্ বনে !

* * *

ফুলে ফুলে ভরা এই বসুন্ধরা
বড় ভালবাসি এই মায়াভরা মাটি,
ভালবাসি ফুলগুলো—ফলের নেশায়,
এত সুধা পান কোরে ক্ষুধা মিটে যায় !

পশ্চিম জার্ম্মানী ভ্রমণ

শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাঁ ও শ্রীমতী অমিতা পাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এবারে সারাদিন কিভাবে কাটাই তাই লিখছি। এখানে কি অফিস, কি দোকান, কি কারখানা সর্ব্বত্র সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কাজ সুরু হয়, সেজন্য সকলকেই ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠতে হয়। তারপর মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ব্রেক ফাষ্টের যোগাড় করি। ইলেকট্রিক উনানের চারটি প্লেটের একটাতে চায়ের জল বসাই, একটাতে ডিম করি, একটাতে দুধ বসাই। উনানের ভেতরে বেকিংএর ব্যবস্থা আছে, সেইখানে পাউরুটী দিয়ে রাখি খুব অল্প সময়ে সুন্দর টোষ্ট হয়ে যায়। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া হয়। তারপর বাসন ধুয়ে রেখে ঘর পরিষ্কার করি। ঘর পরিষ্কার করার জন্য এখানে মেসিন আছে, এই মেসিনের নাম "ভ্যাকুয়াম ক্লিনার"। কার্পেট এবং ঘরের মেঝের সমস্ত ধুলা এই মেসিনের সাহায্যে পরিষ্কার করা যায়। ঘর পরিষ্কার করে চান সেরে বাইরের কাজে যাই। প্রথমে দুধের খালি বোতল ফেরৎ দিয়ে দুধ নিই তারপর বাজার করি তারপর যদি চিঠি পোষ্ট করবার থাকে তাহলে চিঠি পোষ্ট করে বাড়ী ফিরি। কিছুক্ষণ পরে রান্না চাপান হয়; সাড়ে বারটা একটার সময় দুপুরের খাওয়া হয় তবে এখানে পুরুষরা বাড়ীতে খায় না যে যার কর্ম্মস্থলে লাঞ্চ খেয়ে নেয়। তারপর বাসন ধুয়ে রেখে রাত্তিরের রান্না করে হয় চিঠি লিখি, না হয় সেলাই করি না হয় বই পড়ি।

এখানে সব কাজ নিজেদের করতে হয় এমনকি জঞ্জালও নিজেদের ফেলে দিয়ে আসতে হয়। সপ্তাহে একদিন অথবা দুদিন দুপুরে জামা কাপড় কাচতে যাই। এখানে জামা কাপড় কাচবার জন্য মাটীর তলার একটি ঘরে কাপড় কাচা মেসিন বসান আছে। আমরা যে বাড়ীতে থাকি সেই বাড়ীতে বারটি ফ্ল্যাট আছে, এই বারটি ফ্ল্যাটের লোক-জনদের জামাকাপড় এই মেসিনটিতে কাচা হয়। যে ঘরে মেসিনটা বসান আছে সেই ঘরের দরজায় একটা খাতা পেন্সিল রাখা আছে। যে যেদিন কাপড় কাচবে তাকে একদিন অথবা দুদিন আগে খাতায় নাম, সময় এবং তারিখ লিখে রেখে আসতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ ঘরে গিয়ে প্রথমে একটি বাক্সে ৫০ ফেনিগ (প্রায় আট আনার মত) ফেলতে হয়। ৫০ ফেনিগ বাক্সে না দিলে কিছুতেই মেসিন চলবে না। পয়সা ফেলবার পর প্রথমে ঐ মেসিনের দরজা খুলে ময়লা জামাকাপড় ওর ভেতরে পুরে দরজা বন্ধ করে একটা প্লাগ লাগিয়ে দিতে হয় এবং ঐ মেসিনের সঙ্গে লাগানো একটা জলের কল খুলে দিতে হয় তারপর একটা সুইচ টিপলে মেসিন চলতে সুরু করে। প্রথমে ঠাণ্ডা জলে জামা-কাপড়গুলি পাঁচ মিনিট ভিজতে থাকে তারপর একটা বেল বাজর সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্ত্ত দিয়ে গুড়া সাবান ঢেলে দিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। ঠিক এক ঘণ্টা পরে ঐ ঘরটিতে এসে জামাকাপড়গুলি বার করে নিয়ে শুকতে দিতে হয়। জামা কাপড় আছড়ান, কাচা, সাবানজল বেরিয়ে গিয়ে পরিষ্কার জলে কাচা এমনকি নিংড়ান পর্য্যন্ত মেসিনে হয়ে ঠিক এক ঘণ্টা পরে মেসিন আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া হয়।

তারপর সব কাজ সেরে কাগজ পড়া হয়, রেডিও শোনা হয়। কোন কোন দিন সাতটা সাড়ে সাতটার সময়ে আমাদের পরিচিত লোকেরা বেড়াতে আসেন, আবার আমরাও মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। ন'টার সময় দুধ এবং তার সঙ্গে অল্প কিছু ফল খেয়ে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমতে যাই।

সোম থেকে শুক্রবার পর্য্যন্ত সকলেই এখানে একটানা কাজ করে, শনিবার রবিবার এখানে সম্পূর্ণ ছুটী থাকে। এরা শনি রবিকে বলে Week end. এই দুদিন প্রায় সকলেই বেড়াতে যায়। আমরাও এই দুদিন বাসে করে নানান জায়গায় বেড়াতে যাই। রবিবার এখানে কোন লোক কাজ করেনা, সব দোকান বন্ধ থাকে এমনকি কোন রকম খাবার জিনিষও পাওয়া যায়না। তবে রেষ্টুরেণ্ট খোলা থাকে।

এ ছাড়াও "অটোমাটের" ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে যেমন কোন কোন জায়গায় ওজন হতে গেলে ওজনের উপর দাঁড়িয়ে একটা গর্ত্ত দিয়ে পয়সা দিলে আপনি একটা কার্ড বেরিয়ে আসে এই ধরণের ব্যবস্থাকে এরা "অটোমাট" বলে। কয়েকটা দোকানের বাইরের দেওয়ালে একটি বড় কাঁচের শো-কেসের মত আছে এবং এই শো-কেসের মধ্যে কয়েকটা খোপ আছে। এক একটি খোপেতে চীজ, মাখন, জেলী, বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট, ফল ইত্যাদি সাজান থাকে। প্রত্যেকটি খোপের পাশে পয়সা ফেলবার গর্ত্ত আছে এবং কত পয়সা ফেলতে হবে তাও লেখা আছে। যার যে জিনিষ প্রয়োজন সে সেই জিনিষটার খোপের পাশে যে গর্ত্ত আছে তাইতে নিৰ্দ্ধারিত পয়সা ফেলে দিলে সেই জিনিষটা বার করে নেওয়া যায়। খাবার জিনিষ ছাড়া ফুলও অটোমাটে পাওয়া যায়।

রাস্তায় বার হওয়া এক সমস্যা। সমস্ত লোকের চোখ আমাদের দিকে। বাচ্চারাও আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় তারা ভাবে যে তাদের মায়েদের চুল, পোষাক, গায়ের রং, জুতা, কোনটার সঙ্গেই আমাদের মিল নেই। রাস্তা দিয়ে যখন যাই তখন বাড়ীর বারান্দার লোকেরা আরও সকলকে ডেকে এনে আমাদের দেখায়। চলতি গাড়ীর লোকেরা গাড়ীর স্পীড্ কমিয়ে আমাদের দেখতে দেখতে যায়। রাস্তায় যত দোকান থাকে সব দোকানের লোকেরাই আমাদের দেখে আর যে দোকানে ঢুকি সেখানকারত কথাই নেই, ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই নিজেদের কাজ ছেড়ে আমাদের দেখতে থাকে। এর কারণ আমরা দুই বোন ছাড়া এই শহরে আর কেউ শাড়ী পরেনা। একদিন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন গেছিলুম। পরদিন তিনি আমাদের জানালেন যে তাঁর বাড়ীর সামনের বাড়ীর এক জার্ম্মাণ ভদ্রলোক তাঁকে বলেছেন যে "আপনার বাড়ীতে কাল যে দুজন ভারতীয় মহিলা এসেছিলেন তাঁরা খুব সুন্দর শাড়ী পরে এসেছিলেন। বাচ্চাদের এরা খুবই ভালবাসে ঋতা যখনই রাস্তায় যায় তখনই তারা ঋতাকে নানান কথা বলে আদর করে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা ওদের ভাষা কিছুই বুঝিনা।

এখানকার দোকানগুলি খুব সুন্দর সাজান। দোকানের যে অংশ রাস্তার দিকে থাকে সেই অংশটা সবই কাঁচের এমনকি দোকানে ঢোকবার দরজা পর্য্যন্ত কাঁচের তার ফলে দোকানের প্রতিটি জিনিস বাইরে থেকে দেখা যায়। প্রত্যেক জিনিসের দাম লেখা থাকে, সেজন্য লোকে যা কিনবে তার দাম জেনে দোকানে ঢোকে। যে দোকান থেকে বাজার করি সেই দোকানের নিয়ম যে যে জিনিষ ক্রেতারা কিনবে সেই সেই জিনিষ একটা সাজিতে তুলে নিয়ে দোকানদারের কাছে যাবে, দোকানদার সেই জিনিষগুলি ক্যাস রেজিষ্টার মেসিনের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দাম হিসাব করে লিখে দেয়। এখানে প্রতিটি দোকানে ক্যাস রেজিষ্টার মেসিন আছে। এক একটা দোকানে দরজা খুলে ঢুকলেই বাজনা বাজতে

সুরু হয়, যতক্ষণ না দরজা বন্ধ হয় ততক্ষণ বাজতে থাকে। দোকানদার যদি সেই সময় পাশের ঘরে বা অনত্র থাকে ঐ বাজনা শুনে বুঝতে পারে যে দোকানে কোন লোক এসেছে।

এখানকার বাস কোথাও দশ মিনিট কোথাও পনর মিনিট আবার কোন কোন রাস্তায় আধঘণ্টা অন্তর যায়। এখানে বাসের ভাড়া প্রায় পাঁচ আনার মত। আমাদের দেশের মত বাসে জানালা নেই সমস্তটা কাঁচ দিয়ে বন্ধ সেইজন্য সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে বা বসে বাইরেটা দেখতে পায়। বাসে আবার কাঁচের দরজা আছে। ড্রাইভারের কাছে দুটো সুইচ আছে, একটা টিপলে সামনের দরজা খোলে আর একটা টিপলে পেছনের দরজা খোলে। ষ্টপেজ এলে ড্রাইভার আগে সুইচ টিপে দরজা খুলে দেয়, যারা নামবার নেমে পড়ে যারা উঠবার উঠে পড়লে ড্রাইভার আগে সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর বাস চালাতে আরম্ভ করে সেইজন্য চলন্ত বাসে লোক উঠতে বা নামতে পারে না।

কয়েক জায়গায় বাসের টিকিটের পয়সা কনডাকটর যাত্রীদের কাছে এসে নেয় কিন্তু ইউরোপের বেশীরভাগ দেশেই যাত্রীদের নিজেদের কনডাকটরের কাছে এসে ট্রামের বা বাসের টিকিট কেটে নিতে হয়। বাসের বা ট্রামের দুটি দরজার মধ্যে একটি দিয়ে কেবল লোক উঠে এবং একটি দিয়ে কেবল লোক নামে। লোক উঠবার দরজাটির পাশে কনডাকটরের বসবার জায়গা আছে। প্রতিটি লোক উঠে টিকিট কেটে তবে বাসে বা ট্রামে বসতে পারে। কোন লোক কিন্তু নামবার দরজা দিয়ে উঠে পড়ে না। যে সব বাসে কনডাকটর যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট নেয় সেই সব বাসে ভীড়ের সময় যদি কোন লোকের কাছ থেকে টিকিটের পয়সা নিতে ভুল হয়ে যায় তাহলে সেই লোকটি নামবার আগে নিজে কনডাকট:কে পয়সা দিয়ে দেয়।

ঋতা প্রথম প্রথম এখানকার লোকদের দেখলে খুব ভয় পেত কিন্তু এখন আর ভয় পায়না। রাস্তায় অনেক লোক ঋতাকে আদর করে। যে ডাক তার কাছে গিয়ে ও "দাঙ্কে সোয়েন" বলে, দাঙ্কে সোয়েন মানে ধন্যবাদ। এই কথা শুনে এরা আরও আদর করে। বিশেষ করে বয়স্কা মহিলারা রাস্তায় চলতে চলতে ঋতাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন—ঠিক যেন পুতুলের মত সুন্দর মেয়ে, অথচ এদেশের ছেলেমেয়েদের গায়ের রং ও মুখশ্রীর কাছে ঋতা কিছুই নয়। আমার মনে হয় ভারতীয় শিশু এর আগে এরা দেখেনি।

ভারতীয়দের জার্ম্মাণরা খুব শ্রদ্ধা করে। একদিন রাস্তায় আমার কিছু লেখবার দরকার পড়ে কিন্তু সঙ্গে পেন বা পেনসিল না থাকায় এক জার্ম্মাণ মহিলাকে, লেখবার কোন জিনিষ তাঁর সঙ্গে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলুম। তিনি তখন 'আসছি' বলে একটু পরে সম্ভবতঃ একটি পেনসিল কিনে এনে আমাকে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে পেনসিলটি ফেরত দিতে গেলে তিনি বল্লেন "এটা ভারতীয়দের আমার ছোট্ট উপহার"। একদিন এক ভদ্রমহিলা ফুল নিয়ে রাস্তাদিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে আমাদের দেখে আমাদের কাছে এসে ঋতার হাতে ফুলগুলি দিয়ে গেলেন। বাসে বা ট্রেনে ক'রে বেড়াতে গেলে, রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে অগুন্তি লোক ঋতাকে লজেন্স চকলেট দেয়। আমরা যে দোকান থেকে বাজার করি সেই দোকানে প্রত্যেকদিন ঋতাকে আপেল, না হয় লেবু না হয় চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট কিছুনা কিছু দেবেই। এই শহরের লোকেরা শাড়ীপরা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে আমাদেরই বোধহয় প্রথম দেখছে কারণ রাস্তার লোকেরাত আমাদের দিকে অবাক হয়ে দেখেই এমনকি যারা খুব জোরে রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যায় তারাও আমাদের দেখে গাড়ী প্রায় থামিয়ে ফেলে দেখতে দেখতে যায়।

গত শনিবার দিন ট্রেনে করে এখান থেকে পনর মাইল দূরে একটা গ্রাম দেখবার জন্য বেড়াতে গেছিলুম।

এদের দেশের গ্রাম আমাদের দেশের মত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন নয়। ক্ষেতগুলি খুব বিরাট বিরাট এবং খুব সুন্দর সাজান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিতে সার দেয় এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমি চাষ করে। গ্রামের বাড়ীগুলি ছোট হলেও খুব সুন্দর সাজান। প্রত্যেক বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো ও কলের জলের ব্যবস্থা আছে। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো আছে। গ্রামের লোকদের খেলবার জন্য খেলার মাঠ আছে। রেষ্টুরেন্ট-গুলি শহরেরই মত সুন্দর সাজান, ভেতরে বাজনা বাজছে। স্কুল, গির্জ্জে, দোকানপাট প্রভৃতি শহরের মত কিছু কিছু সবই গ্রামে আছে। আমরা যখন গ্রামের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে রেল লাইনের ধারে এসে পৌঁছেছি সেই সময় একটা চলন্ত ট্রেন থেকে অনেক লোক আমাদের দেখে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল, আমরাও অবশ্য তাদের দেখে হাত নাড়লুম।

গত রবিবার দিন বাসে করে এখান থেকে আট দশ মাইল দূরে "নিউরেনবার্গ" শহর দেখতে গেছিলুম। এই শহরটি (এরলাংগেনের) চেয়ে বেশবড়। আমাদের চেনা দুজন ভদ্রলোক আমাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন। আমরা প্রথমে একটি প্রাচীন দুর্গ দেখতে গেলুম, এটি খুব প্রকাণ্ড এবং খুব উঁচু। এই দুর্গে আবার একটি স্তম্ভ আছে এখান থেকে সমস্ত শহরটা দেখা যায়। আমরা ঐ স্তম্ভের উপর উঠে সমস্ত শহরটা দেখলুম এবং নামবার সময় সিঁড়ি গুণে দেখলুম দেড়শ সিঁড়ি আছে। সেদিন যত লোক দুর্গ দেখতে এসেছিল সকলেই আমাদের শাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ দেখছিল। দুর্গের বাইরে এসে আমরা যখন দাঁড়িয়েছি সেই সময় এক বৃদ্ধা জার্মান মহিলা এসে আমাদের অনুমতি নিয়ে আমাদের ছবি তুললেন। তারপর এক রেষ্টুরেন্টে গিয়ে কফি খেয়ে বড় বড় দোকানগুলি দেখলাম। কোলকাতায় কোথাও এত বড় এত সুন্দর সাজান দোকান নেই। এই শহরে ট্রাম বাস দুই আছে। তারপর ট্রামে চড়ে কিছুদূর গিয়ে একটা লেকের ধারে বেড়ালুম। সেই লেকে অনেক লোক নৌকা করে জলের উপর বেড়াচ্ছে। লেকের ধারে অনেক চেয়ার টেবিল পাতা আছে, চারিধারে সুন্দর ফুল দিয়ে সাজান। তারপর হিটলার যেখানে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন সেই জায়গা দেখতে গেলুম। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায় তিন তলার মত উঁচুতে একটা বিরাট পাথরের দালান আছে এবং সেই দালানে অনেক বিরাট বিরাট থাম আছে। এই জায়গাটা এত চওড়া যে সিঁড়ির একপ্রান্তে দাঁড়ালে অপর প্রান্তের লোককে চেনা যায়না। এই চওড়া সিঁড়িগুলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেই প্রকাণ্ড দালানের ঠিক মাঝ বরাবর রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় হিটলার দাঁড়াতেন। এর সামনে চওড়া রাস্তা তার পরেই বিরাট মাঠ সেখানে দর্শকদের দেখবার জন্য ষ্টেডিয়াম করা হয়েছে। এই জায়গাটা আমরা যখন দেখছিলুম তখন দুজন জার্মান ভদ্রলোক আবার আমাদের অনুমতি নিয়ে আমাদের ছবি তুললেন। আর কিছু দেখা হয়নি, বিকাল ছটায় আমরা বাসে করে (এরলাংগেন) ফিরে এলুম।

আমরা কিছুদিন আগে এখানের ইন্দোজার্মাণ এসোসিয়েশনের এক অনুষ্ঠানে গেছিলুম। সেখানে ভারতীয় ও জার্মাণ সঙ্গীতের ব্যাখ্যা এবং চিত্রাঙ্গদা ও জার্মাণ সঙ্গীতের কিছু অংশ টেপ রেকর্ডে বাজিয়ে শোনান হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "নিউরেনবার্গে"র এক অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছি। সেখানে কি হল চিঠিতে পরে জানাব।

(ক্রমশঃ)

গৃহজীবনে বিজ্ঞান ঃ উত্তাপ

ডাঃ অনাদিনাথ দাঁ

আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আমাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের কাজে লাগিয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্যের কত উন্নতি করেছে এবং অল্প আয়াসে অনেক কাজ সম্পন্ন করার নানা কৌশল আয়ত্ত করেছে। বিজ্ঞানের এই সর্ব্বব্যাপী প্রভাব থেকে মানুষের গৃহজীবনও বাদ পড়ে নি। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের উন্নতির ঢেউ সেখানেও পৌঁছে আমাদের জীবন-যাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কত বাড়িয়ে তুলেছে। আজ এরই একটী দিক নিয়ে তোমাদের কাছে আলোচনা করব।

বিজ্ঞান আজ আমাদের গৃহজীবনের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে মিশে গেছে যে প্রথম নজরে এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না—বিশেষ ক'রে উত্তাপের প্রয়োগের কথা। কিন্তু একটু ভাবো দেখি—আজ যে বাড়ীতে রান্না-খাওয়া সেরে স্কুলে এসেছ, উত্তাপের ব্যবহার ছাড়া—তা' সম্ভবপর হত কি? তোমরা হয়ত' বলবে যে কয়লা দিয়ে উনান ধরানো—এত' চিরকালই হয়ে আসছে—এতে বিজ্ঞানের প্রভাব কোথায়? ঠিক কথা, কিন্তু কয়লা পুড়িয়ে এত তাপ কেন পাওয়া যায়, একথা একবারও ভেবে দেখেছ কি? আসলে, উনানে কয়লা পোড়ানোর বৈজ্ঞানিক অর্থ হল কয়লা বা অঙ্গারের সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটানো এবং এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। কাজে কাজেই এই ধরণের তাপের ব্যবহারকে বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিশ্চয়ই বলতে পারি—কি বল?

বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকাল কয়লা ছাড়াও রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। তোমরা যা'রা ক'লকাতায় থাক, তারা পথে-ঘাটে গ্যাসের আলো নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। যে গ্যাসের সাহায্যে এই আলো জ্বলে, সেই গ্যাস দিয়ে রান্নার কাজও করা যায়। এই গ্যাসকে বলা হয় কোল গ্যাস। কোল গ্যাসের একটী বিশেষ গুণ এই যে সামান্য একটী দেশলাই এর কাঠির আগুনেই এই গ্যাস জ্বলে ওঠে ও প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি করে।

শহর অঞ্চলের গৃহজীবনে কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে উত্তাপ সৃষ্টি ক'রে রান্নার কাজ করা হয়ে থাকে। এই ধরণের সরঞ্জামকে ইলেকট্রিক হিটার বলে। এগুলিতে সাধারণতঃ "নাইক্রোম" তারের একটী কুণ্ডলী সাজানো থাকে এবং এই কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাল পাঠানো হয়। এর ফলে কুণ্ডলীটী ক্রমশঃ গরম হয়ে ওঠে ও তাপ বিকিরণ করতে সুরু করে। এই ভাবে পাওয়া তাপের সাহায্যে রান্না ছাড়াও আরো অনেক কাজ করা যায়। যেমন ধর, জামাকাপড় ইস্ত্রী করা বা শীত প্রধান দেশে ঘর গরম করা ইত্যাদি। এমন কি বাড়ীতে চুল শুকানোর কাজেও আজকাল এদের ব্যবহার হচ্ছে।

এ সব ত' গেল উত্তাপের সরাসরি প্রয়োগের কথা। এবার একটু ভিন্নরূপে উত্তাপের ব্যবহারের কথা আলোচনা করা যাক্। এই প্রসঙ্গে আমি যদি পেট্রোম্যাক্স, বিজলীবাতি প্রভৃতি আলোর কথা বলি,

তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বেশ অবাক্ হয়ে যাবে। কেন না এগুলিতে উত্তাপের যে কোন প্রয়োগ আছে, তা' ত' প্রথমে মনেই হয় না। অথচ, আসলে ঐ সবগুলি ক্ষেত্রেই পদার্থকে উত্তপ্ত করার ফলেই আলো পাওয়া যায়। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। তোমরা লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে কোন পদার্থ গরম করলে প্রথমে সেটী লাল হয়ে ওঠে—অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় তা' থেকে লাল জ্যোতি বেরুতে থাকে। তখন তার তাপমাত্রা প্রায় ৬০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। তারপর তাপমাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে উত্তপ্ত পদার্থটী থেকে নির্গত জ্যোতির রংও বদলাতে থাকে—প্রথমে সেটী গাঢ় লাল হয়—ও পরে ১৪০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা আরো বেশী তাপমাত্রায় এটী উজ্জ্বল সাদা বর্ণ ধারণ করে। এইভাবে পদার্থকে উত্তপ্ত ক'রে আমরা তা' থেকে আলো পেতে পারি।

এবার পেট্রোম্যাক্স আলোর কথা ধর। এগুলির ভেতর নজর করলে একটী ছোট, সাদা, জালের মত আচ্ছাদন বা ম্যাণ্টেল দেখতে পাবে। এই ম্যাণ্টেল বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে যার ফলে উত্তপ্ত অবস্থায় এটী থেকে তীব্র সাদা জ্যোতি বেরোয়। ম্যাণ্টেলটী প্রয়োজন মত উত্তপ্ত করায় জন্য পেট্রোম্যাক্স আলোয় কেরোসিন তেল জ্বালানো হয়ে থাকে।

বিজলীবাতির ধরণটা কিন্তু একটু অন্য রকমের। এতে ম্যাণ্টেলের পরিবর্তে থাকে টাঙ্গষ্টেন ধাতুর তৈরী একটী তারের কুণ্ডলী। এই কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রয়োগ ক'রে কুণ্ডলীটীকে প্রায় ৩০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মত উত্তপ্ত করা হয়। এই অত্যধিক উত্তাপের ফলে টাঙ্গষ্টেন কুণ্ডলী থেকে সাদা জ্যোতি বেরিয়ে সারা ঘর আলো করে দেয়। বিজলী বাতিতে বিশেষ করে টাঙ্গষ্টেন ধাতু কেন ব্যবহার করা হয় বলতে পার? এর কারণ হল এই যে এত বেশী উত্তাপেও এই ধাতুটী গলে যায় না।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে উত্তাপ প্রয়োগে পদার্থ আয়তনে বৃদ্ধি পায়। আমাদের দৈনন্দির জীবনে পদার্থের এই ধর্ম্মটী কাজে লাগানো হয়েছে জ্বর দেখা থার্ম্মোমিটারে। এই ধরণের থার্ম্মোমিটারের সরু কাঁচের নলের ভেতর Mercury বা পারা ভরা থাকে। দেহের উত্তাপের সংস্পর্শে এসে এই পারা আয়তনে বাড়তে সুরু করে। থার্ম্মোমিটার তৈরী করার সময়ই প্রস্তুতকারীরা পারা কত উত্তাপে কতখানি বাড়বে, তা' নলের গায়ে নির্দ্দেশ করে দেন। সুতরাং নলের ভেতর পারার অবস্থান দেখে রোগীর জ্বর কত, তা' সহজেই বলে দিতে পারা যায়।

উত্তাপ প্রয়োগে সব পদার্থ কিন্তু সমান অনুপাতে বাড়ে না। অর্থাৎ একই পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগে একটী ধাতু যতখানি বাড়বে, একখণ্ড কাঁচ ততখানি বাড়বে না তোমরা লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে বাড়ীতে একটী কাঁচের শিশির ঢাকনা সহজে খুলতে না পারলে শিশিটীকে অনেক সময় অল্প গরম ক'রে নেওয়া হয়। এতে দেখা যায় যে ঢাকনা খোলা অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে গেছে। এর কারণ আর কিছু নয়—গরম করায় ফলে কাঁচের শিশি যতটা বাড়ে, ধাতুর ঢাকনা বাড়ে তার চেয়ে বেশী। ফলে ঢাকনাটী শিশি থেকে আলগা হয়ে পড়ে।

Refrigerator বা বরফকল যন্ত্রটী আজকাল আর তোমাদের কাছে বিশেষ অপরিচিত নয়। এর সাহায্যে জল থেকে বরফ তৈরী করা যায়, এর ভেতর ফল, মূল বা অন্যান্য খাবার জিনিষপত্র রাখলে তা' ঠাণ্ডা থাকে, আর তার চেয়েও বড় কথা, এগুলি সহজে নষ্ট না হয়ে অনেক বেশীদিন ভাল অবস্থায় থাকে। তোমরা শুনলে অবাক্ হবে যে যদিও পদার্থকে ঠাণ্ডা করাই এই যন্ত্রটীর কাজ তবু উত্তাপের প্রয়োগ ছাড়া সে কাজ সম্ভবপর হত না। একটী Refrigerator কি ভাবে কাজ করে, তা' শুনলেই আমার কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পদার্থের তিনটি অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয় এ তোমরা সবাই জান। উত্তাপ প্রয়োগ ক'রে যে কোন পদার্থকে কঠিন থেকে তরল ও পরে তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। বড় হলে তোমরা শিখবে যে তরল পদার্থের ওপরকার বায়ুর চাপ যত কম হয়, তরল পদার্থকে তত সহজে অর্থাৎ তত কম উত্তাপ প্রয়োগে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। একটী উদাহরণ দিই। দার্জ্জিলিং শহর পাহাড়ের ওপর অবস্থিত বলে এখানের বায়ুর চাপ ক'লকাতার বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম। সুতরাং একবাটী জলকে বাষ্পে পরিণত করতে কলকাতায় যতটা উত্তাপের প্রয়োজন হবে, দার্জ্জিলিং শহরে ঐ একই পরিমাণ জলকে তারচেয়ে কিছু কম উত্তাপ দিয়ে বাষ্পে পরিণত করা যাবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে তরল পদার্থের ওপরকার বায়ুর চাপ যত কমানো যাবে, বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরের জন্য তার প্রয়োজনীয় উত্তাপের পরিমাণও তত কম হবে। এই ভাবে বায়ুর চাপ কমিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যখন তরল পদার্থ খুব সহজেই অর্থাৎ খুব কম উত্তাপ প্রয়োগেই বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়—এর জন্য তখন যে অল্প পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন, তা' আর আলাদা-ভাবে জোগান দিতে হয় না—আশেপাশের আবহাওয়া থেকেই পদার্থ এই উত্তাপ টেনে নেয়। এখন এই প্রক্রিয়া যদি ক্রমাগত চলতে থাকে, তবে আশেপাশের আবহাওয়া ঐ উত্তাপ সরবরাহ ক'রতে ক'রতে ক্রমশঃ নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। Refrigeaator যন্ত্রের ভেতরের আবহাওয়া সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতেই ঠাণ্ডা করা হয়ে থাকে।

এ পর্য্যন্ত যা' বলেছি তা'তে হয়ত' মনে হবে যে একটী Refrigerator যন্ত্র চালু রাখতে অবিরত কোন তরল পদার্থ সরবরাহ করা দরকার। আসলে কিন্তু একই পরিমাণ পদার্থ যাতে বারবার ব্যবহার করা যায় তার জন্য বায়বীয় অবস্থায় পদার্থটীকে ধরে রাখা হয় ও চাপ প্রয়োগ ক'রে পুনরায় তরল পদার্থে পরিণত করা হয়।

আজকালকার গৃহজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবে যে কত ব্যাপক, তা' বলে শেষ করা যায় না। আজ ত' কেবল এর একটী মাত্র দিকের কথাই শুনলে। পরে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের প্রয়োগের কথা শুনবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে বিজ্ঞানকে ঠিকপথে চালিত করলে তা' দিয়ে মানুষের কল্যাণকর কত কাজ সাধিত হতে পারে।

*কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

ভোরের আলো

ছোট বন্ধুরা আমার ঃ

বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাংলাদেশ। এই সময়ে যে পার্বণ উৎসব বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তা পূর্ণতার উৎসব—পৌষ পার্বণ। বাংলার দিগন্ত প্রশারী মাঠ এনে দিয়েছে ফসলের প্রাচুর্য। তাই পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে এ সময়ে এই উৎসব।

ছাত্রদের এ সময়টা ছুটির সময়। সারা বছরের পাঠ সাঙ্গ হয়ে যায় এ সময়। তবে পরীক্ষার ফলাফলের জন্য কেউ কেউ চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাই এই পার্বণ উৎসবে সকলে মন খুলে যোগ দিতে পারে না। মন যখন চিন্তাহীন থাকে তখনই সে সকল আনন্দের ভাগ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করে।

যাক সে কথা। আশা করি তোমরা সকলেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠেছ। নূতন শ্রেণীতে নূতন উদ্যমে পড়াশুনা কর আর সেই সঙ্গে মানুষের সৎপ্রবৃত্তিগুলি আয়ত্ত কর। পড়াশুনার আসল উদ্দেশ্য মানুষ হওয়া। তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল কর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা। অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি এরই পরে নির্ভর করে। এই শিক্ষার প্রশস্ত সময় ছাত্রজীবন। স্মরণ রেখো তোমরা বাঙালী। তোমাদের অনেক বড় হতে হবে। অনেক দায়িত্ব তোমাদের কাঁধে। স্মরণ রেখো বাঙলার বীর সন্ন্যাসীর কথা—"আর কখনো কোন দেশের যুবকগণের স্কন্ধে এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, বাঙলার যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

ইতি

সারথী ভাই

ঔষধ আবিষ্কার

শ্রীশিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্যাঁচড়া গায়ে পিলে পেটা ভুগ্‌ছে জ্বরে মোড়ল খুড়ো,
শয্যা পরে দিবস রাতি খকর খকর কাস্‌ছে বুড়ো।
গোঁসাই মশাই রক্ত আমে মাস এগার হয়ে সারা,
ঠিক দুপুরে একেবারে দাঁত খিচিয়ে গেল মারা॥
ধুক্‌ছে মামা সর্দ্দিজ্বর আর, হাঁফ্‌ কাসিতে জখম হয়ে,
শক্ত রোগে তাহার শরীর একেবারে গেছে ক্ষয়ে।
শূলব্যাধিতে বছর দেড়েক ভুগছে গাঁয়ের শান্তিবাবু,
সকল কর্ম বন্ধ কোরে, অশান্তিতে হয় সে কাবু।
তারপরেতে এল যে এক মস্ত বড় শক্ত অসুখ,
মা শীতলার বাহন তারা নাম শুনিলে কাঁপে যে বুক।
কলেরা আর বসন্ততে গ্রামগুলো প্রায় উজাড় হলো,
কাক্‌ শকুনি বললে হেসে বেশ হতেছে পটল তোলো।
এমন সময় মহারাজের মাথা গেল খারাপ হয়ে,
অমাত্যকে ডেকে এনে কড়া করে দিল কয়ে,
"লাখে লাখে প্রজা মরে তুমি কি হে দেখছ না তা—
মানুষ বিনে গ্রামগুলো সব মাঠের মত করছে খাখা।
বদ্যি আনো, ওষুধ আনো, তবেই তুমি মুক্তি পাবে।
সাতটি দিনের মধ্যেতে চাই, নচেৎ তোমার পরাণ যাবে।"
জ্ঞানী,গুণী যত ছিল ডাকল সবে মন্ত্রী মশাই,
বল্‌ল কেঁদে, "বাঁচাও আমায় নচেৎ শূলে যাবরে ভাই।
মড়ক লেগে কাল হয়েছে রাজার মাথা খারাপ হলো,
বদ্যি ওষুধ খোঁজ কোথাও দিব টাকা হাজার ষোল।
মড়ক লেগে হলে মরণ যেতাম আমি স্বর্গে সুখে,
রাজার কথা শুনেই আমার শূলের ফলা বিধছে বুকে।"

(২)

হাজার হাজার খাতা কিনে অঙ্ক কত কষল লোকে,
ওষুধ নাহি হয় আবিষ্কার সরিষাফুল দেখল চোখে।
কত কবি পদ্য বানায়ে খাতার পাতা করল বোঝাই'
শ্রমের দরুণ পরাণ তাদের, যেন আই ঢাই করে সদাই।
হাজার হাজার পাখা এসে হাজির হলো তাদের তরে,
কবিরা সব ভাবে বিভোর কিন্তু কেবা পাখা করে?
পাখার লাগি বিদেশ থেকে আসিল রাজার সভায়,
তাল বুঝিয়া টাকা কড়ি লুটে নিয়ে তারাই পলায়।
রাজ্যর ঘরে আর দেশেতে কান্নাকাটি পড়লো বড়ো,
রাজাদেশে সিপাই এসে রাত দুপুরে হলো জড়ো।
ধরো চোরতে ঐ যে পলায় যেমন কথা কানে এল,
মার্‌ পাজীকে বলি সেপাই ফাটায় চোরের মাথার তেলো।
আলো জ্বেলে দেখ্‌ল সবে, এ যে নহে অন্য কেহ,
একেবারে মন্ত্রী মশাই, কাঁপছে রাগে তাহার দেহ।
রাজা বলে বুদ্ধি বটে আমার জ্ঞানী গুণীর মত,
জানি নাকো ধরার মাঝে আছে কি লোক এদের মত!

(৩)

অবশেষে বুনো দেশের ঝুনো মানুষ বললো এসে—
জানি ওষুধ খেলে পরে রোগ হবে না তোমার দেশে।
মন্ত্রী যেন বাঁচলো শুনে, বললে তবে এক্ষুণি হোক্‌,
রাজার ছেলে খেয়ে প্রথম খানিক পরে বুজল সে চোখ

রাজা দেখে উঠলো চোটে বললো, "একি কাণ্ড শুনি ?
মন্ত্রী, তুমি একই দোষে বদ্যি সাথে হলে খুণী।"
অমনি তখন তাদের ধরে শূলের কাছে চলল নিয়ে,
বলল রাজা, "শাস্তি লহ তোমাদের ঐ জীবন দিয়ে।"
শূলের পাশে বসে দুজন, কারোর মুখে কথাটি নাই,
এমন সময় আস্‌ল ঋষি বললো, "রাজা, করছ কি ভাই।
আমি দেশের শান্তি করে ঔষধেরি শিক্ষা দিব,
আনন্দ ফের আসবে ফিরে, অসুখ হতে বাঁচাইব,
জড়িবটির মাহাত্ম্যতে অসুখ হতে বাঁচলো সবে,
আপদ বালাই সব পালাল মন্ত্রী বুঝি বাঁচলো তবে।
মন্ত্রী এবার বললো হেসে,—লৌহ, শূলের ওষুধ করো,
পিলে রোগীর পেটটি বিধে ইহার দ্বারা পিলে হরো।

(৪)

শূলের মুখের বদ্যিটিকে বললো ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে,
"বিদ্যে এমন শিখ্‌লে কোথায়, কোন সে গুরুর সঙ্গ লয়ে?
না শিখিয়া টাকার লোভে যাতা ওষুধ দিলে পরে,
সুস্থ মানুষ ব্যস্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে।
অমূল্য সে মানব জীবন, পুতুল সম নহে তাহা,
আর করোনা এমন কাজ, আজকে তুমি করলে যাহা?
সে দিন হতে শিখ্‌ল মানুষ বৃক্ষ হতে ওষুধ যত।
মন্ত্রী আবার বসতে পেল রাজার পাশে আগের মত।

সাধুবাবা

শৈলেন্দ্র মোহন দত্ত

সত্যিই কপালে আমার দুঃখ লেখা ছিল। অনেক না হ'লেও দুঃখের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। তাই আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে কাণের উপরের জটাজাল ভেদ করে কর্ণপটহে এসে বিঁধ্‌ল মেজদার গলার বজ্রনিনাদ—'কমলাক্ষ'!

পেছন ফির্‌তেই দেখি—বেত হাতে দাঁড়িয়ে মেজদা। সাধুবাবার শেষ পরিণতির কথা ভেবে দাঁড়ি গোঁফ খুলবার চেষ্টা কর্‌তে খপ্‌ করে কান টেনে ধরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন,—হতভাগা, পাজি কোথাকার! আমার এগুলোর দিকেও তোমার নজর গেছে?

চার্‌দিক্ একবার দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। পরমভক্ত নাটু হয়তো ভাব্‌ছে—যে সাধুবাবা এতক্ষণ সকলের ভবিষ্যৎ নির্বিবাদে গুণে দিল—ক্ষণপরে নিজের কি হ'তে পারে এটুকুও সে বুঝ্‌তে পারে নাই;—কিন্তু হায়, হরিবে বিষাদ! সকলে তখন দাঁত বে'র করে সাধুবাবার বিচার প্রহসন সানন্দে উপভোগ কর্‌ছে।

মনে মনে বল্‌লাম—হে মা ধরিত্রী! তুমি দ্বিধা হও। আমি পাতাল প্রবেশ করি। কিন্তু এ ঘোর কলি। ধরিত্রী দ্বিধা হ'ল না। আমারও পাতালে আশ্রয় মিল্‌ল না মিল্‌ল মেজদার গলা ধাক্কা। অভিমানে দুঃখে ও লজ্জায় আমি ধরিত্রীর বুকে জটাদেড়ী শুদ্ধ উপর হ'য়ে পড়্‌লাম।